অষ্টম গর্ভ

বাণী বসু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাণী বসুর জন্ম ২৬ ফাল্গুন, ১৩৪৬।
শিক্ষা-দীক্ষা-কর্ম কলকাতায়।
শিক্ষা : প্রথমে লেডি ব্রেবোর্ণ, পরে স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্রী। ইংরেজিতে অনার্স, পরে ইংরেজি সাহিত্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. (১৯৬২)।
কর্ম : হাওড়া বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজের অধ্যাপিকা।
লেখালেখি : ছাত্রী-জীবন থেকেই প্রবন্ধ-গল্প-কবিতা ও অনুবাদ-কর্মে নিযুক্ত। উল্লেখযোগ্য অনুবাদ : শ্রীঅরবিন্দের সনেটগুচ্ছ (শৃণ্বন্তু), সমারসেট মমের সেরা প্রেমের গল্প (১৯৮০, রূপা), সমারসেট মমের সেরা গল্প (১৯৮৪, রূপা) ও ডি.এইচ. লরেন্সের সেরা গল্প (১৯৮৭, রূপা)। আনন্দমেলা ও দেশ পত্রিকায় প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালে। 'জন্মভূমি মাতৃভূমি' প্রথম উপন্যাস। শারদীয় 'আনন্দলোক'-এ প্রকাশিত, ১৯৮৭-তে। পেয়েছেন তারাশঙ্কর পুরস্কার ১৯৯১, আনন্দ পুরস্কার ১৯৯৭। **বঙ্কিম পুরস্কার ১৯৯৯।**

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃষ্ণ এক অদ্ভুতকর্মা শিশুর নাম। আমাদের লোককথায়, পুরাণে, আমাদের চেতনায় মিশে আছে কৃষ্ণকথা। তার ওপরে আছে অবতার-ভাবনা। প্রতিনিয়ত আমরা কৃষ্ণের অবতরণের প্রত্যাশায় থাকি। এই প্রত্যাশা যেমন করুণ তেমনই কৌতুকাবহ। কেননা জাতীয় চৈতন্যে ওতপ্রোত এই কৃষ্ণকথা যেন এক রূপক যা বাস্তব হয়ে উঠতে চায় ঘরে ঘরে শিশুদের জন্মে, তাদের বড় হয়ে ওঠায়, তাদের সম্পর্কে আমাদের আশায়। কোনও না কোনওভাবে তারাও অদ্ভুতকর্মা, যেন এক একটি ছায়াকৃষ্ণ। মহামানবের পুনরাবির্ভাবের স্বপ্ন শুধু আমাদের বিশেষত্ব নয়, স্বপ্নও। অর্ধস্ফুট এই আকাঙ্ক্ষার একান্ত মানবিক প্রেক্ষাপটে তিনটি শিশুর বেড়ে ওঠার কাহিনী 'অষ্টম গর্ভ'। তাদের ঘিরে আবর্তিত হয় বাংলার ইতিহাসের সবচেয়ে কালান্তক সময়। শৈশবকে সাধারণত একটি সুন্দর উপসময় হিসেবেই দেখি আমরা। কিন্তু মানুষ, পৃথিবী, জীবন সম্পর্কে শিশুর বোধও তো বড়দের মতোই বাস্তব সত্য! শিশুদের দেখাকে পূর্ণ গুরুত্ব দিয়ে তৈরি হয়েছে এই উপন্যাসের আখ্যানভাগ। যেহেতু তাদের বোধের জগৎ বড়দের জগতের সঙ্গে সমান্তরাল নয়, তাই দুই জগৎ পরস্পরের সঙ্গে কাটাকুটি খেলে এ উপন্যাসে। তৈরি করে এক জটিল ছক। বস্তুজগৎ সেখানে অনবরত পুরাণ হয়ে যাচ্ছে আর পুরাণ হয়ে উঠছে বাস্তব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ISBN 81-7756-043-3

অষ্টম গর্ভ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অষ্টম গর্ভ

বাণী বসু

আনন্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবা ৺সূর্যপ্রকাশ চৌধুরীকে
শ্রদ্ধার্ঘ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্র থ ম স্ক ন্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্বরঙ্গ

নীলকান্তমণির ন্যায় গাত্রবর্ণের পেশল হ্যান্ডসম পুরুষ তিনি। বিরাট বিশাল। উঁকিঝুঁকি মারিলাম। আশেপাশে কিছুই দেখিতে পাইলাম না। ভূর্ভুবঃস্বঃ আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আকাশে ডান হাতের তর্জনী তুলিয়া শঙ্খনাদে বলিলেন, 'আমি কি অবতীর্ণ হইব ?'

তাঁহার শূন্য তর্জনীর দিকে চাহিয়া দুশ্চিন্তিত হইয়া বলিলাম, 'প্রভু আপনার চক্র কোথায় ?'

—'দুষ্কৃতীদের বিনাশের জন্য পাঠাইয়াছিলাম, যুগ ঘুরিতে চলিল, ফিরে নাই।'

—'সর্বনাশ ! হইলটা কী ? গেল কোথায় ?'

—'টুকরাটুকরাটুকরাটুকরাটুকরাটুকরা হইয়া পৃথিবীময় ছড়াইয়া গিয়াছে শুনিতেছি। নিউট্রন বোমা হইতে চকোলেট বম্ পর্যন্ত বিচিত্র রূপে।'

—'তাহা হইলে আর আপনি যাইয়া কী করিবেন ?'—হতাশ হইয়া বলিলাম। এই চক্রই তো শিশুপালবধ করিয়াছিল। চক্রহস্তে ছুটিয়া আসিতেছেন দেখিলে তবেই তো লোকের কাপড়ে-চোপড়ে হইয়া যাইত !

নীলকান্ত পুরুষ চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া তর্জনী ঘূর্ণিত করিলেন। অর্থাৎ চক্র নাই তো কী হইল ? তর্জনী তো রহিয়াছে। তাহাতে কমান্ডও আছে। চক্ষু আছে, তাহাতে রাইচাস ইনডিগনেশনের অগ্নিশিখা জ্বলিতেছে না কী ? মস্তক আছে, মস্তিষ্কে ডিপ্লোম্যাসি কি নাই ? আশা করিয়াছিলেন বলিব—

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্তমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম, ত্বয়া ত্বং বিশ্বমনন্তরূপ।

[তুমিই আদিদেব, পুরাণ পুরুষ, তুমিই বিশ্বের লয়স্থান ! জ্ঞাতাও তুমি, জ্ঞেয়ও তুমি, চৈতন্যও তুমি, হে অনন্তরূপ, বিশ্বকে ব্যাপ্ত করিয়া আছ তুমিই।]

একদা তৃতীয় পাণ্ডব চমৎকার দেখিয়া, চমৎকার শুনিয়া ভুলিয়া ছিলেন। কিন্তু ভবি ভুলিল না। ভবি অনেক মেগালোমেনিয়াক দেখিয়াছে।

বলিলাম, 'চক্রটি তাহা হইলে এখন দুঃশাসনের হাতে ? শকুনির হাতে ? কী হইবে ?'

অট্টহাস্য করিলেন, 'কুরুবংশ ধ্বংস করিয়াছি, যদুবংশ ধ্বংস করিয়াছি। যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি' ইত্যাদি ইত্যাদি।

মনে মনে বলিলাম—ধ্বংসই যদি সমাধান হইত তো কয়েকটি সুপার-পাওয়ারের ভাঁড়ার হইতে গুটিকতক বোমা কব্জা করা আর এমন কি কঠিন কাজ হইত ! চারিদিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এত প্রতিভাশালী স্মাগলার রহিয়াছেন ! বাঁচিয়া থাকিতে চাওয়াই যে জীবের স্বভাব ! সকলেই চায় অন্যরা মরিয়া যাক, আমরা বাঁচিয়া থাকি। সেটি সম্ভব নয় বলিয়াই ক্রমাগত পাঁয়তাড়াই কষিয়া যাইতেছে, পাঁয়তাড়াই কষিয়া যাইতেছে। রণক্ষেত্রের সম্মুখসমর ছাড়িয়া বাণিজ্যক্ষেত্রের গেরিলা ট্যাকটিক্স ধরিয়াছে। না হইলে সাদ্দাম-বুশের স্কাড-পেট্রিয়ট দ্বৈরথ কি মুষলপর্ব হইতে কোনও অংশে কম ?

মুখে বলিলাম, 'ধ্বংস করিতে কি সত্যই পারিয়াছেন ? এত দুঃশাসন কোথা হইতে আসিল ? এত শকুনি !'

সহসা তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নি অন্তর্ধান করিল। গাত্রবর্ণ ফেকাশে হইতে লাগিল। তিনি এক হাত কনুই ভাঙিয়া ফণার মতো উপরে তুলিয়া আর এক হাত শস্য ঝাড়িবার কুলার মতো নিম্নমুখী করিয়া বরাভয় মুদ্রায় দাঁড়াইলেন। কুঞ্চিত কেশ সদ্য গজাইয়া মস্তকময় পাকাইয়া পাকাইয়া রহিয়াছে। মস্তকের শীর্ষভাগ সামান্য উঁচু। রক্ত গৈরিক ত্রিচীবর তাঁহার পদ্মপলাশবর্ণ গাত্রে বড়ই মানাইয়াছে।

কেশবধৃত বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে !

দেখিলাম ইনি পুরাপুরি গান্ধার আর্টের নহেন। আবার পুরাপুরি মোঙ্গলীয় ধাঁচেরও নহেন। অজন্তার এক নং গুহার উপবিষ্ট মূর্তিটিরই মতো উদাসে কোমলে মুখরুচি।

সবিনয়ে বলিলাম, 'ভন্তে, আপনি আবার কেন ? সভ্যজগৎ অর্থাৎ পশ্চিম-গোলার্ধ এমনিতেই ভেজ হইয়া যাইতেছে। পূর্বাঞ্চলে আবার মাংসাদিও ঘাসের ন্যায় স্বাদযুক্ত। আপনিই ত্যাগ হইয়া যাইবে।'

—'তথাগত তো পৃথিবীকে ভেজ করিতে আইসেন নাই !'

—'শুনিয়াছি বটে, ভিক্ষান্নে মৎস্য মাংসাদিতে আপনি আপত্তি করিতেন না। যাহা হউক আপনার বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধে কী ?'

—'দরিদ্র সুন্দর। দারিদ্র্য সুন্দর। ভোগ সুখ ত্যাগই একমাত্র পথ।'

—'শুনিয়াছিলাম যেন আপনি মধ্যপন্থার সুপারিশ করিয়াছিলেন ?'

ভগবান বলিলেন, 'ওই হইল আর কি !'

দেখিলাম ইনি নিজবাণী ছাড়িয়া 'সিসটার্স অফ চ্যারিটি'র বাণীই গ্রহণ করিয়াছেন। হইবে না কেন ? যস্মিন যুগে যদাচার। মাদার টেরিজা এখন তাঁহাকে সুপারসীড করিয়াছেন।

করুণা হইল। গোপন করিয়া বলিলাম, 'তাহা হইলে আপনাকে আগে বিজ্ঞাপনদাতাদিকে কনভিন্‌স্ করিতে হইবে ভন্তে। ইঁহারা বাচ্চাদের বলিতেছেন—"অহে বাচ্চা, আঁস্তাকুড় হইতে নিমাইয়ের মতো উঠিয়া আইস। নিমাই শচীমাতাকে অস্পৃশ্যতার সংজ্ঞা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কদাপি ওরূপ করিও না। মাতা স্বাস্থ্যবিধি বুঝাইতে জীববিদ্যার ব্যাকটিরিয়া-ভাইরাসাদির অধ্যায় হইতে শুরু করিবেন। তুমি শুধু ঠোঁট ফুলাইয়া মাম্মিকে জানাইয়া দাও একটি বিশেষ ব্র্যান্ডের সাবান ছাড়া স্নানই করিবে না।" ইঁহাদের যুবক পথপার্শ্বের দোকানেই পাওয়া যায় এমন একটি পানীয়র বোতলের জন্য পর্বতশীর্ষ হইতে দড়ি পায়ে বাঁধিয়া ঝাঁপ খাইতেছে, ছুটন্ত ট্রাক হইতে বোতল তুলিয়া লইতেছে। অর্থাৎ এক বোতল সাড়ে সাত টাকা দামের পানীয়র জন্য যুবক জান-মান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকলই বিপন্ন করিল। মর‍্যাল ক্যারেক্টারের আর রহিল কী ? একটি দুর্গত যুবক যদি একই কার্য করিত, তাহাকে কি চোর বলিয়া গণপ্রহার খাইতে হইত না ?'

শীর্ণ হইয়া যাইতেছেন। আর কত রোগা হইবেন ভন্তে ? আরও ফেকাশে। ওমা সুমুণ্ডিত মুখে সোনালি দাড়ি গজাইল যে ! চুলগুলিও বড় বড় হইয়া যাইতেছে। ত্রিচীবর ফেলিয়া কখন যে আলখাল্লা পরিয়া ফেলিয়াছেন বুঝিতেই পারি নাই। দুর্বোধ্য ভাষায় হাত নাড়িয়া নাড়িয়া কী বলিতেছেন। বোধ হইল উহা অ্যারামাইক ভাষা। উনি সার্মন অন দি মাউন্ট বলিতেছেন।

কেশবধৃত খ্রিস্টশরীর জয় জগদীশ হরে।

বলিলাম, লর্ড, আপনি আর হাসাইবেন না।

ঝোঁকে ছিলেন। সার্মনগুলি শেষ করিয়া 'আ য়্যাম দা রেজারেকশন অ্যান্ড দা লাইফ' ইত্যাদি ইত্যাদি বলিয়া যাইতে থাকিলেন। তাহার পর সহসা চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হাসির কথা হইতেছিল কেন ? কে হাসিবে ?'

—'আজ্ঞা, গুড়ায় হাইস্যা দিব।'

—'গুড়া ? অর্থাৎ ঘোড়া ? উহা ওয়র-লাইক অ্যানিমল। হাসিবে কেন ?'

—' "আঁখ মারে, ও লড়কি আঁখ মারে"—গান শুনিয়াছেন ?'

—'ইহা কী ভাষা ? গানটি কি psalm গান ?'

—'ইহা ফিলমি হিন্দি লর্ড, গানটি ফিলমি হিন্দি গানা, তা একরূপ সাম গান বইকি ! ইহাতে কোনও লড়কির চোখ মারার আনন্দসংবাদ জারি করা হইয়াছে।'

—'লড়কি ? অর্থাৎ বালিকা ? ল্যাস্ ? চোখ মারিতেছে ? ইয়ে, মানে বিশেষ পল্লী ?'

—'না লর্ড। সত্য-সত্য মারে নাই। পল্লী-টল্লীও নহে। ভদ্রঘরের কালেজে পড়া বালিকা। ইহাদের প্রকৃত স্মার্ট করিবার চেষ্টা চলিতেছে। "এগজাম্পল ইজ বেটার দ্যান প্রিসেপ্ট" আপ্তবাক্য স্মরণ করিয়া ইহাদের ফিলমের সাহায্যে বোঝানো হইতেছে যে, চোখ মারা ভালো। নিত্যকর্মপদ্ধতির অঙ্গবিশেষ। এই পরিস্থিতিতে "ইফ দাই রাইট আই অফেন্ড দী, প্লাক ইট আউট অ্যান্ড কাস্ট ইট ফ্রম দী", আওড়াইলে হাস্যাস্পদ হইবেন না ?'

লর্ড কথাটি কহিলেন না। আকাশপটে ক্রুশবিদ্ধ হইয়া ঝুলিতে থাকিলেন। এত অল্পেই যদি ইনি ভড়কাইয়া যান তো ঝুলুন। কী আর করিব ? অন্তত একটি ভালো ওয়ল-ডেকোরেশন তো হইয়াছে ! একটি খাজুরাহোর যক্ষী আর একটি ক্রুসিফিক্স থাকিলে ঘরের চেহারা পাল্টাইয়া যায়, যায় না ?

এই সময়ে মহম্মদীয়গণের নবীসংক্রান্ত কিছু ভিসুয়ালও অ্যান্টেনায় ঠেলাঠেলি করিতেছিল। উৎসুক হইয়া গুছাইয়া বসিতেছি। আকাশবাণী হইল :

'ওয়ান টু থ্রি
সলমন রুশদি।
ইলেভন, টুয়েলভ থার্টিন
তসলিমা নাসরিন।'

আমি দুই হাতে চক্ষু ঢাকিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম অধ্যায়

আবির্ভাব

শুনেছি, আমি যখন গর্ভে তখন মা-বাবা কাকভোরে উঠে গীতা পড়তেন। রোজ এক অধ্যায় করে। তার চেয়ে বেশি পড়ার সময় হত না। গোয়াল কাঁড়া, জাবনা দেওয়া, মেঝে নিকোনো, উনুনে গোবর-ন্যাতা দেওয়া—দুটি মুনিষসুদ্ধ এত বড় সংসারের চারবেলার অন্নসংস্থান করা এ সমস্তই তো মাকে করতে হত! সকাল ছটা থেকে আটটা বাবার ইস্কুল বা পাঠশাল বসত একটা চৌচালা ঘরে। আটটা থেকে বারোটা কখনও একটা পর্যন্ত তাঁর ডাক্তারখানা। তারপর চান করে একটু বিশ্রাম করে বাবা পড়ন্তবেলায় মাঠের কাজ দেখতে যেতেন। চারটে থেকে ছটা আবার ডাক্তারখানা। তারপর লণ্ঠনের আলোয় ছেলে-মেয়েদের পড়ানো। শুধু গীতাই নয়, বাবার আকর্ষণ ছিল সবরকম মহামানববাণীর ওপরে। এদিক থেকে তাঁকে রামমোহনীয় বলা যায়। মথি-লিখিত, লুক-লিখিত সুসমাচারগুলিরও সুতরাং বাড়িতে সে সময়ে একটু প্রাদুর্ভাবই ঘটে। লাল লাল ছোট ছোট পুতুলের বইয়ের মতো বই সব এখনও আমাদের বাড়িতে আছে। 'ধম্মপদ'-এর কোনও বাংলা বা ইংরেজি অনুবাদ বাবা পাননি। তবে ঈশানচন্দ্র ঘোষের জাতকগুলি তখন বেরিয়েছে। সেগুলো স-বই তিনি কলকাতা থেকে কিনে আনিয়েছিলেন। 'স্ত্রী-জাতক' প্রমুখ কয়েকটি কাহিনী ছাড়া প্রায় সবই তাঁরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়ে মনে রেখেছিলেন। 'কথামৃত' তো ছিলই। 'রাজযোগ' ও 'স্বামি-শিষ্য সংবাদ'ও ছিল বাবার বিশেষ প্রিয় বই। তবে মায়ের এত খিদে পেত যে ইচ্ছে সত্ত্বেও মা এত কিছু পড়ে উঠতে পারতেন না। শোবার সময়ে বালিশের নিচে বই নিয়ে শুতেন, বাঁ হাতটা বালিশের তলায় গলিয়ে বইটাকে ছুঁয়ে। সে সময়ে সের দেড়েক দুধ নাকি মা অনায়াসে চোঁ চোঁ করে খেয়ে নিতেন। তা ছাড়াও ভাত, তরি-তরকারি, সময়ের ফল, মাছ—এ সব মায়ের ভাষায় মুনিষদের মতো খেয়েও মায়ের খিদে মিটত না। মাথা ঝিমঝিম করত সব সময়ে, সে এক 'আকাশ খাই পাতাল খাই' খিদে। এই খেয়ে উঠলেন আবার খিদে পেয়ে গেল। ভাগ্যিস খেয়েছিলেন! না হলে পৃথিবীর এমন আলো কি দেখতে পেতুম। তা, প্রতিবেশিনীরা নাকি একদিন মায়ের খাওয়া দেখে ফেলেছিল, তারা বলে আকাল আসছে। গর্ভিণীর খাওয়ার পরিমাণ যখন সমস্ত মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, তখন নাকি গর্ভস্থ শিশু আকাল নিয়ে আসে। গর্ভাবস্থায় প্রথম দিকে সমস্ত পৃথিবীর বাতাস মায়ের কাছে যেন বিষাক্ত হয়ে গিয়েছিল। তীব্র কটু গন্ধ পেতেন সব সময়ে। তেল, সাবান ইত্যাদির সুগন্ধও সহ্য করতে পারতেন না। এক মাইল দূরে কাঠকুটো জ্বালালেও মা ধোঁয়ার গন্ধে দম-বন্ধ করা কষ্ট পেতেন। ভাবতেন সত্যিই, এ কি আকালেরই গন্ধ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথিবী কি পচে গেল ? কিন্তু বাবা এ সব আমল দেননি। পঞ্চম মাসে পঞ্চামৃত অর্থাৎ দধিদুগ্ধঘৃতশর্করা ও মধুসহ সাধভক্ষণ করবার পর থেকে না কি মায়ের জন্য হাওয়ায় খালি চন্দনের গন্ধই ভাসতো।

—'দিন-দুপুরে কে আবার ধূপ জ্বাললি রে ?'

—'জ্বালিনি তো মা !'

—'আমি যে ভুরভুর করে গন্ধ পাচ্ছি।'

বাবা শুনতে পেলে ফিসফিস করে বলতেন, 'জ্বলছেন, জ্বলছেন, ভেতরে ভেতরে জ্বলছেন'।

মা নাকি ঝিঁঝির আওয়াজের মতো দূরাগত একটা নূপুরের ধ্বনিও শুনতেন।

—'কোথায় নূপুর বাজছে গো ?'

বাবা বলতেন, 'বাজছেন, বাজছেন, ভেতরে ভেতরে বাজছেন।'

সে সময়ে বাবারা বীরভূমের সুরুলে থাকতেন। বোমাতঙ্কে শহরের লোক সেখানে সদলবলে গিয়ে ভিড় করলে বাবা চটপট সপরিবারে কলকাতায় চলে আসেন। বস্তুত অন্যরা যা করে তিনি সর্বদাই তার উল্টোটা করতেন। ঠাকুর্দাদা থাকতেন শ' বাজারের ভাড়াবাড়িতে। বাবাকে দুম করে এসে পড়তে দেখে বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, 'এভাবে চলে আসাটা তোমার ঠিক হয়নি দুগ্‌গি।'

বাস। বাবার রাগ হয়ে গেল। কয়েকদিনের মধ্যেই কাছাকাছি একটা ভাল বাড়ি সস্তায় পেয়ে বুক ফুলিয়ে পরিবার নিয়ে সেখানে গিয়ে উঠলেন। কারো কোনও কথায় কর্ণপাত করলেন না। বাড়িটা বাবা বড় সস্তায় পেয়েছিলেন। শুধু বড় সুন্দর এবং সস্তাই নয়, কিছুটা ফার্নিশ্‌ডও ছিল বাড়িটা। ছয় ড্রয়ার-অলা বিরাট ভারী দেরাজ, লতাপাতার কাজ-করা পালঙ্ক, সিলিং থেকে মশারি-টাঙানোর ফ্রেম, তক্তপোষ, টেবিল চেয়ার, দেওয়ালে আয়না-দেওয়া দেওয়াল-আলমারি। লাল সিমেন্টের চকচকে মেঝে মাছি-পিছলোনো-মসৃণ। রান্নাঘরটাই কত বড়! বিরাট উঠোন। তার একদিকে চওড়া রোয়াক। উঠোনের শেষ দিকে বড় কলঘর, চৌবাচ্চা, বাইরের লোকেদের জন্য। ভেতরে আর একটা কলঘর। এমনকী দোতলাতেও এক সেট ছোট্ট মিনি কলঘর ছিল। তার ভেতরে ঔ কারের মতন দেখতে একটা গাড় না কমণ্ডলু না কী, ঝকঝকে পেতলের। শিশুকালে এটাই আমার সবচেয়ে আকর্ষণের বস্তু ছিল। হাসিখুশির 'ঔষধ খেতে মিছে বলা' পর্যন্ত পৌঁছে আমি নাকি বলতুম 'ঔষধ খেতে কমোগোলা।'

বিজয়গর্বে নিজের বাবাকে বাড়িটা দেখাতে আনলেন বাবা। দেখেশুনে ঠাকুর্দা বললেন, 'বোমার হুজুগে সব পালিয়েছে। দু' দিন পরেই যখন এসে পড়বে তখন তোমার আস্বা কোথায় থাকে দেখব।'

—'সে দেখা যাবে'—বাবার নিশ্চিন্ত জবাব।

এই বাড়িতেই, বাবা ও ঠাকুর্দাদার তত্ত্বাবধানে আমি জন্মাই।

আমার জন্মের সময়ে মা যখন প্রাণান্তকর যাতনায় চিৎকার করছিলেন তখন নাকি আমার ডাক্তার ঠাকুর্দাদা পরনে পট্টবস্ত্র, কপালে চন্দন, সারাদিন উপবাসী, নিবিষ্টমনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাগবত পাঠ শুনছিলেন। বাড়িতেই ভাগবত পাঠের আয়োজন হয়েছিল, পাঠ করছিলেন তাঁর বন্ধু পণ্ডিত কালিকামোহন শাস্ত্রী ন্যায়সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মশায়। ধূপধুনোগুগগুলের ভারী ধোঁয়ায় সারা বাড়ি আচ্ছন্ন। ভাদ্র মাসের গুমোট গরম। রাত এগারোটা সওয়া এগারোটা নাগাদ হঠাৎ কড়কড় করে বাজ ডেকে তুমুল বৃষ্টি নামল। ঠাকুর্দাদার চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেল। তিনি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকালেন। দু'জনে পরস্পরের চোখে চোখ রেখে কিছুক্ষণ নিষ্পলক। ভাদ্র মাস, ধুন্ধুমার বৃষ্টি, ঘড়ি টিকটিক করে মধ্য রাতের দিকে চলেছে...। সূতিকাগার থেকে তীব্র আর্তনাদ ছুটে আসছে। সারাদিন ধরেই মা কষ্ট পাচ্ছিলেন। সাত সন্তানের জননীর সেবার তিন দিন ধরে লেবর চলছিল। এই যন্ত্রণা উপশম হয়ে সুপ্রসব হয়ে যাবার অব্যর্থ মহৌষধ নাকি বাবার জানা ছিল। কিন্তু তিনি দেননি। এই জন্মের কোনও পর্যায়ে কোনওরকম বৈজ্ঞানিক ইন্টারফিয়ারেন্স চলবে না—ঠাকুর্দাদার এমনটাই ছিল মত। যদিও অন্য সময়ে হোমিওপ্যাথিকে তিনি বিজ্ঞান বলে মানতেনই না। বাবা, ঠাকুর্দার সচরাচর বিদ্রোহী সন্তান এই একটা ব্যাপারে ঠাকুর্দার হুকুম মেনে নিয়েছিলেন। কারণ, এক কানে প্রসূতির চিৎকার, আর-এক কানে ভাগবতের 'সত্যং পরং ধীমহি' বাবাও দেখছিলেন পৃথিবী আর্তনাদ করছে, সেই আর্তনাদ তাঁর কানে গেছে। চল্লিশ লক্ষ প্রেতের আশি লক্ষ হাত ধেয়ে যাচ্ছে তাঁর দিকে, আসন টলেছে। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী তিনি আসছেন, নেমে আসছেন। কারাগারের লোহার দরজা ওই ঝনঝন শব্দে খুলে গেল। তীক্ষ্ণ চিৎকার করে মাকে ঘর্মা-ক্ত করে আমি সড়াক করে অবতীর্ণ হলুম। কারিয়াপিরেত বা। রোমশ, কুঞ্চিত, লোলচর্ম বাঁদর-বাচ্চা এক।

ধাত্রী বললেন—'মেয়ে হয়েচে গো ডাক্তারবাবু। বাপরে, কী কালো কুচ্ছিৎ মেয়ে গো!' সে সময়ে ধাত্রীরা একটু স্পষ্টবক্তাই হতেন।

পিসিমা শাঁখ নিয়ে রেডি ছিলেন। থতমত খেয়ে গেলেন। পণ্ডিত কালিকামোহন একবার গোঁত্তা খেয়ে আবার পড়তে শুরু করলেন। বহু শ্রাদ্ধবাড়িতে তুমুল হট্টগোল, মন্ত্রোচ্চারণ ও কীর্তনের মধ্য দিয়েও একমনে গীতা পাঠ, উপনিষদ পাঠ তাঁর অভ্যেস আছে। ঠিক আড়াই মিনিটের মাথায় আবার আমি হড়কে এলুম। ধাত্রী বললেন, 'যমক গো কর্তা, এবার ব্যাটাছেলে এয়েচে। কী সোন্দর।' এবার আমি ফর্সা টুকটুকে হয়েছি, ঠিক আমার মায়ের মতো। দুরন্ত দমে শাঁখ বাজতে লাগল।

—কিন্তু এখনও তো ফুল পড়ল না?

শুনে হঠাৎ বাবা ও ঠাকুর্দা একসঙ্গে লাফিয়ে উঠলেন।

ভেতর থেকে ধাত্রী চেঁচিয়ে উঠলেন—'আর একটা আচে, আরেকটা, ও ডাক্তারবাবু নাড়ি জড়িয়ে গেছে। শীগগির আসুন।'

বাবা তীরবেগে সূতিকাগারে ঢুকে গেলেন।

এবার আমি কৃষ্ণ-কানহাইয়ার মতো নীলবর্ণ। কিন্তু বাবা তখন প্রাণপণে আমার গলার হার আলগা করছেন। ডানহাতে আমার ছোট্ট ছোট্ট পায়ের পাতা মুঠো করে মুণ্ডু ঝুলিয়ে দিয়েছেন নিচের দিকে, পাছায় চাপড় মারছেন। আঙুলে গজ জড়িয়ে বাবা ছোট্ট মুখের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়েছেন, ক্লেদ পরিষ্কার করছেন, মুখে মুখ দিয়ে আলতো ফুঁ দিচ্ছেন এবং অবশেষে আমি পিঁ করে কেঁদে উঠেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিধ্বস্ত জননী ঘুমিয়ে পড়েছেন। তিন দিনের নিরবচ্ছিন্ন লড়াইয়ের পর প্রথম সুযোগেই নিবিড় ঘুম এসে তাঁকে অধিকার করেছে। স্বপ্নহীন ঘুম। মৃত্যুপম, কিন্তু মৃত্যু নয়। শরীরের প্রতিটি কোষ ঘুমোচ্ছে। তিনি জানেন না তিনি কে, কোথায়! জানেন না তাঁর সাতটি সন্তান আছে এবং এক দফায় আজ তিনি তিন সন্তানের মোট দশ সন্তানের দশভুজা জননী হয়ে গেলেন। আরও জানলেন না বত্রিশ বছর বয়সে নিরবচ্ছিন্ন সন্তান প্রসবের পর এই আজকের লড়াইয়ে তিনি আর সন্তানধারণের ক্ষমতা হারালেন। এই অকল্পনীয় মুক্তির কথা জানলে হয়তো তিনি আরও আরও আরও ঘুমোতে পারতেন।

যেখানে একজনের ব্যবস্থা হয়েছিল সেখানে তিনজনের আবির্ভাব হলে গণ্ডগোল হতেই পারে। তার ওপর একটি অসুস্থ। তার জন্যে তুলোর বিছানা, তুলোর পলতে। রাশিরাশি পরিষ্কার ছেঁড়া কাপড় চাই, রাশি রাশি কাঁথা, সরষের বালিশ একটা ছিল, আর-একটা, অ্যাংটার আগুন, সেঁকতাপ, মালিশ, বোতল, ফুটন্ত জল, ঢাকনা মশারি, আর তুলো তুলো তুলো।

ইতিমধ্যে ভাগবত গুটিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে ঝোলায় পুরে ফেলেছেন কালিকামোহন। দশম একাদশ স্কন্ধ পুরো পাঠ হয়ে গেছে। বেরোতে বেরোতে প্রায় ভোর-রাত্তির। মুখ চোখে জল দিয়ে চা সেবনান্তে ঠাকুর্দাদা বললেন, 'কী বুঝলে কালী?'

কালিকামোহন চায়ে শেষ চুমুকটা দিচ্ছিলেন, বিষম খেয়ে বললেন, 'প্রথমটিই তোমার ঠিকঠাক অষ্টমগর্ভ শিবু, মনকে চোখ ঠেরে লাভ কী?'

ঠাকুর্দাদা বললেন, 'যোগমায়া?'

—'তাই বলো তো তাই। সুভদ্রা-বলদেব-জগন্নাথ বলো তো তাতেও আপত্তি করব না। অর্ডার কি আর সবসময়ে ঠিক থাকে? থাকে না! যুগটা তো পাল্টাচ্ছে হে!'

শুঁড়তোলা তালতলার চটিতে পা গলালেন কালিকামোহন। শিবপ্রসাদ বললেন, 'তা বটে!'

আসলে আমার বাপ-ঠাকুর্দারা সব স্বপ্ন-দেখা মানুষ ছিলেন। ঘোরে ঘুরতেন, ঘোরে ফিরতেন। ওঠা-বসা, খাওয়া-শোওয়া দিব্যি করছেন কিন্তু বাকি আর সব ঘোরে। উচ্চশিক্ষায়, বিজ্ঞান বিদ্যায় তাঁদের এই স্বপ্ন-দিদৃক্ষার কোনও হেরফের করতে পারেনি। এ এক ধরনের আশ্চর্য সহাবস্থান। তাত্ত্বিক বাঙালির সঙ্গে ব্যবহারিক বাঙালির এই সহাবস্থানের ব্যাপারটা নীরদ.সি. ঠিকই বুঝেছিলেন। এঁরা দৈত্যকুলে প্রহ্লাদে বিশ্বাস করতেন, ধ্রুবর মধুসূদনদাদায় বিশ্বাস করতেন, মা ভবতারিণী সশরীরে এসে শ্রীরামকৃষ্ণের হাত থেকে আত্মহত্যার খাঁড়া কেড়ে নিয়েছিলেন বিশ্বাস করতেন, রণে বনে জলে জঙ্গলে মহাপুরুষের সর্বত্র অবাধ গতি বিশ্বাস করতেন, বিশ্বাস করতেন শ্রীঅরবিন্দ অমর এবং সিদ্ধিলাভের পর দৈবীদেহ লাভ করবেন। মহাপুরুষ স্পর্শ করলে কুষ্ঠ সেরে যায়, টিউমর উবে যায়, অন্ধ দৃষ্টি পায়, বোবায় কথা কয়, পঙ্গুতে গিরি লঙ্ঘন করে—এ সমস্তই আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাস করতেন। অথচ শিবপ্রসাদ ছিলেন ডাক্তার, শল্যচিকিৎসায় তাঁর হাত নাকি ছিল অব্যর্থ। ইনি আবার অভাবীদের বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা করতেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক সময় নিজে পথ্য পর্যন্ত কিনে দিতেন। কিন্তু ভিখারি দেখলেই কড়া গলায় বলতেন—'মাফ করো' বা 'এগিয়ে যাও'। শুধু ভিখারি নয়, ভেকধারী সবাইকে। কাক চরিত্র, গেরুয়া-পরা সন্ন্যাসী, মুশকিল-আসান, পীর ফকির...সব। এই ঠাকুদাই একাদিক্রমে তিনটি বিবাহ করেছিলেন। প্রথমজন নিষ্পুত্রক মারা যাওয়ার পর পরিবারই তাঁর পুনর্বিবাহ দিয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয়া একটি পুত্রসন্তান অর্থাৎ আমার বাবাকে বছর পাঁচেকের রেখে মারা গেলে, বিয়ের উদ্যোগ আর হচ্ছে না দেখে ছ' মাসের মধ্যে নিজে উদ্যোগী হয়ে তৃতীয়াকে বিয়ে করে এনেছিলেন প্রথমা পত্নীর চোদ্দ বছরের সদ্য বিধবা কন্যাকে রাগিয়ে এবং কাঁদিয়ে। আত্মীয়স্বজন কেউ কেউ ছি ছি করলে তিনি বলেন...। নাঃ, কী বলেন বলব না। তিনি গৃহস্থধর্ম এবং প্রথম রিপুর প্রপার চ্যানেলিংয়ের কথা অকপটে বলেছিলেন। অকপটে এবং অকাতরে। প্রতিহিংসায় আমার পিসিমা নতুন মাকে সারাজীবন নেহাৎ বাধ্য না হলে কিছু বলেই ডাকতেন না। বেশিরভাগ সময়েই ভাববাচ্যে কথা বলতেন। ছোটভাই অর্থাৎ বাবাকে তিনি সৎমাকে সেজমা ডাকতে শিখিয়েছিলেন। সেজমা কেন জিজ্ঞেস করলে তিনি যা বলেন তার অর্থ হল মায়েদের এই লম্বা কিউ তো শেষ না-ও হয়ে থাকতে পারে! সেজমা মারা গেলে ন'মা, তারপরে কনে-মা তারপর নতুন মা, তারপর ফুলমা...।

শিবপ্রসাদের বাবার নাম ছিল গুরুপ্রসাদ। সত্যিই নাকি ইনি গুরুদেবের প্রসাদে জন্মেছিলেন। কী ধরনের প্রসাদ তা নিয়ে মডার্ন গুরুদ্বেষীরা অনেকরকম জল্পনা-কল্পনা করতে পারেন। কিন্তু কথা হচ্ছে, এই গুরুপ্রসাদ একটু ন্যালা-খ্যাপা প্রকৃতির লোক ছিলেন। হেটো-মেঠোও বটে। ধানজমি, পুকুর, বাগান, মাঠকোঠা ইত্যাদি ভালই ছিল বর্ধমানের সুকুমার সেন-খ্যাত গোতান গ্রামে। ইনি নাকি হ্যা হ্যা করে হাসতেন, আর পুকুরে ছিপ ফেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতেন। হরিদাসী নামে কোনও অভাগিনীর সঙ্গে এঁর বিয়ে হয়, তাঁরই সন্তান শিবপ্রসাদ সিংহরায় শ'বাজারের ডাক্তারবাবু দেবীপ্রসাদ সিংহ রায় থার্ড মাস্টার নিস্তারিণী মেমোরিয়াল হাইস্কুল, ফুলতলা খুলনা, রমাপ্রসাদ সিংহরায় করণিক মিলিটারি অ্যাকাউন্টস, পোস্টেড ইন রেঙ্গুন এবং শক্তিপ্রসাদ সিংহরায় দেরাদুনের মোহান্তর এস্টেটের ম্যানেজার। গুরুপ্রসাদ ও হরিদাসীর ছেলেরা কীভাবে গ্রাম থেকে বেরিয়ে—চতুর্দিকে ছড়িয়ে গেলেন সে নিশ্চয়ই এক চিত্তাকর্ষক ইতিহাস। শিবপ্রসাদ ছাড়া আর কারওরটাই আমি তেমন জানি না। পরে জানতে পারলে নিশ্চয়ই আপনাদের কৌতূহল নিরসন করব।

গুরুপ্রসাদের পিতার নাম ছিল হরিনারায়ণ। নারায়ণ থেকে এঁরা প্রসাদে অবতরণ করেছিলেন দেখা যাচ্ছে। তা সে যাই হোক, হরিনারায়ণ বারাণসীতে বাস করতেন। কী কাজ করতেন তা আমাদের জানা নেই। কর্ম যখন করতেন তখনই নিজগ্রাম গোতানে কিছু জমি-জমা বাড়ান। হরিনারায়ণ সম্ভবত আধ্যাত্মিক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, প্রসাদের গুরু তিনিই আমদানি করেন, কিন্তু সবকিছু ছেড়েছুড়ে একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে যান। তাঁর পত্নী ছেলেকে নিয়ে গোতানে বসবাস করতে থাকেন। এই ধরনের অঘটন ঘটায় দিশেহারা হয়ে ছেলেকে লেখাপড়া শেখানো, জমিজমা সংক্রান্ত ব্যাপারগুলোও অন্তত একটু বোঝানো—এ সব তিনি করেননি বা পারেননি। তবু সেগুলো টিকে গিয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থাৎ জ্ঞাতিরা খুব খারাপ লোক ছিলেন না।

তা হরিনারায়ণের আগে যে কে ছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষ তা আমরা জানি না। হরিনারায়ণ অবধিই যে জানি সেটাই একটা আশ্চর্য ব্যাপার। নয় কী ? শ্রাদ্ধশান্তিতে আমরা পূর্বতন চারপুরুষ পর্যন্ত নাম বলতে পারব। বংশাভিমান আমার পিসিমারই সবচেয়ে বেশি ছিল। তিনি বলতেন, 'আমরা হরিবংশ'।

আমার বাবা দুর্গাপ্রসাদ ওরফে দুগ্‌গি ছিলেন ভারি মজার মানুষ। বি.এ পাশ করে মেডিক্যাল পড়তে পড়তে ফাইনাল ইয়ারে রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা আন্দোলনে ঢুকে পড়েন, দেশের কাজ করতে করতে কাব্য ও ব্যাকরণের আদ্য ও মধ্য পাশ করে ফেলেন, জেল খাটতে খাটতে আইন পড়তে থাকেন, আইন পড়তে পড়তে হোমিওপ্যাথি শিখতে ঢুকে যান। ইতিমধ্যে কী কারণে কে জানে, হয়তো গা ঢাকা দিয়ে থাকতে থাকতে তিতিবিরক্ত হয়ে বিপ্লব ছেড়ে মাসতুতো বউদির খুড়তুতো বোনকে বিয়ে করে ফেলেন। লভ-ম্যারেজই বলব, কেন না বউদির বাড়ি তদীয় খুড়তুতো বোনের (বয়স বারো) হাতে পান খাওয়ার পরই সম্ভবত তাঁর বিপ্লবে বিতৃষ্ণা জাগে। সেই দ্বাদশীও ডাফ স্কুলের পরিধেয় টিউনিক ছেড়ে ধনেখালি ধরতে দ্বিধা করেন না। সেকালের দিনে বাবা মধুচন্দ্রিমা করতে দেরাদুন যান। শোনা যায়, ট্রেনে এক গোয়েন্দাকে শনাক্ত করতে পেরে তিনি এক কামরা লোকের মাঝখানে ফট করে মায়ের ঘোমটা খুলে ফেলে বলে ওঠেন, 'দূর মশাই, এই দেখুন আমার নতুন বউ, বিয়ে করে বেড়াতে যাচ্ছি। দেশ উদ্ধার এবার আপনি করুন গিয়ে। একটা বার্ডসাই খাবেন? ভয় নেই, তামাকে বিষ-ফিষ নেই।' এরপরই বাবা হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস করতে থাকেন এবং সিদ্ধান্তে আসেন অ্যালোপ্যাথি আসুরিক, হোমিওপ্যাথি ঐশ্বরিক। এ মতভেদে একমাত্র পুত্রের সঙ্গে একমাত্র পিতার কী রকম তুলকালাম লাগত সহজেই অনুমেয়।

এঁদের মধ্যে কী ধরনের স্বাধিকারবোধ ছিল তা আমার পিসিমার কেসটা বললেই বুঝতে পারবেন। বালবিধবা পিসিমাকে ঠাকুর্দাদা লেখাপড়া শেখাতে চেয়েছিলেন। পিসিমা কিছুতেই তাঁর 'কালা-মুখ' নিয়ে 'ধিঙ্গি'-র মতো স্কুলে যেতে চাননি। তাঁর বিয়ে দেবার জন্যেও ঠাকুর্দা অনেক চেষ্টা করেছিলেন, যিনি বিধবা-বিবাহ দিতে উদ্যোগী হন তিনি আদৌ যে কেন আট বছরের কন্যাকে গৌরীদান করেছিলেন তা বোঝা যায় না। পিসিমা পুনর্বিবাহের কথা শুনে বলেছিলেন 'মরণ আর কী!' বাড়িতে বসে লেখাপড়াতেও পিসিমার কোনও উৎসাহ ছিল না, সেলাই-ফোঁড়াই, গান-বাজনা কিছুতেই না। ঠাকুর্দাদা চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি। বিষ্ণুপুরী ঘরানার সুবিখ্যাত রাধিকামোহন গোস্বামীর কোনও শিষ্যর সঙ্গে তাঁর খাতির ছিল, পিসিমার স্বাভাবিক সুকণ্ঠ শুনে তিনি আগ্রহীও ছিলেন। কিন্তু পিসিমা দিনকতক শিখে নিজেই গুরুকে ছুটি দিয়ে দেন। অথচ পিসিমা স্বামীর ঘর করার সুযোগই পাননি। পিসেমশাইও ছিলেন (ছবিতে যেমন) ঝোপের মতো গোঁফওয়ালা, কটকটে চোখ, কেমন রাগী মতন, পিসিমাও বলতেন, 'ধুর, আমার পছন্দই হয়নি। কাঠখোট্টা।' অল্পবয়সী দম্পতির মধ্যে যে ধরনের রোম্যান্টিক প্রেম আশা করা যায়, তাঁদের মধ্যে তা ছিল বলে মনে হয় না। এই পিসিমাকেই যখন তাঁর নতুন মা এসে বৈধব্যপালনের কঠোরতা থেকে মুক্ত করতে চাইলেন, অর্থাৎ পেড়ে শাড়ি, মৎস্যভক্ষণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরাতে চাইলেন, একাদশী বন্ধ করতে চাইলেন তখন ঠাকুর্দাদাই বলেছিলেন—'শী শুড রাদার ডাই।' নতুন-ঠাকুমা কুড়ি-একুশ বছরের গাছের-মতো-ঢ্যাঙা-বলে-তেজ-বরে-সদ্য বিবাহিতা সেই কন্যে তখন নিজেই মাছ খাওয়া ছেড়ে দেন, সাদা ছাড়া পরতেন না। ঠাকুর্দাদা বলতেন— 'মাছ খাচ্ছো না আমাকে মারবার ইচ্ছে হয়েছে নাকি ?' অর্থাৎ পাশ করা ডাক্তার, যশস্বী শল্যচিকিৎসক বিশ্বাস করতেন স্ত্রী মাছ না খেলে স্বামীর বেঁচে থাকা শক্ত। নতুন ঠাকুমা এয়ো-নাম রাখতে একাদশীর দিন মাছ খেতেন। আশ্চর্যের কথা, তাঁর এই আত্মত্যাগ কেউ ধর্তব্যের মধ্যেই আনেনি। এর মধ্যে যে কোনও বাহাদুরি, মনের জোরের, স্বাধীন চিন্তার দৃষ্টান্ত আছে, অনম্য সংকল্প আছে সেটা কেউ মনেই করেনি।

আমার বাবা আবার এক কাঠি বাড়া। তিনি পিসিমাকে দিদিমণি বলতেন, কিন্তু আসলে মায়ের মতোই দেখতেন। ঠোঁটের ওপর ভালো করে গোঁফ গজাবার পরই নাকি তিনি ঠার্কুদার সঙ্গে তর্ক জুড়তেন দিদিমণির আপত্তি কানে না তুলে, তাঁর আবার বিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সেই পিসিমারই যখন বোনটিবি ধরল, যথেষ্ট প্রোটিন খাবার ব্যাপারে মাংসের জুস ছোট মাছের ঝোল ইত্যাদি খাওয়াবার কথা ঠার্কুদা বললে সবাইকে অবাক করে দিয়ে বাবা বলেছিলেন,— 'শী শুড রাদার ডাই।' পিসিমা স্বয়ং কিন্তু নিমরাজি হয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'ওষুধ খাচ্ছি মনে করে নাক টিপে খেয়ে নেবো'খন।' মৃত্যুকে খুব ভয় পেতেন পিসিমা। তাঁর ধারণাই ছিল না তিনি মরেই আছেন।

তাই বলে কেউ যেন মনে করবেন না মৎস্যভক্ষণকেই আমি জীবনের সমার্থক বলে মনে করছি। বালবিধবা পিসিমাদের আশ্রয় থাকতো ঠিকই, কিন্তু ঘর কি থাকতো ? করুণা পেতেন, শ্রদ্ধা পেতেন, অধিকার পেতেন না। দজ্জাল অথবা মাটির মাটি জুতোর সুকতলা হবার সুযোগ পেতেন, স্বাভাবিক হবার সুযোগ থাকত না। রন্ধন-পটীয়সী হতেন কিন্তু চিন্তাপটীয়ান কত মানুষ যে কত আনন্দের, উপভোগের খোরাক বইয়ের দুই মলাটের মধ্যে ভরে দিয়ে গেছেন, জানতেন না। ভাতের সকড়ি, রুটির সকড়ি, আঁশ-নির্মিষ্যি খেঁটের কাপড়, মঙ্গলবারে নো মোচা, ছেলেদের জন্মবারে নো তেতো, নো পোড়া, কুমড়ো, লাউ, বেগুন সম্পর্কিত হরেক নিয়ম, জাতাশৌচ, মৃতাশৌচ, চতুর্থী, বিছ্‌ছুচ্ছুগ্‌গু ইত্যাদি হরেক জিনিস তাঁদের জানা ছিল। কিন্তু এই পৃথিবীটা কত সুন্দর, কত বড়, কত তার রং চং ঢং তা জানতেই পারতেন না। তাই-ই ওঁকে জীবন্মৃত মনে করছিলাম। তবে আমার এই মনে করা হয়তো ঠিক না-ও হতে পারে। জীবনের থেকে কোনও রস হয়তো তিনি পেতেন ঠিকই, আমাদের বীক্ষণে তা' ধরা পড়ছে না এই আর কি !

আমি যখন জন্মাই অর্থাৎ চারের দশকে তখন আমাদের মতো পরিবারের (মধ্যবিত্ত লিখলুম না কেননা বিত্ত দিয়ে মানুষ মাপার অভ্যাস একটা মর্ডান থিয়োরি মাত্র। গবেষণার জন্যে দরকার হয়, অর্থনীতি, সমাজনীতি, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি ইত্যাদি। আদতে প্রত্যেকটা মানুষ আলাদা, প্রত্যেকটা পরিবার আলাদা, আঙুলের ছাপের যেমন দ্বিতীয় হয় না, একটা মানুষেরও তেমন আর দ্বিতীয় হয় না। ওপর ওপর মানুষের ল.সা.গু গ.সা.গু বার করা হয়তো সম্ভব। একটু ভেতরে গেলেই কিন্তু মানুষ মৌলিক সংখ্যা।) সূতিকাগারে পুং ডাক্তারের প্রবেশ সচরাচর ঘটত না। খুব জটিল কেস হলে আলাদা কথা। পাশ করা ধাত্রীরা পরিষ্কার সাদা শেমিজ শাড়ি/ধুতি/থান পরে কালো একটা ব্যাগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে সময়মতো এসে উপস্থিত হতেন। আমার বাবা যাঁর ক্রমে নিজ-রুগিমহলে ধন্বন্তরী খ্যাতি হয়, তাঁর কিন্তু বোঝা উচিত ছিল যে মায়ের গর্ভে যমজ বা 'তেমজ' আছে। পেটে হাত দিলেই তো বোঝা যেত একাধিক মুণ্ডু ডাংগুলি খেলছে। দুটো ষণ্ডা একটা ঠাণ্ডা। গাণ্ডে-পিণ্ডে গিলছে দুটো আর একটা নিরীহ ভুশুন্ডের মতো এলিয়ে আছে। যমজ না হয়ে জরায়ু বা ডিম্বকোষের টিউমরও তো হতে পারত। আমরা তিনে-এক একে-তিন একসঙ্গে গোঁত্তা মারতে গিয়ে মাথা ঠোকাঠুকি হয়ে যেতে পারত। একজন হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ নেমে এলো, আর এক জন দিব্যি গর্ভজলে অনন্তশয়ান শুয়ে রইল, আর একজন হেঁটপদ ঊর্ধ্বমুণ্ড হয়ে রইল এরকমও তো হতে পারতো! সেসব থেকে জননীর প্রাণসংশয় হত। সংশয় কেন, প্রাণটি যেতই। মায়ের কাছে শুনেছি টিউমর থেকে ট্রান্সভার্স ফিট্যাল পোজিশন, লকিং সব কিছুরই হোমিওপ্যাথিক নিদান আছে। অর্থাৎ একটি মহৌষধের মহাফোঁটা, ব্যস তৎক্ষণাৎ জাতকের ত্যাড়া ঘাড় সোজা হয়ে যাবে, সে উল্টে গিয়ে মাথা হেঁট করে নামতে থাকবে, বা ভাইটি বোনটির সঙ্গে অনর্থক মাথা ঠোকাঠুকি না করে লক্ষ্মী ছেলেটির মতো গুটগুট করে কিউয়ে এসে অপেক্ষা করবে। কিন্তু সে ওষুধটা দিলে তো ? অষ্টমবার গর্ভাধান হলে বাবা-ঠাকুর্দা ধরেই নিয়েছিলেন *তিনি আসছেন।* সময় কী হয়নি ? চল্লিশ লাখ মানুষ মাঠে ময়দানে, ফুটপাতে, জাঙ্গালে জাঙ্গালে না খেয়ে শুকিয়ে মরে গেছে, সুভাষচন্দ্র অন্তর্হিত। মাঝে মাঝে রেডিওতে নাকি তাঁর ভৌতিক কণ্ঠস্বর শোনা যায়, নেহরুজিকে এডুইনার সঙ্গে সাঁতারে নামিয়ে দিয়ে লর্ড মাউন্টব্যাটেন অর্ধনগ্ন ফকিরটির ওপর তাঁর যাবতীয় কূটনীতি প্রয়োগ করে যাচ্ছেন। জিন্না সাহেব, বিশ্বের রোগাতম লিডার লাঙে যক্ষ্মা লুকিয়ে বিলিতি ধরনে হাসছেন (প্রসঙ্গত বাবা, মিঃ জিন্নার ছবি-ছাবা দেখেই বিধান রায়ী কায়দায় ডায়াগনোজ করেছিলেন, ইনি ক্ষয়রোগে সম্ভবত কর্কট রোগেও ভুগছেন, বেশিদিন ইহলোক নেই), জার্মানিতে হিটলারের গোঁফে তা, ইতালিতে মুসোলিনির ছাঁ, জাপানে তোম্বামুখ তোজো, রাশিয়ায় স্ট্যালিনগ্রাড, আমেরিকায় শ্রীমান সত্যসুন্দর অর্থাৎ ট্রুম্যান এবং ইংল্যান্ডে চার্চিল, যাত্রাদলের অমুক-তমুক-তুসুক *এবং স্বপনকুমার*-এর বিজ্ঞাপনের মতো। এই তো সেই লৌহ কারাগার ? এবং কী আশ্চর্য দুগ্নি কি একজন বসুদেবোপম ব্যর্থ বিপ্লবী নন, যিনি বিবাহের প্রথম উল্লাস কেটে যাবার পর থেকেই বুঝতে পারছেন তাঁর হাতে শেকল, পায়ে শেকল (মধুর শেকলই), দেশের জন্য প্রত্যক্ষভাবে তিনি আর কিছুই করে উঠতে পারবেন না। এবং আশ্চর্যেরও আশ্চর্য। তার চেয়েও আশ্চর্য তদীয় পত্নীর নামও যে দেবহূতি, দেবকী আর দেবহূতিতে কী-ই বা তফাত ? তা ছাড়া দেবহূতি স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা, মহর্ষি কর্দমের পত্নী, সপ্তর্ষি অর্থাৎ মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এবং বশিষ্ঠর শাশুড়ি, ওদিকে আবার স্বয়ং নারায়ণের অবতার কপিল ঋষিরও মা, পুত্রের কাছে যোগ সম্বন্ধীয় উপদেশ শুনে, জগতের কার্য-কারণ উপলব্ধি করে ইনি কঠিন তপস্যার পর নদী হয়ে বয়ে যান, যে নদীতে অবগাহন করেন সিদ্ধ পুরুষরা। দেবহূতির মতোই রূপসী, অথচ নিরভিমান, পবিত্র অথচ পার্থিব, দয়িতা অথচ দশভুজা এই নারী ! সাতটি সন্তান, সাতে আর সাত কোটিতে কতটুকু তফাত জননীরাই জানেন। রাশভারী শ্বশুরমশায়, বাতে ভোগা রুগ্ণ শাশুড়ি, জিদ্দি সোয়ামি, ক্ষণে-হাতে-দড়ি-ক্ষণেকে-চাঁদ বালবিধবা ননদিনী নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর্যাবর্তের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল ঘুরে ঘুরে সংসার করেন যিনি, দু-এক বছর অন্তর অন্তর রাঁধতে রাঁধতে যিনি আঁতুড় ঘরে ঢুকে যাচ্ছেন আবার বেরিয়েই খুন্তি ধরছেন তিনি অসামান্যা ছাড়া কী ? স্থান-কাল-পাত্র প্রস্তুত। এখনও *তিনি* আসবেন না এ কি হতে পারে ?

বস্তুত আমার বাবা দুর্গাপ্রসাদ সিংহরায়ের সবটাই ছিল উল্টো রকম। যেমন জেদি, তেমনি আদর্শবাদী, তেমনি খামখেয়ালি। কলকাতায় স্থিত হবার ঠিক আগে বাবা ছিলেন সুরুলে। সেখানে দিব্যি একটি খামার করেছিলেন। গোরু, ছাগল, হাঁস, ধান জমি, পুকুর, তরি-তরকারি ফল-পাকুড়ের বাগান এই সব। সেখানে মাটির বাড়িতে নিজের অকালমৃত মায়ের নামে করেছিলেন মাতঙ্গমোহিনী হোমিও হল। ভালোই চলছিল। শুধু বাবা-মা দুজনেরই মন খুঁতখুঁত করতো— ছেলেমেয়েদের পড়াশুনো তেমন জুতের হচ্ছে না। হাতের কাছেই যে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম নামে একটি আবাসিক বিদ্যালয় রয়েছে যার সর্বময় বিশ্ববিখ্যাত নোবেলজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাতেও বাবার কিছু এসে যায়নি। আমার বাবা-ঠার্কুদারা রবীন্দ্রনাথকে পছন্দ করতেন না, তিনি বড়লোকের লম্পট ছেলে, সব সময়ে সুন্দরীপরিবৃত হয়ে থাকেন। শান্তিনিকেতনে পড়তে গেলে ছেলেমেয়েরা আর চরিত্র নিয়ে ফিরতে পারবে কি না এ সন্দেহ তাঁদের ছিল। তবে বাবা রবি ঠাকুরের লেখার খুব ভক্ত ছিলেন, ঠার্কুদাদা সেখানেও ছিলেন অনমনীয়। বলতেন— "মাথা নত করে দাও হে," কেন রে বাবা উনি নিজে থেকে নত করবেন না ? ঘাড় ধরে হেঁট করিয়ে দিতে হবে ?"

বাবার আগের পোস্টিং ছিল ভাগলপুর। ভাগলপুরে দুটো প্র্যাকটিসই খুব জমেছিল। চিকিৎসা বাবা যে পেশাতেই থাকুন না কেন, করতেনই। ভাগলপুরের বাঙালি এমনকি বিহারি-রাজপুত-জাঠ মহলেও তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ছিল। কিন্তু ভাগ্য-খারাপ, এরপরেই হল সেই ভয়াবহ ভূমিকম্প। প্রায় উজাড় হয়ে গেল বাবাদের বন্ধুকুল। বন্ধু এবং কী রকম এক কাজিনের একেবারে অনাথ ছেলে পুলকদাদাকে নিয়ে বাবা কলকাতা হয়ে সুরুলে চলে গেলেন। খুব সম্ভব এই সময়েই গোতানের সম্পত্তি বেচা হয়। তাই দিয়েই সুরুলে বাবার লড়াই নতুন করে শুরু হল।

ভাগলপুরের আগে বাবা ছিলেন রেলওয়ে সার্ভিসে। নানান জংশনে ঘুরে ঘুরে তাঁর পোস্টিং হত। দাদা-দিদিরা কেউই কলকাতায় জন্মায়নি। শিবপ্রসাদের আশা ছিল, পুত্র একজন ভারতীয়র পক্ষে যত দূর ওঠা সম্ভব উঠবে। কিন্তু হা হতোস্মি ! বাবার বিপ্লবী জীবনের কাহিনী তো পুলিসের খাতায় গুপ্ত ছিল না ! কোনও প্রমোশনের সময়ে থলির ভেতর থেকে সেই বেরাল বেরিয়ে পড়ে। তাঁকে একটি মুচলেকা দিতে বলা হয়, তিনি তৎক্ষণাৎ চাকরি ছেড়ে কলকাতায় ঠাকুর্দার ভাড়াবাড়িতে এসে গ্যাঁট হয়ে বসেন। এখানেই তাঁর চাকরি জীবনের ইতি। স্বাধীন পেশা ছাড়া অন্য কোনও দিকে যাওয়ার পথ তাঁর ওখানেই বন্ধ হয়ে যায়।

আমার জন্মের পর আমার এক পাঁচ ছ' বছরের মামা মহাবিরক্ত হয়ে তাঁর মা অর্থাৎ আমাদের দিদিভাইকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'দিদির কি প্রতি মাসে একটা করে মেয়ে হবে ?'

দিদিভাই, যিনি বেশ কয়েকবারই মেয়ের সঙ্গে গর্ভবতী হয়েছেন, ছেলেকে আদর করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেন, 'একটা নয় রে, এবার তিনটে।'

তৎক্ষণাৎ মামা জিজ্ঞেস করেন, 'লেত্তির মতো?' লেত্তি বাড়ির ম্যাও-পুষি। বলা বাহুল্য এবম্বিধ তুলনায় দিদিভাই খুব খুশি হননি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় অধ্যায়

অষ্টোত্তর শতনাম

বাঙালিরা বরাবরই নাম বিষয়ে বড্ড খুঁতখুঁতে। যেখানে ইংরেজ বাবা-মা ছেলেমেয়েদের নামের জন্যে বেশি না হাতড়ে দাদু ঠাকুমা দিদিমা মামা এঁদেরই নামের আগমার্কা লাগিয়ে দেন এবং একই পরিবারে যথেষ্ট উইলিয়ম, মেরি, হেনরি, এলিজাবেথ থেকে যায়, যেখানে উত্তর ভারতে পিঙ্কি, কুসুম, নেহা, রাকেশ, রাজিন্দর, সুরিন্দরের ছড়াছড়ি, সেখানে বাঙালি মা-বাবাদের নামকরণ একটি পর্ব। ইংল্যান্ডের রাজবংশেই ধরুন এডওয়ার্ড হলেন অষ্টম পর্যন্ত। জর্জ হলেন ষষ্ঠ পর্যন্ত, কটিই বা রানী ! তা তাঁদের নামের মধ্যে কী রকম পুনরাবৃত্তি ! রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ। শুধু তাই-ই নয়। তাঁর মায়ের নামও এলিজাবেথ। কুইন মাদার আর কুইন। মায়ের নামও উমা, মেয়ের নামও উমা এমনটা কি আমরা ভাবতে পারি ? প্রিন্সেস ডায়নার বড় ছেলে যদি রাজা হয় তো সে হবে উইলিয়ম দা ফিফথ্, ছোট ছেলে রাজা হলে হবে নবম হেনরি। কেন রে বাবা ? আর নাম পায় না এরা ? উইলিয়াম, হেনরি, এডওয়ার্ড, জর্জ ছাড়া কি আর নাম নেই ? এ যেন ক্লোজড্ সার্কিট টি.ভির খেল। আমাদের দেশ হলে অষ্টম হেনরির কীর্তিকলাপের পর ওই হেনরি নাম দশ হাত লম্বা লাঠির ডগা দিয়েও ছুঁতো না কেউ। আমরা কি সাধ করে কখনও ছেলের নাম শকুনি বা রাবণ রাখবো ? অজাতশত্রু রাখবো ? এঁরা সব পৌরাণিক ঐতিহাসিক ভিলেন। ব্লাডি মেরি, মেরি অফ স্কট্স্, মারি আঁতোয়ানেতের পরে মেরি নামটাকেও অপয়া বলে গণ্য করতুম আমরা হলে। সীতা যেমন, নায়িকার নাম হতে পারে, কিন্তু অপয়া নাম। রাখেন কেউ কেউ সীতা-চরিত্রের মহিমার কথা, তাঁর সতীন কাঁটারহিত হওয়ার সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করে, কিন্তু রেখে নির্ঘাৎ ভয়ে ভয়ে থাকেন।

ইউরোপীয় দেশগুলোতেও এই একই ব্যাপার। মাসিও গার্ট্রুড, বোনঝিও গার্ট্রুড, কাকাও স্টিফেন, ভাইপোও স্টিফেন। এমনটাই নাকি এঁদের দেশীয় রীতি। গুরুজনের নামে নাম রাখাটা নাকি গুরুজনের গুরুত্ব স্বীকার করা। আর আমাদের এদিকে ? হরি যদি শ্বশুর-ভাসুরের নামের সঙ্গে জুড়ে রইল, তো আর হরিনাম করা যাবে না। ফরিনাম করতে হবে। ভুলেও কখনও 'ও হরি' বলে ফেলেছ কি মরেছ। 'ও ফরি' বলতে হবে মনে করে করে। আমার দিদিশাশুড়ি খুব ভালো গান গাইতে পারতেন। বিশেষত তাঁর শ্যামাসঙ্গীতের খুব আদর ছিল। 'শ্যামাপদ আকাশেতে মন ঘুড়ি খান উড়তেছিল' গাইতে গেলে তাঁকে বলতে হত 'বাবাপদ আকাশেতে', কেননা তাঁর শ্বশুরের নাম ছিল শ্যামাকান্ত। গানটা তিনি উপযুক্ত ভাবাবেগ সহ গাইতেই পারতেন না, তাঁর হাসি পেয়ে যেত। এই দিদিশাশুড়ির মেয়ে অর্থাৎ আমার পিস শাশুড়িও খুব ভালো গাইতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেডিওর অডিশন দিতে গেলে তাঁকে 'অমলধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া' গানটি গাইতে বলা হয়। তিনি 'বিমলধবল পালে' গেয়েছিলেন, কেননা অমল তাঁর স্বামীর নাম। বিমল বলতেও তিনি প্রত্যেকবারই লজ্জায় অধোবদন হয়েছিলেন। তিনি অডিশনে ফেল করে যান। বিচারকরা বলেন— 'আমরা ওঁকে অমলধবল গাইতে বলেছিলাম। বিমলধবল তো গাইতে বলিনি। যিনি গানের বাণী ঠিক রাখতে পারেন না তাঁর আবার...' ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমাদের দক্ষিণেই বা তেমন নামের বাহার কই? ভুল বললুম, বাহার খুব আছে তবে তা অন্যের নামের বাহার। কত পুরুষের নাম যে এঁরা নিজনামের সঙ্গে জুড়ে নেন, তার হিসেব জানি না তবে নামগুলো তো ওই সীতা, সীতালক্ষ্মী, জয়া, বিজয়া, সাবিত্রী এই সবের মধ্যেই থাকে। খুবই গুলিয়ে যায়। তামিলনাড়ুর ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতার বান্ধবী শশিকলাকে আমি দীর্ঘদিন বোকার মতো কোন কালের অভিনেত্রী শশিকলা ভেবে এসেছি। সেটা অবশ্য আমার দোষ হতে পারে। আমার ব্যক্তিগত অজ্ঞতা হতে পারে। এটা দৈবাতের ব্যাপার। ইংরেজদের মতো ছক কষে কষে একই নামকে, একই কুমির ছানাকে সাতবার দেখানোর মতো ব্যাপার নয়। তা সে যাইহোক, আমাদের মতো নামবিলাসী আর কেউ নয় ভু-ভারতে। আরে বাবা, কিছুও না কোনও বিষয়ে তো আমাদের ফার্স্ট হতে হবে!

ধরুন তেজেন্দ্রনারায়ণ। একবার ফ্যামিলিতে ইন্দ্রনারায়ণ প্রবেশ করলেন তো হয়ে গেল। চলতে থাকবে। গজেন্দ্রনারায়ণ, ব্রজেন্দ্রনারায়ণ, বিজয়েন্দ্রনারায়ণ, মণীন্দ্রনারায়ণ, ফণীন্দ্রনারায়ণ, গুণীন্দ্রনারায়ণ...। মধ্যনাম হিসেবে ইন্দ্র, প্রসাদ, নাথ। এ সব আমাদেরই আছে। নাম, মধ্যনাম, পদবি। পদবিটাই খালি বারোয়ারি। বাকি সব নিজস্ব। ভারতেরই অন্য প্রদেশের সেলিব্রিটিদের দিকে চেয়ে দেখুন! ভেঙ্কটেশ প্রসাদ! যাব্বাবা, কবে থেকে অপেক্ষা করছি প্রসাদের পরে কী জানতে পারব, কাকস্য পরিবেদনা। ভেঙ্কটেশ প্রসাদ যেন বিষম খেয়ে থেমে গেল। কৃষ্ণকান্ত? কৃষ্ণকান্ত কী? জবাব নেই। পদবি-টদবি নেই। বালাই চুকে গেছে।

নাম-বিলাসী তো বটেই। নাম নিয়ে আমাদের বেশ আদিখ্যেতা। আমার মায়ের তিন বন্ধুর নাম ছিল মালতীমালা, মিলনাকুলা, বিরহজ্বালা। এঁদের বাবার কবিত্বের বহরটা একবার দেখুন। মালতীমালাকে না হয় মালতী বা মালা বলে ডাকা গেল, কিন্তু মিলনাকুলার কী লজ্জা? কুমারী মিলনাকুলা পাত্র, ব্রাহ্মবালিকার দিদিমণি চশমার ওপর দিয়ে চেয়ে বললেন পাত্র? না পাত্রী? ফিক করে হেসে ফেলেই তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন। বৃত্তি পরীক্ষার ঠিক আগেই যখন তার বিয়ে হয়ে গেল, দিদিমণিদের সে কী উদ্ভাসিত হাসিমুখ! সকলেই বললেন, 'আমরা জানতুম, জানতুম তোমার তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে যাবে!' কেন দিদিমণিরা এ কথা বলেছিলেন সে বোধোদয় যখন বেচারির হল, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। আর বিরহজ্বালা? তাকে তো সবাই জ্বালা বলেই ডাকতো। বর্গীয় জ-এ ব-য় আকার জ্বালাই হোক, আর শুধু বর্গীয় জ-য় আকার জালাই হোক, কোনটাই কি তার আত্মসম্মানরক্ষার উপযুক্ত? তারপরে সে, নাঃ বাচ্চা হলেও মায়ের বন্ধু তো, তিনি বলাই উচিত, তিনি একটু গোলগাল ছিলেন, একটু বেশিই, তা তাঁকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জালা বলে ডাকলে কেমন শোনায় ? আপনারা আশাপূর্ণা দেবী না সুনির্মল বস্‌র সেই মজার কবিতাটা কি পড়েছেন ? এক পরিবারে পতি মধ্যনাম দিয়ে নাম রাখা হত, শেষকালে আর কিছু না পেয়ে নবজাত বাচ্চার নাম রাখা হল ভগ্নীপতি। কী ভয়ানক নামবিলাস ! এ রকম গল্প আমিও দু একটা জানি। এক পরিবারে পাল দিয়ে নাম রাখা হত। নেপাল, ভূপাল, গোপাল, মহীপাল ইত্যাদির পরেও যখন আবার নাম-সমস্যা নিয়ে এক ছেলে জন্মালো বাবার মাথায় হাত, নাম রাখলেন কপাল। এইভাবেই জিতের মামলায় হেরে হেরে নাজেহাল হয়ে এক বিশাল জিত-পরিবারের কর্তা কনিষ্ঠের নাম রাখেন হারজিত। হারজিত আমাদের সঙ্গেই পড়ত। কায়দা করে নামটা বলত যাতে মনে হয় হরজিৎ, প্রথমে নামটা শুনে আমরা মনে করি এ নিশ্চয়ই পঞ্জাবি। হারজিৎ ডাট। ও হরি, দেখি ছোটখাটো এক বাঙালি তনয় ঢুকছে। উত্তর মেরুতে বলগা হরিণ, ক্যারিবু আর পোলার বেয়ারদের সঙ্গে দেখলেও তাকে বঙ্গসন্তান বলে চেনা যাবে।

আর রবীন্দ্রনাথ ? রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকতে লক্ষ লোকের নাম দিয়ে গেছেন, প্রয়াণের পরও লক্ষ লক্ষ নাম সাপ্লাই দিচ্ছেন। কিন্তু ওঁর নায়িকাদের অনেকের নাম শুধু আমি কেন বেশির ভাগ পাঠকেরই পছন্দ হবে না। বিনোদ বৌঠান কীরকম জাঁহাবাজ জাঁহাবাজ লাগে না ? দামিনী যত আবেগ, যত স্পর্শকাতরতা, যত বেদনা দিয়েই গড়া হোক না কেন, নামের জন্য স্থূল-স্থূল মনে হয় যেন কাপড় কাচা আর ঘর মোছা ছাড়া কিছু জানে না। 'ঘরে-বাইরে'র বিমলা-ই বা কী ? যে-নাম সাধারণত ছেলেদের হয় সে-নামে আকার দিলেই যে সেটা নারী-নাম হয়ে যায় না, স্ত্রী-লোকের নামই হয় শুধু, যেমন অজিতা, অনিলা, সমীরা, সুধীরা, সলিলা...— এটা রবীন্দ্রনাথের মতো কবির বোঝা উচিত ছিল। তখনকার প্রচলিত নাম তো তিনি ব্যবহার করবেনই করতেই হবে, কিন্তু তার মধ্যেও একটু বেছে-বুছে নেওয়া তো যেত ! মৃণাল, কুমু, এলা, চারু, এগুলো ঠিক আছে। অচিরা, রণিতা, তনিকা এসব তো খুবই আধুনিক স্মার্ট নাম। যদিও সত্যি কথা বলছি, চারু যে কতটা চারু তা সত্যজিৎ-মাধবীর রূপায়িত চারুকে দেখার আগে যেন পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করিনি। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তো 'কাব্যে উপেক্ষিতা'য় মাণ্ডবী আর শ্রুতকীর্তিকে তাঁর করুণার পরিধি থেকে বাদ দিয়েছেন স্রেফ নামের জন্য। তা তাঁর দামিনী আর বিমলা সম্পর্কেও আমাদের একই বক্তব্য। মানুষ দুজনকে বুঝতে হলে তাদের নাম বাদ দিয়ে বুঝতে হয়।

আর পুং চরিত্রদের নাম ? আমাকে মিলিয়ন ডলার দিলেও আমি বেহারী বা শ্রীবিলাসের প্রেমে পড়তে পারবো না। উপন্যাসেও এঁরা ব্যর্থ হলেন সম্ভবত এই কারণেই।

মাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, 'সুরুলে থাকতে রবীন্দ্রনাথের কাছে নাম চাইতে পারতে তো ?'

মা বলেছিলেন, 'বিপদ ছিল।'

—'কেন ?'

—'প্রথমত উনি রাখলে সে নাম তো পাল্টাতে পারতুম না। কিন্তু যদি নলিনী দিতেন ? নলিনী বললেই নলেন গুড় আর নলিদির কথা মনে পড়ে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নলিদি ছিল মায়েদের বাড়ির এক পুরনো দাসী, শুধু আমি কেন, মা-ও নাকি তাকে কখনও দন্তবতী দেখেননি। পাকলে পাকলে ছেঁচো পান খেত নলিদি আচার আর বড়ি তৈরি করত দেবভোগ্য, কিন্তু কাউকে দিতে চাইত না। অনেক সাধাসাধি করলে, সুতির কাপড় ছেড়ে, খেঁটের কাপড় পরে আস্তে আস্তে তিনতলার চিলে কুঠুরিতে সে উঠে যেত, তারপর বাটিতে অত্যন্ত পরিমিত কুলের আচার বা ছড়া তেঁতুল এনে ভাত-পাতে ফোঁটা কয়েক দিত। কুলের আচার বা ছড়া-তেঁতুল কেউ ভাতের সঙ্গে খায় ? এক চামচ দু চামচ খায় ? আপনারাই বলুন। কাজেই আমাদের ছেড়ে মায়ের পর্যন্ত নলিনীর ইমেজ নলিদির ইমেজে মিশে গিয়েছিল। যতই নলিনী তড়খড়কে স্মরণ করে রবি ঠাকুর নলিনী নলিনী করুন, আমাদের তো নলিদিকেই স্মরণে আসে কি না !

আমি বলি, 'বলতে পারতে নলিনী বাদ দিয়ে অন্য নাম দিন।'

মা বলেন, 'উনি হয়তো নাম দেবেন অমলিনা, সেটা হয়ে যাবে অমলি, হয়তো দেবেন কমলিকা সেটা হয়ে যাবে কম্‌লি, তার চেয়ে আমি তোদের যা নাম দিয়েছি কেউ সেগুলো বিকৃত করতে পারবে না। একদিন বুঝবি তখন আমায় ধন্যবাদ দিবি। তাছাড়া নিজের ছেলে-মেয়েরই বা কী নাম দিয়েছেন উনি ? মাধুরীলতা তবু যদি বা দাঁড়ায়, রেণুকা ? মীরা ? এত সাধারণ নাম অমন অসাধারণ বাবার মেয়েদের ? রথীন্দ্রনাথ শমীন্দ্রনাথই বা কী আহামরি নাম ! রথী-শমী করে তবু একটু শ্রুতিমধুর হয়েছে। অর্থেরও একটা গভীরত্ব থাকবে তো ?'

মোট কথা রবীন্দ্রনাথের নামাবলি মায়ের একেবারে পছন্দ ছিল না। নামকরণ ছিল মা বাবার প্যাশন। তার অনেক কার্যকারণ থাকত। তার পেছনে ধ্যান-ধারণা, আদর্শ, দর্শন এবং তর্ক-বিতর্কের একটা করে সুবিশাল পটভূমি থাকত। যেমন আমার বড় দাদার নাম প্রথমে হয়েছিল লক্ষ্মীন্দ্রপ্রসাদ। দিয়েছিলেন দাদামশাই অর্থাৎ মায়ের বাবা। মা কোনও আপত্তি করেননি, শুধু তাকে 'ইন্দ্র ইন্দ্র' বলে ডাকতেন, বাবাকে চুপি চুপি বলেও ছিলেন ছেলেকে নিশ্চয়ই তোমরা 'লক্ষ্মী লক্ষ্মী' বলে ডাকবে। ওভাবে ডেকো না দুষ্টু ছেলেদের লক্ষ্মী বলে লাভ নেই। তাছাড়া পরে যখন বড় হলে লোকে লক্ষ্মীদা, লক্ষ্মীবাবু বলে ডাকবে ছেলেই তোমাদের কাছে কৈফিয়ত চাইবে। ব্যস দাদার নাম ইন্দ্র হয়ে গেল। সকলে অর্থাৎ গুরুজনরা জানতেন এ ছেলের নাম ইন্দ্রপ্রসাদ, কিন্তু স্কুল ভর্তির সময়ে সুদূর মোগলসরাইয়ে কে অত খোঁজ রাখতে যাচ্ছেন। ইন্দ্র নাম পাকা হয়ে গেল। এর পরে ঋদ্ধিময়ী। বাবা রেখেছিলেন ঋদ্ধি। প্রথম দু-এক সন্তানের বেলায় মা বাবার প্রসপারিটির আকাঙ্ক্ষাই সবচেয়ে বেশি থাকে, টাকা-পয়সার প্রয়োজনটা সে সময়েই তাঁরা হাড়ে হাড়ে বুঝতে শুরু করেন তো ! তাই ইন্দ্র, তাই ঋদ্ধি, কিন্তু ময়ীটুকু আমার ঠাকুমার দান। ঋদ্ধিও তাঁর স্বভাবতই পছন্দ হয়নি। তিনি 'আভা' নাম রাখতে ইচ্ছুক ছিলেন ! কিন্তু কন্যার পিতার ওপর আর তিনি কী বলতে পারেন ? ক্রমশ বুঝতে পারলেন ঋদ্ধি নাম হলে ছেলের বাড়-বাড়ন্ত হবে, বাড়-বাড়ন্ত যদি খুব না-ও হয় অন্তত ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। 'ময়ী'টুকু তিনি যোগ করে দিয়েছিলেন। সেটা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যায়। বড় ছেলে-মেয়ের নামকরণই প্রথম পরীক্ষা। এই গণ্ডি পার হতে পারলে বাকিগুলো সহজ হয়ে যায়। ইন্দ্র ঋদ্ধি উৎরে গেলে গড়গড় করে নাম আসতে লাগল। ইন্দ্রর পরে সূর্য,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার পরে অংশু, সর্বশেষে 'তেমজ'-এর দুজন পাবন, বরুণ। এঁরা প্রত্যেকেই প্রসাদ ছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রসাদ যে কণিকামাত্র ভোগ্য, এই বাণী স্মরণ করেই আর প্রসাদে যাননি। এখানে চুপিচুপি বলি, শেষ দুটির নাম বলরাম ও কৃষ্ণ রাখতে বাবা আদিষ্ট হয়েছিলেন তদীয় পিতার দ্বারা। এতে মায়ের একটু সুবিধেই হয়ে যায়। বাবা তাঁর বাবার কথার প্রতিবাদ করবেনই। ঠিক তাই। করলেনও। বললেন

—'আপনি কী ভেবেছেন বলুন তো!'

—'কী আবার ভাববো, কালী বলে গেছে ওদের বলরাম জগন্নাথের অংশে জন্ম।' মা আধঘোমটা দিয়ে চা আনছিলেন, তখনও শরীর ভালো সারেনি। তিনি শীর্ণশ্রী। মৃদুকণ্ঠে বলেন, 'এ সব কথা কি লোককে জানতে দেওয়া ভালো?'

মাকে ঠাকুর্দাদা অত্যন্ত স্নেহ করতেন, বললেন, 'ন্যায্য বলেছ বউমা। এ কথাটা তো আমার মনে আসেনি! গুহ্য ব্যাপার কখনই সাধারণের গোচরে আনতে নেই।' বাবা সঙ্কর্ষণ ও কৃষ্ণরূপ-এর পক্ষপাতী ছিলেন। মা আস্তে বলেন, শঙ্কু আর কেষ্টা? বাবা ইঙ্গিতটা তক্ষুণি বুঝে নিলেন। তখনও প্রোফেসর শঙ্কুর জন্ম হয়নি। হলে হয়তো নামটা মায়ের পছন্দ হলেও হতে পারত।

ঠাকুর্দাদা বললেন, 'না, না, না। সঙ্কর্ষণ, কৃষ্ণরূপের তো একই সমস্যা থেকে যাচ্ছে। কোনক্রমেই এটা প্রকাশ...না, না। বউমা, তুমি আর একটু ভাবো।' মায়ের আর একটু ভাবনারই ফল পাবন ও বরুণ।

আমার অন্য দিদিদের নাম শ্রদ্ধা, ভক্তি, ঋদ্ধি, এ অধীনার নাম বিদ্যা। সকলেই আমরা 'ময়ী'। সকলেরই 'ময়ী' মা যথাসময়ে কেটে দিয়েছেন।

নামের বিকৃতি মায়ের একেবারে সহ্য হত না। তাঁর নিজের অতো সুন্দর নাম দেবহূতি, কেউ কি ডাকত? কেউ না। দেবু, সবাই বলত দেবু। এবং মায়েদের ফ্যামিলিতে দেবুমামা, দেবুকাকা, দেবুদাদার কোনও অভাব ছিল না। বাড়িতে বিবাহ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি উৎসবে কেউ একবার দেবু বলে ডাকলে হল। দেবুমামা তাঁর পালোয়ানি গোঁফ, মিলিটারি কাঁধ, কদমছাঁট চুল নিয়ে—'জামাইবাবু ডাকছিলেন?' বলতে বলতে হাজির হয়ে যাবেন, দেবুকাকা নাকের নস্যি মুছে দুবার হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো করে হেঁচে নিয়ে বলবেন—'এঁই যেঁ, এঁলুম দাঁদাঁ, দুঁ মিনিট সবুঁর করোঁ।' দেবুদাদার সবে গোঁফ গজিয়েছে, খুব গুরুত্বপূর্ণ মানুষ হবার ইচ্ছে। সেও একবার টেরি ঠিক করে, একবার চশমা খুলে, আবার চশমা পরে—'পিসেমশাই, দেবু ইজ অলওয়েজ রেডি', বলে আসতে থাকবে। দাদু তিনজনের দিকে দফায় দফায় তাকিয়ে আকাশ হাতড়াতে থাকবেন, এদের কাউকেই তো তিনি ডাকছিলেন না, খুঁজছিলেন না। তাহলে তিনি কাকে চান? খুব কঠিন প্রশ্ন। ঈশ্বরের কৃপায় অবশেষে তাঁর মনে পড়বে, তিনি বলবেন—'দেবো, আমি দেবহূতিকে ডাকছিলুম।' দেবুও এসেছে, একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তার দিকে তাকিয়ে তিনি বলতেন—'মা, আমাকে একটু জল খাওয়াতে পারিস?'

এই ধরনের বিভ্রান্তি মায়ের খুব অপছন্দ ছিল বোঝাই যাচ্ছে। তিনি এমন নাম খুঁজতেন যার জোড়া চট করে পাওয়া যাবে না। যাকে চট করে ভাঙা যাবে না। নাম ভাঙতে পিসিমার জোড়া ছিল না। তাঁর নিজের নাম মনোরমা, নিজেই নিজেকে 'মনো'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে উল্লেখ করতেন। করুণা নামধারী একজনকে তিনি বলতেন, 'কনু', রাধাপ্রসাদকে 'রাধি', গায়ত্রীকে বলতেন 'গাই', মৈত্রেয়ীকে 'মিউ', সর্বাণীকে 'সরু', শিবাণীকে 'শিবি', গুরুচরণকে 'গুচুং', ভবেন্দ্রনাথকে 'ভুচুং' কত আর বলব ! রবিকে অনেকেই 'রবু' করে কিন্তু পিসিমা করতেন 'রেবো'—এর কোনও শব্দতাত্ত্বিক যুক্তি আছে ? রামকে রাম বলে ডাকতে কিসের অসুবিধে ! কিন্তু তিনি বলবেন রেমো। আমাদের ভাই-বোনেদের নাম নিয়ে তিনি বিশেষ কিছু করতে পারেননি বলে বোধহয় ভেতরে ভেতরে একটু দমে গিয়েছিলেন, কিংবা ক্ষেপে গিয়েছিলেন। মায়ের সঙ্গে তাঁর একটা শীতল চালাকির লড়াই চলত। ঋদ্ধি, ভক্তি, শ্রদ্ধা, ঋতিকে তিনি কীভাবে বদলাতে পারেন ? নাম ভাঙাও একটা আর্ট, তারও কতকগুলো রীত-নিয়ম আছে। জিনিসটা লাগসই হতে হবে। পঞ্চানন থেকে যেমন পঞ্চু, পাঁচু, পঞ্চা পর্যন্ত করা যায়, কিন্তু পোচি এমন কি প্যাঁচাও তেমন চলে না। ঋদ্ধিকে ঋধু করে কী লাভ ? ভক্তিকে ভুকি বানানো যায় কিন্তু প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর তাতে থাকে না, শ্রদ্ধাকে সিধু বা সাধু করলেও ইডিয়মেটিক হয় না বদলটা। শব্দ বোধ বা ধ্বনিবোধ পিসিমার খুবই প্রবল ছিল। একমাত্র ঋতিকে তিনি ঋতু করতে পারতেন। কিন্তু যেহেতু 'ঋতু' বলতে তাঁরা ঠিক 'সীজন' বুঝতেন না, অন্য অর্থটাই বেশি চলিত ছিল, তাই 'ঋতু ঋতু' বলে ডাকাডাকি করা থেকে শেষে লজ্জায় বিরত হন।

ভাইপোদের ব্যাপারে কিন্তু তাঁকে আটকানো যায়নি। ইন্দ্রকে পিসিমা ইন্দু ডাকতেন, অনেকেই বাবাকে জিজ্ঞেস করে তাঁর পুত্রের নাম ইন্দুভূষণ না ইন্দুকিরণ ! বাবা রাগ করে বলেন ইন্দুমতী। সূর্যকে সুজ্জি বানাতে পিসিমার কোনই অসুবিধে হয়নি। পাবনকে তিনি পোনু এবং বরুণকে বিনু করেছিলেন। অংশুর ব্যাপারে তাঁর মাথা খোলেনি, তাই অংশু ছিল সেজখোকা। বাবা বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, 'দিদিমণি তুমি সে-জ-খো-কা এতখানি বলতে পারছ, আর সামান্য অংশুটুকু বলে উঠতে পারছ না ?' পিসিমা তাতে বলেন, তিনি সমস্কৃত, বিশেষ করে মন্তর পড়তে পারবেন না সব সময়ে। অংশুর অনুস্বারেই তিনি মন্ত্রর গন্ধ পান। বৃথা মন্ত্র উচ্চারণ করতে নেই, এই মহাজনবাণী অনুসরণ করে চলতেন বলেই তিনি আর সেজ ভাইপোর নামটা উচ্চারণ করলেন না। সংস্কৃত কীভাবে প্রাকৃতে রূপান্তরিত হল, বা তৎসম থেকে তদ্ভবে আসার পদ্ধতিগুলো ঠিক কী কী তার একটি জীবন্ত লেস্‌ন্ ছিলেন পিসিমা মনোরমা মিত্র।

ভাইঝিদের ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত রঙের তাস দিয়ে পিসিমা মায়ের সব সাহেব, টেক্কা জিতে নেন। শুভনাম নিয়ে কিছু করতে না পেরে তিনি ভাইঝিদের রাশনামে হাত বাড়ান। তিনি জানতেন রাশনাম একটু ভারিভুরি, জগদ্দল গোছের হয়। সেখানে ভাই-ভাজ অতটা হালকা হতে পারবে না। তাই অন্নপ্রাশনের সময়ে রাশনামকরণে তিনি খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতেন। ছোট্ট মাথাটি মটকার থানে ঢেকে, গলায় আঁচল দিয়ে ভালোমানুষটির মতন গুঁড়িসুঁড়ি মেরে বসে আছেন যেন কিচ্ছুটি জানেন না। অক্ষর বেরোলো 'ন,' নাম দেওয়া হল নিরুপমা, পিসিমা ডাকলেন পম। এইভাবেই ভক্তির নাম তিলোত্তমা, পিসিমা ডাকলেন টম, শ্রদ্ধার নাম ব্রজেশ্বরী, পিসিমা ডাকলেন বুজ্জি, ঋতির নাম পত্রলেখা, পিসিমা ডাকলেন পটলি। আমার নাম ভবতারিণী, পিসিমার খুব সুবিধে হয়ে গেল, পিসিমা অষ্টোত্তর শতনাম বানাতে থাকলেন। ভবানী, ভবসুন্দরী, ভবশংকরী,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভবি, ভবরানি, শেষে ভুবু হয়ে ডুবু-ডুবু ডুবতে-ডুবতে বুবু।

এইভাবেই পিসিমা মনো এবং মা দেবুর মধ্যে একটা অলিখিত রক্ষা হয়ে যায়। পিসিমাও অর্ধেক জিতেছেন, মা-ও অর্ধেক জিতেছেন। বিপদের সময়ে মানুষ অর্ধেক ত্যাগ করে, মা-ও তাই করেছিলেন। পিসিমা যে অন্তত পক্ষে খেঁদি, বুঁচি, টেঁপি, নেড়া, নেড়ি, ভুতো, হাঁদা, পচা এই সব নাম থেকে আমাদের রেহাই দিয়েছিলেন এতেই মা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন।

এ বিষয়ে আমি ছিলুম পিসিমার যথার্থ উত্তরাধিকারী। দাদা দিদিদের আমি এইভাবে ডাকতে থাকি। পমপম, টমটম, বুজবুজ, পুটপুট, দাদাদের ই-দাদা, সু-দাদা, অংদাদা, পাবনকে পুনপুন এবং বরুণকে বিনবিন বা বুনবুন। পুলকদাদাকে আমি পালক বলে ডাকি, কোনও দাদা যোগ করি না। এর জন্যে যথেষ্ট শাস্তি আমি খাই। অভ্যেস একটু আধটু পাল্টায়ও। তবে ক্রমশ ক্রমশ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় অধ্যায়

গোকুলে বাড়িছে সে

আমি একটা ফুল। জলজ ফুল। পদ্মই হব। কিংবা শালুক। ফুলও নয় এখন। কুঁড়ি। পদ্মকুঁড়ি কিংবা শালুককুঁড়ি। লম্বা নালের ওপর জলে মুখ ভাসিয়ে রেখেছি। পাপড়িগুলো এখন সব মুদে আছে। আরামে। কেন না এখন জন্ম নয়, মৃত্যু নয়, নিদ্রা নয়, জাগরণ নয়। আমি বলতে পারব না এখন কী! শুধু হর্ষ, তরলিত হর্ষ আমার চারপাশে খেলা করে বেড়াচ্ছে। আমি শিউরে শিউরে উঠছি। কিন্তু বড্ড ছোট্ট এই পৃথিবী। মাটি নেই তবু প্রোথিত আছি। কী করে শিহরণ ছড়াব? সঙ্কুচিত হয়ে আছি। খুব সঙ্কুচিত এবং পুঁটলিকৃত হয়ে অবস্থান করছি। হে ইতিহাস, হে বিজ্ঞান, হে দর্শন, তোমরা আমাকে এই আমি দিয়েছ। অনেক অভিজ্ঞা, অনেক অভীপ্সা, অনেক চিন্তায়, ধ্যানে, মননে দিয়েছ, গড়েছ এই আমি। জায়মান, স্ফুটমান। আমি শেষ পর্যন্ত হব তো? পারব তো? ধনুকের মতো বক্র, বৃদ্ধের মতো ন্যুব্জ, ঝুমকো ফুলের মতো নতশির, গিরগিটির মতো কুঞ্চিতচর্ম, হস্তীর মতো লোল, কোমাগ্রস্ত রোগীর মতো নলভুক, পাষাণের মতো পঙ্গু, অর্কিডের মতো পরজীবী, প্রদীপের মতো ক্ষীণপ্রভ এই আমি। জানি না কী ছিলাম, ছিলাম কি না, জানি না কেমন করে হলাম। হলাম কি না। শুধু ধুকধুক করছে-আমি-বোধ, হবো-এই আশায় আছি 'এই আনন্দ, কেন' এই প্রশ্ন...

কে যে আমার শিকড় ধরে টান দেয় থেকে থেকে! কেন যে আমি ঘুরি? একটা বলের মতো আমায় নিয়ে লোফালুফি করে কে সে? একটা সর্পিল ক্ষান্তিপিপাসা থেকে থেকে আমার কণ্ঠ রোধ করতে চায়। কেন? ইতি ঘটাতে চাইছি কেন? আমি চাইছি, না এই তরঙ্গহীন জলধির অন্তরে কোনও অলক্ষ্য বন্ধু শত্রু শত্রুবন্ধু আছে যে এই ক্ষান্তি চায়? না কি এ শুধুই চান্স! অতর্কিত? দৈবাৎ? অকস্মাৎ? এর কি কোনও মানে আছে? না, নেই!

এ কী? এত স্রোত কেন? প্রপতমান জলধির এই নায়াগ্রা কালনাগিনীর মারণপ্যাঁচ সহ আমায় হঠাৎ কোথায় নিয়ে চলল? আমার কোনও শক্তি নেই হে পৃথিবী। যদি চাও তবে মুক্ত করো। যদি চাও। দু-একটি মুহূর্ত, তার মধ্যে ভেবে নাও, চাও কি না।

উত্তুঙ্গ শিখর থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে প্রপাতের প্রতিটি ফোঁটা বেরিয়ে যায়। অন্ধকার, শুকনো, কালো শঙ্কু পথের ওপর ঢলে পড়ছি, মাথা ঠুকছি বন্ধ কপাটে। পৃ...থি...বী...ভে...বে...ছো?

নীলপদ্ম পাপড়ি মেলছে। জ্যোতির্ময় এক পৃথিবীর দিকে মুখ, জ্যোতিষ্মান এক আকাশের দিকে পা, আমি শাঁখ বাজাচ্ছি। যুদ্ধ জিত হয়েছে। পঞ্চজনের থেকে প্রাপ্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই শাঁখ। বাজাচ্ছি। আমি আমি আমি এই আমি।

সেই গর্ভগৃহ ছোট ছিল। অন্ধকার ছিল। এই অলৌকিক আলোর পৃথিবী কী বিরাট! নিজেকে হালকা, বুদ্বুদের মতো মনে হয়। কী লড়াই এখানে! এই আলোর সঙ্গে এই বিরাট ফাঁকা শূন্যের সঙ্গে মানিয়ে নিতে কী ভীষণ লড়াই। চেষ্টায় যেন টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছি। মূত্রে, পুরীষে, লালায় আমি আমার থেকে শতধা হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি। শতধা সহস্রধা। আমি এত কেন? এত কেন? আমি উদর, আমি জানু, আমি উপস্থ, আমি পায়ু। আমি পিঠ, আমি বুক, আমি হাত, আমি পা, আমি চোখ, আমি কান, আমি নাক...আমি এত কেন? এক ছিলাম। পৃথিবী তুমি আমায় ভেঙে চুরে দিলে?

কোথা থেকে গর্জন শোনা যায়। কে ওই ভীষণ গর্জন করছে? ও কি ইন্‌দ্র? যেহোভা? জিব্রাইল? আহুর মাজদা? কে? কে ও?

—'নিয়ে যাও, ওকে নিয়ে যাও, বারো নম্বরে দিয়ে এসো...'

প্রতিধ্বনি গমগম করে বাজতে থাকে। বারো নম্বরে...। ওকে বারো...। নিয়ে যাও...। ওকে দিয়ে এসো...ও...ও...ও।

হাতুড়ি পিটছে বুকের মধ্যে।

—মা ছাড়া ও বাঁচবে কী করে?

—সে নিজেই যেতে বসেছে। যে দুজন সুস্থ তাদের বাঁচান। তাদেরই আগে।

—হানিম্যান সাহেব এই বলেছেন না কি? আমরা তো জানি যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণই আশ, চেষ্টারই নাম চিকিৎসা...

—এ সময়ে তর্ক করবো না। পারলে ওর দিদিভাই-ই ওকে বাঁচাতে পারেন। এখানে সেজমা পারবেন না। দিদিমণির প্রশ্নই ওঠে না। এত বড় সংসার। ওকে বারো নম্বরে নিয়ে যান, আপনি নিজে যান।

অজ্ঞান মায়ের পাশ থেকে ওরা তাহলে আমায় নিয়ে যাবে? মা, মা, মা কে? কী? জানি না। মা মানে মা মানে মা। একটা আশ্বাস। একটা মৃদু আলো মৃদু বায়ুময় গহ্বর যার মধ্যে 'অনন্ত কুয়োর জলে চাঁদে'র মতন আমি আরামে পড়ে থাকি। সেই গহ্বর আর নেই, সেই জল অপসৃত। তবু ছিলাম, লগ্ন ছিলাম, ওরা আমাকে ছিঁড়ে নিল। এখন নিয়ে চলেছে দূরে আরও দূরে। আমি কি ত্যক্ত হলাম? মা। তোমাকে কষ্ট দিয়েছি বলে কি মুখ ফিরিয়ে নিলে? না কি এ ত্যাগ নয়, আরক্ষা? আরক্ষার দিকে চলেছি! কে সে যে চালনা করল? ভূমিকাময় অথচ নিষ্ক্রিয়, জনয়িতা তবু উদাসীন,...

ঘোড়া চলেছে	গাড়ি চলেছে	টক টকাটক	ঘোড়ার ক্ষুর
মাগো আমায়	নিয়ে চলেছে	তোমার থেকে	অনেক দূর
পথের ধারে	ধারের পথে	কাতারে কাতার	কাতারে কাতার
বুড়ো নাচার	ভুখা পাগল	পাগল বুড়ো	ভুখা নাচার
বুকের ভেতর	ঝড়ের হাপর	বুকের ওপর	আগুন গোলা
অন্ন অন্ন	অন্ন বলে	আগুন চাটে	কে ব্যোমভোলা?
ছ্যাকরা গাড়ির	আদুল গায়ে	নোংরা চটা	ন্যাংটা মাথায়
ভরা বাদর	চ্যাটাং চ্যাটাং	চ্যাটাং বোলে	তবলা বাজায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যশোমতীর	ভরাট চোখ	যশো কাঁদেন	ছেলের শোক
সাতটি পুত্র	একটি তার	হলেন যমের	জোগানদার
সান্নিপাতিক	জ্বরবিকারে	দুই পুত্রের	নাড়ি ছাড়ে
একটি সে যে	নদীর টান	চলল ভেসে	কোন উজান
আরেকটি সে	বাপের কোলে	ধড়ফড়িয়ে	পড়ল ঢলে
আসুন বাপা	বসুন বাপা	এইটি আমার	ন্যালাখ্যাপা
বৃষ্টি পড়ে	বৃষ্টি পড়ে	লোকে এবং	লোকান্তরে
কনিষ্ঠটিই	আস্ত তাঁর	বক্ষে আজো	দুধের ধার...

যশোমতী তাঁর বক্ষ দু হাতে টিপে ধরছেন আর তেষ্টার জল সো-জা আমি মুখ, আমাতে পড়ছে। চেষ্টা করতে হচ্ছে না। অর্জুন যেন শুয়ে আছেন শরশয্যায়, পিতামহ তাঁর পিপাসা মেটাচ্ছেন। অর্জুন আর ভীষ্মর ভূমিকা উল্টে গেছে। আমার সমস্তটাই এখন মুখ, কখনও উদর, কখনও শিশ্ন, কখনও পায়ু। আমি কি আবার অখণ্ড হওয়ার দিকে চলেছি ? সেই গর্ভের মতন ? না, না, আলো-অন্ধকারের সেই মৃদুতা আর নেই। এ বার যদি সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জড়ো করে এক হতে পারি সে তা হবে অন্যরকম অখণ্ডতা। আমি এখন মাতৃক্রোড়ে। মা নয়, তবু মা-ই। দেবকীনন্দন নই আর, এখন যশোদা-দুলাল।

দিদিভাই বুকের দুধ গেলে গেলে পলতে ভিজিয়ে আমাকে খাওয়াচ্ছেন। মাথার ওপর বালব জ্বলছে। তুলোর পাঁজে অঙ্গ ঢাকা। পাখির মলমূত্রের মতো সামান্য শরীরমল আমার তুলো ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। গায়ে হাত লাগছে না। তুলোর শয্যা থেকে আমাকে নড়ানো চড়ানো যাচ্ছে না অন্তত একমাস। তার পরেও দিদিভাই ছাড়া কারও হাত ছুঁচ্ছে না আমায়। হাঁটু মুড়ে বুকের কাছে দু হাত জড়ো, তলতলে মাথার চামড়ার তলায় করোটির জোড় দেখা যাচ্ছে, নাড়ির ধুকধুকুনি দেখা যাচ্ছে। চোখ খোলে না, মুখ খোলে না, আঁটো মুঠি, গুটিসুটি। কেউ ভাবেনি আমি বাঁচবো, কেউ আমায় দেখতে আসেন না, বাবা না, ঠাকুর্দা না, মা না কি জানেনই না আমি হয়েছি। জীবনে মরণে দড়ি টানাটানি চলছে তখন। ও দিকে। এ দিকে। দিদিভাই জানতে চাইলেন না মেয়ে কেমন আছে। তার আর দুটি সন্তান কেমন আছে। হয়তো যে মুহূর্তে ঠাকুর্দা তুলোয় মোড়া সেই জ্যান্ত আকাল তাঁর হাতে তুলে দেন তখনই তিনি ভেবে নিয়েছিলেন আর কেউ নেই, এই শেষ। তার সমস্ত জগৎ তখন ছোট্ট সেই প্রাণপিণ্ডে সমাহৃত, সমর্পিত। তিনি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন প্রসবশ্রান্ত মুমূর্ষু জ্যেষ্ঠার দিক থেকে, যে থাকতেও পারে না-ও পারে। মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন পাঁচটি মৃত সন্তানের স্মৃতি-বিষাদের দিক থেকে। সাতটি নাতি নাতনি এখন তাঁর কেউ না। দুটি নবজাতক যারা থাকতেও পারে, না-ও পারে তারাও তাঁর কেউ না। তিনি তদ্‌গত, তন্ময়। একটি মাত্র মুখগহ্বরে তিনি এখন স্থাণু বিশ্ব ও চলৎ বিশ্ব, অদ্রি দ্বীপাদি, খ-গোল, জল, অগ্নি, মন ইত্যাদি দশ ইন্দ্রিয়, সত্ত্বঃ রজঃ ইত্যাদি তিন গুণ, উত্তর দক্ষিণ ইত্যাদি চার দিক-সমন্বিত এই বিশাল ভূ গোলক প্রত্যক্ষ করছেন। আর কিছু স্মরণে নেই।

দ্বিতীয় মাসেই আমি স্তনের বৃন্তে মুখ রাখতে পারলাম। টানতে পারছি। আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারছি ! টানছি আর আমার মুখের মধ্যে চলে যাচ্ছে কবোষ্ণ মধুর রস, জিভ, খাদ্যনালী বেয়ে নেমে যাচ্ছে পাকযন্ত্রে। সঞ্জীবিত হয়ে উঠছি। আপাদমস্তক। তৃতীয় মাসে আমাকে শরবতি লেবুর রস, আর ডিমের কুসুম খেতে দেওয়া হচ্ছে।

আমার মামার বাড়িতে মুরগির ডিম ছেড়ে পাঁঠার মাংস পর্যন্ত ঢুকত না। একমাত্র কালীঘাটের প্রসাদী মাংস পেঁয়াজ ছাড়া রান্না করে খাওয়া হত বছরে একবার। সেই মাংস রান্নার ও খাওয়ার আলাদা বাসনকোশন ছিল। কিন্তু আমার বেলা ডাক্তার ঠাকুর্দাদা যখন বিশেষভাবে মুরগির ডিমের কুসুমেরই বিধান দিলেন, তখন কুলসুম বলে এক বুড়ি নিকাশিপাড়া থেকে প্রত্যহ একটি করে টাটকা মুরগির ডিম দিয়ে গেলে দিদিভাই সন্তর্পণে তাকে সেই পাম্প দেওয়া স্টোভে সেদ্ধ করে, সিকি চামচ ফোটোনো জল দিয়ে মেড়ে আমায় খাইয়ে দিতেন। তারপর চান করে, মাথায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে আবার ঘরে ঢুকতেন, কিন্তু আমি সেই ডিম-খাওয়া জিভ, ডিম খেগো জামাকাপড়, চামড়া-নখ-চুল নিয়েই বহাল তবিয়তে দিদিভাইয়ের খাটে, আমার নিজের বিছানায় অবস্থান করতাম। আমাকে চান করাতে, জামাকাপড় ছাড়াতে, পরাতে, খাওয়াতে দিদিভাইয়ের শুচিতা যেত না। এবং সব চাইতে অদ্ভুত কথা, আমার পরম বৈষ্ণব দাদাভাই যিনি মুরগির নাম শুনলেও কান ধুতেন, তিনি 'আতুরে নিয়মো নাস্তি' বলে দোরগোড়া থেকে উঁকি মেরে রোজ আমার ডিম্বভক্ষণ দেখে যেতেন।

চতুর্থ মাসে ঠাকুর্দা আমার ঘরে ঢুকলেন।

—'অসাধ্যসাধন তাহলে করলেন বেয়ান ?'

—'উনি করার কে ?'—দাদাভাই বললেন, 'যিনি করার তিনিই করেছেন।'

—'তা অবশ্য', ঠাকুর্দা হেসে বললেন, 'কালীয়দমন যিনি করতে করতেই অবতীর্ণ হয়েছেন, থাকবেন কিনা তিনি নিজেই স্থির করবেন। তবু বলি বেয়ান পিঠে-পায়সেও যেমন, নার্সিংএ-ও তেমনি আপনার তুলনা নেই।'

দাদাভাই দু হাত জোড় করে বললেন—

'রূপং যত্ তত্ প্রাহুরব্যক্তমাদ্যং ব্রহ্ম জ্যোতির্নির্গুণং নির্বিকারম।
সত্তামাত্রং নির্বিশেষং নিরীহং স ধং সাক্ষাদ বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ।'

—'কার স্তব করছেন মশায় ? মাতার না শিশুর ?'

দাদাভাই জিভ কেটে বললেন, 'ও কথা বলতে নেই দাদা, যিনি অব্যক্ত, আদি নির্গুণ, নির্বিকার সেই সত্তামাত্র ব্রহ্মজ্যোতিস্বরূপ সাক্ষাৎ বিষ্ণু যখন আমাদের জন্য রূপ ধারণই করেছেন তখন তাঁর ছাড়া আর কার স্তুতি করব ?'

ঠাকুর্দা বললেন, 'ওরে বাবা, একেবারে সাক্ষাৎ বিষ্ণু ?'

—'সাক্ষাৎ বিষ্ণুই তো কৃষ্ণ হয়ে ব্রজে অবতীর্ণ হয়েছিলেন দাদা !'

—'আপনারা কায়েত ঘোষই জানতাম, গোয়ালার পো তা তো আগে বলেননি বেয়াইমশাই ! ভেবেছিলুম একমাত্তর ছেলে কুলীনে কাজ করছি। একেবারে দধি দধীনি বানিয়ে ছাড়লেন যে !'

দাদাভাই এমন একটা তদ্গত ভোলেভালা হাসি হাসলেন, যার পর আর তামাশা চলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, বললেন—'সে ভাগ্য কি আর করেছি ?...কী গো ? দেখাও না, দাদাকে দেখাও !'

—'কী দেখাবেন ?'

—'দেখুনই না, দেখুন, বলুন।'

দিদিভাই বললেন, 'কী যে পাগলামি করো !'

—'তুমি দেখাওই না !'

ঠাকুর্দার উৎসুক দৃষ্টির সামনে আমাকে উল্টে ধরলেন দিদিভাই। কোমর আর পাছার মাঝামাঝি জায়গাটা নীল।

—'ও হো হো'—ঠাকুর্দা হাসতে হাসতে বললেন—'ও সব বার্থ ট্রমা। ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাবে।'

দিদিভাই আমাকে চিত করলেন। বুকের ওপর আবছা খয়েরি মতো দাগ। ঠাকুর্দা হাসলেন—'জড়ুল। জড়ুল দেখেননি ?'

—'সোনালি জড়ুল হয় ?'

—'হয়, হয়, সাদা, সোনালি, খয়েরি কত রঙের হয় বেয়াই !'

দাদাভাই আবার সেই হাসিটা হাসলেন। আপন মনে। কারও কোনও কথায় নয়। কোনও পূর্ব প্রসঙ্গ মনে করেই যেন বা এই প্রসন্ন হাসি।

ওঁদের দুজনের মধ্যে একটা খেলা চলছে। ঠাকুর্দা বল ছুঁড়ছেন, দাদাভাই ধরে নিচ্ছেন, আবার ছুঁড়ছেন, এ বার দাদাভাই ধরে নিচ্ছেন। বল লোফালুফির এক ছেলেমানুষি খেলা, যে ছেলেমানুষি একমাত্র বুড়োমানুষেরাই করতে পারেন। ঠাকুর্দাদা বিজ্ঞান পড়েছেন, চিকিৎসাশাস্ত্র তো শুধু বিজ্ঞানই নয়, প্রয়োগ-বিজ্ঞান ! তিনি জানেন কী থেকে কী হয়, গর্ভদ্বারের কেমন আঘাতে কেমন দাগ হয়, তিনি জানেন পিগমেন্টেশনের তত্ত্ব। কিন্তু তাঁর মস্তিষ্কের মধ্যে খেলে বেড়াচ্ছে এক প্রতীক্ষা। এই প্রতীক্ষা তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন। বৈজ্ঞানিক যুক্তি-তর্ক-বিশ্লেষণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে বেরিয়ে আসছে এই প্রতীক্ষার সত্য। তিনি শুনতে চাইছেন, আশ্বাস চাইছেন। বিশ্বাস-অবিশ্বাস আশা-নৈরাশ্যের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে। তিনি একজন রেফারি চাইছেন। দাদাভাই তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান নিয়ে কি সেই রেফারি হতে পারবেন ? দাদাভাইয়ের বিশ্বাসও নিছক অন্ধবিশ্বাস নয়। তাঁরও এক বিজ্ঞান আছে। শাস্ত্রবিজ্ঞান। সেখানে মাথার ওপর দেবভূমি। তারও ওপর গোলোক। তলায় মর্ত্য, তারও তলায় সপ্ততল পাতাল। স্বর্গ মর্ত্য পাতালের মধ্যে অনবরত এক দেওয়া-নেওয়া চলেছে। পুরাণ অনুসারে। বিষ্ণুপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, স্কন্দপুরাণ, বায়ুপুরাণ...এবং অবশ্যই ভাগবতপুরাণ। তিনি পুরাণ মিলিয়ে মহাপুরুষলক্ষণ বিচার করেন, চিহ্ন দেখেন, 'দা সাইন', যার জন্যে য়িহুদি ঋষিরা মত্ত হয়ে উঠেছিলেন, বুকের খয়েরি-হলুদ-সোনালি জড়ুল সেই লক্ষণ, দেবতার বুকে যা দক্ষিণাবর্ত রোমরাজি। মানুষ-দেবতার বুকে তা-ই জড়ুল চিহ্ন, দেবতার ত্বকে যা নবজল ভারাক্রান্ত মেঘের মতো বর্ণ। মানুষ-দেবতার ত্বকে তা-ই অস্ট্রেলিয়ার ম্যাপের মতো নীল ছাপ।

দাদাভাই অনাদিপ্রকাশ ঘোষ আমার ঠাকুর্দাদা শিবপ্রসাদ সিংহ রায়ের থেকে বয়সে বেশ ছোটই ছিলেন। দিদিভাই তরুবালা তো আমার পিসিমার থেকেও সামান্য ছোট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাদাভাইদের পৈতৃক জমিজমা প্রচুর ছিল, সে সব দেখাশোনা করতেন তাঁর ভাই অনন্তপ্রকাশ। হরিপাল তাঁদের আদি ভূমি। অনন্তপ্রকাশ সপরিবারে সেখানেই থাকতেন। দাদাভাই ভুলো স্বভাবের জন্য কোনও চাকরিতে টিকতে পারতেন না। কলকাতার সম্পত্তি দেখবার কথা তাঁর। তিনি নিজে একটি বাড়িতে থাকতেন, আরও তিনটি বাড়ি ভাড়া দেওয়া ছিল। এ সব দেখাশোনা দিদিভাই-ই করতেন। দাদাভাই কিছুই দেখতেন না। কেন না তাঁর চোখ থাকত অন্যত্র। শোনা যায়, যুদ্ধের ডামাডোলে তিনি একদিন টোলে বেরিয়েছেন। টোলে পণ্ডিতদের সহায়তায় তিনি একটার পর একটা 'শাস্ত্র' পড়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময়ে সাইরেন বাজে, দাদাভাই আকাশে চোখ তুলে দেখেন গর্জন করে বিমানের ঝাঁক আসছে। ব্যস তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন, এবং শূন্যে আঙুল তুলে আঁকিবুঁকি কাটতে থাকলেন। এই অবস্থায় এ আর পি তাঁকে ধরে এবং একটি এয়ার-রেইড শেলটারের দিকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। ইতিমধ্যে পুলিসের গাড়িতে তিনি থানায় চালান হন। জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, তিনি এরোপ্লেনের ঝাঁকটি পার্ফেক্ট প্যারাবোলায় যাচ্ছে কি না দেখছিলেন। তাঁকে স্পাই সন্দেহে আটক রাখা হয়। পরে তাঁর ঝোলা তন্ন তন্ন করে সার্চ করে যখন পতঞ্জলির মহাভাষ্য ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না, তখন থানার বড়বাবু সার্জেন্টটিকে ধমকা ধমকি করতে থাকেন সে খ্যাপা পাগলের থেকে স্পাই আলাদা করতে পারে না বলে। এ গল্প অজানাই থেকে যেত কারণ দাদাভাই অল-ক্লিয়ার বাজার দু ঘণ্টা পর বাড়ি ফেরেন। যথা সময়ে। দিদিভাইয়ের ধারণা ছিল তিনি সংস্কৃত কলেজেই ছিলেন। তিনি হাতের কাজ সারতে সারতে এমনিই জিজ্ঞেস করেন—'সংস্কৃত কলেজের এয়ার রেইড শেল্টারটা কোথায় ?'

দাদাভাইয়ের জবাব—'কে জানে ?'

দিদিভাই—'সে কী ? আধঘণ্টা পরে আজ অল-ক্লিয়ার দিয়েছে। এতক্ষণ ছিলে অথচ শেল্টারটা কোথায় জানো না ?'

—'শেলটারে তো ছিলুম না !'

—'যাওনি ? তোমার পণ্ডিতমশাইও কি তোমার মতো ?'

—'পণ্ডিতমশায় ? হ্যাঁ তা বটে, আমার থেকে ইঞ্চি দুয়েক ছোট হবেন।'

—'আমি জিজ্ঞেস করছি তিনি কেন শেলটারে যাননি !'

—'গিয়ে থাকতে পারেন, তবে আমি জানি না।'

—'মানে ?'

—'আমি তো ওখানে ছিলুম না।'

—'কোথায় ছিলে !'

—'হাজতে।'

এরপর আস্তে আস্তে কাহিনীর ডিটেইলস বেরিয়ে আসতে থাকে। দাদাভাইয়ের নেশা ছিল অঙ্কশাস্ত্র আর সংস্কৃত শাস্ত্র। "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্", "কুমারসম্ভবম্", "মৃচ্ছকটিকম্", কিংবা "কাদম্বরী" সবই তিনি শাস্ত্রজ্ঞানে পড়তেন। একমাত্র বাৎসায়ন আর কৌটিল্যের অংশবিশেষ পড়েই নাকি তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠেছিলেন —'এ হে হে হে হে।' এই ব্যাপারে পারলে আরও আলোকপাত করবো। এখন ক্ষান্ত হই। কেন না, নন্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বংশের বংশলতিকা আমায় পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছে। পাইথনের মতো চাপ দিচ্ছে। যতক্ষণ না প্রকাশ করছি, মুক্তি নেই।

অনাদিপ্রকাশ ছিলেন যতটা ভোলেভালা, অনন্তপ্রকাশ ঠিক ততটাই বিষয়ী। আরও তিন ভাই ছিলেন এঁদের। চিন্তামণি, যদুমণি ও নীলমণি। প্রকাশ থেকে হঠাৎ মণিতে চলে যাওয়ার একমাত্র কারণ হিসেবে অনুমান করা যায়, মণিরা ভিন্ন মায়ের সন্তান ছিলেন। সৎপুত্রদের থেকে আপন পেটের সন্তানদের তিনি হয়তো আলাদা করতে চেয়েছিলেন। এঁদের একটি মাত্রই বোন ছিলেন। তিনটি বোন হয়ে হয়ে মারা গিয়ে একমাত্র এই একটি বোনই জীবিত ছিলেন। এঁর নাম ছিল হারামণি। ইনি ভাইয়েদের খুব আদরের ছিলেন। এঁর আঠারটি সন্তান হয়। এই হারাদিদিমাকে আমি আমাদের বাড়িতে অর্থাৎ মামার বাড়িতে দেখেছি। ইনি ভীষণ মিষ্টি খেতে ভালবাসতেন। মিষ্টির ওপরই থাকতেন। বিশেষ করে গুড়। ভেলি গুড় তো তাই সই। হারাদিদিমা আসবার কথা হলেই দেখেছি মামার বাড়িতে ছুটোছুটি পড়ে যেত। গুড়, বাতাসা, কদমা সংগ্রহের জন্য দাদাভাই কলকাতার সব বাজার ওলোট-পালোট করে ফেলতেন। যদিও হারাদিদিমা সঙ্গে করে থান থান পাটালি নিয়েই আসতেন। হারাদিদিমার যে-ছবি আমার সর্বপ্রথম স্মরণে আসে, তা তাঁর দুই ছেলেমেয়ের স্তন্যপানের দৃশ্য। এক বছরের ছোট-বড় এই মামা-মাসি তখন বোধহয় সাত, আট। আমার মামার সঙ্গে এরা যত রকম শয়তানি সবই করে বেড়াতো। কিন্তু রাতে শোবার আগে বাঘের বাচ্চার মতো হারাদিদিমার কাছ ঘেঁষে বসে পড়ত। তিনি সঙ্গে সঙ্গে গায়ের কাপড় খুলে দিতেন। দিদিমার কোল ও স্তন্য নিয়ে দুজনের মারপিট আরম্ভ হয়ে যেত। অবশেষে হারাদিদিমা বলতেন —'রও।' তিনি তাঁর প্রলম্বিত স্তন্যের একটিকে কাঁধের ওপর লাঠির আগায় বাঁধা পুঁটলির মতো ঝপাং করে পেছনে ফেলে দিতেন। একজন পেছন দিকে চলে গিয়ে স্তন্য পান করত, আর একজন করতো সামনে বসে। নির্বিকার মুখে পান সাজতেন হারাদিদিমা।

এই দৃশ্য আমার কাছে এমনি আশ্চর্যজনক ব্যাপার ছিল যে আমাকে সেখান থেকে নড়ানো যেত না, ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমা মুখে পুরে আমি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতুম, দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বসে পড়তুম, বসে থাকতে থাকতে শুয়ে পড়তুম, তখন কেউ আমায় চ্যাংদোলা করে বিছানায় নিয়ে যেতে গেলে আমি হাত পা ছুড়তে ছুড়তে ঘুমগলায় চেঁচাতুম—'হারাদিদিমার মিনা খাওয়া দেখবো-ও।'

এই দৃশ্য দেখেশুনেই বোধহয় স্তন্য সম্পর্কে আমার এক ধরনের গবেষকের কৌতূহল জন্মে যায়। ছোটবেলায় ধারণা ছিল মানুষ যেমন এক রকমের জীব, স্তনও তেমনি। জীবের সব রকম প্রপার্টিই তাদের আছে। দুঃখের বিষয়, এরা কথা বলতে পারে না, পারবে না-ই বা কেন? এই নিয়ে কত জল্পনা-কল্পনা করতে করতে আমরা মামা-মাসি-ভাগ্নে হারাদিদিমার দুই স্তনের বিয়ে-থা দিয়েছি কিন্তু তারা কোনও সন্তান প্রসব না করায় বেদনা পেয়েছি, আশ্চর্য হয়েছি! লেত্তির ছানা হয়, গঙ্গু (মুলতানি গাই)-র ছানা হয়, হারাদিদিমার মিনারই বা হবে না কেন? কী অবিচার?

হারাদিদিমার এই প্রত্যঙ্গের কোনও তুলনা আমি আজ পর্যন্ত পাইনি। চামড়ার সেই আলগা লম্বা থলি, যার তলদেশে জেলিজাতীয় কোনও পদার্থ ভেতরে থলথল করছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুড়ো আঙুলের মতো বোঁটা, কুচকুচে কালো এবং কুঞ্চিত। তাকে ঘিরে সমকেন্দ্রিক বৃত্তসকল। প্রথমটি কুচকুচে কালো, তার পরেরটি খয়েরি, ক্রমশ আবছা হতে হতে অবশেষে ফিকে গোলাপি। এই স্মৃতি এমনই স্পষ্ট ও গভীর যে আজ পর্যন্ত নারীর স্তনকে কোনও সুন্দর, উত্তেজক ব্যাপার বলে আমি মনে করতেই পারি না। বায়োলজিস্ট কি তার গিনিপিগের ওপর কোনও করুণা অনুভব করে ? বৈজ্ঞানিক নিস্পৃহা আমার নারীর এই প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে। পূতনা সুতরাং ওইখানেই কতকটা বধ হয়ে যায়।

ষষ্ঠ মাসে যখন আমাদের অন্নপ্রাশনের আয়োজন হচ্ছে তখন দিদিভাইয়ের হঠাৎ স্মরণ হয় তাঁর একটি নিজস্ব ছোটছেলে আছে। বয়স পাঁচ কি ছয়। সে-ও স্তন্যপায়ী। এতদিন তার ধনেই তার খাদ্যে বা পেয়-তেই তার ভাগ্নে ভাগ বসিয়েছে। যে ভাগ বসায় সে-ই ভাগ-নে তো ? তিনি আমার ফুলমামুকে ডাকতে থাকেন। —'ছোটকুসোনা, ছোটকুমণি, এসো।' যতই তিনি ডাকেন ফুলমামু ততই সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে যেতে থাকেন। অবশেষে তিনতলার ছাদের দরজার কাছ থেকে কচি কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে আসতে থাকে—'মা। আমি আর খামখাম খাবো না।'

—'কেন রে ?'— দিদিমাও অনুশোচনায় প্রায় গলদশ্রু হয়ে ওপরে উঠতে থাকেন। অবশেষে মা ও ছেলে মুখোমুখি হন। ছেলে গোলাপি বেনারসির পাঞ্জাবি ও ছোট্ট কোঁচানো ধুতি (ভাগ্নে-ভাগ্নীত্রয়ের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে) পরে সিঁড়ির সবচেয়ে ওপরের ধাপে, যার পরই খোলা ছাদ ও রোদে-ভেসে-যাওয়া নীলাভ আকাশ, নীচের ধাপে মুখোমুখি আলগা খোঁপা বাঁধা, চওড়া-পাড়-শাড়ি ও শঙ্খকঙ্কণে সজ্জিতা মা। গায়ে আলগা সেমিজ যার ফাঁস খোলবার জন্যে তিনি প্রস্তুত।

ছেলে সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপে দাঁড়িয়ে শুধু শুনছে।

—'কেন রে ?'

সে তখন সেই কঠিন জবাব দেয় যা এতো তা-বড় তা-বড় পদস্থ সব মানুষও তাঁদের খোকামি সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়া হলেও বলে বা বুঝে উঠতেও পারেন না।

—'আমি এখম বড় হয়ে গিছি।'

ব্যস। বৎস বড় হয়ে গেলে গাভীমাতার বাঁট যেমন শুকিয়ে যায়, দিদিভাইয়ের অমৃতপ্রস্রবণও সেই মুহূর্তে শুকিয়ে গেল। শুধু ফুলমামুই নয়, অন্নপ্রাশনের দিন থেকে আমিও আর খামখাম খেতে পাইনি। গল্প শুনেছি, আমাকে ছাগল দুধ ধরানো হয়, হাত পা ছুঁড়ে কী রকম কাঁদতুম আমি সেই দুধ ঝিনুকে করে খেতে এবং দুগ্ধের প্রতি অভিমানবশতই কীভাবে আমি চটপট কঠিন খাদ্য ধরে ফেলি এ গল্পও শুনেছি। প্রশ্ন উঠতেই পারে কোন টানে দিদিভাই ছেচল্লিশ বছর বয়সেও দুগ্ধবতী থেকে একটি শিশুর প্রাণরক্ষা করতে পেরেছিলেন। বৈষ্ণবী মায়া ? না নেহাত জৈব নিয়মেই ? কার প্রতি বেশি টান ছিল দিদিভাইয়ের ? পেটের ছেলে না অর্জন করা পুত্র ?— আরও অনেক প্রশ্নের মতো এ প্রশ্নেরও জবাব নেই।

ভাগ্যেতে সমর্পিত-প্রাণ মাকে জীবন-মরণের লড়াইয়ে চারমাস আদ্যন্ত দেখে যাঁর ম্যাচুওরিটি হয়, আমার সেই মামুর নাম কানাই, কানু। কানু বিনে আমার জীবনে গীত নাই, গতিও নাই। সে সব কথা পরে। আপাতত আমি জলাধিপতি পসাইডন, জিউসের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপন ভাই, যাঁকে কিছুতেই বঞ্চিত করতে না পেরে অবশেষে পৃথিবীব্যাপী নদী-প্রস্রবণ-সমুদ্রের অধিকার তাঁকে দিতেই হয়েছিল, যিনি রেগে উঠলেই কেঁপে উঠত পৃথিবীর সব জলাধার ; কিংবা আমি মিত্রাবরুণৌ-এর সেই অন্ধকারের সূর্য, যিনি মিত্রর সঙ্গে মিলিয়েও আছেন, আলাদাও আছেন, ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র বেদেও আছেন, আবার উরুবণরূপে প্রাচীন আনাতোলিয়ার মিতান্নি লিপিতেও আছেন।

আসলে আমার অভিভাবকরা জানেনই না আমি যম না যমুনা। গিরি গোবর্ধন ধারণ করব, না প্লাবনে পৃথিবী ভাসিয়ে দেবো। তাঁদের অনন্ত আশা মৃত্যুর সঙ্গে কঠিন লড়াই করে যে বেঁচেছে তার ভবিষ্যৎও অনন্ত।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চতুর্থ অধ্যায়
'Heaven lies about us...'

কী যেন একটা দুলছে। আশে নয়, পাশে নয়, একেবারে মাথার ওপরে। তা-ও আমার আওতার বাইরে। ওটা আমায় ভাল করে দেখতে হবে। আগে দেখে নিই, তারপর ঠিক করব নেব কি না। চিত হয়ে শুয়ে আছি। কড়িকাঠ দেখতে পাচ্ছি। লম্বা লম্বা লাইন, মোটা মোটা, আবার সরু সরু। রং ? কী রং ? কী জানি কী ? চোখে লাগে না, চেয়ে থাকতে কষ্ট হয় না। সাদাটা আমি চিনি। আশে পাশে চারিভিতে শুধু সাদা সাদা আর সাদা। এটাই তা হলে পৃথিবীর রঙ ! কিন্তু ওই দুলদুলে ঝুলঝুলে জিনিসটা সাদা নয়। ওইটা দেখতে হলে আমাকে শিবনেত্র হতে হবে। কিংবা চিবুক উঁচু করে মাথাটাকে একটু হেলিয়ে দিতে হবে পেছন দিকে। তাই করছি। ভারি উজ্জ্বল জিনিসটা। আবার জোঁ-ও-ও মতো শব্দ করে ঘোরে। তখন আমার ভীষণ ভী-ষণ আহ্লাদ হয়। আমি প্রবল বেগে হাত পা ছুড়তে থাকি। হাসিতে আমার মুখ ভরে যায়, গলার মধ্যে হাঁসের ডাকের মতো একটা আওয়াজ করি আমি। আর অমনি আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে একটা না একটা অনিন্দ্যসুন্দর মুখ। এরকম দুটো মুখ আছে আমার। একটা একটু বড়সড়, আর একটা ছোট। বড় মুখটায় একটা সূর্য আছে। দুটো দিঘি আছে। তাতে কতরকম আলো ঝলকায়। একটা সাঁকো আছে। হাত বাড়িয়ে আমি সাঁকো ছুঁতে পারি। যখন মুখটা আমার ওপর খুব খু-উব ঝুঁকে পড়ে। মুখটায় একটা গুহাও আছে। সেই আদি গুহার মতো নয়। এ গুহাটার দু' দিকে, ওপরে-নীচে উজ্জ্বল রঙের পাড়। ফাঁক হলেই গুহাটা ঝিকিয়ে ওঠে। তখন আমারও ভেতরে কে যেন কাতাকুতু দেয়। আমি কিলবিলি করে উঠি, আহ্লাদে।

—'দেখ, দেখ, ও কেমন পিঠটা তুলে দিচ্ছে। কোলে উঠতে চায়।'

—'তুমি ওকে নাও, কোলে নাও না মা।'

—'উঁহু ওকে কোলে নেওয়া বারণ। ডাক্তার মেসো বারণ করেছেন। মানুষের গায়ে নুন থাকে। তাতে বাচ্চার ক্ষতি হয়।'

—'তুমি কি মানুষ না কি ?'

—'মানুষ নয় ? তবে আমি কী ?'

—'তুমি তো মা !'

—'মা, মা'—আমি প্রাণপণে ডাকতে চেষ্টা করি। মা। মা। মা। ও মা। আমায় নাও মা। আমায় কোলে তুলে নাও। তোমার সংসার-মাখা মায়ামোহ আশ্রয়মাখা কোলে আমায় তুলে নাও। এই বিচ্ছেদ, এই বিরহ আমি সইতে পারছি না মা। যতই তুমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার দু দিকে পাশবালিশ ঠেসে দাও, যতই তুমি আমার বুকের ওপর হালকা বালিশ রাখো, আমি বুঝতে পারি ওটা মোটেই তোমার হাত নয়, বালিশ, একটা নিষ্প্রাণ বস্তু, বস্তুগুণে যার মধ্যে কিছুটা যান্ত্রিক উষ্ণতা আছে। তোমার হাতের ওম্ ও কোথায় পাবে ? তোমার হাতের প্রাণ, মমতা তুলো কী করে পাবে ? আমি ঠি-ক বুঝতে পারি। 'মা মা' আমি ডাকতে চেষ্টা করি। ম্‌ম্‌ম্‌ম্‌ম্ মতো একটা আওয়াজ বেরোয়।

—'ও তোমাকে ডাকছে মা।'

—'ডাকুক।'

—'মা ও ঠোঁট ফোলাচ্ছে, দেখো !'

—'ফোলাক।'

—'নেবে না ?'

—'উঁহুহ্।'

আমার মুখটা ভেঙেচুরে যায় যেন একটা গোল আয়নার ওপর কেউ পাথর ছুড়ে মেরেছে।

'হো-ও-অ্যা-অ্যা, হো-অ্যা, হো-অ্যা'— আয়না ফেটে যাওয়ার আওয়াজে ঘর ভরে যায়।

—'বা বা, বেশ তো গলা বেরিয়েছে। কাঁদো একটু কাঁদো দাদা। বুক ভরুক। জোর বাড়ুক। কাঁদো কাঁদো।'

—'ও বড্ড কাঁদছে মা।'

—'কাঁদুক।'

ছোট মুখটা এবার ঝুঁকে পড়েছে। যেন লাফ দিয়ে চলে এসেছে সামনে। ভা-রি চিকণ এই মুখটা। এ মুখটায় খালি ফুল, খালি ফুল। নীল নীল অপরাজিতার ভেতর থেকে জল চিকচিক করে। বরং একটা কলকে ফুল লম্বা হয়ে ঝুলে থাকে দো-পাটির নরম নরম আলগা-বোঁটা পাপড়ির ওপর। এই মুখটায় হাত বোলাতে আমার ভী-ষণ ভাল লাগবে। 'হো-ও-অ্যা' ভুলে আমি আমার বাঁ হাতটা মুঠো করে বাড়িয়ে দিই। বাঁ কাঁধটা উঠে যায়। মুঠো দিয়ে ওই চিকণকে আমি ধরতে যাই।

—'মা, ও মা, ও আমায় খিমচোচ্ছে।'

—'খিমচোক। তুমি কেন ওকে বিরক্ত করছ ?'

ম্‌ম্‌ম্‌ম্‌ম্‌ম্‌ম্—আমি বিরক্ত হইনি তো ! আমার শরীরে বিরক্তি বলে কিছু আছে নাকি ? নেই। খুব কম সময়ে আমি বিরক্ত হই। যখন তুমি চোখ ফাঁক করে কাজল পরাও। যখন তুমি সেই টক-টক মিষ্টি-মিষ্টি জিনিসটা আমায় দিতে দেরি করো, যখন তোমার ঝিনুক আমার জিভে লেগে যায়, যখন ঘুম ভাঙিয়ে আমায় চান করাও বা যখন সময়মতো চান করাও না, যখন তপতপে মতো জিনিসটা আমায় খাওয়াও, যেটা আমার ভাল লাগে কিন্তু গিলতে অসুবিধা হয়, যখন তুমি আমার কাঁথা বদলাতে দেরি করো, যখন তুমি আমায় পরিষ্কার করো, যখন... আর যখন এই ঘর-পৃথিবীতে অন্য বাতাস বয়, অন্য গন্ধ পাই—ভারী বাতাস, অশুদ্ধ গন্ধ, অচেনা শব্দ, তখন...একমাত্র তখনই।

ঘরের বাইরে, অন্যত্র, অন্য পৃথিবীতে অনেক শব্দ আছে, তাদেরও আমি চিনে গেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের কাউকে কাউকে তো ভালইবাসি। কাউকে কাউকে ভয় পাই। কিন্তু তারা ফিরে ফিরে আসে। ফিরে ফিরে চলে যায়। তাই ভয় পেলেও আমার কিছু করার নেই। ভাল লাগলেও না।

খ্‌লপ্‌-খ্‌লপ্‌-খ্‌লপ্‌
গাঁ গাঁ গাঁ গাঁ-আঁ-আঁ
টুন টুন ঠুন, টুন-ঠুন-ঠুন
'আমি অন্ধ বাবা অন্ধ'
'হেই মা দুটো অন্ন মুঠো'
গং-টং-ঠং টং-ঠং-ডংং

চাল দুলকি ; তিন তাল কী ?
চমকে উঠি পাকাই মুঠি
শব্দখানি কান লোভানি
ভালো লাগেনি ভালো লাগেনি।
বড় জব্দ খুব জব্দ খোকা জব্দ
নয় মন্দ পছন্দ ? পছন্দ ?

চমকেই উঠি আর জব্দই হই এই সব শব্দের সঙ্গে আমার একটা সমঝোতা হয়ে গেছে।

কিন্তু হঠাৎ যদি বোমা ফেটে যায়—'কী হে নেপোলিয়ান ? আছো কেমন ?' আমি চিৎকার করে কেঁদে উঠি। ওই হেঁড়ে গলাটা যত উঁচুতে আমাকে তার চেয়েও উঁচুতে উঠতে হবে।

—'ওরে ব্বাপ্‌ ! এ তো দেখি গর্জন করছে !'

—'তা আপনি ওইরকম এক গুরুগম্ভীর লোককে নিয়ে তামাশা করবেন, সে মুখ বুজে মেনে নেবে ?'

—'বেড়ে আছো দাদা, লোকে কোথায় হা-অন্ন জো-অন্ন করে ঘুরছে, আর তুমি ? ভগবান যাকে দেন, ছপ্পড় ফুঁড়ে দেন, কী বলেন বৌঠান ?'

—'একটু আস্তে ঠাকুরপো, ঘুমটা আসছিল। চমকে গেল...'

—'ঠিক আছে, আপনি পুতুল খেলুন। আজ মণখানেক দিয়ে গেলুম। কমলা নেবুগুলো ভাল কিনেছেন। হগ মার্কেটের ?'

—'না, না। হাতিবাগানই বোধহয়। আপনার দাদা তো বেশি দূরে যেতে চান না।'

—'হ্যাঃ, দাদাকে বরং একটা বাক্স করে দিন। কাঁচের বাক্স। আমরা জানব তিনি আছেন। খানকতক বই ঢুকিয়ে দিলেই হাঙ্গামা চুকে গেল।'

অন্য পৃথিবী থেকে অনেক গন্ধও আসে। যতক্ষণ তারা বাইরে ঘোরাঘুরি করছে, আমি কিচ্ছু বলি না। কিন্তু তারা যখন হেঁটে হেঁটে ঘরে ঢুকে পড়ে আমি নাকমুখ কুঁচকে কেঁদে উঠি। ধোঁয়ার গন্ধে এক-একদিন ওঁর শাড়ি ভারী হয়ে থাকে। হয়তো কাঁচা কয়লা ছিল অনেক। বহুক্ষণ পাখা করেছেন। সেদিন উনি কাছে এলেই আমি উল্টে যাবার চেটা করি। পালাচ্ছি। ধোঁয়া-পূতনার কাছ থেকে পালাচ্ছি। কোনও কোনওদিন ভীষণ মেছো-মেছো গন্ধ থাকে হাতে। হয়তো কুচো মাছ বেছেছেন, অনেকক্ষণ ধরে। আমি হাতটা ঠেলে ঠেলে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করি। আঁশ-পূতনার হাত থেকে পালাচ্ছি।

—'দাঁড়া, দাঁড়া, তেলটা মাখাতে দে'...

প্রচণ্ড ঝাঁঝে চোখমুখ দিয়ে আমার ঝুঁঝিয়ে জল পড়ে যায়। নাকমুখ রগড়াই, চিকরে উঠে ঠেলে দিই তেলের শিশি। তেল-পূতনার কাছ থেকে পালাচ্ছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'মা, ওর চোখ দিয়ে জল পড়ছে।'

—'পড়ুক। ময়লা কেটে যাবে।'

তামুক-গন্ধও এক-একদিন ঢুকে পড়ে। চার নম্বর থেকে কর্তা এসেছেন। তামাকের কড়া গন্ধে বাতাস বিষাক্ত হয়ে যায়। আমার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। নাক সড়সড় করে। হিচ্ছু করে হেঁচে ফেলি আমি। তারপরে কাঁদি। তারস্বরে কাঁদি।

—'আমি এলেই ও কাঁদে। দেখেছেন ?'

—'ও অনেক সময়েই ওরকম সৃষ্টিছাড়া কাঁদে, আপনার জন্যে নয়।'

—'না না বেয়ান, আমি লক্ষ্য করেছি। আমি ঘরে ঢুকব, কয়েক সেকেন্ড যাবে, ব্যস্, তারপরেই চ্যাঁ।'

—'আপনিই ভাল বলতে পারবেন, কেন মাঝে মাঝে এমন কারণে অকারণে কাঁদে।'

—'পেট ফাঁপছে না ?'

—'চুনের জল তো আমার তৈরিই থাকে। তেমন বুঝলেই দিয়ে দিই।'

গন্ধটা আরও এগিয়ে আসে। আর সহ্য করতে পারি না। হাত-পা ছুড়ে, শরীর এঁকিয়ে বেঁকিয়ে কাঁদতে থাকি।

—'ওরে বাপরে, এ তো বেশ আপত্তি দেখছি! এত ছোটতে চেনা অচেনা!'

—'হবে না ? অজ্ঞাতে-অজ্ঞানে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছেন। এখন আপত্তি করলে চলবে কেন ?'

—'আপত্তি আপনারও ষোলআনা আছে মনে হচ্ছে!'

হাসির শব্দ, তারপর দীর্ঘশ্বাস।

—'যাবার যখন হয় তখন ওরা গোকুল ছেড়েই যায়। সময় বুঝে আপনার অক্রূর পাঠাবেন...'

—'সে কী বেয়ান ক্রূর আমি নই ঠিকই, তা বলে অক্রূরও নই। আপনি ওকে রাখুন, যদ্দিন পারেন রাখুন। আমার দিক থেকে সব দাবি তুলে নিচ্ছি।'

—'তুলে নিচ্ছি বললেই কি আর তোলা হয় ? দুলাল নামেই যশোদাদুলাল, জানেন না ?' এই সময়ে তৃতীয় গলা প্রবেশ করে। দাদাভাইয়ের কোনও নেশা নেই। কিন্তু গন্ধ ? গন্ধ যাবে কোথায় ? পুরনো বইয়ের গন্ধ, ক্যালকুলাস আর সলিড জ্যোমেট্রির গন্ধ ভুরভুর করে তাঁর গা থেকে বেরোয়। আমি কুঁকড়ে যাই।

—'আরে দাদা যে! কতক্ষণ ?'

—'এই তো! বেয়ানের বড্ড মান হয়েছে, আপনিও নেই। করি কী ? মানভঞ্জন করছি।'

—'কী যে বলেন!' জিভ আর দাঁত মিলিয়ে লজ্জার একটা স্লিচ স্লিচ শব্দ, 'হ্যাঁ গো দাদাকে চা-টা খাইয়েছো ?'

—'আমি আর কী খাওয়াব ? উনিই তো খাওয়াচ্ছেন।'

—'আমি আবার কখন খাওয়াতে গেলুম!'

—'ওই যে যখন তখন ঝুড়িঝোড়া ভর্তি করে পাঠাচ্ছেন!'

—'ও তো শ্রীহরির ভোগের জন্যে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'আপনার শ্রীহরি বুঝি ভেটকি মাছও খান ! রুই-কাতলার মুড়োও খান ! জানা ছিল না তো !'

দড়াম করে একটা শব্দ হয়, আমি চমকে উঠি।

দাদাভাই পড়ে গেছেন।

—'দেখি দেখি ! কী কাণ্ড ! কিছুর মধ্যে কিছু না শুকনো ডাঙায় আছাড় খেলেন যে !'

—'উনি তো ওইরকমই !'

—'খুব লেগেছে ?'

—'না, না, তেমন কিছু...মানে দরজার পাল্লটা ইয়ে ঠেস দিয়েছি—আর...'

আমি উল্টে গেছি। অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করছিলুম। তামুক-গন্ধ থেকে পালাবার জন্য। বাঁ হাতটা বুকের বাঁদিকে, শরীরের তলায় চলে গিয়েছিল কিছুতেই সেটা মুক্ত করতে পারছিলুম না। এখন এই ধড়াম শব্দে চমকে গিয়ে উল্টে যাবার এই কঠিন কাজটা আমি করে ফেলেছি। করে ফেলিনি ঠিক, হয়ে গেছে। উপুড় হয়ে রবার ক্লথের ওপর পদ্মকাঁথা, তার ওপরে পদ্মপত্রে জলের ফোটার মতো টলটল করছি। এঁরা নিজেদের কথাবার্তায় মশগুল, খেয়াল করেননি। এইবার...এইবার করছেন।

—'মা, ও মা, ও উপুড় হয়েছে দেখো !' —কচি গলাটা কিচকিচ করে ওঠে।

—'তাই তো, ওমা, তাই তো !'

—'ওরে নেপোলিয়ন, ওয়াটার্লু তো জিতে ফেললি ! বা ! বা ! বা !' —হাততালির শব্দ —'অনাদিবাবু ঠিক করে বলুন, খচখচ করছে না তো ! একটু শুয়ে পড়ুন তো দেখি, চোট সীরিয়াস হয়ে গেলে বৃথা কষ্ট পাবেন।'

এতদিন নীচে থেকে চোখ তুলে পৃথিবীর কড়িকাঠ দেখতুম। সব কিছুই দেখতুম নীচে থেকে, কেঁচোর মতো। এখন দেখছি ওপর থেকে। পাখি, প্রজাপতি, গাছের ডালে কাঠবেড়ালি যেমনটা দেখে। দেখছি মেটে মেটে রঙের রবার ক্লথ। বালিশটা একটু গড়িয়ে গেছে, সরষের বালিশ। সামান্য একটু টলটল করে দক্ষিণের জানলার হদিশ পাই। এইখান থেকেই অত আলো আসে, আমার চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। ওপর থেকে পৃথিবী দেখার নেশায় আমায় পেয়ে বসে। পৃথিবীর মেঝে দেখি। সাদা-কালো চৌকো-চৌকো শতরঞ্জি মেঝে। গামলায় চানের জল দেখি, জলের ওপর রোদের ঢেউ, আরও ওপরে রোদের ফিতে, ফিতেয় ধুলোর ফুলকি, ফুলকিতে পরমাণুদের ঘোরা-ফেরা। পা দেখি কতরকম। আলতা-পরা, ফর্সা ফর্সা, আঙুল-ক্ষয়া পা, কচি কচি নরম পাটিসাপটার মতো পা— তাতে বেলকুঁড়ির মতো আঙুল, কেঠো-কেঠো আনমনা যখন-তখন-হড়কে-যাওয়া-পা দেখি, শুকনোশাকনা ধুলোমাখা ফাটাচটা খাটাখোটা পা তা-ও দেখি। দেখতে দেখতে আপনমনে হেসে কুটোপাটি হয়ে যাই। হাসির ঝোঁকে মুখটা বারবার রবার ক্লথে ঠুকে ঠুকে যায়। নাক লাল হয়ে ওঠে। পৃথিবী জানো না, তোমার মেঝে কী মজার ! কী মজার। তোমার ছাদের দিকটা শুধু কৌতূহলের, সেখানে কড়ি-বরগা আছে, টিকটিকি আছে, পোকাপুকি আছে, পোকাদের অনবরত উড়ে যাওয়া, গুড়গুড়িয়ে যাওয়া আর টিকটিকির ওত পাতা, তীরের মতো হড়কে আসা, পুঁটকে জিভ ফিচিক করে বেরোনো-আর ঢোকানো আছে। আছে আলো-ছায়ার খেলা, কিন্তু পৃথিবী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার মেঝেটা খালি কৌতুকের। পা দেখে দেখে বলতে পারো কোনটা কে ? আমি বলতে পারি। আলতা-পরা পা দেখলেই আমি হৃষ্ট, পাটি-সাপটা পা দেখলেই কলকলাই, কেঠো পা দেখলেই কান খাড়া করে থাকি, আর খাটাখোটা পা দেখলেও আমি ভারী খুশি। নিজেকে তুলতে চেষ্টা করি আমি সারাক্ষণ। লালায় আমার মুঠি দুটো মাখামাখি হয়ে যায়। আমার চোখ সুড়সুড় করে। চোখ রগড়াই আচ্ছা করে। কেউ আমার পিঠে হাত রাখে। কী চিকণ ছোঁয়া ! এ নিশ্চয়ই সেই চিকণ মুখের চিকণ হাত। আহ্লাদে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকে আমি দেখতে যাই। কিন্তু আমার ঘাড় নেই। কী ঘোরাবো ? তাই এই চেষ্টার ফলে আমি খামোখা আবার চিত হয়ে যাই। আর এই চিত-উপুড় উপুড়-চিত খেলা অবিরত চলতে থাকে তার সঙ্গে আমার। গায়ে তেল মেখে দক্ষিণের জানলা দিয়ে আসা রোদ্দুরের মাদুরে আমি উপুড় হয়ে যাবো। সে এসে সন্তর্পণে আমার পিঠে হাত রাখবে। সে যে কী ছোঁয়া ! কী ছোঁয়া। ফুলের গায়ে যখন শিশির পড়ে, যদি সত্যিই পড়তো, তা হলে ? তা হলে বোধহয় তার তুলনা পাওয়া যেত। আহ্লাদে আটখানা হয়ে আমি সেই চিকণ কালাকে চোখের দেখা দেখবার জন্যে ঘাড়হীন ঘাড় ফেরাতে থাকবো, আর টিপ করে চিত হয়ে যাব। চিত হতে গেলে, মাথাটা টিপ হয়ে গেলে আমার কখনও কখনও লাগবে। তেমন কিছু লাগেনি তবু আমি ঠোঁট ফোলাবো। ইচ্ছে করে নয়। যখন ব্যথা চাপতে চাই অথচ ব্যথা বাগ মানে না, তখনই ঠোঁট ফোলে, নদী যেমন ফুলে ওঠে ভেতর থেকে সমুদ্র থেকে ছুটে আসা ভেতর-জলের আমদানিতে, তেমনি ঠোঁট ফোলে। কোথা থেকে জানা-অজানা কোন কষ্টের সমুদ্র থেকে জোয়ার ছুটে আসে, ঠোঁট চেপে রাখি। আমার মুখে জিভে ঠোঁটে তো আর জায়গা নেই, কোথায় রাখবো এই চাপা কষ্ট ? আর তখনই নাকের মধ্যে দিয়ে ফোঁস ফোঁস আওয়াজ বেরোয়। ফুলে ওঠে ঠোঁটের কূল। সে খুব মজা পায়। হাততালি দেয়। ভীষণ সুন্দর শব্দ ওই চিকণ হাতের হাত তালির। তখুনি আমার ব্যথা ভ্যানিশ। আমি হেসে দিই। কিন্তু সে শুনলে তো ? তার ঠোঁট ফোলানোটাই ভালো লেগেছে। সে চোখ পাকিয়ে আমায় ধমক মারে— 'অ-অ-অ মা-আ।' প্রথম অ থেকে তৃতীয় অ পর্যন্ত গলাটা ধাপে ধাপে চড়ে, মা-তে শীর্ষে উঠে যায়। তারপর ছোট্ট একটু আত্মীয় শ্রুতি স্পর্শ করেই সে থেমে যায়। এ তো ধমক নয়। কোথায় যেন মন-কেমন-করা-বাঁশি বেজেছে। কোথায় যেন আমার কত কী ছিল। হারিয়ে ফেলেছি। সব আমার হারিয়ে গেছে। কোথায় আমার আপনজন, আপন ধন কিছু মনে করতে পারছি না। শুধু মনে পড়ছে তারা ছিল, হয়তো আছে, কোথাও আছে, কিন্তু আমার কাছ থেকে হারিয়ে গেছে। ব্যথার জোয়ার ফণা তুলে ছুটে আসে। ঠোঁট ফোলানো দেখতে চাও ? কত দেখবে, দেখো। দেখো ! ফুলেছে ? তোমার পছন্দমতো ফুলেছে ? জলের ফোঁস ফোঁস শব্দ আমার দু নাক দিয়ে বেরোচ্ছে। চোখে ফিট করা আয়না। দু'এক ফোঁটা গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। সে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। থাকতে থাকতে তার ভেতরেও জোয়ার আসে। আমার ব্যথা তাকে ছোঁয়, তার ব্যথা চেতিয়ে তোলে, তারও যে এক আপন ঘর আছে, নির্বাসিন আছে। সেই সব তার আবছা আবছা মনে পড়ে বোধহয়। তার কচি ঠোঁটও ফুলে ওঠে। ফুলে ফুলে ওঠে। তারও নাক দিয়ে ফোঁস ফোঁস আওয়াজ বেরোয়। চোখের পরিষ্কার আয়না দিয়ে দু'এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুচি, তারপর তিন চার কুচি হিরের গুঁড়ো খসে যায়।

দিদিভাই ঘরে এসেছেন। অবাক কাণ্ড। দুই শিশু মুখোমুখি ঠোঁট ফুলিয়ে ফুঁপোচ্ছে।

—'ওমা, ছোট্কু,— তাই শুনি সব চুপচাপ। কী হল দেখি তো! বাচ্চাকে ভ্যাংচাচ্ছিস না কি রে ছট্কু? এ কী খেলা!'

'ম্‌ম অ্যাঁ—' ছোট্কু কেঁদে ফেলে জানিয়ে দেয় এ খেলা নয়। খেলা ছিল না।

—'মা, তুমি কোথায় ছিলে? আমার মন কেমন করছিল।'

আমি তখন দাপিয়ে দাপিয়ে কাঁদছি। 'হো-ও-অ্যা হো অ্যা।' কেউ জানে না কখন আমার কূল ছাপিয়ে গেছে।

সেই কূলে কূলে ভরা যমুনা। বেণীর একটা গুচ্ছির মতো সে আকাশ থেকে নেমে পাহাড়ের বিস্তীর্ণ সাদা মাঠে পড়ে ভরাট তুষার হয়ে জমেছিল। তারপর কবে কার টানে সে গলে টলটলে হয়ে আকুল ছুটে গেল, ক্রমশ তার তীব্র আকুলতা, তার নীল ব্যথা সে মিশিয়ে দিল গঙ্গার গৈরিকে। কিন্তু তার আগেও সে তার পুলিনে কত বাঁশি শুনেছে, কত জ্যোৎস্না, কত তারা, কত ঝাঁপাঝাঁপি পারাপারি, কত গোধূলির লালচে-কমলা ছায়ায় সে অঙ্গে মেখেছে সেই কমলা-নীল। সেই শুভ্রজ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীম্ উধাও হয়ে রয়েছে তার বিস্মৃতিতে তাই কান্না আর থামতেই চায় না, থামতেই চায় না।

তিনি তুলে নিয়েছেন শিশুকে।

—'ও রে আমার সোনা, কী হয়েছে? কে বকেছে কে মেরেছে? না না না, কাঁদে না, কাঁদে না।' প্রৌঢ় মুখে প্রৌঢ় গলায় তরুণীর আকুলতা।

মুখে পানের গন্ধ, বুকে দুধের গন্ধ, গালে গাল, বুকে বুক যশোমতীর স্নেহের গন্ধ গলে গলে পড়ছে। আস্তে আস্তে শান্ত হই। মুছে যায় সেই নীল, সেই সাদা, সেই বাঁশি, সেই গোঠ। এখন রোদের ঘর। জল থেকে ডাঙায় উঠে এসেছি। স্পষ্ট হয়ে উঠছে দেরাজ, আলমারি, খাট, টেবিল, টেবিলে নানামতো বস্তুনিচয়। একটু একটু ফুঁপিয়ে উঠতে থাকি। ফোঁপাতে ফোঁপাতে ফোঁপাতে ফোঁপাতে চুপ। দু চোখ জুড়ে আসতে থাকে। ঘুম চোখেই চান করি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পাউডার মাখি, কাজল পরি, চুল আঁচড়াই। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে খাই। একটু খেতে না খেতে আলগা ঠোঁট থেকে দুধ খসে পড়ে। একটা খুব মোহন আকৃতির ফাঁক নিয়ে ঠোঁট দুটো স্থির হয়ে যায়। ঘুমের মধ্যে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠি।

যশোমতী বলে বাছা কান্দিলি এমন
উথালিল বক্ষ মোর পাথালিল মন
মন চলে নিজমনে নন্দ নিকেতনে
সুধায় তিতিল বক্ষ সে স্মৃতি মন্থনে
কত ক্ষীর থরে থরে পরমান্ন রান্ধি
তাহারে তুষিতে আমি কত ফান্দ ফান্দি।
ফান্দিয়া শিকায় বাছা বান্ধিয়া ছান্দিয়া
দিবা-দ্বিপ্রহরে যশো পড়ে ঘুমাইয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কখন আসিলি বাছা যাইলি কখন
টের না পায়িল যশো অঞ্চলকেতন
যত ননী চাও সোনা খাইও ছড়ায়ো
যশোমতী মাতা ফেলি কোথা না যাইও
এই ব্রজ এই গোষ্ঠ এই বৃন্দাবন
এই চুমা এই কোরে হে নন্দ নন্দন
এই খেলা এই ধুলা গোকুল ব্যাপিয়া
ভুলিও না বাপা কভু দিও না ভুলায়্যা ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঞ্চম অধ্যায়

দুহুঁ করে দুহুঁ

আমি যেই কাঁদব অমনই ও-ও কাঁদবে। আমার খিদে পেলে ওরও খিদে পাবে। আমি যখন মায়ের কাছে খাই, ওর মুখে তখন দিদি বোতল ধরে। যখন ও মায়ের কাছে খায় তখন দিদি আমার মুখে বোতল ধরে। ও খেলা করলেই, আমিও খেলা করি, ও কোঁকোর কোঁ করে ডাকলে আমিও ডেকে উঠি। ওই মেয়েটা যার নাম মা, সে বলে— 'কোত্থেকে এত মোরগ ডাকছে রে! ভোর বুঝি হয়ে গেল?'

ভোর কাকে বলে গো মা? আমার ওই রকম ডাকই পাচ্ছে যে, ভেতরটা খুশিতে গলে যাচ্ছে। চান করেছি, শরীরটা কী সুন্দর ঠাণ্ডা। পাউডার মেখেছি, কী সুন্দর গন্ধ। নরম নরম জামাকাপড় পরেছি, কী আরাম লাগছে। ঠাণ্ডাও না, গরমও না। আমি ভিজে যাইনি। শুকনো আছি। পেটটি ভরে খেয়েছি। পেটের ভেতরটা কী শা-ন্ত। তাই আমি আহ্লাদে ডাকছি।

আমি একটা দোলনায় শুই, ও তক্তপোশে শোয়, মায়ের পাশে। আমার দোলনায় অভ্যেস হয়ে গেছে, একটু দুলিয়ে দিলেই আমার চোখের পাতায় বাতাস লাগে, একবার-দুবার কাঁপে পাতা। তারপরই টপ করে বুজে যায়। ওই মেয়েটা যার নাম ঋদ্ধি, যাকে আরেকটা ছেলে আরেকটা মেয়ে দিদি বলে ডাকে, সে বলে— 'কী লক্ষ্মী ছেলে, কী লক্ষ্মী?' আমি লক্ষ্মী, ও কিন্তু লক্ষ্মী না। রোজ মায়ের পাশে শুয়ে ওর ঘুমনো চাই, তবু কাঁদবে। ছিঁচকাদুনি। ওই ছেলেটা, যার নাম সুযযি, সে বলে—

ছিঁচকাঁদুনি ছি ছি
পড়ল পাড়ায় ঢিঢি
একটা মেয়ে দেখে যা
কাক-চিল বসতে দেবে না।

এইটে শুনলেই বোকাটা খিলখিল করে হাসে। বুঝতে পারে না এটা হাসির কথা নয়। এটা ওর নিন্দে করা হচ্ছে। আমি কিন্তু বুঝতে পারি, আমি ভুরু কুঁচকে তাকাই। ওর নিন্দে হলে আমার ভাল লাগে না। সত্যি বলছি।

আমি কেমন আপনি আপনি ঘুমিয়ে পড়ি, আপনি খেলা করি। আমি লক্ষ্মী, আমি সোনা। ওর সব সময়ে লোক চাই, যত লোক, তত মজা, দাদা বলে দিদি বলে লোকগুলো যত আসবে, তত ওর হাত-পা ছোঁড়া বেড়ে যাবে। পিসিমা বলে লোকটা বলে— 'ভিরকুট্টি।' কখনও বলে— 'শ্যায়না। খুব শ্যায়না, মন-ভোলানোর কায়দা কত শিকেচে।' বাবা বলে লোকটা বলে— 'তুমিও কতকগুলো শিখে নাও না দিদিমণি, কাজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবে।' ঠাকুর্দা বলে লোকটা বলে— 'ঠিক ঠিক। মনো তুই পাঁজি ছেড়ে এইগুলো মুখস্থ কর। কাজে দেবে।' ঠাকুমা বলে লোকটা বলে— 'তোমরা কেউ খোকাকে দেখচো না। কী যে সুন্দর দেয়ালা করে। আপন খেয়ালে থাকে। ওই কেল্টি মেয়েটির দিকে তোমাদের সবার মন।' 'কা-লো, জগতের আ-লো।' ঠাকুর্দা বলে লোকটা বলে। বাবা বলে লোকটা আমায় তুলে নিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে দেয়। লুফে নেয়। আবার ছোঁড়ে আবার লোফে। প্রথমটা আমি ভয়ে কাঠ হয়ে যাই, তারপর খেলাটা বুঝতে পারি। বুকের ভেতরটা একটু গুরগুর করতেই থাকে বটে, কিন্তু কাঁদি না। বাবা বলে— 'কী জানো তো সেজ মা, মেয়ে হয়ে জন্মেছে, তার ওপর তোমার মতো কেল্টি, কেড়েকুড়ে না নিলে তো পাবে না, তাই এমন নেই-আঁকুড়ে। তোমার মতো "হলেও হল, না হলেও হল" ফিলসফি তো আর সবার জন্যে নয়!'

ওরা যা যা বলে আমি সব শুনতে পাই। বুঝতে পারি। কেন বলছে, কোন কথার কী মানে অতশত বুঝি না। কিন্তু শব্দগুলো আমি ধরতে পারি। আমি যেন একটা খোলা জায়গায় আছি, ওরা একটা গুহার মধ্যে আছে। ওরা কথা বলাবলি করছে, কথাগুলো মানে শব্দগুলো ধ্বনিগুলো গুহার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, গমগম করছে গুহাটা। আমার কাছে পুরোপুরি পৌঁছচ্ছে না। তা ছাড়াও আমার চারপাশেও আরও অনেক শব্দ। বৃষ্টি পড়ছে কোথাও ঝরঝর করে, হিম ফুটছে সিরসির করে, ইঁদুরেরা দৌড়ে চলে গেল, পিঁপড়েরা বাসা বাঁধছে, ফড়িং-এর পাখা কাঁপছে, ধানের শিষের মধ্যে দুধ জমছে, পাখি উড়ে যাচ্ছে, রামধনু উঠছে, মেঘেরা হাসছে, বাজ ধমক দিল, ছাগলছানা জন্মাল, কেঁচো মাটি খুঁড়ছে, এই সমস্ত শব্দ আমার কানে ভোঁ ভোঁ করছে, কী করে ওদের কথা সব মানেসুদ্ধু শুনতে পাব! 'কেল্টি' একটা শব্দ ওলটপালট খেতে খেতে কাটা ঘুড়ির মতো গোঁত্তা খেয়ে এসে পড়ল। বা রে বেশ তো, বেশ তো! 'ছিচকাঁদুনি, ছিচকাঁদুনি, ছিচকাঁদুনি ছি-ছি-।' ধ্বনিটা শুনলেই বোঝা যায় এটা ছি-ছি শব্দ, ভালো-কথা বলছে না, মায়ের বিছানায় যে পুঁচকিটা শুয়ে এখন খেলা করছে সে এই ছিছিক্কারটা ধরতে পারছে না, তাই আরও খেলছে। জোরে জোরে খেলছে, একেবারে আহাম্মক পুঁচকিটা। আমাকে বলুক দিকি, আমি রেগে উঠব, চেঁচাব, তাতেও না থামলে আমি কাঁদব। তখন সাদা চুল লোকটা এসে কালো চুল লোকটাকে বকবে। বেশ হবে।

কালো চুল লোকটাকে কিন্তু আমার ভাল লাগে। ওকে একজন 'সুয-যি সুয্যি' করে ডাকছিল। ছি-ছির খুব কাছাকাছি হলেও 'সুয-যি' কথাটা আমার খারাপ লাগে না। আমি নিজের মনে বলি 'যি, যি, যি, যি।' তার মানে যে 'সুয-যি' এটা এই বোকারামগুলো বোঝে না। একটা বোকা বলল— একেবারে "জি"-তে চলে গেলি? আর একটা বোকা বলল— 'বাংলাতেও জ ম এর আগে, ইংরেজিতেও জি এম-এর আগে। ও তো ব্যাকরণগত কোনও ভুল করেনি বাপু।' আরেকটা বোকা বলল— 'পথের পাঁচালী' পড়ে দেখিস অপু-ও জে-জে-জে, জে-এ-এ, গীত দিয়ে লাইফ আরম্ভ করেছিল।' 'ইনফ্যান্ট স্টেজ থেকেই টুকতে শুরু করলি?' —আরেকটা বোকা বলল। এতগুলো বোকাকে একসঙ্গে আগড়োম বাগড়োম বকতে দেখে আমার শেষ পর্যন্ত ভা-রি হাসি পেয়ে গেল। আমি হাসছি। খিলখিল করে হাসছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—গলার মধ্যে গার্গল করার মতো কী রকম আওয়াজ করছে দেখেছ ? সরু গলার একটা লোক বলল। এই লোকটা আলাদামতন, এটা বোধহয় মেয়ে। 'যি-যি-যি'—আমি প্রাণপণে চেঁচাই। সেই লোকটা আসছে না কেন ? ঝাঁকড়াচুলো সেই লোকটা ? সেই ছেলেটা ? কী রকম যে হাসে, মুখটা যেন আকাশ, হাসিটা যেন বিদ্যুৎ, কিংবা মুখটা যেন জল, হাসিটা এক টুকরো ঢিল। টুপ করে পড়ল, অমনই ঠোঁটের ভাঁজে, চিবুকে, গালে, নাকের পাটায়, চোখের পাতায়, ভুরুতে কপালে হাসি ছড়িয়ে গেল। কেমন অঙ্গভঙ্গি করে ছেলেটা ? আমার চিবুকের ওপর আঙুল রেখে টিপ্ করে টিপে দেয়—আমি হেসে উঠি। খুব হাসি পেয়ে যায় আমার। এই ছেলেটাকে, লোকটাকে আমি আলাদা করে চিনতে পারি। যেমন মা বলে লোকটাকে, বাবা বলে লোকটাকে, সাদা চুল লোকটাকে দেখলেই চিনতে পারি! তেমনই সুয-যিকে আমি চিনি। অন্য ছেলেমেয়েগুলো কে কোনটা আমার গুলিয়ে যায়। কতগুলো বাব্বাঃ। একটা পল্টনবিশেষ! সবগুলো যখন ঘরে ঢুকে আসে। আমার তো একটু ভয়ই করে। কী রে বাবা, মারবে নাকি ? বকবে নাকি ? আমায় টুক করে তুলে নিয়ে পালিয়ে যাবে না কি ? অনেক সময়ে খুব বিরক্তও লাগে, অতগুলো লোক ঘরে এলে হাওয়া বন্ধ হয়ে যায় না ? গুমোট ঘরে নিশ্বাস নিতে আমার কষ্ট হবে না বুঝি ? তা ছাড়াও সুয্যি ছেলেটাকে আমার কেমন চেনা-চেনা লাগে। ওকে আমি আগে কোথাও দেখেছি। আগে ? আগে মানে কী ? আগে আমি ছিলুম ? কোথাও ? কোনওভাবে ? জানি না তো! তবে কি আকাশ থেকে সুয্যিকে অনেক দিন ধরেই লক্ষ করছি ? ওর কাছে কি তখনই আসতে ইচ্ছে হয়েছিল ? কিছুই জানি না। খালি সুয্যিকে আমার চেনা লাগে, ভাল লাগে, ওকে দেখলে ভরসা পাই।

এই লোকগুলো চেঁচামেচি করছে। ঝগড়াঝাঁটি করছে না কি ? না, না, একজন আরেকজনের পিঠ চাপড়ে দিল। উঃ! হাসছে। যাক হাসছে। ওই যে ওই যে, এসেছে। সুয-যি এসেছে। 'যি-যি-যি। যি-যি-যি।' কত কী বলতে চাই, কিছুই ছাই বেরোয় না যে মুখ দিয়ে। 'যি-যি-যি।'

—'তোমরা এসে হইচই করছ কেন বলো তো, এমন করছ যেন বাড়িতে যমজ হয়েছে। ...এইদ্ দেখো তোমাদের গোলমালে খোকাটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। দাদা দেখো।'

দাদা—'একা চোরা ন্যাকা বোকা ভ্যাবাচ্যাকা গোবেচারা'

সুযযি—'ডাকাবুকো, ন্যাজামুড়ো, বোকাসোকা ম্যাদামারা'

দাদা— 'হাবাগোবা ফুটিফাটা নেটিপেটি হারাকিরি'

সুযযি— 'ন্যাড়াবোঁচা, খিটিমিটি, হাবিজাবি, গড়াগড়ি'

দাদা— 'তুমি হেরে গেছ। হারাকিরি, গড়াগড়ি মেলে না।'

সুযযি— 'মেলে, অবশ্যই মেলে, কানে শুনতে একটুও খারাপ লাগছে না। কী শ্রদ্ধা, পুলকদা, দিদি, তোমরাই বলো, খারাপ লাগছে ?'

পুলকদা— 'গড়াগড়ি না বলে যদি গুরুগিরি বলতিস, তাহলে কিন্তু খাপে খাপে বসে যেত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাবাগোবা ফুটিফাটা নেটিপেটি হারাকিরি
ন্যাড়াবোঁচা, হাবিজাবি, খিটিমিটি গুরুগিরি।'

সবাই মিলে হাততালি দিয়ে উঠল। একটা লম্বা-চুল গম্ভীরমুখো লোক, বোধহয় মেয়ে, এসে বলল— 'বাচ্চার ঘরে তোমরা এত গোলমাল কোরো না। ওকে ঘুম পাড়াতে অসুবিধে হবে।'

'পুরুত বামুন রেগে আগুন তেলে বেগুন' —দাদা
'বেগুন ভাজুন চাকুম চুকুম দাদা আসুন' —সুযযি
'আসুন মশাই বসুন খাটে পিঠ ভাঙব চ্যালা কাঠে' —শ্রদ্ধা
'কাঠ কি অত সস্তা ? ভুসিমালের বস্তা ?' —পুলকদা
'বস্তা এখন খা-লি ভেলি-গুড়ে বা-লি'—অংশু
'বালির মধ্যে চি-নি চিনির মধ্যে সিদ্ধি' —ভক্তি
'ঋদ্ধি মহা গিন্নি ঋদ্ধি বড় জিদ্দি' —দাদা

—'হয়নি হয়নি, দাদা তুমি হেরো' —সুযযি চেঁচিয়ে উঠল।

—'ঠিক আছে, ঋদ্ধি গিন্নিকে জিজ্ঞেস করো।'

—'জিজ্ঞেস করার কী আছে ? এ তো সামনে পড়ে আছে। সিদ্ধি দিয়ে শুরু করতে হবে তোমাকে...'

—'আরে বাবা সে কি আমি জানি না ?'

—'নিজেই খেলার রুল তৈরি করবে। নিজেই ভাঙবে।'

—'যে গড়ে ভাঙবার রাইট তারই আছে। এটা একটা নতুন খেলা হয়ে গেল। কেউ কি ভাবতে পেরেছিল শেষ লাইনে সব ব্যাপারে বিধানদাত্রী ঋদ্ধিগিন্নিকে এনে হাজির করতে পারব ?'

খেলা ? তার মানে ওরা আমাকে আদর করছে না ? খেলছে ? বা রে। আমি বেশ ভাবছিলুম আমাকেই ডাকছে হাবাগোবা, একাচোরা, নেটিপেটি বলে। আমাকেই আদর করছে ন্যাড়াবোঁচা হাবিজাবি বলে। ও হরি, এগুলো ওদের খেলা ? এত বড় বড় লোকগুলো খেলছে ? এ মা। খেলবার আর জায়গা পাননি বুঝি আপনারা। আমি ঠোঁট ফোলাই।

ঋদ্ধি—'ওমা, ওই দেখো পাবন ঠোঁট ফোলাচ্ছে। তোমরা এত গোলমাল করছ। সরো, জলদি সরো। দেখি ও কী করছে।'

'যি-যি-যি-ই-ই', আমি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলি।

ঋদ্ধি— 'বাচ্চা কাঁদছে। জলদি সরো।'

ইন্দ্র— 'তখন থেকে "যি-যি" করে কাঁদছে। সূর্য, কাছে এগিয়ে যা তো ! সূর্য লাফিয়ে এগিয়ে এসে তুলে নেয় আমাকে। —রাইট, দাদা ও আমাকেই ডাকছে।'

আমি ফোঁপাতে ফোঁপাতে চুপ করে যাই।

সূর্য— 'এই দেখো চুপ করে গেল !'

ঋদ্ধি— 'ওইটুকু ছেলে তোকে চিনেছে, তোকে ডাকছে। কী কাণ্ড রে। দেখিস ও মস্ত কিছু হবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মস্ত কী ? আমি মস্তো হব ? ব্যস্ত-সমস্তর মতো কিছু নাকি ব্যাপারটা ? তারই বা মানে কী ? আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাই। তলার ঠোঁটটা কী রকম বোকার মতো এক দিকে ঝুলে যায়।

সুযযি আমাকে নিয়ে সারা ঘরে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ায়। মায়ের বিছানা থেকে বোকারামটা হাঁ করে দেখে। আমি কেমন বেড়াচ্ছি, লাফাচ্ছি, আদর খাচ্ছি, তুই শুয়ে আছিস, ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক জায়গায়। বড্ড জোর একটু উপুড় হতে পারিস। তুই ভারী, আমি হালকা। আমি সুযযির কোলে উঠে-এ ছি। যি যি যি যি-ই।

বোকারামটা হাসছে। ও সবেতেই হাসে। কী বোকা, না ? মাকে বেশিক্ষণ না দেখতে পেলেই বোকাটা কাঁদবে। একেবারে হাঁদা। কাঁদার কী আছে ? মা বলে লোকটাও তো মানুষ ? তার কাজকম্মো নেই ? খাওয়া-দাওয়া নেই ? কলঘরে যেতে হবে না তাকে ? বড়রা কি তোর আমার মতো বিছানা ভেজায় ? কিন্তু বোকাটা যতই বোকা হোক, যতই ওকে টেক্কা দিই আমি, বোকাটাকে আমি বড্ড ভালবাসি। একেক সময়ে ওর জন্যে আমার বুকটা কেমন হু-হু করতে থাকে। যেমন এখন। ব্বু-বু-ব্বু-উ। আমি আওয়াজ করছি। সুযযিটা বুঝছে না। আমি হাত বাড়াচ্ছি ওর দিকে। তবুও বুঝছে না। আরেক গাধা এই সুযযি ঠাকুর। আমি চেঁচাই রেগে। গলা ফুলিয়ে আমি চেঁচাই। সুযযির নাকটা কামড়ে দিই আমি।

—'অ্যাঁ ?'

সুযযি আমাকে আমার দোলনায় শুইয়ে দিয়েছে।

আমি চেঁচাচ্ছি।

—'রেগে গেছে কেন বল তো !'

—'তুই দেড়ো, দেড়ে গাল ঘষেছিস বোধহয় ওর গালে।'

মায়ের বিছানা থেকে বোকাটা ডাকছে— 'ক-অ-অ, ক-অ-অ, ববববব।'

মানে— 'তুই কই ? বাচ্চা !'

আমি বলি—'বু-বু-বু-উ-উ, যি-যি-যি।'

মানে—'বুবু। সুযযি।' অর্থাৎ সুযযি আমাকে বুবুর কাছে নিয়ে চলো। কেউই কিছু বোঝে না। আমি চিৎকার করে কাঁদতে থাকি।

'হো-ও-অ্যা, হো-ও-অ্যা, হো-অ্যা'

কে যেন বলে—'কী আশ্চর্য ! কান্নার আওয়াজটা পর্যন্ত এক রকমের। অথচ একজন রামরতন বোসের লেনে আর একজন শিবশঙ্কর মল্লিক লেনে।'

কে যেন বললে—'তুই কি মনে করিস দেখে দেখে শেখে ? ওসব ভেতর থেকে আসে।'

কে যেন বললে—'মেয়ে-ছানাটাও তো যমজ। কিন্তু আলাদা। কেন এমন হয় কে জানে !'

লোকগুলো মানে দাদা দিদিগুলো এক এক করে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি কখন চুপ করে গেছি কে জানে ! হাজার চেঁচালেও তো বুবুর কাছে যেতে পারব না। চুপ করে নিজের কাজে মন দেওয়াই ভাল। নিজের কাজ কী বলো তো ? আঙুল চোষা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চুক চুক করে আঙুল চুষতে চুষতে আমার চোখ জুড়ে ঘুম নামে। ঘুমের মাসি ঘুমের পিসি আমায় ঘুমের দেশে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আমার বিছানার চারটে কোণ ধরে চারটে মাসিপিসি হাওয়ায় উড়ে উড়ে যায়। যেতে যেতে একটা বাড়ির মাথায় দাঁড়ায় ওরা। ইশারা করে আমায় বলে—দেখো, দেখো, দেখো তো খোকা কিছু দেখতে পাও কি না।

আমি বাড়িটার জানলা দিয়ে দেখি। দেখি আমি ঘুমোচ্ছি। একটা পালঙ্কে, ধবধবে বিছানার মধ্যে ফুলের মতো আরও একটা বিছানা। তার মধ্যে আমি শুয়ে ঘুমচ্ছি। গোল মতো মশারি টাঙানো রয়েছে। মশারির গোলাপি রঙের কুয়াশার মধ্যে দিয়ে আমার মুখটা ফুটে আছে। পাশে বসে দিদিভাই, আর ফুলমামু। দেখেই বুঝতে পারি।

মামু বলে—'ও হঠাৎ অমন ঘুমিয়ে পড়ল কেন মা ?'

দিদিভাই বললেন—'কেন আর ? ওর ভাইটা আছে চার নম্বরে। সে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে, তাই এনারও ঘুম পেয়ে গেল।'

মামু—'সত্যি, মা ? দুজনে আলাদা আলাদা জায়গায় আছে, তা-ও ওরা সব কিছু একসঙ্গে করে ?'

দিদিভাই—'যতই আলাদা থাক ! ওরা সব একসঙ্গে করবে চিরকাল। যদি ওর হাসি পায় তো এ শুধু শুধু হেসে ফেলবে। এর কান্না পেলে ওরও কান্না পেয়ে যাবে।'

মামু—'বড় হয়ে গেলে তো আর কান্না পাবে না, তখন ?'

—'তখন ? ধর বরুণ আছে এসকিমোদের দেশে, আর পাবন আছে জুলুদের দেশে। বরুণ ঠিক যখন এসকিমোদের সঙ্গে সিল মাছের মাংস খাবে, পাবনও তখন জুলুদের সঙ্গে সিংহর মাংস খাবে।'

—'যদি পাবনদের তখন রাত আর বরুণদের তখন দিন হয় ?'

—'তখন ? মাঝরাতে পাবনের খিদেয় ঘুম ভেঙে যাবে। তার মনে হবে আকাশ খাই, পাতাল খাই। যতক্ষণ বরুণ খাবে ততক্ষণ পাবন খিদেয় ছটফট করবে। বরুণের খাওয়া হয়ে গেলেই পাবনের পেট ভরে যাবে। সে ঘুমিয়ে পড়বে।'

—'তাহলে তো ওদের একজনকে খাওয়ালেই হয় মা।' দিদিভাই তো-তো করছেন, বিপদে পড়ে গেছেন।

—'শরীরগুলো তো আলাদা, ছোটকু। শরীরটা তো না খেলে বাড়বে না।'

—'শরীর আলাদা হলে পেট কী করে এক হবে মা।'

—'পেট এক বলিনি তো !'

—'এই যে পেট ভরে যাওয়ার কথা বললে !'

—'পেট নয়, মন, আসলে আমি মনে হওয়ার কথা বলেছি, বলতে একটু ভুল হয়ে গেছে বাবা !'

—'ওদের মন এক ?'

বরুণ গোলাপি মশারির ঢাকা ফুঁড়ে ওপরে উঠে এল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বলল—'কোথায় তুই থাকিস পাবন ? আমি মন খারাপ করতে গিয়ে ভাল করে মন-খারাপ করতে পারি না। আধখানা মন হারিয়ে থাকে ! আমার কান্না আধখানা। আমার হাসি আধখানা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বলি—'ও মা তুই বুঝি তুই ? আমি ভেবেছিলুম তুই আসলে আমি। আমার কিন্তু গোটা মন খারাপ করে, গোটা মন-ভাল হয়, যখনই হাসি আমার সঙ্গে সঙ্গে তুইও হাসছিস বুঝতে পারি। আমার হাসির মধ্যে তোর হাসি মিশিয়ে থাকে তাই হাসিটা বিরা-ট। কান্নাটাও বিরা-ট। একদম উপচে যায়। ধর আমি হাসছি, ঘরের মধ্যে হাসিটা উপচে পড়ছে, হাওয়ায় কিলবিল করছে হাসি, মেঝেতে খিলখিল করছে হাসি। তখন যদি দাদা-দিদি বলে লোকগুলো ঘরে আসে তো ওদের কাতুকুতু লাগে। ওরাও হাসতে থাকে। হাসিটা তারপর জানলা দিয়ে বেরিয়ে যায়, যেখান দিয়ে হাসির হাওয়া বয়, সব্বার মুখ হাসি-হাসি হয়ে যায়।'

বরুণ বলে—'কান্না ? আর কান্না ?'

আমি বলি—'কান্না পেলে সব থই-থই। লোনা জলে থই-থই, হই-হই। বিষ্টি পড়ে। পুকুর বাড়ে, জোয়ার আসে। বান আসে। সব ভেসে যায়।'

বরুণ বলে—'তোর কেন বেশি-বেশি আমারও কেন কম-কম রে ?'

পাবন বলে—'আমার বুব্বু আছে।'

বরুণ বলে—'আমারও কানু আছে।'

পাবন বলে—'আমার মা আছে।'

বরুণ বলে—'আমারও দিদিভাই আছে।'

পাবন বলে—'আমার দোলনা আছে।'

বরুণ বলে—'আমার পালং আছে।'

বলতে বলতে, থাকা-না-থাকার হিসেব দেওয়া-নেওয়া করতে করতে, কান্না-হাসির, মা-দিদিমার বখরা বাঁটাবাঁটি করতে করতে পাবন-বরুণের শরীর-মন-আত্মা সব কিছু সব, ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুত-ব্যোম বাষ্পীভূত হতে থাকে। আকাশে হালকা মেঘের মতো ভেসে থাকে একে দুই, দুয়ে এক, দুই-কোরে-দুই- কাঁদে-বিচ্ছেদ-ভাবিয়া চিরবিরহী অস্তিত্ব এক। পাশাপাশি হাসাহাসি, তবু বুক হু হু, তবু ভুবন ধু-ধু। বারোমেসে বিচ্ছেদ-কোকিল সেই ভুবন জুড়ে ডাকতে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ষষ্ঠ অধ্যায়

হরিবংশ-১ এবং লঙ্কাকাণ্ড

কিছু কিছু মহিলা আছেন যাঁদের দেখে মনে হয় তাঁরা বয়সকালে খুব সুন্দরী ছিলেন। কিন্তু কথা হচ্ছে, আদপেই তাঁরা কোনওদিন সে রকম কিছু ছিলেন না। এখনও যেমন আগেও তেমনই ছিলেন এঁরা। নিমসুন্দরী। আমাদের পিসিমা মনোরমা ছিলেন এই জাতীয়। ফুটফুটে রং। পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনের প্রকৃতই প্রকৃত গৌরবর্ণা। সেই গৌরে বেশ ভাল রকম হলুদের মিশেল ছিল। অমন চম্পকগৌরী আমি সারা জীবনে কমই দেখেছি। লম্বা নয় একেবারেই। কিন্তু বেঁটে তাকে কখনওই বলা যাবে না। কারণ অনুপাত। হাত পা মুণ্ড ধড় ইত্যাদির সুসামঞ্জস্যের জন্যে তাঁকে কখনওই বেঁটেখাটো মনে হত না। বরং তাঁর পাশে লম্বা কেউ দাঁড়ালে মনে হত কী তালঢ্যাঙা রে বাবা! পিসিমা একটি মিনিয়েচার লক্ষ্মী। যাঁকে বেঁটে প্রমাণ করতে হলে তাঁর পাশে লম্বা কাউকে দাঁড়াতে হবে এবং তাতেও তাঁর বেঁটেত্ব প্রমাণ না হয়ে অন্য জনের ঢ্যাঙাত্বই প্রমাণ হয়ে যাবে। পিসিমার পায়ের পাতাগুলো ছিল অদ্ভুত। তুলো ভরা ছোট ছোট বালিশের মতো। আঙুলগুলো যেন মাটির প্রতিমার আঙুল, পরস্পরের গায়ে গায়ে লাগা। মাঝখানে ফাঁক আছে কিনা বোঝা যায় না। হাতগুলোও তেমনই। মিনি বেরালের থাবার মতো। হাতের তেলোর ঢিবিগুলো বেশ উঁচু এবং স্পষ্ট, বেশ মাংসল থাবাটে-থাবাটে হাত যার আঙুলগুলো প্রায় গাঁটহীন, এবং পায়ের আঙুলের মতোই গায়ে গায়ে লাগা। আমি খুব লক্ষ করে দেখেছি পিসিমা যখন খেতেন ডান হাতের চার আঙুল পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে থাকত। যেন একটা হেমি-সোনার বড় চামচ। বুড়ো আঙুলটা অবশ্য আলাদা হয়ে থাকত এবং সেটা এমন নমনীয় ছিল যে উল্টো দিকে যথেচ্ছ বাঁকানো যেত। চলিত বিশ্বাসকে ভুল প্রতিপন্ন করে অবশ্য পিসিমা নিজে ছিলেন অনমনীয়। খাবার সময়ে তিনি যদি হাত চাটতেন তো মনে হয় চারটে আঙুলের চামচ একসঙ্গে মুখে ঢুকিয়ে দিতেন, আর নয়তো সেই মাথা-পেছনে-হেলানো বুড়ো আঙুলটা মুখে ঢুকে যেত। প্রসঙ্গত হাত-চাটা সিঙ্গি বাড়ির মেয়েদের একটা জিন-ঘটিত বা জৈন অভ্যেস। মা ঘোষ-বাড়ির মেয়ে, তিনি হাত চাটা পছন্দ করতেন না। ঠাকুমা দত্ত-বাড়ির মেয়ে, তিনিও হাত চাটাতে বাদ সাধতেন। তা সত্ত্বেও, পিসিমা মনোরমা থেকে শুরু করে পমপম-টমটম পার হয়ে বিদ্যা পর্যন্ত একটি হাতচাটা পাতচাটা নারীকুল সৃষ্টি হয়েছিল সিঙ্গি বাড়িতে। 'পা-চাটা যে নয়, এটাই রক্ষে' বলতেন ঠাকুর্দাদা।

যাই হোক, পিসিমার আঙুলের ফাঁক সম্পর্কে খুব ছোটবেলাতেই আমার কৌতূহল জাগে। কৌতূহল নিরসন করবার জন্যে আমি পিসিমা-বেচারির ঘুমের সময়টাই নির্বাচন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করি। রাত্তিরে তিনি কখন ঘুমোতেন আমাদের জানবার কথা নয়, কারণ তার অনেক আগেই আমরা যেখানে-সেখানে ঘুমিয়ে পড়েছি এবং কোনও-না-কোনও দাদা বা বাবার দ্বারা স্বস্থানে বাহিত হয়ে গেছি। বস্তুত এই ঘুম, মানে আমার আর পাবনের ঘুম বাড়িতে একটা সন্ত্রাসের ব্যাপার ছিল। কখন কোথায় আমাদের ঘুম পাবে কেউ আগে থেকে অনুমান করতে পারবে না। ধরুন আমরা ছোটরা খেতে বসেছি। সবাইকার সব পদ খাওয়া হয়ে গেল, পাবন বা পুনপুন দেখা গেল এগোতে পারেনি।

'কী রে, খা!'

পুনপুন গরস মুখে তুলছে। তুলতে তুলতে শিথিল হাত থেকে গরস পড়ে গেল। পুনপুন ঘুমিয়ে পড়েছে। ডাল দিয়ে ভাত মাখা। সরু সরু আলুভাজা দিয়ে গরস পাকিয়েছে। মুখ আর পাতের মাঝখানে শূন্যে হাত নিরলম্ব রেখে পুনপুন ঘুমিয়ে পড়েছে। হয়তো পুনপুন কলঘরে গেছে। আসে আর না। আসে আর না। মায়ের খেয়াল হল। মা বললেন—'দ্যাখ তো নিশ্চয়ই ও ঘুমিয়ে পড়েছে।' ঠিক। পেন্টুলের দড়ি হাতের মুঠোয়, উবু হয়ে বসা, ছোট্ট চুটকিটি বেরিয়ে আছে, পুনপুন উবু হয়ে বসে ঘুমোচ্ছে। যদি সে প্যানের মধ্যে পড়ে যেত? পুনপুনের মাথা বেশ শক্ত। প্যান নির্ঘাত ভেঙে যেত। সেই কাঁচ ভাঙা নোংরার মধ্যে পুনপুনের মাথা, বুঝুন! মেথর-মিস্ত্রি ডাকতে হত, পুনপুনকে কী ধরনের চান ও শুদ্ধিকরণ করানো হলে সে আবার গ্রহণযোগ্য হত ভাবতে গেলেও হৃদকম্প হয়।

ওর ঘুম ছিল যেমন নিঃশব্দ, বেরালের চলাফেরার মতো, টের পাওয়া যায় না, বুবুরটা আবার তেমনই সশব্দ। দাদা-দিদিরা মাঝের বড় ঘরে তক্তপোশের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে হয়তো আড্ডা দিচ্ছে, বুবু কোথা থেকে হন্তদন্ত হয়ে এল। সব্বাইকার মাঝখানে একে ঠেলে ওকে ঠেলে খানিকটা জায়গা বার করে নিল, তার পরেই উপুড়। ঝাঁকড়া চুল মাথার চারপাশে ছড়িয়ে আছে, পিঠটা উঠছে নামছে, উঠছে নামছে।

পালক হয়তো বলল—'মাটি করেছে। কাঁদছে-টাঁদছে না কী?'

ইন্দ্র বলল—'কাঁদবার আর জায়গা পেল না?'

ভক্তি বলল—'কী হয়েছে বুবু, কাঁদছিস কেন? কে বকেছে?'

আর কে? বুবু নিথর। ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঠাকুমা সন্ধেবেলায় জপ করছেন। কম্বলের আসনে বসা, সামনে কোশাকুশি, হাতে মালা ঘুরছে। হঠাৎ কনুইয়ের কাছে একটা গোঁত্তা খেলেন, কনুই আর কোলের মাঝখানের জায়গাটা যেন গুহার মতো, তার মধ্যে গুঁড়ি মেরে সিংহ কিংবা বাঘ ঢুকছে। ঢুকে গেল। মাথাটাকে ঠাকুমার কোলে কোনওক্রমে ঢুকিয়ে দিয়েই বুবু ঘুমিয়ে পড়েছে। বাকি ধড়টা মেঝেতে পড়ে আছে।

সে যাক। যে কথা বলছিলুম। পিসিমাকে রাতের ঘুমের সময়ে ধরা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। এদিকে পিসিমা দুপুরে ঘুমোতেন না। কিছু করার না থাকলে হাঁটু দুটো বুকের কাছে জড়ো করে বসে থাকতেন। থাকতে থাকতে ঢুল আসত। ঘুমোব না ঘুমোব না করেও একটু ঘুমিয়েই পড়তেন পিসিমা। সেই বিরল মুহূর্ত, কখন স্বাতী নক্ষত্র উঠবে তার থেকে জল পড়বে, ঝিনুকের বুক খোলা থাকবে তাতে সেই জলের ফোঁটা পড়বে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তক্কে তক্কে আছি। পিসিমা বেশ কিছুক্ষণ নট নড়নচড়ন হয়ে আছেন। আমি পিসিমার পায়ের আঙুলের ফাঁকে আমার আঙুল ঢুকিয়ে দিয়েছি। পিসিমা একটু শিউরে উঠে আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমার আঙুল চটচট করছে। আঠা। ভগবান পিসিমার আঙুলে আঠা লাগিয়ে দিয়েছেন। ভগবানের আঠা, ভাবি একটু শুঁকে দেখি। নাঃ, ভাল গন্ধ তো নেই-ই, আমাদের গঁদের আঠার চেয়েও গদগদে মতো গন্ধটা। তবু যদি সেই আঠায় আমার আঙুলও জোড়ে। ছ্যাতরানো আঙুলগুলো, সবাই বলে হাঁসের পা। আগে আঠাসুদ্ধ আঙুল মাথায় ঠেকিয়ে নমো নমো করে নিই। ভগবানের আঠা তো! ভাগ্যবান ছাড়া কে-ই বা পায়। আমার পাপীর আঙুল জুড়ল না। আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন জিনিসটা কী! আমি অনেক পরে বুঝেছিলুম ওটা হাজা। তখন আর হাত ধুয়ে লাভ নেই।

ছোট্ট মাথা-ভর্তি একঝাঁক চুলও ছিল পিসিমার। আমি যখন দেখেছি তখন পিসিমা উত্তর-পঞ্চাশ, কিন্তু চুল কমেওনি, বেশি পাকেওনি, অথচ আমার মায়ের চুল মধ্য-তিরিশেই রীতিমতো কাঁচাপাকা। কিন্তু এত সত্ত্বেও পিসিমা ছিলেন নিমসুন্দরী। আমি পরে মাকে জিজ্ঞেস করেছি— 'মা, ছোটবেলায় পিসিমা খুব সুন্দর দেখতে ছিলেন, না?' মা বলেন— 'অত রং, অত চুল, অমন গড়ন, রূপসী বইকি! এখনও তো তাই।' ব্যাস আমি পিসিমার রূপের মধ্যে ওই নিম-এর অস্তিত্বটা তখনই বুঝে গিয়েছিলাম। রং, চুল, ফিগার সবই ছিল, তবু পিসিমা সুন্দরী ছিলেন না। পিসিমা খুব কঠোর বৈধব্য পালন করতেন। খুব সকালবেলায় পিসিমা নীচের কলতলা থেকে স্নান করে বেরোতেন, তখন প্রায় কেউই ওঠেনি। পিসিমা খুব নিশ্চিন্তে একটি গামছা স্কার্ট করে পরে আর একটি গামছা ওড়না করে গায়ে জড়িয়ে কলতলা থেকে বেরোতেন। সে সময়ে তাঁকে দেখে ফেলেছি বলেই বলছি তিনি বেশ পীনপয়োধরাই ছিলেন। এবং আমি তাঁর এই প্রত্যঙ্গ আবিষ্কার করে টেলিফোনযন্ত্র আবিষ্কারক গ্রাহাম বেল-এর মতোই আশ্চর্য ও উল্লসিত হয়েছিলাম। কেননা আমার ধারণা ছিল পিসিমার যেহেতু সন্তান নেই তাই ও বস্তুও নেই। আমার উল্লাসের আর একটা কারণ হল এই আবিষ্কারের পেছনে আসল অর্থ আবিষ্কার। অর্থাৎ পিসিমার সন্তান নেই তা হতে পারে না, কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই আছে। মাকে অনেকবার জিজ্ঞেস করেছি—'মা পিসিমার ছেলেমেয়ে কোথায়?'

—'নেই।'

—'হয়ে মারা গেছে? রাধু পিসির ছেলের মতো?'

—'না রে বাবা। হয়নি।'

কিছুদিন পরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই একই প্রশ্ন। মা তিতিবিরক্ত হয়ে যেতেন। তিনি কিছুতেই বুঝতে পারতেন না কেন আমি বুঝতে চাইছি না, তাঁর কথায় অনাস্থার মূলটা আমার কোথায়। এই সমস্যার সমাধান করতে না পেরে অবশেষে আমি আরেকটা আবিষ্কার করি, সেটা হল—আমাদের মধ্যেই কেউ-কেউ নিশ্চয়ই পিসিমার ছেলেমেয়ে। কোনও কারণে সেটা গোপন করে যাওয়া হচ্ছে। কে পিসিমার সন্তান হতে পারে ভেবে আমার শৈশবের অনেক নিঘুম দুপুর কেটেছে। তার পর যেদিন সেই গুপ্ত সন্তানকে বার করতে পারলাম সেদিন উত্তেজনায় আমার এত গা-বমি করতে থাকে যে আমি খেতে পারি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। উত্তরটা হাতের কাছেই রয়েছে। পালক! পালকই সেই পিসতুতো। আমাদের বলা হয়েছে পালক আমাদের দূর সম্পর্কের দাদা। পালকের পদবি রায়, পিসিমার পদবিও রায়, শ্রীযুক্তা মনোরমা রায়ের নামেই মাঝে মাঝে কোন দূরদেশ থেকে মনি অর্ডার আসে। কিন্তু পালকের সত্য পরিচয় না দেবার কারণই বা কী হতে পারে? পালক কি ছোটবেলায় কোনও গুরুতর অপরাধ করেছিল? সেই কারণেই পিসিমা তাকে ত্যাগ করেন? এবং আজও পালককে দেখতে পারেন না? মায়েরা কি এমনই নির্মম হন? সেই থেকে অপরাধ ব্যাপারে আমার বেশ ভয়ই জন্মে যায়। কোন অপরাধের জন্যে যে মা আমাকে ত্যাগ করতে পারেন, ভেবে কূল পেতাম না। তবে তা সত্ত্বেও অপরাধপ্রবণতা বা অপরাধের মাত্রা কমেনি। অপরাধটা করার পরে দুশ্চিন্তা হত। ইতিমধ্যে পালক ও পিসিমার ওপর আমি নজরদারি করতাম।

পালক—'টম্ চা দে।'

ভক্তি ওরফে টম্—'ভিজিয়েছি।'

পিসিমা—'সাতসকালে যে চা-চা করচো, দাঁত মেজেচো?' পালক পিসিমার কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে হাঃ করে একটা ভাপ ছাড়ল। পিসিমা—'ম্যাগে। নিঘ্‌ঘিন্নে, ছুঁয়ে দিলি, নংকাপোড়া!'

পালক—'এক হাত তফাতে দাঁড়িয়ে আছি পিসিমা, মেপে দেখুন, ফিতে দেব?'

পিসিমা—'দূর হ। বাসি জামাকাপড় ছেড়েচিস?'

পালক—'বাসি? বাসি কাকে বলে পিসিমা?'

—'যা যা বেশি বকাস নি, রাত পোয়ালেই জামাকাপড় বাসি হয়। ছেলেমানুষেও জানে।'

—'তাই বলুন,' পালক উঠোনের ওপর তারে মেলা শুকনো কাপড়গুলো পটাপট তুলতে থাকে।

—'কী করচিস, কী করচিস!'

—'রাত পুইয়েছে পিসিমা, বাসি হয়ে গেছে কাপড়গুলো, ভিজিয়ে দিই। টম কেচে দেবে এখন।'

—'দূর হ, দূর হ নংকাপোড়া, কাপড়চোপড় সব অ্যাড়া বাসি করে দিলে গা!'

অর্থাৎ পালকে পিসিমায় অহিনকুল সম্পর্ক।

এইসব প্রাত্যহিক দ্বৈরথের থেকে পিসিমার তিক্ততার মূল কারণ বার করার চেষ্টা করতে করতেই আমার মনস্তত্ত্বে হাতে-খড়ি হয়ে যায়।

পিসিমা ডবল গামছা পরে কলঘর থেকে বার হয়ে ঠাকুরঘরে যেতেন, সেখানেই একটি দেয়াল-আলনায় তাঁর শুদ্ধ কাপড় থাকত। সেটি পরিধান করে দরজা খোলা রেখেই তিনি পুজোয় বসতেন। পিসিমার পুজো বা জপ এই ধরনের হত :

—'পম উঠলি? টমকে ডেকে দিয়েচিস তো? ইন্দু এখনও ওঠেনি নিশ্চয়। গায়ে জল ঢেলে দে। পাশবালিশেও জল ঢেলে দিস। বাপের সঙ্গে বাজারে যাবে কে?'

আধ মিনিট।

—'চললে কোথায়, অ সেজ মা, খবদ্দার গায়ে চৌবাচ্চার বাসি জল ঢালবে না। একটু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রও, আমি গরম জল করে দিচ্ছি।'

কোয়ার্টার মিনিট।

—'আসার সময় তা হলে হল মা অন্নর ? অন্নদা ! অন্নপূর্ণা ! তুমিই আজ ভাত দিও মা, আমি তোমার কাচে হেরে গেলুম। কুটনো-বাটনা ছত্তিশ কাজ বাকি, এখনও রান্নাঘর মোক্ত হল না। বাসনে যেন এক ফোঁটা জল না থাকে বলে দিচ্ছি, নইলে তোরই এক দিন কি আমারই এক দিন। দু মিনিটের মধ্যে ঝাড়াঝড়ঝড় সব সেরে দিয়ে যে নাম কিনবে সেটি হবে না।'

এ সময়ে অন্ন বাণী দেবে—'আচ্ছা পিসিমা, আপনি না পুজো কচ্চো ? মুখের কামাই নেই গা ! আশ্চয্যি !'

গল্পকথা হলে এইখানটায় উভয়ের মধ্যে একটা তুমুল ঝগড়া হয়ে যেত। তা কিন্তু মোটেই হবে না। পিসিমা হঠাৎ তুষ্ণীভাব অবলম্বন করবেন এবং অন্ন বাসনপত্রে জল ঢেলে রান্নাঘরে উনুন নিকোতে ঢুকবে।

বাবাকে মাঝে-মধ্যেই বলতে শুনেছি—' দিদিমণি তোমার ওই জপতপের নাটকটা করবার দরকার কি বলো তো ? ছেড়ে দাও না, ছেড়ে দাও...'

পিসিমা তার উত্তরে বলতেন—'গুরুর দেওয়া নাম ছেড়ে দিতে বলচিস ? ব্রহ্মহত্যার পাপ হয় অমন কথা বললে, তা জানিস ? কপালে হাত ঠেকিয়ে চোখ আধখানা বুজে তিনি ভোলাগিরি গুরু মহারাজের উদ্দেশে নমস্কার করতেন।'

মেজাজ খারাপ থাকলে অবশ্য পিসিমার উত্তরটা আর একটু কড়া হত :

—'দু হাতে করে গু-মুত ঘেঁটে মানুষ করলুম, এখন উনি জপতপ শেখাতে আসচেন।'

পিসিমা সাবান মাখতেন না, তেল মাখতেন না, ঘুঁটের ছাই দিয়ে দাঁত মাজতেন, দিনে আতপ চালের ভাত আর রাত্তিরে রুটি খেতেন। খাওয়ার পরিমাণ এত কম ছিল যে অত খাটতেন কী করে ওই খেয়ে সেটাই একটা আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল। পিসিমা পান খেতেন না, মুসুর ডাল, গাজর, লাল নটে, কলমি শাক আরও কী কী যেন আমিষ বলে মানতেন। পিসিমার ভাত খাওয়ার কালো (শ্বেত নয়) পাথরের কানা-উঁচু থালা ছিল। কালো পাথরের গেলাস ছিল, বাটি কখনও নিতেন না, বাটি নেওয়াও বোধহয় বিধবাদের নিষিদ্ধ ছিল। আমাদের ভাঁড়ারঘরে ঝুলকালিগ্রস্ত একটি বাংলা ক্যালেন্ডার সব সময়ে শোভা পেত, তাতে উদ্যত খাঁড়া-হাতে করালবদনী লোলজিহ্বা মা কালীর একটি ছবি থাকত। কোনও দোকানী, সম্ভবত মুদির দোকানের দোকানী বছরের পর বছর আমাদের এই কালিকামূর্তি-সংবলিত, লাল-কালি-দাগানো অমাবস্যা-পূর্ণিমা-একাদশী চিহ্নিত ক্যালেন্ডারটি সাপ্লাই দিতেন। এই ক্যালেন্ডারটি আমার বিশেষ মনোযোগের কারণ ছিল। কারণ নম্বর এক— কাটা হাতের স্কার্টের নীচে মা কালীর নিম্নাঙ্গের কিছু দর্শন করা যায় কি না, কারণ নম্বর দুই— মুণ্ডমালার মুণ্ডগুলো গণনা করা এবং হাতের সংখ্যার সঙ্গে তার সামঞ্জস্য আছে কি না অর্থাৎ যত মুণ্ডু তার দ্বিগুণ হাত আছে কি না গণনা করা। এই মুণ্ডগুলোর মধ্যে আমার পরিচিত কারুর আদল পাই কি না ক্ষীণালোক ভাঁড়ার ঘরে এটাও আমার আবিষ্কর্তব্য ছিল, তৃতীয়ত— মা কালী জাগ্রত কি না খেয়াল রাখা। জাগ্রত তো নিশ্চয়ই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু পলক ফেলার মুহূর্তে, পা মুড়ে বসার সময়ে যদি তাঁকে কখনও ধরে ফেলা যায়। (আমি নিজে ওইভাবে দাঁড়িয়ে দেখেছি, বেশিক্ষণ পারা যায় না, বস্তুত পাড়ার নাটকে একবার আমার রং ও চুলের জন্যে কালী সাজতে হয়েছিল। কিছুক্ষণ পরেই আমি নড়ে যাই, তাতে দর্শক মহলে হাসির হররা ওঠে।) আর একটা জিনিস আমার খুব আনজাস্ট মনে হত। কালীমা নগ্ন, অথচ শিবের কেন নিম্নাঙ্গ ঢাকা থাকবে ? আমরা চারধারে যা দেখি, এ তো ঠিক তার উল্টো ? নয় কী ? মেয়েরা সবসময়েই সর্বাঙ্গ ঢেকে রাখেন, কিন্তু পুরুষরা তো রাস্তাঘাটেও অত্যন্ত স্বল্পবাসে বেরিয়ে যেতে দ্বিধা করেন না। আমাদের পাশের বাড়ির জ্যাঠামশাই ধুতি লুঙ্গির মতো করে পরে খালি গায়ে বাজার যেতেন, কেশব জ্যাঠা ও ওতুল কাকা যখন তদীয় রকে বসে বাবার সঙ্গে গল্প করতেন, তিনজনেরই গা খালি থাকত, অথচ গোপনযোগ্য প্রত্যঙ্গ তাঁদের তিনজনেরই ছিল। ওতুল কাকা ও বাবা অস্ফুটস্তনী হলেও কেশব জ্যাঠা তো বেশ গুরুস্তনীই ছিলেন। তবে ? ঠাকুর্দা যখন আরাম-চেয়ারের হাতলে দুই পা মাঝে মাঝে তুলে দিতেন তখন তাঁর তৃতীয় পদ বা থার্ড লেগও আমি চকিতে দর্শন করেছি। তা হলে ছবিতে এই বিপরীত আচরণ কেন ? আমার ইচ্ছে হত শিবের কোমর সংলগ্ন শ্বেতবস্ত্র টেনে খুলে দিই। কিন্তু হায় ছবির শিবের কাপড় খোলা যায় না!

পিসিমার থেকে খালি খালি দূরে সরে যাচ্ছি। এই ক্যালেন্ডারটি ছিল পিসিমার প্রাণ মান ধ্যান সব। কুমড়ো খেতে হলে তিথিটা প্রতিপদ কি না, পটল এলে তৃতীয়া কি না, মুলো এলে চতুর্থী বলে বাবার সঙ্গে রাগারাগি নিত্যকার ঘটনা। ঠাকুর্দাদা রোজ বেল খেতেন, কিন্তু পঞ্চমী তিথিতে পিসিমা জেদি কিছুতেই বেল খেতে দেবেন না, 'পঞ্চমীতে বিল্বে কলঙ্ক' জানেন না না কি ?' —পিসিমা উত্তেজিত।

ঠার্কুদা বলতেন— 'আরে বাবা! তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, এখন আর কী কলঙ্ক হবে ? সে সব আগে যা হবার হয়ে গেছে রে!'

পিসিমা—'কলঙ্ক কি শুধু এক রকমেরই হয় ?'

ঠাকুর্দা তাতেও অকুতোভয়, বলতেন, 'হলে, কাঁচকলা। তুই আমায় বেলটা দে। নইলে আমার পেট খোলোসা হয় না।'

এ ছাড়াও ষষ্ঠীতে পিসিমা নিম-বেগুন করবেন না, চিংড়ি মাছের মালাইকারি করার আয়োজন হলে তিনি দেখে নেবেন তিথিটা অষ্টমী কি না, অষ্টমী হলেই মালাইকারি ভণ্ডুল, কেননা অষ্টমীতে নারকোলে মূর্খতা প্রাপ্তি! এরকম একটা উপলক্ষে আমি দাদাদের পিসিমার সঙ্গে তর্ক করতে দেখেছি।

ইন্দু—'বাবা আর আমি দেখে-শুনে কত করে নারকোলটা আনলুম, আর আপনি বলছেন মালাইকারি হবে না ?'

পিসিমা—'তালে শরীরনাশ স্যান্নারিকেলে চ মূর্খতা জানিস না ?'

ইন্দু—'হলে আমরা মূর্খ হব, আপনার তো আর সে ভয় নেই।'

পালক—(ফিক করে হেসে) 'পিসিমা তো মুখখু-ই আছেন, আর কত মুখখু হবেন ?'

পিসিমা—'দূর হ নংকাপোড়া, তুই কেন আমাদের মাঝখানে প্যাঁকপ্যাঁক করছিস ? মালাইকারি আজ হবে না যা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইন্দু—'আমিও আপনার লাউ কাটব না যান।'

লাউ বা কুমড়ো গোটা এলে সেটাকে কাটতে কোনও পুরুষের দরকার হত। কেন না কুষ্মাণ্ডঘাতিনী নারী ও দীপনির্বাপক পুরুষ থেকে বংশ নাশ হয়।

সাবান না মাখা তেল না মাখা সত্ত্বেও কিন্তু পিসিমার মুখটুকু তেল চুকচুকে প্রতিমার মুখের মতন চকচক করত। হাতও আদপেই শক্ত ছিল না। হাত পা ধুয়ে তিনি কক্ষনো মুছতেন না। সেই ভিজে থেকেই সম্ভবত তাঁর হাতে পায়ে হাজা হত। এবং ওই একই কারণে বোধহয় তাঁর কখনও সর্দি হত না। পিসিমা পৃথিবীর একমাত্র মানুষ যাঁর কখনও সর্দি হয়নি। সব সময়ে হাত-পা ভিজে থাকার ফলেই সম্ভবত তিনি সর্দি থেকে ইমিউনিটি অর্জন করেছিলেন। তবে পিসিমার গা আস্তে আস্তে কালো খসখসে হয়ে যেতে থাকে। তেল না মাখার ফলেই সম্ভবত পিসিমার চুলেরও খুব ক্ষতি হয়েছিল। চিরুনি দিয়ে ভাল করে চুল আঁচড়ানোতেও বোধহয় তাঁর বৈধব্যের কঠোরতা নষ্ট হত। কোনরকমে দুবার চিরুনি চালিয়েই তিনি চুলটাকে একটা আঁটসাঁট গিঁটখোঁপা করে নিতেন। ভিজে অবস্থাতেই। ফলে চুলে বোদা একটা গন্ধ হত। মাথা ধরত সন্ধে হলেই। শীতের দিনে তিনি রোদে পিঠ দিয়ে বসে চুল মেলে দিতেন। এই সময়ে তাঁর একমাত্র বিলাসিতা ছিল আমাদের দিয়ে পাকা চুল তোলানো। পাকা চুল থাকা না থাকাতে তাঁর কিছু এসে যেত বলে মনে হয় না। আসলে মাথায় কচি আঙুলের নড়াচড়ায় তিনি আরাম পেতেন। এই চুল তোলার সময়েই আমি আর পুনপুন তাঁর মাথায় একটি কালো আব আবিষ্কার করি। আমাদের ধারণা ছিল, ওইটে টিপে দিলেই একটা মিরাকল্ হবে, ওটাই সেই মিরাকলের বোতাম। মিরাকলটা কী ধরনের হতে পারে এ নিয়ে পুনপুনের সঙ্গে আমার খুবই মতভেদ হত। পুনপুন যদি বলত যে ওই বোতাম টিপে দিলেই পিসিমা টিয়ে পাখি হয়ে ট্যাঁ ট্যাঁ করে উড়ে যাবেন, তো আমি বলতুম— না ওটা টিপলে পিসিমার আসল রূপ বেরিয়ে পড়বে। পুনপুন এটা মেনে নিত, ওর মতে পিসিমা 'ঠাকুরমার ঝুলি'র সেই রাক্ষসীটা হয়ে যাবেন, যে বন্দিনী রাজকুমারীকে দিয়ে পা টেপাত, আমার মতে পিসিমা নিশ্চয়ই অপ্সরী হয়ে যাবেন, আকাশে মিলিয়ে যাবেন। তিনটে সম্ভাবনাকেই আমরা যথেষ্ট ভয় পেতুম বলে বোতামটা কখনও টেপা হয়নি। ওটাকে আমরা সাবধানে এড়িয়ে যেতুম।

তবে আমাদের ছোটবেলাতেই পিসিমা একবার আমাদেরই সঙ্গে ন্যাড়া হয়ে গেলেন। তিনি যে ন্যাড়া হবেন তা বাড়ির কেউ বুঝতে পারেনি। খুব হাত পা ছোঁড়া কান্নাকাটির মধ্যে দিয়ে আমাদের ন্যাড়াকরণ সমাপ্ত হলে পিসিমা হঠাৎ বললেন— ও বেজা, একটু সবুর কর তো!

চোখ মুছতে মুছতে ভেতর-বাড়িতে যাচ্ছি, পিসিমা বেজার কাছে এসে বসে পড়লেন— 'দে আমার মাথাটাতেও খুর বুলিয়ে দে।'

আমার অবাক চোখের সামনে মাথার বোতাম না টেপা সত্ত্বেও পিসিমা একটি ছোট্ট রূপী বাঁদরীতে পরিণত হয়ে গেলেন। ফর্সা রং, ছোট্ট মুখ, বাঁ দিকের দাঁত একটু উঁচু— একেবারে রুপিনী।

সব্বাই পিসিমাকে ঘিরে ধরে হাসছি। আমার চুলের শোক আমি ভুলে গেছি। পালক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হঠাৎ পিসিমাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে নাচতে লাগল— 'নেড়ি, তেলকামড়ি, তেলে ভাজা বড়া। নেড়ি তেলকামড়ি তেলেভাজা ব-ড়া।'

—'দূর হ নংকা পোড়া', পিসিমা পালকের কোলে ছটফট করছেন। মা এসে বললেন— 'ও কি দিদিমণি, এ কী করেছেন?' পিসিমা বললেন —'ধুর, রোজ মোছরে, আঁচড়াও রে, বাঁধো রে, পাপ ঘুচিয়ে দিলুম একেবারে!'

এর পরে পিসিমার যে চুল গজায় তা সব খাড়া খাড়া। দু ইঞ্চি সমান খাড়া খাড়া হয়ে মাথার ওপরে চুলগুলো দাঁড়িয়ে থাকত। কিছুদিন আগে বহুকাল আমেরিকা প্রবাসিনী আমার এক বন্ধু এসেছিল। তার দেখি ওইরকম চুল। চুলগুলোকে সজারুর কাঁটার মতো দাঁড় করিয়ে রাখার জন্যে নিশ্চয় কিছু ব্যবহারও করে। বুঝলুম ফ্যাশন বিষয়ে সময়ের অনেক আগে জন্মেছিলেন পিসিমা।

যাই হোক, তখনও জনসাধারণের চোখ তৈরি হয়নি। কাজেই পিসিমার এই নতুন ফ্যাশনের সমঝদার তো কাউকে পাওয়া যায়ই নি, আমার বাবা পর্যন্ত তাঁকে খ্যাপাতে আরম্ভ করেন। পিসিমার ন্যাড়া মাথায় চুল একটু একটু গজাতে শুরু করলেই বাবা নাচতে শুরু করে দিতেন— 'উচ্ছে গাছে নতুন পাতা বেরুচ্ছেন বেরুচ্ছেন।' হাতে তালি দিয়ে তালে তালে লাফিয়ে লাফিয়ে নাচ। পিসিমা বা পিসিমার মাথা যে কেন উচ্ছে গাছের সঙ্গে তুলিত হয়েছিল তা আজও বুঝতে পারিনি। কিন্তু বাবার নাচের সেই ছন্দ ছোটবেলার ছন্দের সঙ্গে এক হয়ে রয়ে গেছে।

'উচ্ছে গাছে নতুন পাতা বেরুচ্ছেন বেরুচ্ছেন।' বাবাই যদি এই করেন তাহলে পালক কী করবে বা করতে পারে বোঝাই যায়। পালক নানারকম ধাঁধা তৈরি করত। তার একটা হল—

আগে 'চু-চু' পরে 'অ্যাল্!'
চেয়ে থাকে ফ্যাল-ফ্যাল,
কাশ নয় বাঁশ নয় তবু খাড়া দাঁড়িয়ে
সব বাঁশ ছাড়িয়ে।
ফ্যালো কড়ি মাখো তেল
পেয়ে যাবে কৎ-বেল।

এটা সে বেশ অঙ্গভঙ্গি সহকারে পেশ করত। 'চু-চু'টা কুকুর ডাকার মতো। 'অ্যাল'টা জিভ কেটে, ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে থাকার ভঙ্গি যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য বোকামির সঙ্গে, 'খাড়া দাঁড়িয়ে'র খাড়াত্ব, বাঁশের লম্বাত্ব, কৎ-বেলের গোলত্ব সব কিছুতে বেশ ভাল করে ঝোঁক দিয়ে, যাতে চুল এবং মাথার ব্যাপারটা কিছুতেই আন্দাজ করা না যায়।

এটাতে কেন জানি না পিসিমা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠতেন না। শুধু নিজের কাজে যেতে যেতে বলে যেতেন— 'নংকাপোড়া!'

'নংকাপোড়া' শব্দটা বিশেষণ না অনুজ্ঞা এটা আমি বহু দিন বুঝতে পারিনি। শব্দটা উচ্চারিত হলেই আমি কান পেতে থাকতুম। ইনটোনেশন বলত ওটা বিশেষণ, অর্থাৎ পালক একটি নংকাপোড়া, কিন্তু শব্দটার গঠন আমায় বলত ওটা অনুজ্ঞাই হবে (বিশেষণ, অনুজ্ঞা এ সব বিয়াকরণগত শব্দ স্বভাবতই তখন জানতুম না)। পিসিমা লংকা পোড়াতেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলছেন, এবং সেটি বেশ গর্হিত কর্ম এই আমার ধারণা।

লংকা পোড়ানো কতদূর গর্হিত কর্ম হতে পারে সেটা হাতে-কলমে পরীক্ষা করার জন্য আমি তৎপর হলুম। তারপর এক দিন সুবিধে বুঝে পিসিমার সেই অভিনব জপ তপের সময়ে অন্নর নবপ্রজ্বলিত উনুনের লকলকে শিখার মধ্যে আমি আগে থেকে সরিয়ে রাখা কয়েকটি শুকনো লংকা আহুতি দিই। পিসিমা হাঁচতে হাঁচতে তাঁর কম্বলের আসন কোশাকুশি ইত্যাদি ভেক গুটিয়ে ফেললেন, এত হাঁচির মধ্যে কি আর ঈশ্বরের নাম করা যায়? ঈশ্বরকে হাঁচি দিয়ে দূষিত করাই কি ঠিক? অন্ন হাঁচতে হাঁচতে বাসন-মাজার পার্ট-টাইম কাজে প্রায় ইস্তফা দিয়ে ফেলল, 'তোমাদের বাড়িতে বড্ড হাঁচি হয়', সে ঘোষণা করল—'এত হাঁচতে হাঁচতে কাজ করা যায়? আপনিই বলো পিসিমা।' একদিনের হাঁচিকে সে রোজের হাঁচিতে পরিণত করল অনায়াসে। পালক, যে আসল নংকাপোড়া, সে যখন হাঁচতে হাঁচতে পশ্চাদপসরণ করছে— 'নস্যটারে ভস্ম করি করেছ এ কি পিসিমাতা/কৌটো হতে দিয়েছ তারে ছড়ায়ে,' বলতে বলতে এবং পিসিমা এত রেগে গেছেন যে প্রায় তাকে মারতে ছুটেছেন, তখন আমি নিশ্চিত হয়ে যাই লংকা পোড়ানো অতিশায় গর্হিত কাজ, এবং শব্দটি দিয়ে পিসিমা কাউকে লংকা পোড়াতে বলেননি, লংকা যে পোড়ায় তাকেই শনাক্ত করতে চেয়েছেন। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে আমিই নংকাপোড়া। এই ভাবেই 'নংকা পোড়া'র অর্থ বিশ্লেষণ ও এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে দিয়ে শিখি। এ নংকা যে সে নংকা নয়, রাবণের লংকা এবং সেই লংকা পোড়ানো হনুমানই যে পিসিমার লক্ষ্য এ কথা আমার ঘুণাক্ষরেও মনে হয়নি। আর একটি অন্তর্নিহিত গুপ্তকথাও আমি বুঝতে পারিনি, পিসিমার সেদিনকার প্রচণ্ড রাগের কারণ যে তাঁর গোপনে নস্যভক্ষণ, এবং সেই নেশার বার্তাই পালক পাবলিক করে দিয়েছিল সেদিন এই কেচ্ছা কেচ্ছাভক্ত বুবুর বুঝতে সময় লাগে।

যাই হোক, লংকাগুলো পুড়ে কালো হয়ে গিয়ে এক সময়ে তাদের ঝাঁঝ ও হাঁচি উদ্রেক করার ক্ষমতা সম্পূর্ণ হারাল, প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর হাড়গোড়ের মতো তারা কয়লার ফাঁকে-ফোকরে আশ্রয় নিল এবং উনুন অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যে জ্বলতে লাগল। পিসিমা মন্তব্য করলেন 'আজ আঁচটা খুব ভালো উঠেছে রে অন্ন!' বলে উনুনের ওপর দু তিন চিমটি নুন অর্পণ করলেন, অগ্নিকে কিছু খেতে না দিয়ে রান্না শুরু করতে হয় না বলেই না কি এই নিয়ম। প্রশংসায় বিগলিত এবং গৌরবান্বিত হয়ে শ্রীমতী অন্ন বললেন— 'অন্নর কাজে গাফিলতি পাবে না পিসিমা, কাজ আপনি দেখে নাও আগেই বলেচি কি না, আর আট আনা মাইনে বাড়িয়ে দাও বাবুকে বলে।'

আমার কৃতিত্ব অন্ন আত্মসাৎ করল দেখে খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে আমি আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু অনেক কষ্টে সামলেও নিলুম। সাত সক্কালে কানে প্যাঁচ পড়াটা ঠিক নয়। তবে আমার দুষ্কর্মের ফলে বাবা-ঠাকুর্দাদার আট আনা মাসিক খরচ বেড়ে গেল। যে অত ভালো আঁচ দিতে পারে এবং অত হাঁচির পরেও কাজে বহাল থাকে? আট আনা স্যালারি-রেজ যেত তার প্রতি অবশ্যকর্তব্য সুবিচার— এটা অন্ন পিসিমার মারফত তাঁদের বুঝিয়েই ছাড়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সপ্তম অধ্যায়

হরিবংশ-২—কালো কুমু

ঠাকুমা যে আমাদের আপন ঠাকুমা নন, এ কথা আমরা জানতুম না। পিসিমা জানাতে খুব উৎসুক ছিলেন। কবে এক চোদ্দো বছরের সদ্য-বিধবা বালিকা বাবার বিয়ে দেখার অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গিয়েছিল, মা মারা গেছেন বছরও ঘোরেনি, নিজের স্বামী মারা গেছেন দেশান্তরে, ঘনিষ্ঠতা তো দূরের কথা, ভালো করে আলাপ-পরিচয় পর্যন্ত হল না, চোদ্দো বছরের মেয়ে ডুরে শাড়ি, চুড়ি বালা হার কানের রিং খুলে ফেলতে হল, কালো পাথরের থালায় আতপ চালের পিণ্ড নির্দিষ্ট হল। সেই মেয়ে বাবার নতুন বউকে দুধে-আলতায় পা দিয়ে হাতের মুঠোয় লেঠা মাছ সামলাতে দেখেছে অন্তরাল থেকে। এ ট্রমা বেচারি কাটিয়ে উঠতে পারেনি সারা জীবন। এবং পৃথিবীর সব অবিচারের মতোই কোপটাও পড়েছিল নির্দোষ বেচারি ঠাকুমারই ওপর। বুড়ো বয়সে এই রাগের আর ধার ছিল না তেমন। কিন্তু একটা ভোঁতা বিস্বাদ-বিরাগ থেকেই গিয়েছিল। এর সামনে ঠাকুমা ছিলেন একেবারেই অসহায়। এটা তাঁর প্রাপ্য শাস্তি এটা যেন তিনি মেনেই নিয়েছিলেন। কিন্তু আমার মা কতকগুলো ব্যাপারে ছিলেন খুব কঠোর। তিনি পিসিমাকে বলে দিয়েছিলেন আমরা যেন কোনওদিন এই সম্পর্ক জানতে না পারি। আমরা কেউ জানতুম না ঠাকুমা আমাদের নিজের ঠাকুমা নন। বাবাও খুব সম্ভব ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই পারিবারিক সম্পর্কের রূপকথা বানাবার ব্যাপারে কতকগুলো লুপ-হোল বা ছিদ্র থেকে যায়। পিসিমা আর বাবা ঠাকুমাকে সেজমা বলতেন, মা কিন্তু মা-ই বলতেন শাশুড়িকে।

আমার জ্ঞানোন্মেষ খুব অল্প বয়সেই হয়। অন্যদের কথা বলতে পারি না, আমার মনে প্রশ্নগুলো কীভাবে জাগে এবং কীভাবে তাদের সমাধান হয়, বলি। প্রথমে আমার মনে কোনও প্রশ্নই জাগেনি। ছোটরা চারপাশে যা দেখে সেটাকেই রীতি বলে ধরে নেয়। ঠাকুমাদের বাবারা সেজমা বলেই ডাকেন, এই ধারণার চিড় খেলো যখন দেখলুম পাশের বাড়িতেই জ্যাঠামশাই তাঁর মাকে 'মা' বলছেন। অতএব মায়ের প্রতি প্রশ্নবাণ—'ও বাড়ির জ্যাঠামশাই কেন মাকে "সেজমা" বলেন না মা?'

মা প্রথমটায় খারাপ ছাত্রীদের মতো প্রশ্নটা ধরতেই পারেননি। একটু পরে বুঝে বললেন— 'অনেকে অনেক রকম বলে মা-বাবাকে—মা-মণি, বড়মা, শোননি? এ-ও সেই রকম।' আমি এটাকে পরিষ্কার ধাপ্পা বলে বুঝতে পারি। কেননা সেজ একটা আদরবাচক বাচক শব্দ নয় ক্রমবাচক শব্দ। এভাবে তো বুঝিনি! মা-মণির মণি আর সেজমার সেজ মোটেই এক জাতীয় নয় এটুকুই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ে বুঝেছিলুম। আর খুব সামান্য লোকে মাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড়মা, কাকিমাকে ছোটমা বলে বটে। কিন্তু বেশির ভাগই বড়মা জেঠিমাকে বলে থাকে। এই উদাহরণগুলো আমার মাথায় চক্কর খেয়ে উড়ে গেল। মা এড়িয়ে গেলেন ব্যাপারটা। বেশ নিরাপদ একটা সময় পার হয়ে গেলে মাকে জিজ্ঞেস করি

—'ঠাকুমার নাম কী মা ?'

—'মনোমোহিনী দেবী !' দেবী কথাটা লক্ষ করুন। এ সম্পর্কে পরে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

—'তা হলে বাবার চেম্বারের নাম কেন মাতঙ্গমোহিনী হোমিও হল ?' মা একেবারে থতমত খেয়ে গেলেন। মিথ্যে কথা মা বলতে পারতেন না। এড়িয়ে যাওয়া, ধাপ্পা দেওয়ার হাজারও কৌশল তাঁর জানা ছিল, কিন্তু সোজাসুজি মিথ্যে কথা বলা মায়ের পক্ষে শক্ত ছিল। তবে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বও তো তাঁর কম নয়। একটু সামলে নিয়ে বললেন—'বাবাকে জিজ্ঞেস করো।'

মার ধারণা ছিল বাবাকে জিজ্ঞেস করার সাহস আমার হবে না। ঠিকই ভেবেছিলেন। তাই আমি সোজাসুজি ঠাকুমাকেই জিজ্ঞেস করি।

ঠাকুমা বললেন—'ওমা ! মাতঙ্গমোহিনী আর মনোমোহিনীতে তফাত কী রে ! মাতঙ্গমোহিনী কেটেছেঁটে মনোমোহিনী তো আমিই করে নিয়েছি। মাতঙ্গ যেন কেমন জবরজং নাম, নয় ?'

আমি বলি—'মনোমোহিনীও জবরজং নাম। বিচ্ছিরি !'

—'ঠিক বলেছিস', ঠাকুমা বলেন, 'তবে আগে তো সেটা ভালো বুঝতে পারিনি, এখন তুইই বল কী নাম হলে তোর ভালো লাগবে?'

তখন আমি বলি—'কাননবালা।'

ব্যাস ঠাকুমার মুখ হাঁড়ি। বেগতিক দেখে আমি সেবারের মতো প্রশ্নোত্তরের আসর থেকে সরে পড়ি। কাননবালা নামটা চারধারে শুনতুম, পোস্টার-টোস্টারও দেখে থাকব, ভারি সুন্দর। তাই নামটাও পছন্দসই। এই নাম সাজেস্ট করতে ঠাকুমা যে কেন গম্ভীর হয়ে গেলেন বুঝতে পারিনি।

ঠাকুমা একই সঙ্গে খুব দুর্বল এবং খুব সবল ছিলেন। দুটোরই উৎস বোধহয় তাঁর সততা ও বিবেক। লম্বা, ময়লা রং, একটু ঝুঁকে-পড়া ঠাকুমা দেখতে সুন্দর ছিলেন না। কিন্তু হাসলেই মুখটা অদ্ভুত সুন্দর হয়ে যেত। মাঝখানে সিঁথি কাটা পাকা-মাথায় অল্প-সিঁদুর ঠাকুমা কারুকে কষ্ট দিতে পারতেন না। পিসিমার জন্যে মাছ, রঙিন শাড়ি ত্যাগ ইত্যাদির কথা আগেই বলেছি। কতটা মনের জোর থাকলে একটি উনিশ-কুড়ি-বছরের সদ্য-বিবাহিতা মেয়ে বিমুখ সতীনকন্যার জন্যে এতটা ত্যাগ করতে পারে ভাবলে অবাক লাগে। আপনারা বলবেন প্রথমটায় সতীন-কন্যাকে তুষ্ট করবার জন্যে এটা করেছিলেন, পরে যখন তাতে ফল হল না আর অভ্যাসটা ত্যাগ করতে লজ্জা পেয়েছেন। আমার কিন্তু মনে হয় আন্তরিক সমব্যথার জন্যেই তিনি এমনটা করেছিলেন, পিসিমার কষ্টটা তিনি পুরোপুরি বুঝেছিলেন, একজন বঞ্চিত বালিকার সামনে জীবন উপভোগ করতে তিনি প্রকৃতই লজ্জা ও কষ্ট পেয়েছিলেন। সে হিসেবে ঠাকুমাই আমাদের বংশের প্রথম বিদ্রোহিণী। তার জন্য কোনও স্বীকৃতি অবশ্য তিনি পাননি, বরং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সারা পরিবারের বিমুখতাই পেয়েছেন। তবে নিজের স্বভাবগুণে সবাইকেই তিনি জয় করেছিলেন, পিসিমাকে ছাড়া। এখন ভাবলে আমার মনে হয় তাঁর যে নিজস্ব সন্তান হয়নি, সেটাও ইচ্ছাকৃত ও পরিকল্পিত। ঠাকুর্দাদা তো ডাক্তারই ছিলেন। দুটি স্ত্রীর মৃত্যুতে এবং কন্যার দুরবস্থায়, সাংসারিক জটিলতায় হয়তো তাঁর চৈতন্য হয়েছিল। ঠাকুমার বিদ্রোহের আরও নিশানী আছে। ওই দেবী। তাঁর মা মারা যেতে পুরুতমশায় তাঁকে চতুর্থী করাচ্ছেন। —'আপনার নাম কী মা ?' —'মনোমোহিনী দেবী' উত্তর হল। দেবীটা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে পুরুতমশায় মনোমোহিনী দাস্যাঃ বলে মন্ত্র পড়তে লাগলেন, কায়স্থ তো ! অব্রাহ্মণ মাত্রেই শুদ্দুর, দেবী একমাত্র ব্রাহ্মণ-কন্যাদেরই বলা যাবে। ঠাকুমাও পুরুতমশায়কে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে দাসীর জায়গায় দেবী দিয়ে যেতে থাকলেন। মনোমোহিনী দেব্যাঃ তস্যা মাতা পঙ্কজিনী দেব্যাঃ···। কিছুক্ষণ পর পুরোহিতমশায় বিনীত গলায় বললেন 'দেবী বলবেন না মা, এসব পারলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড, অপরাধ হয়ে যাবে।'

ঠাকুমা নিচু গলায় বললেন— 'অপরাধ হলে আপনার হবে ঠাকুরমশাই, আমি আপনার মায়ের তুল্য, আমাকে আমার মরা মাকে আপনি তখন থেকে দাসী বলছেন।'

ঠাকুমার পুরোটা আমি স্বভাবতই ছোটবেলায় বুঝতে পারিনি। এইখানে একটু ডাইগ্রেস করি, কিছু মনে করবেন না পাঠক। নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন একই জিনিস বোঝাতে যে-সব প্রতিশব্দ আছে, এক এক পরিবার তার এক একটা ব্যবহার করেন। আমরা, পশ্চিমবঙ্গীয় শহুরে মানুষ বলি 'ছোটবেলা'। রবীন্দ্রনাথ বললেন 'ছেলেবেলা', পরে আমার বন্ধুদের মা-ঠাকুমাদের মুখে শুনেছি 'ছোটকাল'। প্রথম যখন রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা' পড়ি, বেশ ছোটবেলাতেই তখন কী রকম একটা অস্বস্তি হতে শুরু করে। 'ছেলেবেলা' 'ছেলেবেলা' 'ছেলেবেলা' ভেতরে কথাটা যেন কামড়াতে থাকে। ক্ষীণভাবে মনে হয় আমি যদি কোনওদিন আমার ছোটবেলার কথা লিখি তাহলে কি 'মেয়েবেলা' লিখব ? 'মেয়েছেলে' কথাটা যেমন অস্বস্তিকর 'ছেলেবেলা'টাও তেমনই। রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা'কে আমি ভালো মনে নিতে পারিনি। আপনারা নিশ্চয়ই আমার বোকামিতে হাসছেন। আরে বাবা, 'ছেলে' হল এমন একটা শব্দ যা কখনও কখনও শিশুকে বোঝায়, কেউ অন্তঃসত্ত্বা হলে আগে কী বলা হত ? এখন শি'জ ক্যারিয়িং, শি হ্যাজ কনসিভ্‌ড্‌, শি'জ ইন দা ফ্যামিলি ওয়ে, ইত্যাদি সভ্যতর ভাষা ব্যবহার হয়, কিন্তু আগে কী বলা হত ?—'ছেলে হবে।' সোজাসুজি 'ছেলে হবে'। এর থেকেই মানে বেরিয়ে আসে। 'ছেলে' বলতে অবশ্যই যে কোনও বাচ্চাকে বোঝায়। তার লিঙ্গটা ইমপর্ট্যান্ট নয়, যেমন 'আহা ছেলেমানুষ'-এর ছেলে, বা হিন্দিতে বাচ্চাকে 'বেটা বেটা' বলে আদর লিঙ্গনির্বিশেষে। আসল কথা, আমি শুধু আমার ছেলেমানুষি চিন্তাটাই রেকর্ড করলুম। তবে আর একটা মানেও কিন্তু হয়। একটা পুরো পরিবারের পুরো জাতির মনে প্রোথিত আশা যে শিশু যে আসছে সে ছেলে অর্থাৎ পুংলিঙ্গ হয়েই আসবে। মনস্তত্ত্ববিদরা বলুন আমার বিশ্লেষণ ঠিক কিনা। এই জায়গায় মিনু মাসানির 'উইমেন স্প্র্যাং ফার্দার', অর্থাৎ মেয়েরা 'জৈব প্রগতির মাপকাঠিতে আরও উন্নত জীব' পড়ে আমরা ক্লাসসুদ্ধু মেয়ে কী রকম হৃষ্ট হতুম সে কথা আজও মনে আছে। আমরা ঠিক যতটা হৃষ্ট আমাদের

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাস্টারমশাই করুণাবাবু হতেন ঠিক ততটাই ইনভার্স প্রপোর্শনে অর্থাৎ রুষ্ট হতেন। বলতেন, 'আরে! হোয়াট ইজ দ্যায়ার টু লাফ অ্যাবাওট। স্প্রিং মানে জানস? স্প্রিং মিনস জাম্প। জাম্পিং জাম্পিং ক্লাইম্বিং ট্রিজ। যত্ত সব বান্দরী জুইট্যাছে।'

ঠাকুমার কথায় ফিরে আসি। খু-উ-ব নির্লিপ্ত ছিলেন মানুষটি। সারা বাড়িতে একটি ছায়া বা কোণঠাসা ভূতের মতো, যিনি প্রায় কখনই অবয়ব ধারণ করতেন না। ঘর-সংসার ছেড়ে দিয়েছিলেন কন্যার হাতে। কখনও কোনও ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতেন না। মায়েরা যখন সুরুল ছেড়ে কলকাতায় বসবাস করতে শুরু করলেন এবং ক্রমে ক্রমে ঠাকুর্দা ঠাকুমা পিসিমা সবাই আমাদের বাড়িতে চলে এলেন, মা, তখন গর্ভভারে প্রপীড়িতা, প্রথম সকালেই ঠাকুমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন— 'আজ কী কী রান্না হবে মা?'

ঠাকুমা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন—'মনোকে জিজ্ঞেস করো মা।'

মনোকে জিজ্ঞেস করতে গিয়ে মা দেখলেন দুটি পাতা উনুন আঁচে জ্বলজ্বল করছে, একটিতে ভাতের হাঁড়ি বগ্‌বগ্ করে ফুটছে, আর একটিতে মাছের ঝোল কলকল করে ফুটছে। জিরে লংকা হলুদের পিণ্ড বাটতে বাটতে অন্নতে মনোতে বিশ্রম্ভালাপ হচ্ছে।

পিঁড়িতে উপবিষ্ট মনো, উনুনদ্বয়ের দিকে পাশ ফিরে বসে বৃহৎ বঁটিতে চচ্চড়ির আনাজ কুটছেন। অপরদিকে অন্নদাদেবী আর একটি পিঁড়িতে উপবিষ্ট হয়ে দুই বাহু এবং হাতের তেলোর বুড়ো আঙুলের তলার মাংসল ও জোরদার অংশটির সহযোগে বল প্রয়োগ করে হলুদের ত্যাড়া ঘাড় সোজা করছেন। জিরের খুদে ঘাড়তানি জব্দ করছেন, এবং খ্যাসখেসে শুষ্কং কাষ্ঠং লংকার থেকে তরল লাভা পেস্ট বার করছেন। দুজনেরই মুখ চলছে।

মনো—'কী জেত?'

অন্ন —'যদি বলি বাউন তো বিশ্বেস যাবে পিসিমা? পইতে তো নি।'

মনো—'তুই বলই না। বিশ্বেস অবিশ্বেস পরের কথা।'

অন্ন—'মাহিষ্য পিসিমা, মিথ্যে বলবনি, মাথার ওপরে ভগমান আচেন কি নি?'

মনো—'তাতে কী হয়েছে? মাহিষ্য সৎ-শূদ্র। কুটনো-বাটনার দোষ নেই। ভাতের হাঁড়ি না ছুঁলেই হল। আচার-বিচার ষোলো আনার জায়গায় আঠারো আনা মানবে তোদের পিসিমা, তাই বলে অবিচার পাবিনি। তবে জল খেতে যখন দোব, আলগোছে দোব মা, মনে কিছু করো না, বেধবা মানুষ, বোঝই তো!'

অন্ন—'অমনি আমি মনে করতে গেলুম আর কি! বেধবা মানুষ দেবীর তুল্যি। আলগোছই দিক, কি যা করেই দিক, যা দেবে পেসাদ।'

এই জায়গায় অন্ন লংকামাখা হাত কপালে ঠেকায়।

অন্ন—'তোমাদের একটু চন্নামিত্তির পেলে বর্তে যাব।'

সেই হাজাওলা পায়ের চরণামৃত! বুঝুন!

মনো—'তা যেন হল, কিন্তু কটা বাড়িতে কাজ ধরিচিস? যত্তি বল কেন, পাঁচটা মানুষের পাঁচ জেত মা, ছত্তিশ বিচার, এঁটো কাঁটা, মাংস ডিম, ক্যাঁকড়া···বাসি হেগো, একেক্কার দেখচি তো চাদ্দিকে!'

অন্ন—'এক বাড়িতে আচো পিসিমা, ছত্তিশ বাড়ির খপরে আপনার কাজ কী! যে জেতেই কাজ করি না কেন (ঘসর ঘসর আওয়াজ), তোমার মশলা তো কাপড় ছেড়ে শুদ্দু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েই করচি ! অন্য বাড়ির জেতের কতা তুললে তাঁরা কি ভালো মনে নেবে ?' অন্নর দাবড়ানিটা অতর্কিতে এসেছে।

মনো (মিইয়ে গিয়ে) —'না তাই বলছিলুম।'

আমার মা কতকগুলো ব্যাপারে খুব সাবধান ছিলেন। এই সংলাপের কনটেন্ট সম্পর্কে তিনি বিশেষ কিছু আপত্তির কারণ খুঁজে পাননি। কিন্তু ফর্ম ? শিলের ওপর উপুড় হয়ে কথার স্রোত ? এ তিনি কখনই বরদাস্ত করতে পারবেন না। কিন্তু যা করবেন প্রপার চ্যানেলে করবেন। অতএব তিনি সোজা চলে গেলেন শাশুড়ির কাছে।

—'মা !'

—'কী বউমা ?'

—'অন্ন বাটনা বাটতে বাটতে ভীষণ কথা বলছে। একটু বারণ করুন না মা !'

—'মনো আছে ?'

—'হ্যাঁ-অ্যা ! দিদিমণির সঙ্গেই তো কথা বলছে।'

—'জানিনি বাপু ! এদিকে এত বিচার, তত বিচার, আর ওদিকে··· তা বউমা বলো না, তুমিই বলো না মা।'

—'সেটা কি ঠিক হবে ?'

—'হওয়ালেই হবে ! আমরা কি তাই বলে বাড়িসুদ্ধু অন্নর মুখামৃত খাব ?'

—'আপনি বললেই ঠিক হত না ?'

—'আমার মেয়েকে আমি যতটা চিনি বউমা, তুমি তো তত চেনো না ? আমি বললে, এর পর ও অন্নকে লেকচার দিতে শিখিয়ে দেবে। এখন তবু কথাবাত্রার ওপর দিয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া আমি কোনও দিন গিন্নি নই। যা বলার তুমি বলো মা, কিচ্ছু অন্যায্য হবে না।'

মা অগত্যা যেন হঠাৎই রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন। ঢুকেই ভীষণ অবাক হয়ে গেলেন।

—'ও কি অন্ন ? বাটনা বাটতে বাটতে তুমি কথা বলছো ? ছি ! ছি ! দেখেছেন দিদিমণি !'

পিসিমা—'কী অনাছিস্টি কাণ্ড। আশ্চয্যি ! অত যদি কথার শক তো মুখে কাপড় বেঁদে নিবি এবার থেকে। ছি··· ছি ছিছি···ছিঃ। আজ যা কল্লে কল্লে বলে দিলুম অন্ন।'

অন্ন (নুয়ে পড়ে)—'বাটা মশলাগুলো কি ফেলে দোব বউদি ?'

মা—'নাঃ, তার দরকার নেই। তবে এরপর থেকে সাবধান হবে। রান্নাবান্নার কাজ করার সময়ে কথা বলতে নেই, এটুকু জানো না ?'

পিসিমা—'মশলা করতে করতে কথা কইলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়, বুজলে ?'

ঠাকুর্দাদার দেখাশোনাও বেশির ভাগ পিসিমাই করতেন। তামাক সাজাটা ঠাকুমার হাতে ছিল, কিন্তু ঠাকুর্দাদার যে সে-সাজা পছন্দ হত না, এটাও বেশ প্রচারিত ছিল। পিসিমা রান্নাঘরে মুখ জুবড়ে আছেন অতএব এটুকু ঠাকুমাকে করতেই হত। ঠাকুমা ঘরদোর গুছিয়ে রাখতেন, বিছানাপত্র ফিটফাট, কিন্তু তার পর ? পুজো-আচ্চাও করতেন একেবারে দেশাচার হিসেবে, যেমন মানুষ দাঁত মাজে, মুখ ধোয় তেমন। ঠাকুমা অনবরত বই পড়তেন। দুটো লাইব্রেরি থেকে বই আসত। দাদা-দিদিদের দিয়ে আনাতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়িতেও প্রচুর বই ছিল ঠাকুমার কেনা। এবং এই সমস্তই উপন্যাস। সন্ধেবেলা রুগি দেখে ফেরবার পথে ঠাকুর্দাদা হয়তো রুগির বাড়ি থেকেই হাতিয়ে আনা কোনও বই নিয়ে ঘরে ঢুকলেন—'এই নাও ছোটগিন্নি, তোমার নবেল।'

ঠাকুমা লজ্জাশীলা ষোড়শীর মতো লালচে হয়ে বইটি গ্রহণ করবেন, হয়তো পাতা উল্টে দেখে বলবেন—'ও মা, এ যে "যোগাযোগ" গো। এ তো আমার পড়া! বাড়িতেই রয়েছে।'

—'ও হো, মলাটটা তো পাল্টে গেছে কি না, বইটা বাঁধিয়েছে। তাই বুঝতে পারিনি।' ঠাকুমা ছিলেন যাকে বলে ভোরেশাস রিডার। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র সব মুখস্থ ছিল। গড়গড় করে উদ্ধৃতি দিয়ে পরে কতবার আমাকে অবাক করে দিয়েছেন। চোখে চশমা লাগিয়ে রোদে পিঠ দিয়ে ঠাকুমা বসে আছেন শীতের দিনে, হাতে বই। ঠাকুমা আপনমনে হাসছেন, কখনও আঁচলের খুঁট দিয়ে একটু চোখ-নাক মুছে নিলেন অর্থাৎ একটু কেঁদে ফেলেছেন—এই দৃশ্য ঠাকুমার উল্লেখ হলেই আমার মনে পড়ে। মাথায় পাকা চুল অতিরিক্ত লম্বা বলে একটু ঝোঁকা, ময়লা রং, অন্যমনস্ক হাসি-ভরা-মুখ মনোমোহিনী দেবীকে কোন ক্যাটিগরিতে ফেলব আমার শিশু চোখ বুঝতে পারত না। প্রৌঢ়া! যুবতী! তরুণী! বাবার মা! পিসিমার মা! অথচ ওঁদের চেয়ে ছোট! ছোট না কি? কত রহস্যই না ছিল ছোটবেলার জীবনে। উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল বলে ঠাকুমা একটু বেশিদিন স্কুলে পড়তে পেরেছিলেন। ম্যাট্রিকুলেশন তিনি পাস করেন বেথুন স্কুল থেকে। বিবাহের সময়ে নাকি এ কথাটি চেপে যাওয়া হয়েছিল। একে মেয়ে ঢ্যাঙা, তায় কালো, তায় কুড়িতে বুড়ির দিকে পা-টি বাড়িয়েছে, এর ওপর ম্যাট্রিকুলেশনের কথা জানাজানি হয়ে গেলে তেজবরও যদি পিছিয়ে যায়? মনোমোহিনী দেবী আমার পরিণত চেতনায় একজন কুমু। কালো রজনীগন্ধা। সুগন্ধি, শুভ্র, রুচিশীল তাঁর হৃদয়, বিদ্রোহী কিন্তু কোনও কিছু অস্বীকার করার বিদ্রোহ সে নয়। পরিচিত সম্পর্ককে নতুন মাত্রা দিতে দিতে তিনি নিজের তৈরি জগতে বেঁচে থাকতেন। যেমন, কন্যা ছিল তাঁর সম্ভ্রম, সমীহ ও অশেষ করুণার পাত্রী, এক ধরনের শাশুড়ি। স্বামীর সঙ্গে এমন একটা ব্যবধান তাঁর ছিল, যা ঠাকুর্দাদা কিছুতেই পার হতে পারতেন না। প্রথম জীবনে বোধহয় বুঝতেই পারেননি যে, এরকম ব্যাবধান হয়, থাকতে পারে মানুষের সঙ্গে মানুষের। যার হাতে তামাক খাচ্ছি, যার সঙ্গে এক বিছানায় শুচ্ছি, যে আমার জামাকাপড়, কাজের জিনিস, বিছানাপত্র পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখছে, নিত্য মৃদু হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করছে, আমার ছেলেমেয়ে মানুষ করছে, তার সঙ্গে আবার দূরত্ব কিসের? ক্রমে ক্রমে যত বয়স বাড়ে ততই বোধহয় তিনি এই ব্যাপারটা আবছাভাবে বুঝতে পারেন। ফলে কালো রজনীগন্ধা ফর্সা মধুসূদনের কাছ থেকে মৃত্যুর আগে রোম্যান্টিক প্রেম আদায় করে নিতে পেরেছিলেন। বোধহয় সাহিত্যের যোগাযোগের থেকে একদিন প্রতিদিনের যোগাযোগে এইটুকুই যা তফাত।

আসল কথা, ঠাকুমা ছিলেন ভা-রি বুদ্ধিমতী। তিনি দেখলেন তথাকথিত রূপের অভাবে তাঁর সব সঞ্চয়ই অচল পয়সা হয়ে গেল। বয়স্ক স্বামী, দুই স্ত্রীতে অভিজ্ঞ, রীতিমতো কামুক। একটি ছোট বোনের মতো সাবালিকা কন্যা যে ইতিমধ্যেই জীবনের সায়াহ্নে পৌঁছে গেছে। একটি নাবালক পুত্র যার পুরোপুরি ভার তাঁকে দিয়েও দেওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবে না। এবং চারদিকে খালি ইস্ আর ছি ছি। তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী, তবু তার সঙ্গে পূর্ববর্তিনীদের তুলনা প্রতি-তুলনা উঠতে-বসতে। 'আহা, মাতুর পা দু'টি কেমন ছোট্ট ছোট্ট ছিল যেন লক্ষ্মীর পা (বলা বাহুল্য মাতু তাঁর জীবৎকালে এবংবিধ শংসা শুনে যাননি), আর এর দেখো, খড়ম-পেয়ে একেবারে।' কিংবা 'অ মনো, তোর মায়ের ছিল জগদ্ধাত্রীর রূপ, তোর কি আর মনে আছে ? তা মনে রাখবার উপায় এবার একেবারে ঘুচে গেল।' বুদ্ধিমতী মনোমোহিনী যখন দেখলেন সংসার এই মতো, তখন তিনি জীবনের থেকে যতটুকু পেয়েছিলেন তাঁর সেই মূলধন, পড়বার এবং পড়ে উপভোগ করবার ক্ষমতা, তাকেই তিনি কাজে লাগালেন। তিনি ঘুরে বেড়াতেন এক দ্বিতীয় পৃথিবীতে, তৃতীয় সংসারে, চতুর্থ লোকে যেখানে তিনি সুচরিতা হয়ে গোরার প্রেমে পড়ছেন, অথবা রাজলক্ষ্মী হয়ে শ্রীকান্তর, সাবিত্রী হয়ে যেখানে তিনি মুখে কাপড় গুঁজিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িতেছেন, সূর্যমুখী হইয়া একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, অথবা দেবী হইয়া একটু একটু কাঁদিতেছেন, চঞ্চলকুমারী হয়ে কোনও অতুলনীয় চরণের অতুলনীয় আঙুলের আঘাতে ঔরঙ্গজেবের ছবির নাক ভাঙছেন, আয়েষা হয়ে গর্বিত বচনে বলছেন 'বন্দি আমার প্রাণেশ্বর', ভ্রমর হয়ে যিনি ফিরিয়ে দিচ্ছেন গোবিন্দলালকে, বিজয়া হয়ে নরেনকে। যিনি আনন্দময়ী, ভুবনেশ্বরী, যোগমায়া আবার লাবণ্যও অর্থাৎ যাঁকে পাঠিকা হিসাবে পেয়ে উপন্যাস ধন্য হয়েছে, কেননা এই জন্যেই উপন্যাস লিখিত হয়েছিল, বিকল্প জীবনে দেওয়ার জন্য, এক জীবনে মানুষকে বহু বিকল্প জীবনের স্বাদ দেওয়ার জন্য এবং বহু-আরাধনা-করি-প্রাপ্ত তিল তিল সঞ্চয় দিয়ে তিলোত্তম হবার জন্য।

মনোমোহিনীর চোখ দু'টি সব সময়ে অন্যমনস্ক, ভাবালু মুখের হাসিটি আনমনা। ইন্দ্রর বি এসসি-র রেজাল্ট বেরিয়েছে। ঠাকুমাকে প্রণাম করতে এসেছে।

—'ও ঠাকুমা, পা দুটো কই আপনার ?'—চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি যেন।

—'ঠাকুমা ! ও ঠাকুমা !'

—'মা ! ইন্দ্র আপনাকে প্রণাম করতে এসেছে।'

—'কে ? অ্যাঁ ? অ—ইন্দ্র ? কী ব্যাপার ভাই ?'

ঠাকুমা চিনতেই পারছেন না বড় নাতিকে। ভালো করে দেখতেও পাচ্ছেন না। চোখ দুটো জলের কুয়াশায় আচ্ছন্ন। সর্বজয়া দুগ্‌গাকে বড্ড মেরেছে। মেরে বাড়ির বার করে দিয়েছে। মেয়েকে মার দেওয়ার দুঃখ, মায়ের হাতে চোরের মার খাবার দুঃখ আবার ছোট্ট ছেলের চোখে দিদির মায়ের হাতে মার খাওয়া দেখবার দুঃখ, সবরকমই বাষ্প হয়ে জমে আছে মনোমোহিনীর চোখে, বুকে। তিনি সহসা সেই কুয়াশা থেকে বেরিয়ে আসতে পারছেন না।

আবার হয়তো আশেপাশেই কোথাও কান্নার রোল উঠেছে। কোনও প্রতিবেশীর বাড়ি কোনও মৃত্যু ঘটেছে, হয়তো ঠাকুমা বা ঠাকুর্দারই বয়সী কোনও মানুষের। ঠাকুমা আপনমনে হেসে খুন হয়ে যাচ্ছেন। ত্রৈলোক্যনাথ পড়ছেন। কীভাবে ভূতের তেল বার করা হল, তারপর তেলহীন ছিবড়ে ভূতের কী চেহারা হল তার বিশদ বিবরণ ঠাকুমা বারেবারে পড়ছেন। ডমরুধর কী করিয়া হঠাৎ কিছু টাকা পাইয়া গেল বা কীভাবে মৃত কুমিরের পেটে সাঁওতাল মাগী তখনও বসিয়া বেগুন বেচিতেছে পড়তে পড়তে ঠাকুমা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেসে জেরবার।

কন্যা মনো এসে দাঁড়িয়েছে—'কী যে হাসো রাতদিন বুঝতে পারি না বাপু, লোকের বাড়ি সব্বোনাশ এ দিকে ইনি হাসচেন। বলি অ সেজমা।'

—'অ্যাঁ ? কী ? কে ? মনো ? কী বলছিস ?'

—'বলব আবার কী ! গঙ্গামাসিমা তো গঙ্গা পেল, শুনতে পাচ্চো না, অবিনাশবাবু তাঁর বোন সব হাহাকার কচ্চে যে !'

—'কে ? কী বলছিস রে ? গঙ্গা পেল, মানে ?'

ডমরুধরের ধনপ্রাপ্তির অকুস্থল থেকে অবিনাশবাবুর বাড়ি ফিরতে মনোমোহিনীর বেশ দেরি হয়।

মনোরমা ঝংকার দেন—'যাও না, হাসিটা রেখে একটু যাও। এ সময়ে মানুষকে মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হয়, যতই বলো কেন, তো অমন দিন তোমার আমার ঘরেও একদিন না একদিন আসবে, তখন পাঁচজনকে দরকার হবে।'

—তাই তো, তাই তো ! মনোমোহিনী ধড়মড়িয়ে উঠে পড়েন। গঙ্গাদেবী তো তাঁর সখীস্থানীয়াই ছিলেন, যদিও সখিত্ব তেমন গড়ে ওঠেনি। মনোমোহিনীর সঙ্গে কে-ই বা সখিত্ব করবে। তৃতীয় পক্ষের বউ, সতীন কন্যার হাতে সংসার, তবু যার মুখে-চোখে নালিশ নেই, গলার স্বর শোনা যায় না, নিজস্ব সন্তান নেই, সন্তান কামনাও নেই, কোনও খেদও যার নেই, সে মানুষের চারদিক ঘিরে একটা বলয় গজিয়েই যায়।

মা মনো এবং মেয়ে মনোর জীবন বইছিল এইরকম সমান্তরাল ধারায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অষ্টম অধ্যায়

হরিবংশ-৩ এবং হরধনুর্ভঙ্গ

রেমব্রান্টের 'নাইট-ওয়চ' ছবিটা দেখছি। আবছা আবছা সব মুখ, ভালো করে চেনা যায় না। আলোর ফোকাস যার মুখে পড়েছে, সে মুহূর্তে সে যা, তার মুখ যা, হতভম্ব, সতর্ক, মনোযোগী, অমনোযোগী সেটাই তার সম্পর্কে নিত্য বর্তমান হয়ে যাচ্ছে। নিত্য সত্য। পমপমদিদি আসছে, পায়ের তলায় পদ্ম ফুটে উঠছে। চারদিকে অগুরু ধূপের গন্ধ। পমপমদিদির চুলে কালী, চোখে দুর্গা, ঠোঁটে নিবেদিতা, অঙ্গে মা শ্রীশ্রীসারদাময়ী। পমপমদিদির ধবধবে শাড়ি, দুই, সওয়া দুই ইঞ্চি কমলালেবু বা সবুজ পাড়ের মিলের শাড়ি। পমপমদিদির লম্বা চুলে গিঁট। চাউনি থেকে ছুটে যাচ্ছে তীরের মতো হোমের আগুন, যেখানে পড়ছে যার ওপর পড়ছে সব পাপ-তাপ, নোংরা-ঝোংরা, ময়লা-টয়লা পুড়ে সেখানটায় শুধু সোনা পড়ে থাকছে। সোনা। পমপমদিদি মার চেয়েও বড়। মেয়ে কী করে মায়ের চেয়েও বড় হয় আমাকে জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। আমি বলতে পারব না। তবে কথাটা সত্যি। মা পমপমদিদিকে শ্রদ্ধা করেন, সমীহ করেন। বাবাও। আমি ? আমি সমীহ করি কী ? উঁহুহ্। কিন্তু সমীহ-সমীহ ভাব দেখাই। আমি জানি পমপমদিদি শাপগ্রস্ত দেবী, হয়তো সরস্বতী কিংবা দুর্গা। পৃথিবীর অসুরদের খুব খারাপ সময় আসছে। পমপমদিদি যেদিন রেগে যাবে, সত্যি সত্যি একটা কুটো তুলে নিয়ে শোঁ-ও-ও করে ছুড়ে দেবে তোমাদের দিকে অমনই তোমরা সব অসুর-বধ হয়ে যাবে। প্রথমেই বধ হবে না অবশ্য। কাঁপবে, চেঁচাবে। রক্ত পড়বে ঝুঁঝিয়ে! আচ্ছা অত কি নিষ্ঠুর পমপমদিদি ? অসুর হলেও মানুষই তো ? তার বুকে বর্শা বিঁধিয়ে দেবে ? সিঙ্গি দিয়ে খাওয়াবে তাদের ? কী আর করবে ? অসুর যদি অসুরই হয়, যদি পাপ করে তখন তো দেবতারা সব ব্রহ্মাকে ধরবেনই, ব্রহ্মাকেও তপস্যায় বসতেই হবে, বসলেই দেবীকে তৈরি হয়ে যেতে হবে। একেবারে শাড়ি-টাড়ি গয়না-টয়না পরা ফুল ফ্লেজেড দেবী, তখন তাঁর হাতে প্রহরণ দিয়ে দেবতাদের সাজিয়ে দিতেও হবে। দেবীই বা তখন কী করবেন, অসুর-বধ ছাড়া ? এ সমস্তই সুতো দিয়ে পরপর বাঁধা, ঘটে যাবে। পমপমদিদির কিচ্ছু করবার নেই। পমপমদিদির এই সমস্ত মহিমা জেনেও আমি তাকে ভয় করি না। জ্বালাতন করি, সময়ে সময়ে আঁচড়ে কমড়েও দিই। কেন সে আমাকে মায়ের কাছে যেতে দেবে না, পুনপুনের কাছে যেতে দেবে না ? পুনপুনের কেন অসুখ করবে ? মা কেন পুনপুনের কাছ থেকে নড়বেন না, আমাকে কোলে নেবেন না। অসুখ না আরও কিছু। বাজে, বাজে কথা। এই 'মিথ্যে কথা' বলিসনি তো বুবু ? 'মিথ্যে কথা' বলতে নেই, খারাপ কথা। না, 'মিথ্যে' বলিনি, 'বাজে' বলেছি। 'বাজে' আমি পালককে বলতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুনেছি, বাজে মানে বাজে মানে মিথ্যে। যা বলছিলুম। এ সবই পমপমদিদির ষড়যন্ত্র, যাতে আমি মায়ের কাছে, পুনপুনের কাছে না যেতে পারি। আমি তো বলেছিলুম পিসিমার খেঁটের কাপড়টা পরে, কিংবা সিল্কের ফ্রকটা পরে ও ঘরে যাব, আবার সিল্কের ফ্রক খুলে রেখে বাইরে চলে আসব, একটিবার যাই! তা পমপমদিদি আমাকে গল্প বলার লোভ দেখাল। ডাল দিয়ে সরু সরু আলুভাজা দিয়ে ভাত খাব, মাছভাজা খাব, আর গল্প শুনব। একটা, দুটো, তিনটে গল্প। প্রথম গল্পটা ওই অসুরদের সম্পর্কে। শুম্ভ নিশুম্ভ অসুর কেমন বধ হয়ে গেল। মহিষাসুর কেমন বধ হয়ে গেল দেবীর হাতে সেই গল্প। বিষ্ণু দিলেন চক্র, চক্রের ছবি আমি দেখেছি একটা বইয়ের মধ্যে। রথের মধ্যে ভীষ্ম বলে একটা বুড়োমতন লোক হাতজোড় করে বসে আছে আর নীল রঙের কৃষ্ণ চোখ পাকিয়ে রে রে করে ছুটে যাচ্ছেন। কৃষ্ণের আঙুলের মাথায় চক্র, বাঁই-বাঁই করে একবার ঘুরিয়ে ছেড়ে দিলেই চক্র ঘুরতে ঘুরতে চলে যাবে, ভীষ্মর মাথা কেটে দিয়ে আবার কৃষ্ণের আঙুলে ফিরে আসবে। আমি আমার খেলার জাঁতা দিয়ে চক্র ঘোরাই তো! একদিন ঘুরিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলুম, পুনপুনের মাথায় লেগে টেঁপারির মতো ফুলে গেল। হ্যাঁ তারপর? পবন দিলেন গদা। গদা আমার নেই। হামানদিস্তের ডাঁটিটা দিয়ে গদা করা যায় কিংবা শিলনোড়ার নোড়া দিয়ে। কিন্তু গদার দুটো অংশ, একটা হ্যান্ডেল আর একটা গোদা মতন ঝুঁটি। সেই ঝুঁটিটা না থাকলে গদার গদাত্ব থাকে না। গদা বেশ গাবদাগোবদা জিনিস হলেও তার বেশ একটা আকার আছে। তা ছাড়া ভাঁড়ারঘর থেকে নোড়া সরানো বা হামানদিস্তের ডাঁটিতে হাত দেওয়া পিসিমার চোখ এড়িয়ে ও ভীষণ শক্ত ব্যাপার। বরুণ দিলেন পাশ। পাশ কী? পাশবালিশ? আই এ পাশ? বি-এ পাশ? হ্যাঁ বরুণ দিলেন পাশ।

দিলেন নয়, দিলো। কেন বলব তো? বরণ দেবতাই হোক আর যাই হোক, ও তো আমার ভাই, বুনবুন। বুনবুন দেবীকে পাশ দিয়েছে। বুনবুনের এত ক্ষমতা? হবে না কেন? ছদ্মবেশী দেবতা তো!

—'বরুণ পাশ দিয়েছিল? পমপম?'

—'দিয়েছিল বলতে নেই, দিয়েছিলেন।'

—'না। দিয়েছিল।'

—'দিয়েছিল নয়, দিয়েছিলেন।'

—'দিয়েছিল, দিয়েছিল, দিয়েছিল।'

পমপমের চোখের দৃষ্টি রাগত। কেন বুঝতে চাইছ না পমপম! বরুণ দেবতা হলেও আমার ভাই, আমার থেকে চার মিনিটের ছোট। কেন তাকে আমি 'আপনি' করে বলব? বলব না তো, যতই কেন দেবী হও! আমারও তো একটা ইজ্জত আছে।

পরের গরসটা মুখের মধ্যে ঠেলে ঢুকে এল। একটা অতিরিক্ত বড় গরস। তার ভেতরে ওই গদার মতোই পমপমের আঙুল। আমি কটাং করে কামড়ে দিয়েছি। উঃ! আমার মুখ থেকে ভাত ঝরে পড়ছে, চোখ থেকে জল, পমপমের আঙুল থেকে রক্ত। আমার দাঁতের দাগ বসে গেছে। গদা তো নয়। আঙুলটা কী ভীষণ নিরীহ, মাঝের আঙুলটার দৈর্ঘ্যের পাশে বেঁটে হয়ে যাওয়া একটা তর্জনী আঙুল, যে আঙুল দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পা-আ-প্' করে।

—'ও মা ! কী শয়তান মেয়ে গো ! রক্ত বার করে দিয়েচে যে রে ! দে দু' ঘা দে।' পিসিমা ওদিক থেকে চিকরে উঠেছেন, 'দু ঘা দে না।'

আমি মাথাটা সরিয়ে বুকটা কুঁকড়ে, ধড়ের দু' পাশে হাত দুটো সেঁটে পাশের দিকে হেলে যাই। দু' ঘা নামবে এবার, আমার শরীর এখন ডিফেন্সের প্রস্তুতি নিচ্ছে। নিচ্ছে কেন, নিয়ে ফেলেছে। এ সব কি কেউ ভেবেচিন্তে করে নাকি ?

কিন্তু দু' ঘা নামে না।

—'পিসিমা, শয়তান-টয়তান বলবেন না।'

—'হ্যাঁ, বলবে না। শয়তানকে শয়তান বলব না তো কী বলব, ধো, হাতটা ধো।' আমি উঠে পালাতে চাই। আর খাব না। ভাতও না মারও না।

পমপমের বাঁ-হাত আমাকে চেপে ধরেছে। ডান হাত আহত, কিন্তু বাঁ হাত তৎপর।

—'বোস।'

—'ন্-না-আ-আ, খাবো না।'

—'কিলু-বিলুর গল্পটা বলব।'

কী অবিশ্বাস্য ! অবিশ্বাস্য সৌভাগ্য ! পমপম আমাকে মাফ করে দিয়েছে। শুধু তাই নয় ! কিলু-বিলুর গল্পটাও বলবে ! কী অসাধারণ নিপুণতার সঙ্গে পমপম তর্জনীটা বাদ দিয়ে অন্য চার আঙুল দিয়ে গরস তুলছে।

'এক যে ছিল ছেলে, তার নাম অনিল। অনিল খুব ভাল ছেলে।' (সুবোধ বালক।) 'মা, বাবা যা বলেন স-ব কথা শোনে' (ওর পমপম আছে ? পমপমের কথা শোনে ?) 'অনিল খাওয়ার সময়ে লক্ষ্মী হয়ে খেয়ে নেয়', (আমার মতন না) 'খেলার সময়ে খেলে, পড়ার সময়ে পড়ে' (আমি পড়ার সময়ে খেলি, খেলার সময়ে পড়ি—আমার হাঁসিখুশি আছে, বর্ণপরিচয় একম (১ম ভাগ আছে) 'পরিষ্কার জামাকাপড় পরে। মুখ সবসময়ে সময়ে ধোয়া, চুল আঁচড়ানো' (কে ওর মুখ ধুইয়ে দেয় ? চুল আঁচড়িয়ে দেয় ? কোনও পমপমের কথা তো শুনিনি, অনিলের পমপম ব্যাকগ্রাউন্ডে কোথাও না কোথাও আছেই আছে। কোনও নিগূঢ় কারণে আমার পমপম অনিলের পমপমের কথা বলছে না, সে কারণটা কী হতে পারে ? এই গল্পের মর‍্যালটা শব্দভেদী বাণের মতো ওই দিক থেকেই আসবে বোধহয়, আমি চিবিয়ে যাচ্ছি, শিঙ্গি মাছের ঝোল, সপসপিয়ে তোল)। 'অনিল রোজ যখন স্কুলে যায়, বই খাতা পেনসিল স্লেট নিয়ে' (টিফিন নেয় না ? টিফিনের কথা বলছে না কেন পমপম ? কী জন্যে তা হলে স্কুলে যায় অনিলটা ?) 'তখন রাস্তায় খেলা করে কিলু আর বিলু' (পচা আর কুচানের মতো ? ওরা রাস্তায় খেলা করে, ওদের জামায়, প্যান্টে ময়লা থাকে, কুচানের ফ্রকে বোতাম থাকে না, কাঁধ থেকে ঝুলে পড়ে, আমার খুব ভাল লাগে, আমিও ওদের সঙ্গে এক্কা-দোক্কা খেলব, ওই রকম কাঁধ থেকে ঝুলে পড়া, বোতামবিহীন ফ্রক কী ভীষণ ফ্যাশনেব্‌ল আমিও ওই রকম পরব-ও)। 'কিলু-বিলু অনিলকে বলে—কোথায় যাচ্ছিস ? যাসনি। আমরা কী সুন্দর খেলছি দেখ। আমাদের সঙ্গে খেল' (পচা-কুচান কক্ষনও আমায় খেলতে ডাকে না, নিজেরা খেলে, আমি আমাদের রকে দাঁড়িয়ে থাকি, ওরা আড়ে আড়ে আমার দিকে চায়, আমার পাশে টেকন দাঁড়িয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকে, গার্ড, তার দিকে চায়, কিলু-বিলু-উ, পচা-কুচান আমি তোদের সঙ্গে খেলব-ও-ও-ও।)

—'খাচ্ছ না কেন ? বুবু ? খাও, না হলে গল্প আর বলব না।'

—'খাচ্ছি তো ! কাঁটা, মুখে কাঁটা লাগছে।'

—'কই দেখি ! কোথায় কাঁটা, কোথাও কাঁটা-টাঁটা নেই। জলদি করো, জলদি জলদি খাও।'

জলদি। কীরকম জলদগম্ভীর শব্দটা। আবার ই-কার যোগ হওয়াতে তার জলদত্ব অনেকটা কমে গেছে। এই কথাটা পমপম বলে। এটার মানে কী ? এটা বললেই খুব তাড়াতাড়ি করতে হয় সব। আমি তাড়াতাড়ি চিবোই। পমপমেরা ভাগলপুরে ছিল তো, মোগলসরাইয়ে ছিল, ওই সব জায়গা বিহার, ওরা হিন্দি বলে, ওইখান থেকেই কি পমপম শব্দটাকে মুখের মধ্যে নিয়ে এসেছে ? শব্দটা নিয়ে কুলকুচি করে পমপম। জলদি জলদি। জলদি জলদি করো। জলদি জলদি যাও। জলদি জলদি ঘুমোও। জলদি জলদি হিসি করে নাও। আচ্ছা, জলদি জলদি হিসি কী করে করা যায় ? হিসি তো আমার হাতে নয়। আর ঘুম ? ঘুমই বা কী করে জলদির আওতার মধ্যে পড়ে ? ঘুম কি বুবুর হাতে ? ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছে, কখন তাদের বুবুর কাছে আসার সময় হবে, ঝুপ করে তারা আকাশ থেকে নামবে ? তবে তো ! বুবুর কাজ শুধু পিঁড়ি পেতে রাখা।

'ঘুমিয়ে পড়ছো বুবু ! ঘুমিও না, খেয়ে নাও। এতক্ষণে এইটুকুনি খাওয়া হল ? শোনো শোনো, এবার রাত্তির হলে অনিলের জানলা দিয়ে ঐরাবত আসবে। সাদা ধবধবে ঐরাবত হাতি। অনিলকে শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে পিঠে তুলে নেবে, সেখানে মখমলের হাওদা আছে' মখমল কী ? ভীষণ নরম, চকচকে, তুলতুলে, মায়ের কালো মখমলের জামা আছে, মা বিয়েবাড়ি পরে যান, আমাকে মখমলের জামা দেওয়া হবে যদি আমি অনিলের মতো লক্ষ্মী হই। পারব কী ? অমন হতে ? খুব শক্ত কাজটা, হতে আমি চাই কি না আদৌ, সন্দেহ আছে। কিলু-বিলুর খেলা, পচার ময়লা হাত, কুচানের বোতাম ছাড়া ঝুলে পড়া ফ্রক আমাকে টানে, ভী-ষণ টানে যে ! এ জন্মে আর অনিল হওয়া হল না। ঐরাবতের পিঠে চড়ে স্বর্গে যাওয়া হল না, কিলু-বিলুর সঙ্গে নরকেই থাকতে হবে আমায়। নরক মানে কী ? নরক একটা ঘর, তার একটাই চার পাল্লার জানলা আছে। গরাদে মুখে চেপে কিলু-বিলু দাঁড়িয়ে আছে। গরাদের লম্বা ময়লা ছাপ কিলু-বিলুর মুখে। চোখের জলে বসে গেছে। নরকের ঘরটাতে রাশি রাশি লাল পিঁপড়ে, আরশোলা, ওরে বাবা, মাকড়সা, ই মা, টিকটিকি। বাবা রে, বিছে মা গো ! থাকে। আমি আরশোলা দেখলে আর নড়তে পারি না। আরশোলার শুঁড়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখের তারা নড়ে। এরই মধ্যে আবার মাঝে মাঝে যমদূত এসে ডাণ্ডস মারে। ডাণ্ডস কী ? ভয়ঙ্কর কিছু হবে একটা। বিষ্ণুর চক্র, পবনের গদা, শিবের ত্রিশূল, বরুণের পাশ এ সবের থেকেও অনন্তগুণ কোনও ভয়ঙ্কর ! ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি ডুকরে কেঁদে উঠি। নরক, ডাণ্ডস, মাকড়সা, টিকটিকি, বিছে, কিলু-বিলুর মুখে গরাদের ময়লা দাগ ! কে যেন আমাকে নরম করে জড়িয়ে ধরে। আমার রগের কাছে নরম নরম হাতের থুপথুপ চাপড়। মা, মা, তুমি কি এলে ? পুনপুনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসুখ কি ভালো হয়ে গেছে ? মা ? ম্যা-অ্যাঁ-অ্যাঁ বুবু কাঁদতে থাকে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, আমি জানি এটা মা নয়, এই থুপ থুপ পমপমদিদির হাতের। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাই। অগত্যা। অনিল আর এক পা-ও যাচ্ছে না। ঐরাবতের শুঁড় বেয়ে পিঠ থেকে নেমে যাচ্ছে। কিলু-বিলুকে না নিয়ে সে যাবে না স্বর্গে। এইখানেই পমপম দিদির গল্পের আসল মর‍্যাল। ক্ষমাশীল অনিল। করুণহৃদয় অনিল। যত ভালো, যত পরিচ্ছন্ন, যত গুড বয়ই সে হোক না কেন, আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর সে নয়, একা একা স্বর্গের মজা সে ভোগ করবে না। সুতরাং, স্বপ্নের মধ্যে কিলু-বিলু চান করে গোলাপ জলে, পরিষ্কার জামা-কাপড় পরে অবিকল অনিলের মতো, চুল পাট করে আঁচড়ায়। পায়ে শু জুতো, ফিতে বাঁধা টিপটপ। তারপর তিনজন—বুবু, পচা, কুচান স্বর্গের দিকে যেতে থাকে ঐরাবতের পিঠে। হেলে দুলে। হেলতে দুলতে, হেলতে দুলতে। যমদূত সেলাম করে, দেবদূত স্যালুট ঠোকে, স্বর্গের গেটে ফোয়ারা থেকে রামধনু রঙের জল পড়ে, সাদা ধবধবে রাজহাঁস সব জলের মধ্যে ভেসে বেড়ায়, দাঁড়ে বসে কাকাতুয়া ঝটপট ঝটপট ঝটপট করে, সাদা সাদা খরগোশ লম্বা লম্বা কান খাড়া করে মুঠোর মধ্যে থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে পালায়।

—'খগগোশ, খগগোশ—কোয় যাচ্ছ !'
—'যাচ্ছি যাচ্ছি, বাড়ি যাচ্ছি।'
—'বাড়ি কোথায় ?'
—'গোলোকে।'
—'গোলোক কোথায় ?'
—'ভূলোকে।'
—'ভূলোক কোথায় ?'
—'ভূগোলে।'
—'ভূগোল কী ?'
—'পঙ্কজবাবু।'
—'পঙ্কজবাবুর বেল মাথা
পঙ্কজবাবু যাবেন কোথা ?
যাবি কোথা যাবি কোথা
কলকাতা কলকাতা।'

AMARBOI.COM

ফোয়ারা কোথা থেকে এলো বলুন তো ? 'হাসিখুশি' থেকে। ফোয়ারা হতে জল পড়ে, সেই ফোয়ারা, আর খরগোশ ?—খরগোশ এসেছে ভেটরিনারি কলেজ থেকে। পালক নিয়ে এসেছে, আমাদের জন্যে। জালের আলমারির মধ্যে খরগোশরা থাকে, বাঁধাকপির পাতা আর গাজর খায়। কী সুন্দর দেখতে, কিন্তু কী বিচ্ছিরি কালো কালো নাদিতে নাদিক্কার করে ফেলেছে, জালের আলমারিটা। পালক বলেছে ওদের রোস্ট করে খেয়ে নেবে। ঋতি মানে পুটপুট বলেছে ওকে না মেরে কেউ তুলতুলি গুলগুলি (খরগোশদ্বয়)কে মারতে পারবে না। কী ভেবেছে পালক ? তুলতুলি-গুলগুলির রোস্ট কী জিনিস আমার দেখতে খুব ইচ্ছে করে। টোস্টের মতো ? পাঁউরুটি-টোস্ট। কালো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জালির মধ্যে তুলতুলিদের আটকে জালিতে ছিটকিনি দিয়ে উনুনের ওপর ধরবে আর রোস্ট-টোস্ট হয়ে যাবে ? এর পরেও অবশ্য তুলতুলি-গুলগুলি বেঁচে থাকতে পারবে না, লম্বা লম্বা কান খাড়া করে, পেছনের লম্বা পা ছড়িয়ে সামনের বেঁটে পা বাড়িয়ে লাফিয়ে আসতে পারবে না, কিন্তু কী-ই বা করা যেতে পারে ? রোস্টটা যে আমাকে দেখতে-ই হবে। রোস্ট আর তুলতুলি-গুলগুলির কুপকুপ করে বাদাম খাওয়ার মধ্যে যদি কেউ আমাকে বেছে নিতে বলে, আমি রোস্টটাই বেছে নেব, কেননা রোস্টটা আমি দেখিনি, কুপকুপ করে বাদাম খাওয়াটা আমি দেখেছি। তবে, রোস্টটা দেখলেও আমি খাবো না। ছিঃ। তুলতুলিদের খেতে হয় ? তা ছাড়া অত লোম, পেটের মধ্যে অত নাদি, সব সুদ্ধই তো রোস্ট হবে। ম্যাগে। পালক একা খাক গিয়ে।

আমি আবার ঘুমিয়ে পড়ছি, এক ঘুম থেকে আরেক ঘুমে ঢুলে পড়ছি, আমার হাত মায়ের বুক খুঁজছে, মায়ের বুকের উসুম-কুসুম ময়দার তালে হাত না রাখলে আমি শান্তি পাই না। মা, মা, তুমি কোথায় ? কে আমার হাত ঝটকা মেরে সরিয়ে দেয়। পমপম, পমপম। পমপমকে মা ভেবে আমি....ঘুমের মধ্যেই আমার কানে প্যাঁচ পড়েছে। কতকগুলো অপরাধ পমপম ক্ষমা করতে পারে যেমন আঙুল কামড়ে রক্ত বার করে দেওয়া। কতকগুলো অপরাধ পমপম ক্ষমা করতে পারে না, যেমন মা ভেবে...ঘুমের মধ্যে...হোক না ঘুম, হোক না অজান্তে অজ্ঞাতে, তবু পমপমের নিভৃতি, পমপমের পবিত্রতা লঙ্ঘন করা একটা পাপ, মহিষাসুরের পাপের চেয়েও বড় পাপ, তার জন্যে শাস্তি খেতেই হবে। ঘুমোই আর যাই করি।

এক কানে দোল-দোল মাকড়ি পরে আমি ঘুমোচ্ছি। মাকড়িটা কিসের বলুন তো ? পমপমের হাত, বা আঙুল। আমিও ঘুমের মধ্যে পমপমের...পমপমও ঘুমের মধ্যে আমার...। একবার কান ধরে কান আর ছাড়েনি পমপম। অপরাধ তো আবারও ঘটতে পারে, শাস্তিটা তাই মাকড়ি হয়ে আঁকড়েই রইল। আজও আমার বাঁ কানটা ডান কানের চেয়ে বেশি ঝোলা। বড়ও বোধহয়। একটু নেমেগেছে, অসমান হয়ে গেছে। মাপিনি কখনও। কিন্তু টের পাই। আমার চশমা উল্টে টেবিলে রাখলে একটা দিকের হাতল শূন্যে উঠে থাকে। চশমার সেই ফাঁকাটার দিকে তাকিয়ে দেখি, সেটা ফাঁকা নয় মোটেই, সেখানে পমপমের আঙুল, মাকড়ি হয়ে ঝুলছে।

আচ্ছা, ওই পঙ্কজবাবুটা কে বলুন তো ? ঠিক ধরেছেন ঠাকুর্দাদার এক রুগি। ঠাকুর্দাদার চেম্বারে যখন কেউ থাকে না, টেকন সব ঝাড়পোঁছ করে চলে গেছে; ঠাকুর্দাদা এ ঘরে আসার আগে একটু হুঁকো খেয়ে নিচ্ছেন, তখন আমি চেম্বারে ঢুকে পড়ি। টেবিলের তলায় বসে থাকি। গুট করে। কেউ টের পায় না। একটু পরে ঠাকুর্দাদার পা দুটো আমার সামনে এসে বসে, ঠাকুর্দার গলাও আসে, অন্য সব রুগিদের গলাও আসে, কিন্তু সেসব আমি শুনি না ভালো করে। আমি পায়ের জগৎ দেখি। ঠাকুর্দার পা ভীষণ ফর্সা, মুখ-গা অত ফর্সা নয়, কিন্তু পা ভীষণ ফর্সা। সিল্কের মতো চামড়া দিয়ে ঢাকা, নস্যিরঙের শুঁড়তলা চটি পরা থাকে।

—হ্যাঁ বলুন, কত টেম্পারেচার ? দেখেছেন ? ওই তো আপনাদের দোষ, দেখি, হাতটা দেখি, ডাক্তারবাবুর নাড়ি টিপলেই জ্বর, জ্বরের রীত-নীত, জ্বরের নিদান স-বই বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবেন, বাঃ। সর্দি তো বেশ দেখছি।

—আজ্ঞে, হয়েছিল বটে, তা এখন তো আর তেমন...

—বসে গেছে। বসে গেছে।—ঠাকুর্দার গলা কী জোর। বাব্‌বাঃ।

এই টেবিলের তলাতেই পঙ্কজবাবুর মোটা ধ্যাবড়া পা দেখি। পঙ্কজবাবুর গিন্নি ভোগেন, গিন্নির বোন ভোগেন, শাউড়ি ভোগেন, ছেলে-মেয়ে সবাই ভোগেন। পঙ্কজবাবু তাদের জন্যে ওষুধ নিয়ে যান।

পঙ্কজবাবুর মুখ আমি দেখিনি। এখনও দেখিনি। কিন্তু একদিন ঠি-কই দেখব। গলা শুনে বেল মাথাটা ধরে নিয়েছি। বেল-মাথা একজন লোককে আমি ডাক্তারখানা থেকে বেরোতেও দেখি, দোতলার জানলা থেকে। সেটাই নিশ্চয় ওই ধ্যাবড়া পায়ের পঙ্কজবাবু।

পঙ্কজবাবুর বেল মাথা
পঙ্কজ যাবেন কলকাতা
রেল কম ঝমাঝম্
পঙ্কজবাবু আলুর দম্!

—'কী বিড়বিড় করছিস ? বুবু! ওঠো, ওঠো বলছি, ভোর হয়ে গেছে।'

ভোর হল, দোর খোল। খুকুমণি জাগো রে। যাঃ, এরই মধ্যে ভোর হয়ে গেল ? পমপমের কাছে শুলে সক্কাল-সক্কাল উঠে পড়তে হয়, জলদি জলদি মাজন দিয়ে দাঁত মেজে নিতে হয়। তারপর হারুর দোকান থেকে চ্যাঙারি করে জিলিপি নিয়ে আসে ই-দাদা কি সু-দাদা। মামার বাড়ি থেকে খাঁটি দুধ এসে পৌঁছয়, জ্বাল দেন পিসিমা, জল মিশিয়ে নরম করে। ঢালা-উপুড় করে করে, সেই দুধ আর জিলিপি দিয়ে আমায় উপবাস ভঙ্গ করতে হবে।

ইতিমধ্যেই পমপমদিদি টুকুর ঘরে জলচৌকির ওপর মোটা মোটা বই খুলে বসে গেছে। পমপমদিদি, টমটমদিদি, বুজবুজদিদি, পুটপুটদিদি, আমাকে ওইখানে যেতে হবে। হাঁসিখুশি, আর বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ, আর কাশীর খাঁল্লা নিয়ে ওইখানে বসব। পুঁতুল নিয়ে আসব। যেখানে মোটা মোটা বই থাকে সেই আলমারির তলায় একটা ফাঁকা জায়গা আছে, সেইখানে পর্দা ঢাকা আমার পুঁতুলের ঘর। আসলে পুটপুটদিদির, কিন্তু পুটপুট এখন খেলে না।

তার সম্পত্তি সে সব আমাকে দিয়ে দিচ্ছে আস্তে আস্তে। তার স্লেট, তারও নয়, এ হয়তো ই-দাদা পমপমদিদিদেরই স্লেট গড়াতে গড়াতে আসছে নীচের দিকে। যার পালা সে লুফে নিচ্ছে, কাজ হয়ে গেলে আবার গড়িয়ে দিচ্ছে নীচে। স্লেটে আমি আঁকিবুঁকি কাটি। একটা তোবড়ানো গোল। একটা ঠ্যাং। কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং।

—'ঋতি ওকে পাখি আঁকতে শিখিয়ে দে না।'

ঋতি আঁকে আর বলে।

'দ-এর বড় জ্বর।
বসতে দিল পিঁড়ি,
বাইশটা দিল বড়ি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেরে দিল, খোঁচাটি,
হয়ে গেল পেঁচাটি।'

যাঃ, বুবু স্লেট ভেঙে ফেলেছে।

—'ভাঙলি ?'

—'ভাঙলে ?'

কী আশ্চর্য। ষোলো সতেরো বছর ধরে যে স্লেট গড়াতে গড়াতে গড়াতে গড়াতে ঠিক এসে যাচ্ছে রিলে রেসের ব্যাটনের মতো, সেই স্লেট ভেঙে ফেলেছে। বাহাদুরি আছে বলতে হবে, প্যালিওলিথিক এজের ওই স্লেট, এখন কত শক্ত, কত মজবুত, কত জনের বিদ্যের ভার বহন করে করেপোক্ত, কিন্তু বুবু তাকে ভেঙে ফেলেছে।

ঠাকুমা চিলেকোঠার ঘর থেকে এক পা এক পা করে নামছেন।

—'কী হল রে ?'

—'বুবু স্লেট ভেঙে ফেলেছে।'

ই-দাদা নিচ থেকে চেঁচাচ্ছে—'কী হল রে ?'

—'বুবু স্লেট ভেঙে ফেলেছে।'

—'কী করছিল স্লেট নিয়ে ?'

—'আঁকতে গিয়েছিল, দ-এর বড় জ্বর...'

—'কোন স্টেজে এই যুগান্তকারী দুর্ঘটনাটি ঘটল ?' পালক উড়ে এসে বসে গেছে। হাঁটু মুড়ে, বাবু হয়ে, আমার আর ঋতির সামনে।

—'দ টা আমি এঁকে দিলুম'—ঋতি বলছে—'বাইশ আর বড়িও আমিই এঁকে দিলুম।'

—'পিঁড়ি পিঁড়ি ?'—পালক জিজ্ঞেস করছে, পালকের পেছনে উবু হয়ে বসেছে ই-দাদা। পেছন থেকে উঁকি মারছে অং-দাদা।

—'পিঁড়িটাও তো আমি-ই।'

—'তাহলে তুই-ই ভেঙেছিস, এখন বুবুর নামে দোষ দিচ্ছিস।'

—'না-আ-আ'—ঋতি সরু গলায় চিৎকার করে উঠেছে।

—'আমি ওকে দিলুম, ও নিল, তারপর'—ঋতি একটা মার্ডার কেসের সাক্ষীর মতন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ঘটনাক্রম বর্ণনা করতে থাকে।

—'ওকে দিয়েছি দেখতে, তারপরেই ভাঙার শব্দ...'

—'কী রে ? মুড়মুড় করে ভেঙে দিলি ? পাঁপর ভাজা ভেবেছিলি ?'

ভ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ, আমি তো 'মেরে দিল খোঁচাটি'র খোঁচাটা মারতে গিয়েছিলুম। এরা বোঝে না কেন ? আর, কতজন জড়ো হয়েছে দেখো! একে স্লেট ভেঙেছি, তায় পমপমদিদি দুর্গার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ঋতি নিজেকে ডিফেন্ড করতে সমস্ত দোষ আমার ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। এর পরে বোধহয় স্লেটটা আমাকে দেওয়ার কথাও অস্বীকার করবে।

ই-দাদা বলল—'সমস্ত শরীরের চাপ দিয়েছে স্লেটের ওপর, বুঝলি ? বড়ি দেখ, বাচ্চা হাতি, হাতের চেটোগুলো কী! হুলো বেরালের থাবা! কুলোর মতন কান, মুলোর মতন দাঁত, পিঁপড়ের মতো চোখ...'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পালক শ্লেটের দুটো টুকরো তুলে নিয়ে সে দুটো সামনে মেলে ধরে বলতে লাগল 'হে প্রাগৈতিহাসিক শ্লেট, কবে কত লক্ষ বৎসর পূর্বে তুমি সমুদ্রতলে কাদা জমিয়া জমিয়া তৈয়ারি হইয়াছিল। তাহার পর কত ডাইনোসর তোমার বক্ষ দিয়া পদভরে তোমাকে প্রকম্পিত করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তুমি ভাঙো নাই। তুষার যুগে পর্বতপ্রমাণ হিমবাহের তলায় তুমি চাপা পড়িয়াছিলে, তাহাতেও তোমাতে ফাটল পর্যন্ত ধরে নাই, তুমি অখণ্ডিত অনাঁচড় দেহে সিংহবাড়ির সিংহ-সিংহীদের কাছে আনীত হইয়াছিলে, তাহারাও তোমার বক্ষে কত লীলা করিয়াছে, তখনও তুমি দমো নাই। আজি এই ঘোর কলিতে হস্তিরূপিণী একটি ক্ষুদ্র সিংহী অথবা কল্কি অবতার তোমার লীলাখেলা সাঙ্গ করিয়া ছাড়িল।'

'আমাদের ক্ষমা করিও হে মহীয়ান, ওই ক্ষুদ্র হস্তী-সিংহীকে ক্ষমা করিও, উহার জ্যেষ্ঠা ওই যত নষ্টের গোড়া বাঁশের বাঁশিটিকেও তুমি ক্ষমা করিয়া দাও হে শীতল হৃদয়' বলতে বলতে হাতের চাপে শ্লেটের দুটো বড় টুকরোকে টুকরো টুকরো করে ফেলল পালক।

ঠাকুর্দাদা এসে বললেন—'শ্লেট ভেঙেছে এই তো কথা! রামও তো হরধনু ভেঙেই ফেলেছিলেন। তাঁকে তো কেউ অমন লজ্জা দেয়নি! তোমরা ওকে অমন করো না।'

তা সে যা-ই বলুন আর তাই বলুন।

আমার সারা ছোটবেলা জুড়ে সেই আনাড়ি শ্লেটের টুকরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। আজও জড়ো করবার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নবম অধ্যায়

হরিবংশ-৪—গোপীজনবল্লভ

'দেখুন দাদা, মায়ের কথা আমায় জিজ্ঞেস করবেন না। মায়ের কথা বলা যায় না।'

—'কেন ?'

—'এ যে সেই 'অব্যক্তাদীনি ভূতানি, ব্যক্তমধ্যানি'—এই মধ্যটুকু বললেই মায়ের আদি অন্ত শেষ হয় না। ইনি জগদীশচন্দ্রের 'অব্যক্ত', ইনি উপনিষদের 'অক্ষর' ইনি গীতার 'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে', ইনি ঋক্ বেদসংহিতার দশম মণ্ডলের নাসদীয় সূক্ত, ইনি ওয়র্ডসওয়ার্থের 'ফ্যানটম অফ ডিলাইট'। সবচেয়ে মজার কথা ইনি জানেন না ইনি কে, ইনি কী ? ইনি বিভূতিভূষণের 'মেঘমল্লার' গল্পের সেই আত্মবিস্মৃতা সরস্বতী। এঁকে কেউ স্বর্গ থেকে নামিয়ে নিয়ে এসেছে কোনও ইতর অঙ্গীকারের সূত্রে, অথবা মানবশিশুদের দুর্দশা দেখে কাতর হয়ে ইনি নিজেই মনুষ্যরূপ ধরে নেমে এসেছেন। নেমে এসে ভুলে গেছেন নিজের পুরনো পরিচয়।

ওই দেখো উনি রান্নাঘরে কাজ করছেন, উনুনের আলো পড়েছে ওঁর মুখে। ভয়সা ঘিয়ের মতো ওঁর গায়ের রঙ, ঘি বলেই যেন তাতে একটু একটু গলেছে। মাথার চুলগুলি যেন করুণেকোমলে, চোখ মুখ তেমন স্পষ্ট নয়, অর্থাৎ বিশাল বিশাল ডাগর চোখ নেই, তাতে লম্বা-লম্বা বাঁকানো পাপড়ি নেই, চিবুকে লাল ঢেউ খেলানো ঠোঁট নেই, কিন্তু কী অপূর্ব লাবণ্যে ইনি ঝলমল করছেন। ভুল বললাম—ছলছল করছেন। ঝলমলানো জৌলুস তো এঁর নেই! মুখের ডৌল গ্রিক দেবীদের মতো; হেরা কিংবা এথিনা। নাকটি মুখকে স্পষ্টতা দিয়েছে। সামান্য স্থূলাঙ্গিনী ইনি। ভারতীয়দের সৌন্দর্যের ধারণা অনুযায়ী ইনি সুন্দরী, একটু পৃথুলা না হলে নারীশোভা তো খোলে না ভারতীয় মতে! বাহু এঁর অঙ্গদে শোভিত হবার যোগ্য, আঙুল অঙ্গুরীতে, কণ্ঠ হারে, মাল্যে, প্রকোষ্ঠ কঙ্কণে। কিন্তু এ সকল কিছুই নেই তো আমার মায়ের বরাঙ্গে। বাঁ হাতে তিন-চার রকম লোহার বোঝা, ডান হাতে তিন-চার গাছি ক্ষয়া ক্ষয়া সোনার চুড়ি, বাহুতে মাদুলি, কণ্ঠ আভরণহীন, কানে সোনার তারের ছোট ছোট চাকা। মা সকালবেলায় চান করে সিঁথিতে একটু সিঁদুর ছোঁয়ান, কপালে কড়ে আঙুল সিঁদুরে ডুবিয়ে একটি টিপ পরেন, ব্যাস, ভোরের আলোয় মাঠঘাট বনবাগান শহরবন্দর সব হেসে ওঠে।

'কেন মা মঙ্গলচণ্ডী এতো হেলা ?
হাসতে খেলতে
কাজল কুমকুম পরতে
কেন মা গো তোমার এতো হেলা ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা কিচ্ছু কৈফিয়ত দেন না। বস্তুত কৈফিয়ত কেউ চায়নি। কৈফিয়ত চাওয়ার কথাই মনে হয়নি কখনও। আগাগোড়া ঘিয়ে রঙের ওই অপূর্ব দেবীমূর্তির কি অলঙ্কার লাগে না কি? মাকে আমরা ওইরকমই দেখতে অভ্যস্ত। শুধু তাই নয়, ভেবে দেখুন গ্রিক মূর্তিগুলো নাকি অমন সর্বশ্বেত ছিল না, ছিল রঙিন, বসনাবৃত। কালের প্রকোপে সব রঙ গলে গেছে। ভাগ্যিস গিয়েছিল? না হলে কি গ্রীবাভঙ্গের ওই মহিমা দেখতে পেতুম! ওই অপূর্ব দাঁড়ানোর ভঙ্গি? মরাল নয়, মা ছিলেন কম্বুগ্রীব, শঙ্খের আবর্তের মতো দাগ ছিল মুক্তাশুভ্র গলায়, 'মা!' ডাকলেই যখন ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতেন, সেই চিহ্নগুলির স্থির বিন্যাস ভেঙে আলোছায়ার ঢেউ উঠত। স্বর্ণসূত্রে বন্দি হলে সে মহিমা বোধহয় ক্ষুণ্ণ হত।

স্বায়ম্ভুব মনুর মেয়ে দেবহূতি কর্দম ঋষির প্রেমে পড়েন। রাজার মেয়ে ঋষির প্রেমে পড়লে যা হয় তাই হল। রাজা মনু এবং তাঁর রানি শতরূপা বহু উপহারসামগ্রী যৌতুক দিয়েছিলেন, কিন্তু ঋষির সেবা কি সেভাবে করা যায়? দেবহূতি চুল বাঁধলেন না, প্রসাধন করলেন না, ভালো করে খাওয়া-দাওয়া করলেন না, দিবারাত্র শুধু সেবা, সেবা আর সেবা। যে মুহূর্তে ঋষি তাঁর অলৌকিক মায়ায়, সোনার তোরণ, হিরের খিলান, মানিক্যের দেয়াল, প্রব্যালের মেঝে-অলা উড়ন্ত প্রাসাদ সৃষ্টি করবেন, বিলাসে আনন্দে দিন কাটবে, নয় মেয়ে এক ছেলে জন্মাবে অমনি কর্দম ঋষি তপস্যা করতে চলে যাবেন। তাই-ই বোধহয় দেবহূতি অলঙ্কার, বেশভূষার প্রতি উদাসীন, বিলাসপ্রসাদ চান না...

কিন্তু কত রকমের আজব গপ্পো শুনি যে! আমার বড় মাসিমা, মায়ের কেমন যেন জারতুতো বোন বলেন— 'কাকাবাবু কত গয়না দিয়েছিলেন। সোনার, জড়োয়ার। মুক্তোর কলার ছিল, হাতের মানতাশা ছিল, কোমরের বিছে ছিল, তোর বাবা-মা মোগলসরাইয়ে চলে গেল শ্বশুর-শাশুড়ি-ননদের কাছে রেখে, ব্যাস তোর মার গয়না কপ্পুরের মতো উবে গেল। সব ওই জটিলে-কুটিলে খেয়েচে।'

—'মা, সোনার বিছে কেমন হয় মা, দাড়া থাকে? একটা বিছে দিয়েই পুরো কোমরটা বেড় দেওয়া যায়?'

—'দুর বোকা, বিছে একরকম গয়না, চওড়া হারের মতো, কোমরে পরে।'

—'তোমার বিছে আছে মা?'

—'না।'

—'বড় মাসিমা যে বললেন ছিল!'

—'বড় মাসিমা জানেন না।'

—'বড় মাসিমা বলেছেন বিয়ের সময়ে তুমি পরেছিলে। জটিলে-কুটিলে খেয়ে নিয়েছে।'

—'ক্-কী?'

—'জটিলে-কুটিলে। জটিলে-কুটিলে কী মা?'

—'কিচ্ছু না। কথার কথা।'

—'মা, শ্বশুর-শাশুড়ি-ননদ কী মা?'

—'কেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'বলো না।'

—'স্বামীর মা-বাবাকে শাশুড়ি-শ্বশুর বলে, বোনকে ননদ বলে।'

—'তোমার শাশুড়ি আছেন ?'

—'বাঃ, আছেন বইকি। তোমাদের ঠাকুমাই তো আমার শাশুড়ি।'

—'তাহলে ঠাকুর্দা তোমার শ্বশুর ? পিসিমা তোমার ননদ ? তাহলে বাবা তোমার স্বামী ? হি, হি, হি।'

—'এই সব পাকা-পাকা কথা বলতে হবে না।'

—'ই মা। ননদ কী অসভ্য কথা ? ননদ বিচ্ছিরি, এই পুনপুন, কাউকে বলবি না কিন্তু পিসিমা মায়ের ননদ।'

ব্যাস, আমাদের ড্যাং ড্যাং করে বড় মাসিমার বাড়ি যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। খারাপ কথা শিখে এসেছি ওখান থেকে। ননদ-ভাজ শ্বশুর-শাশুড়ি। তাছাড়া বিছে-টিছে, মানতাশা- টানতাশা এই সব। এর জন্যে বড় মাসিমার বাড়ি যেতে হলে মার সঙ্গে রিকশাগাড়ি চেপে যেতে হয়। মা সারাক্ষণ চোখের আড়াল করেন না। দীনবন্ধুদা কি টেকনের সঙ্গে সারা রাস্তা এক্কা-দোক্কা খেলতে খেলতে মাসির বাড়ি যাওয়া বন্ধ। বন্ধ। বন্ধ।

দিদিভাই বলেন— 'দেশের কাজে দেবু সব দিয়ে দিয়েছে। তোদের বাবা তো দেশের কাজ করত কি না।'

—'দেশের কাজ কী দিদিভাই ?'

—'এই যে আমাদের দেশ, ভারতবর্ষ, এই সমস্ত গ্রাম, শহর, নদীনালা, গাছপালা, মানুষ, গরু...'

—'কুকুর বেড়ালও দিদিভাই ? পাখি ? পাখিও দেশ ? আরশুলা ? টিকটিকি ? মাকড়সা ? স-ব দেশ ?'

—'স-বই দেশ। তাদের স্বাধীনতার জন্যে চেষ্টা করতে হয়। কাজ করতে হয়।'

—'স্বাধীনতা চাই না। গয়না কই ? কেন মা দেশের কাজে স-ব দিয়ে দেবে। পরব, আমি, পুটপুট, বুজবুজ, টমটমদিদি, পমপমদিদি পরব। মা-ও পরবেন। মুক্তোর লহর, সোনার হার, কঙ্কণ, এই সব পরব-ও-ও।'

আমি কান্নার সুর ধরি।

—'দেশ স্বাধীন হয়ে গেলেই পরবে।'

অত বোকা নই আমি।

—'দেশের কাজে তো দিয়ে দিয়েছেন মা, আর কি দেশ সে-সব ফেরত দেবে না কি ? দেশ বাজে, দেশ বিচ্ছিরি, দেশ চোর।'

দিদিভাইয়ের মুখ গম্ভীর।

—'বলব, বাবাকে ? বলে দেব ? দেশ চোর। দেশের জন্যে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ দিচ্ছে, বয়কট করছে, পিকেটিং করছে। দেশ চোর ?'

বুনবুন বললে—'এই কথাটা বুঝছিস না কেন ? দেশ তো আর না বলে নেয়নি। চোর হবে কী করে ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুনপুন বললে— 'চেয়ে নিয়েছে।'

আমি বললুম—'তাহলে ভিখিরি। দেশ ভিখিরি। দুটো গয়না ভিক্ষে দেবে গো! বলে মায়ের কাছ থেকে সব গয়না নিয়ে গেছে।'

দিদিভাই হঠাৎ মুখ নিচু করে, আঁচলটা মুখে চেপে ধরেছেন।

—'ও দিদিভাই, কী হল? কাঁদছেন?'

—'কাঁদছি-ই তো?'

—'তাহলে চোখে জল কই?'

আর পারছেন না। দিদিভাই ডুকরে হেসে উঠেছেন। দাদাভাইকে ডেকে বলছেন— 'শুনছো। তোমার নাতনি কী বলছে? বলছে দেশ চোর। দেশ ভিখিরি।'

চোখে চশমা লাগিয়ে দাদাভাই অঙ্ক কষছেন। মাথা নেড়ে বিজ্ঞের মতো বললেন— 'হ্যাঁ। তা একরকম ঠিক বইকি!'

শরৎচন্দ্রের যাদব-গিরীশের অরিজিন্যাল মডেল, আমার মামার বাড়িতে অঙ্ক নিয়ে বসে আছেন।

মায়ের কেরামতি কি কম না কি? আস্তে আস্তে শ্বশুর শাশুড়ি ননদ এসব শব্দ আমাদের কাছে অশ্লীল হয়ে গেল। পুনপুন জিজ্ঞেস করলে— 'এই বুবু, তুই বিয়ে করবি?'

আমি—'কক্ষনও না। বিয়ে হলেই তো ননদ হবে। খারাপ কথা। ছিঃ। তুই?'

পুনপুন— 'আমিও না। আমার ননদ অত খারাপ লাগে না। কিন্তু তুই না করলে আমিও করব না।'

শুধু ননদই নয়। মানতাশা, বিছে, আর্মলেট, মুক্তোর কলার, চিক—এসব শব্দও উচ্চারণের অযোগ্য অশ্লীল 'চার অক্ষর' হয়ে গেল আমাদের কাছে। যখন প্রাণভরে খারাপ কথা বলতে ইচ্ছে হত তখন কলঘরে গিয়ে একনিশ্বাসে বলে নিতুম— 'শ্বশুর শাশুড়ি ননদ ভাজ মানতাসাতগাকলারবিছে।'

একদিন আমার আর পুনপুনের ভীষণ ঝগড়া হয়ে গেল, পুনপুন রেগেমেগে আমাকে বলল— 'ননদ, ননদ, তুই একটা ননদ!'

আমি বললুম—'তুই মানতাশা।'

পুনপুন বলল— 'তুই স্বামী তুই একটা স্বামী।'

আমি বললুম— 'চূড় তাগা চিক, তুই একটা ভাজ।'

পুনপুন আমার ওপর লাফিয়ে পড়ল। আমি পুনপুনের ওপর লাফিয়ে পড়লুম। দুটো বেড়াল যেমন আঁচড়াআঁচড়ি কামড়াকামড়ি করে সেইরকম দেখতে হল ব্যাপারটা। টমটমদিদি এসে আমাদের ছাড়িয়ে দিল। আমার চোখ রাগে জ্বলছে। জ্বলন্ত কয়লার টুকরো যেন। পুনপুনের নাক হোসপাইপের মতো ফোঁস ফোঁস করে ফুলছে। আমার দাঁত পুনপুনের হাতে বসে গেছে, পুনপুনের দাঁত আমার হাতে বসে গেছে। কিন্তু টমটমদিদি হাজার জেরা করলেও আমরা কেউই মুখ খুলি না। কী এমন গালাগাল আমরা পরস্পরকে দিয়েছি যার জন্য এমন প্রাণান্তকর ডুয়েল টমটম কিছুতেই জানতে পারলো না। ওই কথা কখনও বড়দের সামনে উচ্চারণ করা যায়? টমটমদিদির ধারণা হল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাঙ্ঘাতিক, ভয়ঙ্কর কোনও গালাগালি আমরা দেওয়া-দেওয়ি করেছি। অতএব সে আমাদের দালানের কোণে কান ধরে এক পায়ে দাঁড় করিয়ে দিল। যাতে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করার সময়ে বিশ্বের তাবৎ প্রাণী আমাদের দেখতে পায়।

প্রথমেই দেখল অংদাদা। সে একটু দূরে দাঁড়িয়ে বক দেখালো। তারপরই পমপমদিদি আসছে দেখে ভালো মানুষের মতো কেটে পড়ল। পমপমদিদি আড়চোখে একটি করে বাজ হেনে গজেন্দ্রগমনে চলে গেল। এরপর গেলেন বাবা। দৃশ্যটি দেখলেন— 'কী হল। কী দুষ্টুমি করেছ ? কে শাস্তি দিয়েছে ?'

আমরা ফোঁস ফোঁস করে কাঁদছি। প্রথম প্রশ্নটার জবাব এড়িয়ে, দ্বিতীয়টার জবাব দিলুম— 'টমটমদিদি।'

বাবা এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন। বোধহয় ভেবে নিলেন টমটমদিদির দেওয়া শাস্তি তাঁর মকুব করা ঠিক হবে কি না। তারপর বললেন— 'দিদির কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও।'

দুঃখিত মুখে বাবা চলে গেলেন। পরবর্তী আগন্তুক পালক। অংদাদা তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। কেন ? মজা দেখতে, আর কী !

পালক— 'খোঁড়া ল্যাং ল্যাং ল্যাং'

অংদাদা— 'কার বাড়িতে গিসলি খোঁড়া কে ভেঙেছে ঠ্যাং ?'

পালক— 'বুবলি পুবলু কাঠের ঠ্যাং
বুবলি নাচে ড্যাডাং ড্যাং।'

মাকে আসতে দেখে দুজনেই হাওয়া হয়ে যায়। আসল আসামি হলেন এই দেবহূতি সিংহী। তিনিই আমাদের চিত্তে অশ্লীল শব্দের কনসেপ্ট ঢুকিয়ে দিয়েছেন। তাই সহজাতবোধে আমরা তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণ করি।

—'কী করেছিলে ? বিদ্যা ?'

—'কিঁছু কঁরিনি।'

—'কী করেছিলে, পাবন ?'

—'খারাপ কথা বলেছিলুম।'

—'কী বলেছিলে ?'

—'ননদ'— লজ্জায় অধোবদন হয়ে পাবন বলে।

—'কী ? ননদ ?' মা হতভম্ব।

—'বুবুও আমাকে যা-তা বলেছে।'

—'কী বলেছে ?'

—'মানতাশা, আরও বলেছে ভাজ।'

মা বিমূঢ়। বললুম না আত্মবিস্মৃত ! কীর্তিটি যে নিজেই করেছেন, জানেন না।

—'ঠিক আছে, এবার যাও।' —বিমূঢ় মা স্থানত্যাগ করেন।

তা সে যাই হোক, এক একটা দিন আসে উৎসবের। নেমন্তন্ন বাড়িতে যাওয়ার উৎসব। বিয়ে বাড়ি। তখন মা সাজেন। কালো ভেলভেটের একটা প্রায় স্লিভলেস ব্লাউজ আছে মায়ের। মা সেইটা পরেন, আর অমনি প্রতিতুলনায় মায়ের গায়ের রঙ ঝলমল করে ওঠে। সোনালি জরি আর কালোয় আশপাঁড় শান্তিপুরী শাড়ি পরেন মা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুপোর চাবির গোছা পিঠে ঝনাত করে ফেলেন। এ কিন্তু আসল চাবি নয়। সাজের চাবি। মায়ের গলায় চিকচিক করতে থাকে তেঁতুলে-বিছে হার। হাতে ওঠে ঝকঝকে তোলা সোনার চুড়ি, বালা, চুল বেঁধে খোঁপা করে তাতে একটা রুপোর কাঁটা গুঁজে দেন মা। তুলোয় আতর ভিজিয়ে বুকের মধ্যে রাখেন। একটা পান খেয়ে ঠোঁট লাল করে নেন মা, কানে পরেন মুক্তোর টপ। ট্যালকাম পাউডার হাতে মেখে নিয়ে মুখে একটু বুলিয়ে নেন। কালো ভেলভেটের চটি পরেন। ব্যাস নিরাবরণ গ্রিক দেবী কয়েক মিনিটেই অষ্টমীর দুর্গা হয়ে যান। দেখে দেখে দেখে আশ আর মেটে না। চোখ ধাঁধিয়ে যায়। বুকের ভেতরটা কেমন-কেমন করে। আমাদের ওই মা-ই তো ? দেবু মা ? না কি অন্য কেউ ? স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা দেবহুতি কি এবার নিজরূপ ধরলেন ? ছদ্মবেশ ঘুচে গেল ? শাপমুক্ত হলেন ? নিজলোকে চলে যাবেন না কি ?

আমার আর পুনপুনের জামাকাপড় বেরোয়। পুনপুনের সেলর স্যুট। আমার থাক-থাক ফ্রক, অর্গ্যান্ডির। এতটা ফুলে থাকে। গোলাপি অর্গ্যান্ডি। পায়ে মোজা জুতো পরে, মস্‌মস্‌ করে আমরা নেমন্তন্ন যাই। ফিটন গাড়িতে বসে নিশ্চিন্ত হয়ে পুনপুন বলে— 'তুই কটা বেগুন ভাজা খাবি রে ?'

—'দুর, বেগুনে আমার মুখ কুটকুট করে। আমি ছোলার ডাল দিয়ে কুমড়োর ছক্কা দিয়ে নুচি খাব।'

—'আর মাংস ?'

বৈষ্ণব বাড়ি আমাদের। মাংস হয় না। তবে বাইরে খেতে আমাদের বাধা নেই। কিন্তু খাবো কী করে ? অত ভাল খেতে হলে হবে কি, মাটির খুরির মধ্যে মাংসের টুকরো দেখলেই মাংসের দোকানের ছাল-ছাড়ানো ঝুলন্ত পাঁঠার দৃশ্য মনে পড়ে যায়। আমার বমি পেয়ে যায়। কষ্টে, ঘেন্নায় চোখ ভরে জল চলে আসে। মাছের ফ্রাই থাকলে খুব মজা। কিন্তু মোটা ছাল-অলা নেমন্তন্ন বাড়ির মাছের কালিয়াও আমি-পুনপুন খেতে পারি না, যদি চিংড়ি মাছ থাকে তো আলাদা কথা। এত বড় বড় গলদা চিংড়ি বেশ। তবে শেষ পর্যন্ত কুমড়োর ছক্কার পরই আমরা চাটনিতে চলে যাই। পাঁপরভাজা লজ্জায় খেতে পারি না। কুড়ুর-মুড়ুর করে শব্দ হবে। লোকে সবাই বুঝতে পারবে এই ছেলে-মেয়ে দুটো পাঁপর খাচ্ছে। অথচ পাঁপরভাজা ফেলে চলে আসাও যায় না। অবশেষে দু'জনে পরামর্শ করি সবাই যখন খাবে, তখন আমরাও খাব। পাঁপরভাজা খাওয়ার সমবেত অর্কেস্ট্রায় আমাদের অবদান বোঝা যাবে না। অধ্যবসায় সহকারে বসে থাকি। তা ছাড়াও লেডিকেনি আসবে। হয়তো রাবড়িও।

কিন্তু খাদ্যাখাদ্যের গল্প আরম্ভ করবামাত্র পুটপুটদিদি ধমক মেরে থামিয়ে দেয়—'অ্যাই খেতে যাচ্ছিস না কি লোকের বাড়ি ? একদম হ্যাংলাপনা করবি না।' কী আশ্চর্য ! খেতেই তো যাচ্ছি।

মামার বাড়ি থেকে বুনবুনকে তুলে নেওয়া হয়। সে ছোট্ট ধুতি আর লাল বেনারসীর পাঞ্জাবি পরেছে। এত সুন্দর দেখাচ্ছে যে আমাদের খুব হিংসে হয়। বিয়েবাড়িতে বুনবুনকে নিয়ে লোফালুফি, গাল টেপাটেপি। তখন আবার আমাদের খুব গর্ব হয়। বুনবুন দিদিভাইয়ের কাছে একা থাকে, খুবই আদর যত্নে মানুষ হয়। ওকে একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপেলের মতো দেখায়। তার ওপরে লাল পাঞ্জাবি। কার্তিক ঠাকুরটি। মা আর দিদিভাই, মেয়ে-মা হলে কী হবে, দুজনের রুচি একদম আলাদা। আমরা এজমালি সংসারে মানুষ হই আমাদের জন্য কোনও আলাদা আদর-যত্ন নেই। পুনপুনের চুল, বিশেষ করে মাথার পেছন দিকে গোল ঘূর্ণিমতো জায়গাটায় চুলগুলো খাড়া-খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কিছুতেই তাদের শোয়ানো যায় না। বুনবুনের ওই একই চুল তো ? অথচ চমৎকার পোষ মেনে গেছে। পুনপুনকে মা শার্ট প্যান্ট পরাবেন। স্ট্রাইপ দেওয়া শার্ট, খাঁকি প্যান্ট। বুনবুনকে দিদিভাই এমব্রয়ডারির নকশা করা পপলিনের, সিল্কের জামা পরাবেন, জাঙিয়াটা তলায় ফুলে গোল হয়ে থাকবে। আমাদের জন্যে মা গোলাপি, হালকা নীল, ফ্যাকাসে কমলা, সাদা এই সব রঙ বাছবেন, পুনপুনের তো খাঁকি আর কালো ছাড়া পেন্টুলই নেই। ওদিকে বুনবুন পরে আগুনের মতো লাল, টিয়েপাখির মতো সবুজ, শীতের বেগুনের মতো ঘোর বেগুনি সব জামা। আমাদের তিনজনের মধ্যে বুনবুন হিরো। বুনবুনকে আমরা পুজো করি বললেই ঠিক বলা হয়।

কিন্তু নেমন্তন্নবাড়িতে শেষ পর্যন্ত আমাদের নিয়ে এমন হট্টগোল হয় যে আমরা অত্যন্ত বিরক্ত হই।

—'দিদি এসেছো ? হ্যাঁ গো তোমার সেই যমজ তিনটে ?'

—'এই তো। এই তো!'

—'ও মা! ছেলে দুটো একদম এক রকম দেখতে।'

—'এক রকম জামা পরিয়ে রাখ না কেন ? আমি হলে তাই করতুম।'

—'গুলিয়ে যাবে, বুঝলি না, একে খাওয়াতে ওকে খাইয়ে দেব।'

—'মাসি, ও মাসি, তোমার কোলেরগুলো কই ?'

এই 'কোলের' কথাটায় আমাদের তিনজনেরই প্রভূত আপত্তি। আমরা মোটেই 'কোলের' নই। গটগট করে হাঁটি, নিজে নিজে খাই, নিজে নিজে কলঘরে যাই, যদিও ছিটকিনিটা উঁচুতে বলে নাগাল পাই না বলে কলঘরের দরজা বন্ধ করতে পারি না বলে পাছে দুষ্টুমি করে আটকে যাই বলে কোনও না কোনও দাদা বা দিদি পাহারায় দাঁড়িয়ে থাকে। আমরা মায়ের কোলে উঠি না তো! আমাকে তো পালক ছাড়া কেউই কোলে নিতে পারে না, আমি ভীষণ ভারী। তবে ? 'কোলের' কেন বলবে ? ভীষণ অপমানজনক। নিজেদের মধ্যে আমরা বলাবলি করি—'বিয়েবাড়ি বিচ্ছিরি, খালি যমজ যমজ, খালি কোলের কোলের, কী নাম কী নাম, কার মেয়ে, কার ছেলে—বিচ্ছিরি।'

এরই মধ্যে আবার একটা পরী উড়ে এসে বলে—'দেবুদি, ও দেবুদি তোমার মেয়েটাকে আমায় দেবে ? দাও না গো, একটা মেয়ের কী যে শখ আমার। তিনটে ধ্যাধ্‌ধেড়ে ছেলে, গুণ্ডামি করে করে আমার মাথা খারাপ করে দিলে। দাও না গো।'

পরীটা আমায় কাছে টেনে নিতে যায়। আমি শক্ত কাঠ হয়ে মার আঁচল মুঠো করে পাকিয়ে ধরে থাকি। পারলে মায়ের গায়ের চামড়াসুদ্ধু মুঠো করে ধরে থাকতুম। নিয়ে নেবে না কি ?

—'কী নাম ? বিদ্যা ? ও মা, ও রকম নামে ডাকা যায় না কি ? তুই একটা বাবলি। এই বাবলি, আমার সঙ্গে যাবি ? কী সুন্দর পাখি দেব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোখের জল কোনওমতে চেপে ধরা-ধরা গলায় বলি—'আমার খগ্‌গোশ আছে।'

—'ওমা, খরগোশ আছে, তোর খগ্‌গোশ আছে ?'

পরী হেসে খুন হয়ে যেতে থাকে। আশেপাশে আরও সবাই যোগ দেয়।

পাগল না কি এরা। 'খগগোশ আছে'-তে হাসির কী হল ? এত হাসি ?

—'আমিও খরগোশ দেব তোমাকে বাবলি, আমাদের বাড়ি হরিণ আছে।'

'বুবু' আমি বলি। দু হাতে বুড়ো আঙুলের ওপর মাঝের দুটো আঙুলের মাথা চেপে ধরে, তর্জনী আর কড়ে আঙুল খাড়া রেখে আমি হরিণ তৈরি করি। অটোমেটিক হয়ে যায়।

পরী এবং তার সঙ্গীসাথীরা পাগলের মতো হাসতে থাকে।

—'কী মিষ্টি, কী মজার, দাওনা গো দেবুদি। তোমার বুবুকে দাও না।'

—'নে না, আমি কি বারণ করেছি ?'

—'আয় বাবলি, ও না না বুবু, বুবু না বললে তো আবার...'

ভ্যাঁ-ভ্যাঁ। আমি একা নই। পুনপুনও আমার ফ্রক মুঠো করে ধরেছে।

—'না-আ, ও যাবে না', বলতে বলতে সে ফোঁপাতে থাকে। আমি তো মায়ের ওপর অভিমানে একবারে গরম জলের ফুট ধরার মতো ফুটতে থাকি! মা আমাকে দিয়ে দেবেন ? অনায়াসে ? এমন অনায়াসে ? পরী আমাকে নিয়ে যাক না-যাক, মায়ের এই দানপত্র আমাকে এত ব্যথা দেয় যে বুকের ভেতরটা হু-হু করতে থাকে।

বুনবুন আমাদের সঙ্গে বাড়ি আসে সেদিন। রাত্তিরে শোয়া কী রকম হবে ? আমি আর পুনপুন মায়ের দু পাশে শুই। মা আজকে বিধান দিলেন, পুনপুন এক দিকে বুনবুন আর এক দিকে, আমি মাথার কাছে শোবো। টেবিলে কাঁটা ছুরি চামচ সাজানো হয় দেখেছেন তো ? সেই চামচের জায়গায় আমি। মা প্লেট, পুনপুন বুনবুন কাঁটা ছুরি। বাঃ! কী নিষ্ঠুর।

'রে মোহিনী রে নিষ্ঠুরা ওরে রক্তলোভাতুরা
কঠোর স্বামিনী
দিন মোর দিনু তোরে শেষে নিতে চাস হরে
আমার যামিনী !'

প্রথম দফার ঘুমটা আটকানো যায় না। কিন্তু আধোরাতে যদি ঘুম ভেঙে যায় ? সন্তর্পণে বুনবুনকে টেনে সরিয়ে দিই। আমার গায়ে খুব জোর তো! যে ফাঁকটুকু তৈরি হয় তার মধ্যে আমি নিজেকে ঢুকিয়ে দিই, মায়ের গায়ের সঙ্গে লেপ্টে যাই। মাকে আমার দিকে আকর্ষণ করি। ঘুমের মধ্যে মা আমার দিকে পাশ ফিরে যান। পুনপুন আর বুনবুনকে বঞ্চিত করার বিপুল দুঃখ বুকে নিয়ে আমি মাকে একা অধিকার করে থাকি। তবু বিরহবোধ ফুরোয় না। পাশে শুয়ে, মায়ের হাত আমাকে জড়িয়ে, মায়ের বুকের ওম আমার শরীরে তবু ভেতরটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, 'মা, ওমা, এসো, মা আমাকে কোলে নাও, নাও না মা-আ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দশম অধ্যায়

আকালাসুর

কাকে বলে মন্বন্তর, আকাল কী—এসব প্রশ্ন আমাদের মনে কখনও ওঠেনি। কেননা কথাগুলো আমরা আদৌ শুনিনি। যে কথাটা শুনতুম সেটা হল 'যুদ্ধের বাজার', 'জিনিসপত্র মাগগি/ আক্রা' কিংবা 'চালের দর চল্লিশ টাকা'। দেখেছিলুম যেটা সেটা হল— নানা শ্রেণীর ভিখারি। এরা আমাদের মনে তেমন করুণা জাগাত না। কেননা মনে হত নাটক দেখছি। যদিও নাটক কী তা জানতুমই না। আমাদের শৈশব-চেতনা থেকে সহস্র যোজন দূরে ছিল অভাববোধ, উৎপীড়ন ও দয়া-দাক্ষিণ্য ইত্যাদি সব কিছু মানবিকতা। আমরা সব এক-একটি ছোটখাটো সেলফিশ জায়ান্ট ছিলুম। জেনেশুনে নয়, অজ্ঞাতে অজ্ঞানে।

সুরুল ছাড়ার পর মায়েদের জীবনে দারুণ অর্থসঙ্কট যায়। সুরুলে অন্নের অভাব ছিল না। কিন্তু কলকাতায় আসার পর সুরুল থেকে চালের স্রোত আসা ক্রমে বন্ধ হয়ে গেল। লিগ সরকার সম্ভবত লেভি করে চাল কিনতে আরম্ভ করল, বোমার ভয়ে যারা ওখানে ভিড় করেছিল তারা রীতিমতো গোলা আটক করল, কোনও চাল বাইরে যেতে দেবে না। নতুন জায়গায় এসেই বাবার পসার জমে যাবে এটা তো আশা করাও বাতুলতা। এখানে আবার প্রাইভেট কোচিং বা পাঠশালারও তেমন সুবিধে হল না। ফলে শ'বাজারের ডাক্তারবাবু শ্যামপুকুরের গলিতে চলে এলেন। চেম্বার দুটো রইল। ক্রমে শ'বাজারেরটা উঠিয়ে দিলেন। আমরা ষোল আনা না হলেও দশ আনা ঠাকুর্দাদার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লুম। এই সময়ে ন্যায্য মূল্যে চাল দিয়ে আমাদের যাঁরা বাঁচিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে পয়লা নম্বর আমাদের মামার বাড়ি। হরিপালের জমি-জমা যক্ষের মতন আগলাতেন মেজদাদাভাই অনন্তপ্রকাশ, তিনিই বীরবিক্রমে চাল আনতেন কলকাতায় পরিবারের জন্য। সেই চালেরই ভাগ পেতুম আমরা। মেজদাদাভাইয়ের কীর্তির কথা বলি। টিনের পেল্লাই ট্রাঙ্কে চাল ভরে তার ওপর চেপে বসে আসছেন, হাতেও দুটি বোঁচকা, ভর্তি চাল।

ট্রেনে এক ধরনের ঠোঁটকাটা খ্যাঁকখেঁকে মতো যাত্রী থাকে না! সেই লোকটি বাড়ানো হাঁটুর ওপর চ্যাটালো হাত রেখে এগিয়ে বসে সোজাসুজি মেজদাদাভাইকে আক্রমণ করে— 'লজ্জা করে না মশাই! দেশ থেকে দেশবাসীর মুখের চাল নিয়ে গিয়ে শহরের বাজারে বেচছেন! মানুষ আপনারা, না কসাই!'

—'কসাই ঠিকই, তবে আমি নয়, আজ্ঞে, আপনি।' এইটুকু বলে মেজদাদাভাই চুপ।

—'অর্থ? অর্থ কি এর? অমনি আমাকে একটা যা-নয়-তাই বলে দিলেন?'

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'যা-নয়-তাই-ই যদি হয়, তবে সেটা আমি বলিনি, আপনি বলেছেন, ট্রেনের দাদারা সাক্ষী আছেন।'

এইভাবে আসল ইস্যু গুলিয়ে যাবার অনেক পরে মেজদাদাভাই প্রকাশ করেন, তিনি একজন স্বজনবিরহিত চিরদুঃখী প্রবাসী। তাঁর পুরো একান্নবর্তী সংসার কর্ম এবং স্কুল-কলেজ উপলক্ষে কলকাতায় বাস করছে, তিনি একা হরিপালের জমিজমা সমস্ত সামলান, আর হপ্তায় হপ্তায় বিরাট ফ্যামিলির অন্ন নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দেন।

—'শুধু কি চাল ? ডাল, মুগ, পাটালি, সর্ষের তেল, নারকোল তেল, কী নয় ? এই যে ট্রাঙ্ক দেখছেন ? জামাকাপড় ভেবেছেন ? রাম বলো ! ওসব পাটালি। ছয় ভাইয়ের সংসার। ছেলে-পিলে মা ষষ্ঠীর কৃপায়... পাটালি নইলে হয় ? আপনারাই বলুন। ভগবানেরই বা কী বিচার আর দাদাদেরই বা কী ?'

বাঙালি ট্রেনযাত্রীদের মধ্যে ফাজিল ফক্কড় মিচকে পটাশরা তো সংখ্যায় নেহাত কম নয়। তেমনই একজন খ্যাঁক করে হেসে বলল, 'ট্রাঙ্ক ভর্তি পাটালি ? তো একখান ভাঙুন না দাদা, কামরাসুদ্ধ লোকে প্রসাদ পাক।'

— 'ও গুড়ে বালি দাদা।' মেজদাদাভাই দেঁতো হেসে বললেন। 'দেশে থাকি আমি আর আমার পরিবার। তা পরিবার ট্রাঙ্ক গুছিয়ে, চাবি দিয়েই, চাবি লুকিয়ে রাখেন। ডুপ্লিকেট আছে কলকাতায় বউদিদির কাছে। তিনি ছাড়া কেউ খুলতে পারবেন না। কিন্তু তাতে কী হয়েছে ? আমার পুঁটলিতে আছে দু একখানা, ধরুন বার করছি।'

পুঁটলি থেকে পাটালি বেরোয়। সাগ্রহে সবাই হাত পাতে। মুহূর্তে পাটালি লোকেদের জিভস্থ হয়। পরস্পরে চোখ-চাওয়া-চাওয়ি চলতে থাকে।

— 'কেমন, বলুন ?' গর্বের হাসি চিকচিক করছে মেজদাদাভাইয়ের চোখে।

— 'তোয়ের করেচে কে ?' একজন পাটালিখাদক প্রশ্ন করেন।

— 'সম্বচ্ছরের পাটালি আমার পরিবার মানে আপনাদের বউঠাকরুন তোয়ের করেন। জোগাড়ে দু-একজন আছে কিন্তু উনিই সব। ওঁর হাতের তারই আলাদা।'

— 'তা আর বলতে !' গোপনে মুখের পাটালির কুচি থুথু করে ফেলতে ফেলতে সহযাত্রীরা বলেন, 'বউঠাকরুনের হাতের তারই আলাদা।'

পাটালি হাকুচ তেতো।

কলকাতা এসে যেতে কুলির মাথায় পেল্লাই ট্রাঙ্ক তুলে দিয়ে মেজদাদাভাই যখন বাড়ির পথ ধরেন, তখন সহযাত্রীরা গা-টেপাটেপি করে হাসিতে ফেটে পড়ে।

—'সাবধানে দাদা।'

— 'সামলিয়ে, ট্রাঙ্ক সামলিয়ে।'

— 'বউঠাকরুনের নিজের হাতের জিনিস কি না !'

নানাবিধ মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে গৌরবের হাসি হাসতে হাসতে মেজদাদাভাই ছ্যাকরা গাড়িতে ওঠেন। মুখ গম্ভীর হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। বলেন— 'ছপ্টি চালা। তুরন্ত যাওয়া চাই।'

চালের দ্বিতীয় জোগানদার ছিলেন আমাদের পাড়ার পাকুমা। ইনি এক অত্যন্ত বর্ধিষ্ণু পরিবারের গৃহিণী। বাবা এঁর বহুদিনের সায়াটিকার ব্যথা আরাম করে দেওয়ায় ইনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবাকে পুত্রবৎ স্নেহ করতে আরম্ভ করেন। কলকাতায় বাবার প্রথম কংকোয়েস্ট ইনিই, এবং ইনিই বাবাকে ধন্বন্তরী নাম/ উপাধি দেন। পাকুমা জিজ্ঞাসাবাদ করবারও ধার ধারতেন না। যখন-তখনই চাল, ডাল, ফলফুলুরি, দুধ ইত্যাদির সিধে সাজিয়ে তিনি আমাদের বাড়ি পাঠিয়ে দিতেন।

— 'ধন্বন্তরীর সিধে এয়েচে গো!' ওঁদের বাড়ির মোক্ষদা হাঁকত। 'ও টেকন তাড়াতাড়ি ধর না, মাথাটা যে গেল।'

বাবা এতে আপত্তি করলে পাকুমা বলতেন, 'আপনি আমার গৃহ-চিকিৎসক। ঈশ্বরতুল্যও বটে, পুত্রতুল্যও বটে। চিকিৎসক, শিক্ষক, পুরোহিত এঁদের গুরুবারে সিধে দেওয়া আমাদের কুলপ্রথা যে।'

তবে এতৎসত্ত্বেও শুনেছি, আমাদের দাদা-দিদিদের অনেক সময়ে রাঙালু সেদ্ধ, আলুসেদ্ধ, এসব খেয়ে দিন গেছে। আমরা যখন একটু বড় হয়ে গেছি তখনও প্রতি সকালে ই-দাদার তত্ত্বাবধানে ভাতের ফেন পরিষ্কার ডেকচিতে গালা হত। কিছুক্ষণ পরই তাতে মোটা সর পড়ত। সেই সর তুলে ফেলে দিয়ে, চিনি, নুন ও লেবু মিশিয়ে সরবত করা হত। ফেনের সেই সরবত এক চুমুকে শেষ করে, তবে দাদা-দিদিদের সারা দিনের কাজ আরম্ভ হত। এতে পিসিমার খুব আপত্তি ছিল। তাঁর নানা ধরনের সংস্কারের একটা ছিল—

ফেন খায় ছেলে
ঘ্যানঘ্যানে কেলে।

তাই আমাদের ফেন খাওয়াতে তাঁর প্রভূত আপত্তি ছিল। আর একটা সংস্কার ছিল

ফেন খায়
তো সব যায়।

অর্থাৎ ফেন খেলে চিরনিঃস্ব হবার ঝুঁকি থেকে যায়। ই-দাদা এসব বলা বাহুল্য মানত না। সে আমাদের রান্নাঘরের সামনে লম্বা কিউ করে দাঁড় করিয়ে দিত। পালক দিয়ে আরম্ভ, পুনপুন দিয়ে শেষ। পুনপুন আর আমি হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে থাকতুম। কিছুতেই হাত ছাড়তুম না। এই বিশাল কিউয়ের মধ্যে যদি কোনওমতে একবার হারিয়ে যাই, কিছুতেই আর পরস্পরকে খুঁজে পাব না, এমনি ছিল আমাদের ধারণা। সেই প্রতিদিনের দেখা রান্নাঘর। প্রতিদিনের ই-দাদা, সু-দাদা, পমপম-টমটম, বুজবুজ-পুটপুট দিদিরা সেদিন আমাদের কাছে বিশাল জনগণেশ হয়ে দাঁড়াত।

কিছুতেই ই-দাদার সঙ্গে না পেরে অবশেষে পিসিমা বিদ্রোহ করেন। — 'তোর নজ্জা নেই রে ইন্দু, ভিখিরিগুলো একটু ফেন চায়, তাতেও বাদ সাধছিস?'

—'আপনাকে নজ্জা পেতে হবে না পিসিমা, আমি ওদের জানিয়ে দেব, এ-বাড়িতে ফেন সকালবেলার জলখাবার, দেওয়া যাবে না। সেই সঙ্গে ঠাকুর্দাকেও ডেকে আনব।'

ঠাকুর্দা ভিখারি দু'চক্ষে দেখতে পারেন না, তাই ঠাকুর্দার অবতারণা।

সঙ্গে সঙ্গে পিসিমা বলবেন— 'ভিরকুট্টি, ভিখিরিকে চাল দেবে না, ফেন দেবে না, পয়সা দেবে না, সে বাঁচবে কী করে?'

— 'বেঁচে কাজ নেই, বেঁচে কাজ নেই,' ঠাকুর্দা হুঁকো হাতে সশরীরে এসে উপস্থিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুগন্ধ তামাকের গন্ধে দালান ভরপুর। আমি আর পুনপুন বেশি করে প্রশ্বাস টানছি। আমাদের ভেতরে হুঁকো সম্পর্কীয় কোনও গোপন সংকল্প জন্ম নিচ্ছে।

— 'স্পার্টার নাম শুনিছিস ?' ঠাকুর্দা পিসিমাকে বলছেন। স্পার্টা! স্পার্টা! স্পার্টা! কী সুন্দর! আমি পুনপুনকে বলি— 'আমি বেশ স্পার্টা, হ্যাঁ ?' পুনপুন ঠোঁট ফুলিয়ে বলে— 'সবই তুই হবি, না ? সেদিন যে তুই কাননবালা হলি ? আমি বলি— 'ঠিক আছে, কাননবালাটা আমি তোকে ছেড়ে দিচ্ছি। তুই স্পার্টাটা আমাকে দে।' কিন্তু কাননবালার ওপর থেকে আমার যেমন, পুনপুনেরও তেমন মন সরে গেছে। আমরা দু'জনেই মুখ গোমড়া করে দাঁড়িয়ে থাকি। এই সময়ে একটি নতুন সম্ভাবনা দেখা দেয় আমাদের সামনে। পিসিমা তদীয় পিতাকে বলছেন —'যা করছেন, তাতে বাড়িসুদ্ধ সব্বাইকে কুম্ভীপাকে নিয়ে যাচ্ছেন।' এই নতুন ভ্রমণের সম্ভাবনায় আমরা দু'জনেই খুব খুশি হয়ে যাই। স্পার্টা বা কাননবালা না হতে পারার দুঃখ পুরোপুরি ভুলে গিয়ে আমরা কুম্ভীপাকে যাবার জন্যে কী কী নেব, তার তালিকা করতে থাকি।

পুনপুন— 'টেকনের বিড়ির বাকসোটা আমি নেব। আর গুণ্ডির বটুয়াটা তুই।'

আমি— 'রাসমণির গোলাপ ফুল দেওয়া সুটকেসে তোর জামা থাকবে, আমারটা যাবে ঠাকুদ্দার গ্ল্যাসটোন ব্যাগে।'

রাসমণির গোলাপ ফুল দেওয়া সুটকেসে জামাকাপড় নিয়ে কুম্ভীপাকে যাবার সম্ভাবনায় পুনপুন বেশ খুশি হয়ে ওঠে। আর গ্ল্যাসটোন ব্যাগ তো আমি নিজেই বেছে নিয়েছি। যদিও দু'জনেই জানি রাসমণির সুটকেস এবং ঠাকুর্দার ব্যাগ হাতানো মোটেই সোজা কাজ হবে না। টেকনের বিড়ির বাকসো আর গুণ্ডির বটুয়া সম্পর্কেও ওই একই কথা। তবু, স্বপ্নে পোলাও খেলে তো মানুষ ঘি বেশি করেই ঢালে। যে আমরা আজ পর্যন্ত সজ্ঞানে লিলুয়া-দর্শনও করিনি, কুম্ভীপাকের মতো একটি সুদূর জায়গায় ঠাকুর্দা সেই আমাদের সত্যিই যে শেষপর্যন্ত পাঠাবেন এ বিষয়ে যথেষ্টই সন্দেহ আছে। তবু...।

আলোচনা বেশ চমৎকারই চলছিল। আমাদের কোনও মতবিরোধ ছিল না। দু'জনেই রেডি, যাব কুম্ভীপাক। এই সময়ে কুম্ভীপাকের অবস্থান নিয়ে আমাদের চুলোচুলি বেধে যায়। অপরাধের মধ্যে আমি বলেছিলুম কুম্ভীপাকটা যখন যাচ্ছিই, তখন স্পার্টা যেতেই বা ক্ষতি কী ? জায়গা দুটো তো পাশাপাশি, যেমন কলকাতা-হাওড়া। সুরুল-বোলপুর। কিন্তু পুনপুন এইখানে বেঁকে বসে। তার কথায় যথেষ্ট যুক্তি ছিল। পুনপুন বলে স্পার্টা তো কোন জায়গা নয়, মানুষের নাম। সে আমাকে মনে করিয়েও দেয় যে কিছুক্ষণ আগেই আমি নিজেকে স্পার্টা বলে জাহির করছিলুম। যেহেতু কোনও মানুষের নাম, সেহেতু স্পার্টায় যাওয়াও যায় না। এতে আমি ধৈর্য হারিয়ে পুনপুনের ওপর লাফিয়ে পড়ি। আমার আক্রমণের ধরনই ছিল এরকম। সাধে কি আর মা আমাকে সিংহ-মেয়ে বলতেন! আমার সব কিছু হাতেনাতে। আজকালকার দিনের 'আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে' সব কিছু স্থির করার নীতি কখনও আমার ছিল না।

আমাদের ছাড়াবার চেষ্টায় সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আমাদের দাসী অন্ন মন্তব্য করে— 'এই ধুমসিটাই খোকাকে মেরে ফেলবে একদিন', সে খ্যানখ্যান করে চিৎকার করে বলেছিল কথাটা। আমার চোখের সামনে তৎক্ষণাৎ বিদ্যুদ্‌গতিতে চলচ্চিত্র খেলে যায় ছবি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নং এক আমি (ধুমসি) লাফিয়ে পড়ছি পুঁটকে খোকা (পুনপুন)-র ওপর— ছবি নং দুই— পুনপুন (খোকা) মাটিতে চিৎপটাং হয়ে পড়ে গেছে। ছবি নং তিন— ঠাকুর্দাদা প্রাণপণে নাড়ি দেখছেন। ছবি নং চার— চারদিকে হাহাকার। মা, বাবা, দাদারা, দিদিরা। আমি পুনপুনের পায়ের কাছে। ঠাকুর্দা মাথা নেড়ে বলছেন— 'মরে গেছে।'

আমার হাঁ বোজে না। আমি এক বিকট আর্তনাদ করে মেঝেতে আছড়ে পড়ি।— 'না, আমি পুনপুনকে মেরে ফেলব না আ-আ।' কাঁদতে কাঁদতে আমি নীল হয়ে যাই। নাকের জলে চোখের জলে এক। পুনপুন স্বয়ং পরিস্থিতির সামাল দিতে সরু গলায় আমায় বলতে থাকে— 'আমি জানি বুবু, আমি তোকে মেরে ফেলব, তবু তুই আমায় মেরে ফেল্‌বি না।' এহেন কায়দার বাক্যেও আমার মন মানে না। পালক আমায় তুলে নিয়ে যেতে থাকে এবং বাবা বজ্রগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করেন অন্নর আর পরদিন থেকে আসবার দরকার নেই।

এ ঘটনার পরেও যখন আমি নির্লজ্জভাবে অন্নর উল্লেখ করব, আপনারা বলবেন, এনার কালাতিক্রমণ দোষ ঘটছে। অন্ন তো কবেই বরখাস্ত হয়ে গেছে। কিন্তু না, আমার কোনও দোষ হয়নি। অন্ন সাভাইভ করে। পিসিমা তাঁর সইকে ছাড়বেন কেন! তিনি অন্নকে নাক খত দেওয়ান ছোট ছেলেপিলের মনে আঘাত দেবার জন্যে। কিন্তু পরিশেষে অন্ন আট আনা মাইনে বাড়িয়ে নিয়ে কাজে বহাল থাকে।

এ-দিকে আমি 'পুনপুনকে মেরে ফেলতে পারি' এই অপরাধবোধে আক্রান্ত হয়ে দিনের পর দিন অশ্রুমুখী, মৌনী, খাবারদাবারে নিস্পৃহ হয়ে থাকি। অবশেষে বাবা বালুসাই এনে আমার মান ভাঙান। বাক্স-ভর্তি বালুসাই নিয়ে তিনি অদূরে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করতে থাকেন:

'ভুলুবাবু কাঁদছেন তো দাও না গো কাঁদতে
ময়রাকে বলে দাও জিভেগজা রাঁধতে
অং খাবে টং খাবে আর খাবে মিষ্ট
ভুলুর তরে জিভেগজা আর নাই কিন্তু,
কি ভুলু, থামালে যে সনাতন-কান্না?
তবে ভাই বালুসাই কিনে তুই আন না।'

ছড়াটি প্রচলিত কোনও মনোমোহন কবির তা মনে পড়ছে না। কিন্তু 'শিশুভারতী'র পাতায় ভুলুবাবুর কান্নার ফিরোজা গোলাপি ছবি দেখে আমরা মোহিত হয়ে যেতুম এবং গুরুজনরা ইচ্ছেমতো সেই ছড়াকে নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য বিকৃত করে ব্যবহার করতেন।

যাই হোক, এই ছড়া আমাদের এতই প্রিয় ছিল যে বুবুদিদি থেকে ভুলুবাবু হতে বিন্দুমাত্র আপত্তি করতুম না। এবং হাতেনাতে বালুসাই পেয়ে তখন ভুলুবাবু এমনই খুশি যে কান্নার মধ্যে দিয়ে ফিকফিক করে হেসে ফেলেছে।

সঙ্গে সঙ্গে বাবার দ্বিতীয় ছড়া: 'মেঘলা ভেঙে সুয্যিমামা বেরুচ্ছেন বেরুচ্ছেন।' ঘুরে ঘুরে হাতে তালি দিয়ে নাচ এবং গান 'মেঘলা ভেঙে সুয্যিমামা বেরুচ্ছেন বেরুচ্ছেন।'

অতঃপর সকলে মিলে বালুসাই ভক্ষণ। আমি গোটা বালুসাই পাই। বাকিরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধখানা, সিকিখানা। ফুটবল টিমের মতন-পরিবার। তেমন তেমন দিনে তিন-চারখানা হাঁসের ডিম ভেঙে বাড়িসুদ্ধ সবাই খাওয়া হয়েছে, তবু কেউ বাদ যায়নি। আমি আড়চোখে তাকিয়ে দেখি পুনপুনের আধখানা শেষ। সে করুণ চোখে আমারটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আমি নিষ্করুণভাবে আমার অতিরিক্ত আধখানা শেষ করি। ওকে এক কুচিও না দিয়ে। যদিও দুঃখে বুক ভেঙে যায়, এবং বহুদিন স্বপ্নে আমি পুনপুনকে— 'আধখানা বালুসাই দেবে গো' বলে ভিক্ষে করতে দেখি। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে একটা সময়ে আমাদের ভোরবেলায় ঘুম ভেঙেই খিদে পেত বলে মা একটি অ্যালুমিনিয়মের টিফিন কৌটোয় দু'জনের জন্যে দুটো গজা, কী পেঁড়া, কী চমচম বা অন্য কিছু শুকনো মিষ্টি রেখে দিতেন। পুনপুন আগে উঠলে নিজের ভাগেরটা খেয়ে খেলতে বসে যেত। আমি আগে উঠলে দুটোই খেয়ে নিবিড়ভাবে ঘুমিয়ে পড়তুম। পুনপুনের রাগত কান্নায় আমার ঘুম ভাঙবার অনেক আগেই মা বেচারি তৃতীয় গজা সাপ্লাই দিয়ে দিয়েছেন। ঘুমও ছিল আমার এমনি গভীর। এখন রাতের পর রাত নিঘুম চোখে আকাশের দিকে চেয়ে বলি— আকাশ আকাশ, তুমি কি আমার পুনপুন ? তুমি কি আমার বুনবুন ? গজা খেয়ে নেওয়ার শোধ নিতে আমাকে জাগিয়ে রেখে তুমি কি ঘুমোচ্ছ ? আকাশ আকাশ, তুমি কি আমার পমপম দিদি, টমটম দিদি নও ? আমাকে ঘুম পাড়াবে না ? আকাশ, আকাশ, ও আকাশ তুমি কি আমার সে-দাদা ই-দাদা নও ? কাঁধে করে বেড়াবে না ?

যাই হোক, এমনি আত্মমগ্ন, পরিবারমগ্ন, গোষ্ঠীপরমগ্ন আত্মপর না কি আত্মস্থ ছিলুম আমরা ছোটরা যে রাঙালু-সেদ্ধ খাওয়ার, প্রতিবেশীনের বাড়ি থেকে সিধে আসার, মামাবাড়ি থেকে চাল-দুধ আসার ছোটবেলাকে আমরা আকাল বা যুদ্ধের বাজার বলে বুঝতেই পারিনি। কিংবা বুঝতে পেরেও আমাদের আত্মা-পুরুষ ধ্বংস করেছিল তাকে বেঁচে থাকার প্রবল আগ্রহে ও আনন্দে।

মার্কসিস্টরা বলবেন পাতিবুর্জোয়া, টিপিক্যাল মধ্যবিত্ত মেন্টালিটি। নিজেরটি হলেই হল। অন্যান্য শ্রেণী সম্পর্কে অচেতন। দ্বারে ভিখারি কেঁদে যাচ্ছে, শিশু এমনই যে তার মনেও রেখাপাত করছে না। মধ্যবিত্ত শিশুও এইরকমই পাতিশিশু।

পাতিকাক পাতিহাঁস পাতিলেবুর মতো আমরা পাতিশিশুরা যেখান থেকে যা পারি খুঁটে খেয়ে মেখে দিব্যি চিকন-চাকন হয়ে উঠছিলুম এবং হাতে পয়সা পেলেই এক ছুট্টে চিনেবাদাম, কিংবা মৌরি লজেন্স বা হার্সেস চকলেট কিনতে ছুটছিলুম। মৌরি লজেন্সকে আমরা মুড়ি লজেন্স বলতুম। সম্ভবত ধ্বনিসাদৃশ্য ও গোল গোল মুড়ির আকারের সঙ্গে সাদৃশ্যের জন্যে। ভেতরের মৌরির জন্য যে এদের মৌরি লজেন্স নাম এ কথা পরে জেনে বিশেষ শান্তি পাইনি। মুড়ি লজেন্স যদি হঠাৎ মৌরি লজেন্স হয়ে যায় আর চার্ম থাকে ?

সত্যি কথা বলতে কি, শিশুকালের সেই ভুখা-মিছিল আমাদের দেখার কথা নয়। কিন্তু আকাল তো আমরা নিয়েই এসেছিলুম। তাই প্রকৃত আকালের পরেও প্রায় প্রায়ই আমরা আকাল দেখতুম। 'এক মুঠো ভাত দাও মা' বলতে বলতে ক্লান্তপদ খরচক্ষু ভিখারিরা দিনযাপনের অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। পৃথিবী মানে যেমন সকালবেলার ফুটন্ত এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিকেলবেলার পড়ন্ত রোদ, পৃথিবী মানে যেমন তিন-চার গাছি সুপুরি গাছের আমূল দোলন, পৃথিবী মানে তেমনই ভিখারিও। ছেঁড়া ন্যাকড়া-কানি পরা, হাতে-লাঠি, পায়ে-ব্যান্ডেজ, টিনের-মগ-ঠনঠনানো ভিখিরি সব। মাঝেমধ্যেই একখানা বড় চাদরের চার খুঁট চারজনে ধরে হারমোনিয়াম বাজিয়ে ফর্সা-কাপড় পরা অন্যরকম ভিখিরারাও বেরিয়ে পড়ত।

'দান করো মা, দান করো মা, দান করো মা, করো মা, বাবার নামে দান, দান করিলে অসৎ পথে যাবে না'।

মেঠো সুরে গাইতে গাইতে যেত তারা। সব বাড়ির দোতলা থেকে কাপড়-জামা পয়সা চাল ঝুপঝাপ ঝরঝর করে পড়ত চাদরের ওপর। আমরা আমাদের টঙের জানলা থেকে দেখতুম সোজা-পথ, বাঁকা-পথ পায়ে-চলা পথের মতো একরকম পথ, অসৎ পথে যাতে না যেতে হয় তাই সবাই কেমন দান করছে। পুনপুন পরামর্শ দিত— 'চল রে বুবু, আমরাও বাবার নামে দান করি। তা'লে আর অসৎ পথে যেতে হবে না।' তখন, যে ফ্রকটা আমার দু'চক্ষের বিষ ছিল সেই ফ্রক আর বাবার পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা ফুটো পয়সা বার করে আমরা ছুট্টে গিয়ে টঙের জানলা থেকে দান করতুম।

—'আমাদের বাবার নাম দুগ্‌গি, দুগ্‌গির নামে দান করলুম।' চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতুম আমরা, নিজেদের বদান্যতায় নিজেরাই মুগ্ধ হয়ে।

এইরকমই ছিল আমাদের আকাশের সঙ্গে মোকাবিলা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একাদশ অধ্যায়

ছদ্মবেশী অসুর-অসুরিণী

ভিখিরিদের প্রতি সদয় না হবার একটা মস্ত বড় কৈফিয়ৎ আছে অবশ্য আমাদের। রাবণ তো ভিক্ষে নিতে এসেই সীতাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল কিনা। শূর্পণখাও তো ভিখারিণীই। প্রেমভিখারিণী অবশ্য। কিন্তু অতশত তো আমরা বুঝতুম না। আমাদের চেতনায় শূর্পণখা একটি ভালোমানুষের মেয়ে সেজে আসা রাক্ষসী, যে রামের কাছে রাম-ভিক্ষে এবং লক্ষ্মণের কাছে লক্ষ্মণ-ভিক্ষে চাইতে এসেছিল। পমপমদিদি গল্পটা যেভাবে কায়দা করে বেঁকিয়ে চুরিয়ে আমাদের বলে তাতে এই ভিক্ষের ব্যাপারটাই প্রাধান্য পায়। এই কায়দাটা পমপমদিদির কাছে শিখে নিতে পারিনি বলে নিজের ছেলেপুলেদের বেলায় প্রয়োগ করে উঠতে পারিনি। বিয়ের কথা বলে ব্যাপারটা চাপা দেবার চেষ্টা করি, কিন্তু ছেলেমেয়ে দুজনেই সঘৃণায় প্রতিবাদ করে— 'রাম লক্ষ্মণের তো সীতা-উর্মিলার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে, আবার শূর্পণখার সঙ্গে বিয়ে কী করে হবে?' এটা বলেই তারা বিজ্ঞের মতো হেসেছিল, অর্থাৎ 'এ ম্যা, শূর্পণখাটা কী বোকা!' হায় শিশু তোমরা একস্ট্রা-ম্যারিটালের রহস্য সম্পর্কে কিছুই জানিলে না, সরলমতি তোমরা বহুবিবাহের মহিমা তো প্রত্যক্ষই করো নাই।

শুধু রাবণ-শূর্পণখা কেন? 'ঠাকুরমার ঝুলি'র রূপতরাসী ভর্তি যে রাক্ষস-রাক্ষুসী, খোক্কস-খোক্কসী? কে সুন্দরী মেয়ে সেজে, কে দুঃখিনী মেয়ে সেজে রাজা-রাজকুমারকে ভুলিয়ে রানি হয়ে বসছে, তারপর চুল ছুঁড়ে গায়ে মারতেই 'রাজা বোকা হইয়া যাইতেছেন, নিত্যই রাজার হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে।' কাজেই আমরা রাস্তা ভর্তি রাবণ শূর্পণখা আর রূপতরাসী দেখতে পেতুম।

খুব ভোরবেলায় গলায় খোল ঝুলিয়ে গান গাইতে গাইতে যেত উঁচু দরের বোষ্টম ভিখারি।

'হরে মুরারে মধু কৈটভারে
গোপা-লো গো-বিন্দ মুকুন্দ শৌরে....।'

এই গানটা আমাদের খুব খারাপ লাগত। লোকটার খনখনে গলা। নস্যির গুঁড়ো, বিড়ির গন্ধ সব কিছু বেরোত গানটা থেকে। 'কৈটভারে' আর 'মুকন্দ শৌরে' কথাগুলোকে কেন জানি না আমাদের বিচ্ছিরি বুড়োটে-বুড়োটে লাগত। 'শৌরে'টা তো রীতিমতো পাকা অসভ্য কথা বলে ভাবতুম। পরে যখন 'শৌরি বাসুদেব' এই শব্দদ্বয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলুম তখন ভাবতুম এই মহাজাগতিক ধ্বনিনিচয়কে কী করে দুটি অবোধ শিশু অশ্লীল ভেবেছিল! শিশুকাল আর পরিণত কালের মধ্যে কি কোনও উপাদানগত পার্থক্যই আছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা হলে ?

লোকটি আরও গাইত—

'যদি গৌরাঙ্গ না হত কেমন বা হত কেমনে ধরিত দে'
রাধার মহিমা প্রেমগুণসীমা জগতে জানাত কে।'

এটা হলেই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমার কান খাড়া হয়ে যেত। টমটমদিদি খুব ফর্সা ছিল বলে বাবা তাকে 'গৌরাঙ্গ' বলে আদর করতেন। আমার ধারণা ছিল গানের গৌরাঙ্গ আমার টমটমদিদি। টমটমদিদির উল্লেখ থাকায় গানটা আমার বিশেষ প্রিয় ছিল। 'কেমনে ধরিত দে'র রহস্যময় উচ্চারণ শোনামাত্র আমার গায়ে কাঁটা দিত, তারপরে যখন 'রাধার মহিমা প্রেমগুণসীমার' সুর সামান্য মুড়কি কাজ দিয়ে গাওয়া হত আমি অমনি লেঠা মাছের মতো উল্টে গিয়ে দু হাতে মুখ ঢাকতুম আর পুনপুন সঙ্গে সঙ্গে আমায় এক ঠেলা মেরে বলত 'কী রে কাঁদছিস ?' এতক্ষণ কাঁদছিলুম না, একটা ঘোর ছিল, এবার কিন্তু সত্যি সত্যি চোখে জল ভেসে উঠত। মনটা হু হু করত। রাধার মহিমা প্রেমগুণসীমা সে যে কী মন কেমন করা জিনিস ! ছোট্ট বুকের ভেতরটা উথালপাথাল করত। সেই কান্নাকাটি দেখলে বড়রা সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিত হয়ে যেতেন আমার বুনবুনের জন্যে মন কেমন করছে। বুনবুনকে অবিলম্বে তলব পাঠানো হত। এবং সে 'রেমো'র কাঁধে চড়ে এসে উপস্থিত হলে আমাদের খেঁল্লাবাটি খুব জমত।

'ভজো গৌরাঙ্গ কহো গৌরাঙ্গ লহো গৌরাঙ্গের নাম রে,
যে জনা গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে।'

এ গানটাও খুব ভালো লাগত। গৌরাঙ্গের উল্লেখ থাকায়। 'ভজো' কথার মানে আমরা মায়ের পেট থেকে পড়েই জানতুম, কেননা আমাদের বাড়িতে খুব ভজন হত। টমটমদিদিই গৌরাঙ্গ, তাকে ভজনা অর্থাৎ পুজো করলে কারুর প্রাণপ্রিয় হওয়া যাবে এই আইডিয়াটা আমাদের প্রাণ স্পর্শ করত। সত্যিই তো টমটমদিদি তো পুজো করবারই জিনিস। কী সুন্দর ঠাকুরের মতো ফর্সা, কোঁচকা কোঁচকা ঠাকুরের মতো চুল, জলচৌকি পেতে দিবারাত্র পড়াশোনা করে, পমপমদিদি, ই-দাদা, সু-দাদা এরা তো টমটমদিদিকে পুজোই করে প্রায় !

আর একজন যেত একটু বেলায় সে যেন চটের বা জুটের বিজ্ঞাপন। মাথায় চটের ফেট্টি বাঁধা, শতচ্ছিন্ন হাফ-প্যান্টে চটের তাপ্পি মারা, নীল রঙের একটা মোটা জামাতেও তাই। কাঁধ থেকে ঝুলত একটা মস্ত চটের থলে, থলের তলার দিকটা বেশ ভারী এবং ফুলো। একে আমরা বলতুম ঝোল্লাবুড়ো। ঝোল্লাবুড়ো নামটা সম্ভবত বুনবুন কিংবা কানুমামার দেওয়া। বুনবুন প্রায়ই আসত। একদিন এসে বিনা ভূমিকায় বলল— 'তোদের গলি দিয়ে ঝোল্লাবুড়ো গিয়েছিল ?'

পুনপুন সঙ্গে সঙ্গে বলল— 'রোজই তো যায়।'

কে যে ঝোল্লাবুড়ো তা আমাদের বুঝিয়েও দিতে হল না। দেখা গেল ঝোল্লাবুড়ো প্রথমে বারো নম্বরের গলি দিয়ে যায়, পরে আমাদের গলিতে আসে। এতে আমাদের খানিকটা ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স জাগে। আমরা প্রমাণ করতে চেষ্টা করি যে ঝোল্লাবুড়োর ভ্রমণসূচি এক এক দিন এক এক রকম। কিন্তু সফল হই না। দেখা যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝোল্লাবুড়োর বারো নম্বরের ওপর পক্ষপাত দিনের পর দিন বজায় থাকছে। ঝোল্লাবুড়ো বাসি রুটির ভক্ত ছিল, লোকে আর যা ভিক্ষে দিত— চাল, পয়সা, সে সবের জন্য সে তার ঝোলা বাড়িয়ে দিত। ভাত ডাল দিলে গাঁউ গাঁউ করে খেয়ে নিত, খালি রুটিগুলি সযত্নে হাত পেতে নিয়ে ঝেড়েঝুড়ে খবরের কাগজে মুড়ে ঝোলার মধ্যে রেখে দিত। ঝোল্লাবুড়ো যে রাবণের তুতো ভাই এ সম্বন্ধে আমাদের কোনও সন্দেহই ছিল না। আমাদের উঠোনে বড় বড় চৌকো সিমেন্টের স্ল্যাব লাগানো ছিল। তার চারপাশের রেখাগুলোকে আমরা ভারি ভক্তি করতুম। ঝোল্লাবুড়োকে রুটি দেবার সময়ে মা বা পিসিমা বা দিদিরা যাতে এই গণ্ডির ভেতরে থাকেন সেটা আমরা খেয়াল রাখতুম। ঝোল্লাবুড়োর রুটিপ্রীতি একটা অতি রহস্যময় ব্যাপার ছিল আমাদের কাছে। কিন্তু কোনওদিন সে রহস্য ভেদ করবার চেষ্টা আমরা করিনি। বড়রাও করেননি। এখন বুঝতে পারি, এই রুটি শুকিয়ে গুঁড়ো করে সে নিশ্চয়ই রাস্তার ধারের চপ-কাটলেটের দোকানে বিক্রি করত। এখন এটা খুবই পরিচিত ব্যবসা। কিন্তু আমার মনে হয় এই ব্যবসার আইডিয়ার প্রথম উদ্ভাবক প্রতিভাবান শ্রীল শ্রীযুক্ত ঝোল্লাবুড়ো। রুটির গুঁড়োর লগ্নিবিহীন ব্যবসাদারদের লম্বা বংশের আদি জনক আমাদের ঝোল্লাবুড়ো। অনেকে অনেক বড় বড় মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন বলে গর্ব করেন। কে গান্ধী, কে রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন, আমরাও বুক ফুলিয়ে বলতে পারি আমরা ঝোল্লাবুড়ো নামক মহাপ্রতিভার সংস্পর্শে এসেছি।

ঝোল্লাবুড়ো সম্পর্কে আর একটা সন্দেহও অবশ্য আমাদের ছিল। তার অত বড় ঝোলার সবটাতেই কি রুটি থাকে? সে নিশ্চয়ই ছেলেধরা। কিংবা কিংবদন্তির সেই একানড়ে।

'কানদুটো তার নোটা নোটা
চোখদুটো আ-গুনের ভাঁটা
কোমরে বি-চুলির দড়ি
বেড়ায় লোকের বাড়ি বাড়ি
যে ছেলেটা কাঁ-দে
তাকে ঝুলির ভেতর বাঁ-ধে
গাছের ওপর চ-ড়ে
আর তুলে আছাড় মা-রে।'

এই একানড়ে সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেন পিসিমা। মা একদিন হঠাৎ আমাদের একানড়ে ভীতির কথা জেনে ফেলেন এবং তাদের অনস্তিত্ব বিষয়ে আশ্বস্ত করেন। কিন্তু যেটুকু ইতিমধ্যেই আমাদের কানে ঢুকেছিল সেটুকুই বেশ ভালো করে মরমে পশেছিল। একানড়েকে আমরা ভয় করতুম আবার করতুমও না। কোলরিজের সেই 'টেম্পোরারি সাসপেনশন অফ ডিসবিলিফ' আরকি। ভয় করতে ভালো লাগত তাই অবিশ্বাসটাকে সাময়িকভাবে মুলতুবি রেখে দিতুম।

আমাদের তৃতীয় ভিখারি একটি জোড়া। একজন ঠেলাগাড়িতে বসে থাকত, তার হাত পা সব ব্যান্ডেজ বাঁধা, মুখেরও চারপাশে ব্যান্ডেজ। সবই যে কতটা ময়লা তা আর

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কহতব্য নয়। অন্য জন গাড়িটা ঠেলত। এর একটা চোখ ছিল লিচুর শাঁসের মতো। অন্য চোখটা দুঃখী, কাতর। এরা পাড়ায় ঢুকলেই দূর থেকে পয়সা ছোঁড়া শুরু হয়ে যেত। ফুটো পয়সা, তামাটে রঙের। ডবল পয়সা আজকালকার পাঁচ পয়সার মতো দেখতে, যাকে আমি বলতুম 'ডবলি'। এই-ই পড়ত সাধারণত। এদের সবাই কুঠে বলত।

একদিন কুঠেরা গড়গড় করে যাচ্ছে, আমরা 'রকে' দাঁড়িয়ে দেখছি, হঠাৎ আমাদের বন্ধু মানিকের পিসতুত দাদা দীপুদা চালিয়াতের মতো বলে উঠল—'সব সাজা কুঠে। আসল কুঠে আর হতে হচ্ছে না।' যেন কুঠে হওয়াটা খুব বাহাদুরির ব্যাপার।

কথাটা দীপুদা বেশ জোরেই বলেছিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা কাণ্ড ঘটল। যে লোকটা গাড়ি চালাচ্ছিল, তার দুঃখী দুঃখী চোখটা হঠাৎ একটা জ্বলন্ত কয়লার টুকরো হয়ে গেল। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল— 'কী-ই ? সাজা কুঠে ? নিতে ! দেখা তো !' অমনি গাড়িতে বসে-থাকা লোকটা তার ব্যান্ডেজ-অলা হাত বাড়িয়ে দিল, গাড়ি-ঠেলা লোকটা ব্যান্ডেজ খুলতে লাগল। একটা ব্যান্ডেজের তলায় আরেকটা, তার তলায় আরেকটা, তার তলায় আরেকটা, তার তলায় আরেকটা। লোক জমে গেছে রাস্তায়, লোকটা ব্যান্ডেজ খুলেই যাচ্ছে। শেষকালে দেখা গেল ব্যান্ডেজের তলায় কিছুই নেই। হাতের জায়গাটা ফাঁকা। কনুইয়ের শেষ প্রান্তে ধক ধক করছে ঘা।

দেখে সবাই পালাতে লাগল। চিৎকার করতে লাগল কেউ কেউ। জ্বলন্ত কয়লার টুকরো আমাদের দিকে ছুঁড়ে লোকটা গড়গড় গড়গড় করে গাড়ি ঠেলে চলে যেতে থাকল। এরই মধ্যে কাণ্ড করল বুনবুন। সে হঠাৎ তীরবেগে রক থেকে ছুটে নেমে গিয়ে পড়ে-থাকা সেই স্তূপীকৃত ব্যান্ডেজ দু হাতে তুলে নিয়ে বলল— 'তোমার ব্যান্ডেজ, ও কুঠে তোমার ব্যান্ডেজ নিলে না ?'

—'ফেলে দে ফেলে দে'—আমাদের বাড়ি থেকে পিসিমা চেঁচাচ্ছেন।

—'ফেলে দে, ফেলে দে'—অবিনাশ জেঠু চেঁচাচ্ছেন।

বিমূঢ় জনতা দাঁড়িয়ে আছে, আগুন-নেবা-ছাই চোখে কুঠেরা চলে যাচ্ছে, বুনবুন হাত থেকে ব্যান্ডেজ ফেলে দিয়ে, বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছে, সাদা চুল ধবধবে ফর্সা ঠাকুর্দাদা আমাদের সদর দিয়ে বেরিয়ে বুনবুনকে কোলে তুলে নিলেন, সমবেত জনতার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ও ডাক্তার হবে।'

ডাক্তার পরিবারের ছেলে তো ডাক্তার হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু ঠাকুর্দাদা এমন করে বললেন যেন এটা একটা রেভিলেশন। জন দা ব্যাপটিস্ট যেন উটের লোমের পোশাক পরে, চামড়ার কৌপীন পরে বলছেন— 'আমার চেয়েও শক্তিমান একজন, সেই একজন আসছেন।' যোগমায়া যেন আকাশ থেকে তর্জনী শাসিয়ে পৃথিবীর তাবৎ কংসকে বলছেন— 'তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।'

রবিঠাকুর যেন চোখ বুজিয়ে গাইছেন—

'মহারাজো, এ কি সাজে এলে হৃদয়পুর মাঝে,
চরণতলে কোটি শশী সূর্য মরে লাজে ॥
মহারাজো !'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পিসিমা নিজের বাবাকে এবং বুনবুনকে তেড়ে মারতে এলে, ঠাকুর্দাদা শান্তভাবে বললেন,— 'ঘাবড়াসনি। লোকটা সত্যিই সাজা কুঠে। হাতটা বোধহয় কোনও কারণে অ্যাকসিডেন্টে-টেন্টে গেছে, কনুইয়ে রক্ত-চন্ত লাগিয়ে ওইভাবে ভিক্ষে করে। দে বরুণকে শুদ্ধ করে দে।' একটু থেমে ঠার্কুদাদা বললেন— 'আর কুঠে হলেই বা কী!'

ভিখারি-খেদানো ঠাকুর্দাদা আর ভিখারির ব্যান্ডেজ ঘাঁটা বুনবুনের মাথার পেছনে জ্যোতির্বৃত্ত এঁকে-দেওয়া ঠাকুর্দাদাকে এতদিনে বোধহয় খানিকটা মেলানো গেল, তাই না? আসল কথা, প্রত্যেক প্রাণীরই প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও বাঁচবার দুরন্ত তাগিদ থাকে। চল্লিশ লাখের ওপর লোক যাতে মারা গিয়েছিল সেই পঞ্চাশের মন্বন্তরে করুণাকে প্রশ্রয় দিলে তলিয়ে যেতে হবে এ কথা বোধহয় শিব-ডাক্তারবাবুর ভেতরের প্রাণীটা মোক্ষম বুঝেছিল; তাঁর ভেতরের পুরুষটা নিজেকে নিজে গড়েছিল বলে ভিক্ষাবৃত্তিকে মর্মান্তিক ঘৃণা করত, তাঁর ভেতরের মানুষটা ভেক ধারণ ও প্রবঞ্চনাকে মেনে নিতে পারত না; আর তাঁর ভেতরের ডাক্তারটা চিকিৎসাকেই পরমধর্ম জ্ঞান করত, তার কাছে কুঠে আর অ-কুঠের কোনও তফাত ছিল না।

নিজের ঠাকুর্দাদার সাফাই গাইছি? হবেও বা। পিতৃপুরুষের প্রতি কিছু কর্তব্য তো আমাদের থাকেই!

আমাদের চতুর্থ ভিখারিও এক যুগল। পুরুষটি অন্ধ। অমোঘভাবে বন্ধ চোখ নিয়ে সে হাতড়ে হাতড়ে পথ হাঁটত। তাকে হাঁটাত তার স্ত্রী। স্ত্রীটি বেশ বুড়ি। তুলনায় অন্ধ স্বামী সবল। তারা এই ভাবে ভিক্ষা চাইত:

অন্ধ— (গুঙিয়ে) বাব্বা!

বুড়ি— (ক্যানকেনে গলায়) বাব্বা গো!

অন্ধ— (গুঙিয়ে গুঙিয়ে) আমি অন্ধ-অ।

বুড়ি— (দোহারকি দিয়ে) অন্ধ-অ

দুজনে একত্রে— অন্ধকে একটু দ-য়া। একটু দয়া...বাব্বা অন্ধ-অ।

'দয়া তব দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে' গানটি যখন প্রথম শুনি, মনে হয়েছিল কোথায় যেন 'দয়া'র এমনি পুনরাবৃত্তি এমনি গোঁত্তা খাওয়া শুনেছি। সেই ভিখারিযুগলের উচ্চারণের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব গানটির মূল নকশা লুকিয়ে ছিল। তবে সাধারণত আগে একটা সৃষ্টিকর্ম হয় তার পরে তার ক্যারিকেচার হয়। এক্ষেত্রে ক্যারিকেচার বা প্যারডিটাই আগে হয়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ কি এই ঘরানার কোনও ভিখারি-স্লোগান শুনেছিলেন? হেমন্ত মুখোপাধ্যায়-লতা মঙ্গেশকরের প্রথম দ্বৈত সঙ্গীত 'তোমার হল শুরু আমার হল সারা' শুনেও মনে হয়েছিল কোথায় যেন এই এফেক্ট শুনেছি। আবারও বলি, শুনেছিলুম সেই ভিখারি-দম্পতির দ্বৈত উচ্চারণে। অন্ধ স্বামীর গলা মোটা, ভারী, বুড়ি স্ত্রীর গলা সরু ফিনফিনে বা ক্যানকেনে। ফলে দুজনের উচ্চারণই পরিষ্কার আলাদা আলাদা ভাবে শোনা যেত। এবারেও, প্যারডিটাই আগে হয়ে গিয়েছিল, বলা বাহুল্য।

তবে এবার 'স্বামী-স্ত্রী' ধারণার সংশোধন করতেই হয়। একদিন আমরা আবিষ্কার করি এরা আদৌ স্বামী-স্ত্রী ছিল না। টঙের জানলা থেকে তেঁতুলের আচার খেতে খেতে একদিন আমি আর পুটপুটদিদি দেখে ফেলি অন্ধ আর তার তথাকথিত স্ত্রী প্রবল ঝগড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করছে। বুড়ি বলছে—'নিয্যস পয়সা সরিয়েচিস। কাল থেকে অন্য স্যাঙাত ধরবি। কড়ার ছিল আদ্দেক দিবি তবে তোর মাগ সাজবো।' অন্ধ তখন রীতিমতো চক্ষুষ্মান হয়ে বুড়িকে এই মারছে তো সেই মারছে।—'আদ্দেক তো সরিয়েই রেখেচিস, আবার কিসের আদ্দেক ?"

তখন আমরা খানিকটা বড় হয়ে গেছি। 'মাগ' শব্দটার মানে স্বভাবতই বুঝতে পারিনি। তবে পুটপুটদিদি আন্দাজ করেছিল এবং বলেছিল—'এ মা, বউ নয়, সেজেছে।' আমিও বলি—'অন্ধ নয়, সেজেছে।' তখন আমাদের তেঁতুলের আচারের কাঁইবিচি রাস্তার ওপর টুকটাক পড়তে থাকে এবং ওরা আমাদের উপস্থিতি টের পেয়েই চট করে চোখ বুজে বলতে থাকে— 'অন্ধ বাব্বা অন্ধ'। বোধ হয় চমকে গিয়ে দুজনেই চোখ বুজে ফেলেছিল, তাই ওরা বেশ হোঁচট খায়, আমরা হেসে উঠি এবং ওরা তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দুপুরের ভাত-ঘুমন্ত-গলি পগারপার হয়ে যায়। ঠিক যেন সুর তাল ফসকে আর তালে ফিরতে না পেরে আনাড়ি গাইয়ে স্টেজ ছেড়ে পালাচ্ছে।

পঞ্চম ভিখারিটি ছিল দুর্দান্ত। এ প্রতিদিন স্টেজে অ্যাপিয়ার হত না। বড় বড় অ্যাক্টর-অ্যাকট্রেসদের মতো এ ছিল খেয়ালি বা খেয়ালিনী। এ একটি দশাসই জবরদস্ত বিধবা মহিলা। ফর্সা রঙ, ফর্সা থান পরা। মাথার অল্পস্বল্প কয়েকগাছি চুল চুড়ো করে বেঁধে রাখত। বাহুতে তারকেশ্বরের মাদুলি ছিল। পূজারিণীর ভঙ্গিতে একটা কানা উঁচু কাঁসা বা ভরনের পরাত এ ডান হাতে ধরে থাকত এবং দুপুর দেড়টা-দুটোর সময়ে গলির মোড়ে আবির্ভূতা হত। বাজখাঁই গলার চিৎকারে সমস্ত পাড়া ধড়ফড়িয়ে উঠে বসত।

—'তুই মর, তোর পুত মরুক, তোর ভাতার মরুক, তোর চোদ্দো পুরুষ মরুক, ভাতারখাকি, শত্‌খোয়ারি মরুঞ্চে বেহায়া অবুশ্যো মেয়ে মা-নুষ...।'

এর অর্থ হল, বাড়িতে নিরামিষ ঘরে যা যা রান্না হয়েছে চচ্চড়ি, শুকতো, ডালনা সব কিছু ওর জন্যে রেডি রাখতে হবে। ও পাড়ায় ঢুকলেই ডেকে বসিয়ে ওর পরাতটিতে সব বেড়েটেড়ে ঠিকঠাক করে দিতে হবে। না দিলে, দিতে দেরি করলে, অর্ঘ্য পছন্দ না হলে... সব ক্ষেত্রেই ও শাপশাপান্ত দিয়ে সবার চোদ্দোপুরুষ উদ্ধার করে দেবে। এই ভিখারিণী থামত না। একই ছন্দে বিশাল নিতম্ব দোলাতে দোলাতে চলে যেত। অর্থাৎ একে ভিক্ষে দেওয়ার জন্যে মানুষকে জ্যোতিষ, অঙ্ক এবং নাচ তিনটেই জানতে হত। স্কিপিং দড়ি লাফানোর খেলা দেখেছেন নিশ্চয়! একজন দড়ি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লাফাচ্ছে, আর একজন বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাল ঠুকছে, ঠুকতে ঠুকতে ঢুকে পড়ল স্কিপিং দড়ির ঘেরের মধ্যে। এই খেলা অভ্যেস থাকলেই ওকে ভিক্ষে দেওয়া সম্ভব। সুতরাং পাড়াসুদ্ধ লোককে গালিগালাজ খেতেই হত। আসার সময়টিও ছিল চমৎকার! ঠিক যখন বাড়ির গিন্নিরা হাঁড়ি চেঁছে খেয়ে-দেয়ে ঢেঁকুর তুলছেন। ও হ্যাঁ বলতে ভুলেছি, ওর থালায় বা পরাতে বেশ খানিকটা ভাতডাল থাকতই। না হলে থালা হাতে বসবে কী করে ? ভাবটা, যেন ভিন পাড়া ভালো পাড়া। সেখান থেকে ভাত ডাল নিয়ে ও এই পোড়ারমুখো পাড়ায় ঢুকেছে তরি-তরকারি নিতে। কিন্তু যেমন আবাগী, নি-মুরুদে পাড়া! কিছুই দিচ্ছে না। ফলে ও-ই গালাগালির ছড়া দিতে দিতে চলেছে। এই ভিখারিণী ছিল একটি ফেনোমেনন। এ চলে গেলে পাড়া শ্মশানের মতো চুপচাপ হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেত। মায়েরা বাচ্চাদের চিবুক ছুঁয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে বলতেন—'ষেটের বাছা ষাট ষাট। বাছার বালাই দূরে যাক।'

খালি আমার ঠাকুমা-পিসিমাকে ও ভয় দেখাতেও পারত না, জব্দ করতেও পারত না। ওর আওয়াজ শুনতে পেলেই ঠাকুমা বই বুকে তাঁর বাত-শয্যায় উঠে বসতেন—'মনো, অ মনো।'

পিসিমা জবাব দিতেন— 'শুনতে পাচ্ছি, চেঁচিও না।'

ঠাকুমা— 'একটি ফোঁটাও দিবিনি বলে দিচ্চি ওই তাড়কা রাকুসিকে।'

পিসিমা— 'তুমি বললেই দিচ্চি আরকি!'

পিসিমা-ঠাকুমার এই মতের মিল ও সাময়িক সখিত্বের সম্ভাবনায় বাজখাঁই ভিখারিণী পাড়ায় ঢুকলেই আমরা পুলকিত হয়ে উঠতুম।

এরাই আমাদের ধেনুকাসুর, শকটাসুর, অঘাসুর, বকাসুর.... কোনও না কোনওভাবে হয় ছদ্মবেশ ভেদ করে, নয় মজা পেয়ে, নয় রোমাঞ্চিত হয়ে, অর্থাৎ ভয় না পেয়ে আমরা এদের জয় করেছিলুম। তবে ভয় যে একেবারে কাউকেই পেতুম না তা নয়। পেতুম একজনকে। সে হল হীরেমোতি।

হীরেমোতিকে দেখা যেত কোনও কোনও শীতসন্ধের ঝুঁঝকো আঁধারে রামরতন বোসের লেনের মামারবাড়ির চারপাল্লার কাটা দরজা ঠেলে ঝুমঝুম শব্দে ঢুকতে। পরনে তার ভয়ংকর কালো শাড়ি। গায়ে হাতে মুখে কালো রঙ মাখা, ঠোঁট দুটো টকটকে লাল, কালো মুখের মধ্যে চোখের সাদা যেন শাঁকালুর মতো ডেলা পাকিয়ে আছে। নাকে ইয়া রুপোর নথ, গলায় হাঁসুলি হাতে বাউটি, কানে ঝুমকোর মাকড়ি। পায়ে ঝমর ঝমর মল বাজিয়ে সে নাচত। হাত দুটো তার লম্বা লোহার হাত। আমি পুনপুন বুনবুন মা-দিদিভাইয়ের আঁচল শক্ত করে ধরে দাওয়ার ওপর কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে তার কিম্ভুত নাচ দেখতুম।

AMARBOI.COM

একদিন মা বললেন— 'ও মা, বিদ্যা পাবন বরুণ তোরা ভয় পাচ্ছিস বুঝি, ও তো দুলারি! দুলারি তুমি দেখাও তো তুমি কে!'

তখন হীরেমোতি লোহার হাত খুলে উঠোনের কল থেকে মুখ-টুখ ধুয়ে এলো। কাজলের মতো কালো ধুয়ে সাঁঝের আকাশের মতো একটা স্নিগ্ধ কালো ফুটে উঠল, ঠোঁটের লাল মুছে অপ্রস্তুত, লাজুক হাসি। টপটপ করে মুখ-ধোয়া জল আর ঠোঁট-ধোয়া হাসি ঝরে পড়ছে বুকের কালো কাপড়ে।

পুনপুন তীক্ষ্ণ স্বরে বলল— 'ওই কাপড়ের তলায় কী আছে দেখবো!' (সর্বনাশ! প্রায় 'চোলি কী পিছে'র মতো!)

দিদিভাই বললেন— 'দেখবি?' বলে হীরেমোতিকে ডেকে নিয়ে গেলেন। একটু পরে দিদিভাইয়ের লালপাড়-কোরা মিলের শাড়ি পরে হীরেমোতি পুরোপুরি দুলারি হয়ে হাসতে হাসতে এসে বলল— 'গোড় লাগে মায়ি, গোড় লাগে।'

ব্যস, শেষ রাক্ষসীটি বধ হয়ে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বাদশ অধ্যায়

হরিবংশ-৫—টমদিদি

পুনপুন, বুনবুন, তোরা বাবার কথা বলিস, ঠাকুর্দার কথা বলিস, দাদাদের কথা, দাদাভাইদের কথা বলিস। দ্যাখ, আমাদের তো হরিবংশ? আর সেই হরিবংশের হরিষে বিষাদ আমি বুবু একজন হরি-ণী। আমার বংশ চলে এসেছে বৃদ্ধ প্রপিতামহী, প্রপিতামহী, পিতামহী, বৃদ্ধ প্রমাতামহী, প্রমাতামহী, মাতামহী, মা, দিদিরা···এই প্রমীলা ধারায়। বংশ বলতে এঁদের কথা তো কেউ বলে না! আমার প্রকৃত কুল মাতৃকুল। মায়ের মা শুধু নয়, বংশের যেখানে যিনি স্ত্রীলিঙ্গে আছেন, সব্বাইকে নিয়ে আমার হরি-ণী বংশ। বাবা, ঠাকুর্দা, দাদা, দাদাভাইদের আমি অস্বীকার করছি না, কিন্তু ওই যে বললুম হে মাতঃ, তোমার কুলের কথা যে কেউ বলে না!

পমদিদির কথা বলেছি। এবার টমটমদিদি অথবা তিলোত্তমা অথবা ভক্তি অথবা গৌরাঙ্গদিদির কথা বলি। আগেই উল্লেখ করেছি টমদিদিকে সবাই পুজো করত! টমদিদির ছোটরাও, টমদিদির বড়রাও। কেন? টমদিদি যে সত্যি-সরস্বতী, আবার কেন?

টমদিদি হল আমাদের বাড়ির বিস্ময়-বালিকা, প্রডিজি। একদিন মা পূর্ণিমার রাতে দুধ-ধোয়া ছাতে মাদুর পেতে বসে শুক্ল রাতে চাঁদের তরণী বেয়ে যাওয়া দেখছিলেন। বাবা ছিলেন তাঁর মনের মধ্যে। কী জানি কী ইচ্ছে হল মায়ের। চাঁদের তরণী থেকে একটি আলোর মেয়ে হাউইবাজির ফানুসের মতো দুলতে দুলতে দুলতে দুলতে হঠাৎ যেন জ্বালানি ফুরিয়ে টুপ করে মায়ের কোলে খসে পড়ল। মা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে মেয়ে দেখলেন, তারা খসার মতো খসে পড়লেও এ তো বাপু উল্কা নয়? ছোট্ট মেয়ের চিবুকে মা চুমো রাখলেন, ডাকলেন 'ভক্তি! ভক্তি!' অমনি সেই মেয়ে উঠে বসে মায়ের গলা জড়িয়ে বলল—'আছি আছি!'

—'কোথায় আছিস?'

—'আছি এই ছাতে, বাগানে, পুষ্পে, কাননে, হাওয়ায়, গাওয়ায়, শূন্যে, পুণ্যে সর্বত্র আছি মা।'

মা বললেন—'তাই যদি হয় মা, তাহলে যাও, ভাণ্ডারে তৈল আছে, ক্ষার-খৈল আছে মেখে এসো, কলঘরে তোলা বালতিতে জল আছে, হুকে গামছা কাপড় আছে, নেয়ে ধুয়ে পরে এসো, আর রান্নাঘরে রেঁধে-বেড়ে রেখে এসেছি যা ইচ্ছে খেয়ে এসো।'

পলক ফেলতে না-ফেলতে মেয়ের নাওয়া-ধোওয়া শেষ, চিতল হরিণের গায়ের রঙের ফ্রক পরে, চাঁচর চুল সোজা করে আঁচড়িয়ে, মেয়ে এসে মায়ের কোলে বসল। এক হাতে দুটি চাটিম কলা, আর এক হাতে "ক্ষীরের পুতুল"।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা বললেন—'লাল টুকটুকে ফ্রক রেখেছি মা, পরনি কেন ?'

মেয়ে বলল—'রূপ যে রূপ ! নুকিয়ে রাখব । জাজ্জ্বল্য হব না ।'

মা বললেন—'গন্ধ তেল ঢেলে এসেছি মা, মাখোনি কেন ?'

—'মাছি আসবে, পিঁপড়ে আসবে, ভোমরা আসবে মা, ডাঙশ আমি খাব না ।'

মা বললেন—'পিঠে-পায়েস, সুরুয়া-দমপোক্ত, বিরিয়ানি-বাকরখানি··· খেলে না কেন ?'

—'রাজসিক খেলে যদি রানি হই, মা-ধরণীর ছোঁয়া তো আর পাব না মা, তাই

চাটিম কলা চাটিম
হটর হটর হাঁটিম
গোলাবাড়ি ছাদনদড়ি কুটুম কাটুম লাটিম ।'

মা বললেন—'বেশ । তা "ক্ষীরের পুতুল" কেন ?'

মেয়ে বলল—

'ক্ষীরের পুঁতুল ক্ষীরের পুঁতুল করছো তুমি কি ?
এই দেখো না আমি কেমন পড়তে শিখেছি ।
ঢোল ডগর ঢোল ডগর ঢোলে দিলে ঘা
কে বলেছে তোমার খুকু লিখতে জানে না ?
ঘটর ঘটর পবনের না'
হট্টমালার দেশে যা—'

ও মা ! মায়ের গালে হাত, মা দেখলেন ছোট্ট খুকু, খুকু তো নয়, যেন বাছুর । জন্মাতে না-জন্মাতেই সে এখান থেকে ছিটকে ওখানে, ওখান থেকে ছিটকে সেখানে চলে যাচ্ছে । দুধের বাটি উলটে, কাজললতা লেপটে খলবল খলবল করে হামা টানছে ।

কোথায় গেলি রে ? কোথায় গেলি রে ?

তক্তপোশের তলায় ।

কোথায় গেলি রে ? কোথায় গেলি রে ?

ধানের আড়ায়, চালের বাতায়, চৌকাঠ-মৌকাঠ চোদ্দঘাট পেরিয়ে দেখতে দেখতে খিড়কি ! এ যে ম্যাজিক মেয়ে !

হাঁ করলে কথা বোঝে, বানান করলে দ্রব্য খোঁজে,

স্বরে অ স্বরে আ আমায় এখন ডেকো না

[illegible]ন বন্ন, বিসর্গ সন্ধি, তদ্ধিত পেত্যয়, উৎপাত তৎপুরুষ সমস্ত দেখতে দেখতে শেষমেশ করে ছানা তখনও লাল ঠোঁট হাঁ করে রয়েছে । খিদে আর মেটে না খিদে আর মেটে না ।

এ কি মানুষের ছানা না গরুড়ের ছানা ?

'তরুণ গরুড়সম কী মহৎ ক্ষুধার আবেশ !'

আকাশ ঘোরঘটা করে এসেছে । মা কাজে আছেন । ছেলেমেয়েরা কে কোথায় খেয়াল নেই । হঠাৎ হুড়মুড়িয়ে বজ্রপাত হল । কী প্রকাণ্ড আওয়াজ ! যে যেখানে আছে আছড়ে পড়ে কাঁপতে লেগেছে । মা দৌড়চ্ছেন, দৌড়চ্ছেন । ছোট্ট খুকু কোথায় গেল ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাঁতকপাটি লেগে গেল না কী ? জানলার ধারে খুকু চুপটি করে বসে রয়েছে, হাতে সেলেট, সেলেটে অক্ষর, খুকু শোলোক লিখছে। মা ধড়ফড়িয়ে কোলে তুলে নেন—'শব্দ শুনতে পাসনি ? আওয়াজ ?'

—'ওই তো !' খুকু হাত বাড়িয়ে দেখায়। দূরে একটা তালগাছ দাউদাউ করে জ্বলে যাচ্ছে। মা ভয়ে কাঠ।

—'ভয় করেনি মা ?'

—'না তো, দেখলুম আকাশটা ফেটে গেল। ভেতরের আগুন শোঁ-ও-ও করে নেমে এসে তালগাছটাকে বিঁধে মাটি ফুঁড়ে চলে গেল।'

খুকু কোলে নিয়ে মা ঠকঠক করে কাঁপতে থাকেন। কী বাঁচা বেঁচেছে ! অবোধ মেয়ে ! কিন্তু এক ফোঁট্টা ভয় নেই ?

এ তো মেয়ে মেয়ে নয় !

সাতসক্কালে সব্বার আগে পমদিদি টমদিদি চান করে, তার পরে পিসিমা, তার পরে মা, ঠাকুমা ···এই অর্ডার। পম-টম জোড়া -দিদি। সারা পিথিমিতে তাদের জুড়ি নেই। সব সময়ে সদ্যস্নাত, বিশাল চুলের তলায় গিঁট, সেইখানে এক ফোঁটা দু ফোঁটা জল টুলটুল করছে। ওরা ভোরবেলায় ওদের ঘর ঝাঁট দেয়, পোঁছে, ধূপ জ্বালে, জলচৌকির ওপর মোটা মোটা বই থাকে। ঝাড়া পোঁছা। এক ফোঁটা ধুলো পাবে না। বই তো নয়, সব দেবতা। অগ্নি, সোম, বরুণ, সূর্য, নাসত্য, অশ্বিনীদ্বয়, মরুৎ, উষা, পর্জন্য, পৃথিবী··· । বই নয়, সব ঋষি। বিশ্বামিত্র, বসিষ্ঠ, মধুচ্ছন্দা, কুত্স, অত্রি, অর্যমা, সুহোত্র, পুলস্ত্য, ক্রতু, অঙ্গিরা···অপালা, মৈত্রেয়ী, গার্গী, বাক্··· জলচৌকির একধারে শ্বেতপাথরের গ্লাসে রেকাবিতে ফুল থাকে, ছাত-বাগানের মাত-করা সব ফুল। সপ্তমুখী জবা, ডবল যুঁই, বেলী, দোপাটি, সূর্যমুখী, রজনীগন্ধা, স্থলপদ্ম আর সবার সেরা, সবাই রাজা, তবু রাজাধিরাজ—গন্ধরাজ। একটি আড়াই ফুট টবের গাছে অজস্র গন্ধরাজ, কখনও কখনও মনে হয় ফুল ? না গাছময় সদ্য-ডিমফোটা বকের ছানা ? এই সমস্ত ফুলগাছ— গ্লোব নার্সারির বাহাদুরি। কলমের গাছ সব। বাবা-মা গাছ ছাড়া ফুল ছাড়া থাকতে পারেন না। কলকাতায় এসে বৃক্ষশূন্যতায় পুষ্পশূন্যতায় আতুর হয়ে হন্যে হয়ে অবশেষে ছাত-বাগান তো ছাত-বাগানই সই। কলমের গাছ শুনে বুবু ভাবল—কিসের কলম ? খাগের কলম ? না নিবের কলম ? কলম থেকে গাছ জন্মায় ? অমন ফুলে-ফুলে ভরা গাছ ? আমার কলম তো আমি চিবিয়ে চিবিয়ে সারা, রোজ সকালে উঠে চুপি চুপি দেখি গাছ গজাচ্ছে কি না। না তো ? শেষকালে মাথায় বুদ্ধি খেলল। কী বোকা ? কী বোকা। মাটি লাগবে তো ? মাটি ছাড়া কি গাছ হয় ? গরমকালে দোপাটির টব খালি ; কলমটি তার মধ্যে আমূল পুঁতে দেয়। রোজ একটু একটু করে জল দেয়।

—'খালি টবে জল দিচ্ছিস কেন রে ?'

—'দিচ্ছি !'

ফাঁস করে না আসল কথা। বোকা হলেও এটুকু বুদ্ধি আছে যে ফাঁস করা চলবে না। কে জানে কখন বোকা বনে যেতে হয় !

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'খালি টবে জল দিচ্ছিস কেন রে ?'

—'বা রে খালি-টবের বুঝি জল-তেষ্টা পায় না ?'

তা সেই ছাতের গাছ, গাছের ছাত, ছাতের ঘর, ঘরের ছাতে পমপম-টমটমের আসন। দিদি বলতে বোন অজ্ঞান, বোন বলতে দিদি অজ্ঞান। ঋদ্ধি যেন ভক্তির দিদি নয়, মা ; মা নয়, গার্জেন এঞ্জেল, অধিদেবতা।

ঋদ্ধি পড়ে—'ঈশা বাস্যম্ ইদং সর্বং··· । ঈশ্বরের দ্বারা সবই আবিষ্ট...'

ভক্তি পড়ে—'পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদম্··· । ইহাও পূর্ণ উহাও পূর্ণ।'

ঋদ্ধি পড়ে—

'তুমি যেথা আমাদের আত্মার আকাশ
অপার সঞ্চার ক্ষেত্র— সেথা শুভ্র ভাস—
দিন নাই, রাত্রি নাই, নাই জনপ্রাণী
বর্ণ নাই, গন্ধ নাই, নাই নাই বাণী ॥'

ভক্তি পড়ে—

'আমারে ফিরায়ে লহো অয়ি বসুন্ধরে,
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে
বিপুল অঞ্চলতলে। ওগো মা মৃণ্ময়ী,
তোমার মৃত্তিকা-মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই,'—

বুবু পড়ে—'ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকরি চামে কাটা মজুমদার'

পুনপুন পড়ে—'ধেয়ে এলো দামোদার'

বুনবুন পড়ে—'দামোদারের হাঁড়িকুঁড়ি'

—'তুই চুপ কর না। আমি বলব—গোয়ালে বসে চাল কাঁড়ি,'

সব্বাই মিলে—

'চাল কাঁড়তে হল বেলা
খেতে বসলো জামাই-শালা'

হি-হি-হি-হি, শালা খারাপ কথা, ছড়া বলার ছলে বেশ বলে নিচ্ছি,

'খেতে বসলো জামাই-শালা,
পাতে পড়ল মা-ছি
কোদাল দিয়ে চাঁ-চি।
কোদাল হল ভোঁ-তা।
খ্যাঁক শেয়ালের মা-থা।'

—'অত হাসছো কেন বিদ্যা, বরুণ ? পাবন অত হাসছো কেন ?'—

এই রে পমপমদিদি টমটমদিদিকে কী সব সূত্র-টূত্র পড়াচ্ছিল, তার কানে গেছে।

আমরা ভয়ে চুপ। জামাইকে শালা, শালাজামাই বলতে পেরে মহা খুশি হয়ে হাসছিলুম, পালে বাঘ পড়ল।

—'শালা মানে কী বলো তো ? শালা মানে স্ত্রীর ভাই। আমাদের বড়মামা বাবার

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শালা। বাবা আর বড়মামা যদি একসঙ্গে খেতে বসেন তো সেটা হবে "খেতে বসল জামাই-শালা"—বুঝেছ ?'

—'হ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ', তিনটে মাথা নড়ে। মনটা খারাপ হয়ে যায়, শালা মানে যদি বড়মামা দাঁড়ায়, তাহলে আর ইঁকড়ি-মিকড়ির মজা কী রইল ?

—'এখন ইঁকড়ি-মিকড়ি করছো, প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ কোথায় ?'

বুনবুন দ্বিতীয় ভাগের 'ঐক্য-বাক্য-মাণিক্য' ধরে ফেলেছে। আমি আর পুনপুন 'জল পড়ে পাতা নড়ে'র থেকে এখনও বেরোতে পারছি না। বুনবুন তার দ্বিতীয় ভাগ প্রোডিউস করে।

—'পাবন, বিদ্যা তোমাদের প্রথম ভাগ ?'

কাঁচুমাচু মুখে জানাই—'হারিয়ে গেছে।'

—'আবার হারিয়েছো ? এই নিয়ে কবার হল রে ভক্তি !'

—'পাঁচ-ছবার তো বটেই।'

—'প্রথম ভাগ বাড়ি থেকে কোথায় হারাবে ? কে নেবে ? কেউ না !'

পমপম দিদি ভারি অবাক !

এই সময়ে বুনবুন বিশ্বাসঘাতকতা করে, ছোট্ট গলায় বলে—'আমি জানি।'

—'কী জানিস ?'

—'কোথায় হারিয়েছে।'

—'কোথায় ?'

—'এসো।'

বুনবুন বিভীষণের মতো পথ দেখিয়ে দেখিয়ে পমদিদি টমদিদিকে বড় শোয়ার ঘরে নিয়ে যায়। সেখানে জোড়া তক্তপোশ পাতা। তক্তপোশের ওপরের তোশকের খুঁট নিয়ে বুনবুন টানাটানি করতে থাকে। দুই দিদি তোশক উল্টে দেয়। বুনবুন মীরজাফরের মতো নিশ্চেষ্ট হয়ে রণক্ষেত্র থেকে সরে থাকে। জুডাস ইসক্যারিয়টের মতো অঙ্গুলিনির্দেশ করে। তোশকের তলার ছ-সাতটা প্রথম ভাগ, গোলাপি মলাট সহ অক্ষত অটুট অবস্থায় চেপ্টে রয়েছে। ফলে দুপুরবেলা রুগি দেখে ফেরবার পথে বাবা আমাদের জন্যে 'হাসিখুশি' নিয়ে ফেরেন। গম্ভীর মুখে বলেন—'একটা বই-ই দুজনকে পড়তে হবে কিন্তু। মারামারি করা চলবে না।'

মারামারির কথায় আমি আর পুনপুন ভারি ব্যথা পাই। 'মারামারি ?' সে আবার কী ? আমরা দুজন হরিহর আত্মা। মা-রা-মা-রি ? তবে সে যাই হোক। হাসিখুশি পেয়ে আমরা দুজনেই ভারি হাঁসিখুঁশি। ছোট্ট থেকে এই সমস্ত 'অয় অজগর আসছে তেড়ে'-টেড়ে শুনে আসছি। কী সুন্দর সুন্দর ছড়া-ছবি,—এবার থেকে আর আমাদের বই হারাবে না। তবে হ্যাঁ যদি প্রত্যাশা করো, 'হাসিখুশি' থেকে সব জ্ঞান উজাড় করে নিয়ে আমরা 'বোধোদয়'-এর পথে সত্বর এগিয়ে যাব, তো একটু বেশি-বেশি হয়ে যায় প্রত্যাশাটা। 'হাসিখুশি'টা আমাদের অভিনয়শিক্ষা, চিত্রাঙ্কনশিক্ষা, এবং আরও অনেক দুরূহ তত্ত্ব শিক্ষার আকর গ্রন্থই হয়ে থাকে মূলত। পুনপুন ইঁদুরছানা হয়ে গুটলি পাকিয়ে শুয়ে থাকে। আমি ঈগল পাখি হয়ে তাকে ছোঁ মারি। আমার হাতের নখ পুনপুনের পিঠে লেগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঁচড়ে যায়, তাতে পুনপুন বিদ্রোহ করবার উপক্রম করে, ওর দাবি এবার ও ঈগল হবে আমি ইঁদুরছানা হব। তবে, আমার সঙ্গে ও পেরে ওঠে না, আমি 'উর্ধ্ববাহু আছেন ঝুলে'র দিকে ওর মন ফেরাতে সমর্থ হই। দুজনেরই একত্রে উর্ধ্ববাহু হওয়ার পথে তেমন কোনও বাধা আসে না। তবে 'ঔষধ খেতে মিছে বলা'য় পৌঁছে আমাদের মুখে বক্রহাসি ফুটে ওঠে, লেখকদের অজ্ঞতা আবিষ্কার করে। ঔষধ খেতে তো আমরা দারুণ পছন্দ করি। বস্তুত খাদ্য-পানীয়র চেয়ে ঔষধেই আমাদের আসক্তি বেশি। ছোট্ট ছোট্ট ওষুধের শিশি হাতের কাছে পেলেই আমরা কর্ক খুলে পুরোটা আধাআধি করে খেয়ে নিই। পুনপুন হালকা বলে টিকটিকির মতো সড়সড়িয়ে জানলা বেয়ে উঠে গিয়ে হাত বাড়িয়ে তাক থেকে ওষুধ পাড়ে, অনুগত লক্ষ্মণ ভাইটির মতো শিশি আমার হাতে অর্পণ করে, তারপরে আমরা খাই। একবার এমনি ওষুধ খেয়ে আমাদের গায়ে চাকা চাকা সব ঘা মতো বেরিয়েছিল। তখনই বাবা ব্যাপারটা ধরে ফেলেন।

—'আবার ওষুধ খেয়েছো ?'

মাকে বললেন—'সালফার খেয়েছে।'

—'কী হবে ?'— মায়ের কাঁদো-কাঁদো জিজ্ঞাসা।

—'কী আবার হবে। অ্যান্টি-ডোট দিয়ে দিচ্ছি।'

তবে, সেই থেকে বাবা রোজ দিনের একটা সময়ে ডাকেন—'বিদ্যা, বিদ্যাধরী ! পাবন বনবনন্‌ন্‌...'

ঘড়ির ডিং ডং-এর মতো সেই ডাক বাজতেই থাকে, বাজতেই থাকে যতক্ষণ আমরা ছুটতে ছুটতে গিয়ে উপস্থিত না হই।

বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিল। তার ওপরে সবুজ চামড়ার বাঁধাই। হাতলঅলা গদি-মোড়া চেয়ারে বাবা বসে আছেন। সামনে মস্ত শিশিতে সুগার অফ মিল্ক, গ্লোবিউল... পেছনে বাবার বিরাট ওষুধের ক্যাবিনেট তাতে চাবি ঝুলছে।

ছোট্ট ছোট্ট দুটো কাচের পুতুল, পাখির ছানা, কাঠবেড়ালি, কিচিরমিচির, কিচিরমিচির।

—'ওষুধ খাবে তো ?'

—হ্যাঁ-অ্যা-অ্যা।'

—'তবে হাঁ করো।'

কোনওদিন গুঁড়ো ওষুধ, কোনওদিন গুলি ওষুধ খাই আমরা।

বাবা সুর করে বলেন— 'ওষুধ খেয়ে-ছো ?'

—'হ্যাঁ-অ্যা-অ্যা।'

—'তবে আর চুপিচুপি খাবে না ?'

—'না-আ-আ।'

—'ওষুধ খাবার ইচ্ছে হলেই আমার কাছে চলে আসবে, কেমন ?'

মাথা নাড়ি আমরা। পরের দিনই পুনপুন হাতে-নাতে ধরা পড়ে যায়।

বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমাশীল টমটমদিদি। টমটমদিদি আমাদের বিপত্তারণ মধুসূদন। টমদিদি সেলেটে সুন্দর করে অক্ষর লিখে দেয়। আমরা দাগা বুলোই। টমদিদি আমাদের বিকেলবেলায় সাজিয়ে দেয়, ফিঁতের ফুল করে, জুতোর ফিঁতে বেঁধে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেন্টুলে বেল্ট বেঁধে, টমদিদি আমাদের পুঁতুল তৈরি করে দেয়, ছেঁড়া কাপড় আর তুলো দিয়ে, যখন আমরা পড়তে চাই না সেলেটে 'আপিসের বাবু' এঁকে আমাদের ভোলায়। আপিসের বাবু জানেন তো ? বাবু একা-একা থাকেন। আপিস থেকে এসে তিনি উনুন জ্বেলে উনুনে কড়া বসালেন। তাতে তেল ঢাললেন। তারপরে দুটো আলু, একটা পটল আর এক ফালি কুমড়ো ভাজতে দিলেন। তারপরে কড়ায় একটা ঢাকা দিয়ে দিলেন। এবার আঁচটা জোর করবার জন্যে উনুনের মধ্যে কয়েকটা লম্বা লম্বা কাঠ গুঁজে দিলেন। ব্যাস হাস্যমুখ অফিসের বাবুকে অমনি স্বশরীরে সেলেটের ওপর দেখা যেতে লাগল। বুনবুনটা বেরসিক কম না। টমদিদির এহেন অঙ্কন শিক্ষাপদ্ধতির উদ্যোগে জল ঢেলে সে বলে ওঠে—'ভাত খাবে না ? আপিসের বাবু ভাত খাবে না ? নুচি খাবে না ? বা রে !'

ভাগ্যিস সে আলুকুমড়ো কাটার পদ্ধতি নিয়েও তর্কাতর্কি করেনি। বুনবুন আসলে এসব ব্যাপারে বেশি বিশেষজ্ঞ ছিল। সব সময়ে সে দিদিভাইয়ের পায়ে পায়ে ঘুরত। তাই কুটনো-বাটনা সম্পর্কে তার বেশ ভালোই ধারণা ছিল। আমাদের মনেও যে কুটনোপদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন ওঠেনি তা নয়। আলু তো গোটা গোটা তেলে ছাড়া হয় না ! গোল গোল করে কাটা হয়। নরম-নরম সাদা-সাদা আলুভাজা, কিংবা কাঠি আলুভাজা, কুমড়োও তো চৌকো চৌকো করেই কাটা হয়। কিন্তু প্রশ্ন বা সংশয়গুলোকে আমরা ভালো করে গজিয়ে ওঠবার আগেই গিলে নিতুম, নিত্যকর্মপদ্ধতির মধ্যে দিয়ে আপিসবাবু স্বয়ং এইভাবে শরীর ধারণ করায় (হোক তা জগন্নাথের মতো শরীর) চমৎকৃত হয়ে। আবার ওই 'সাসপেনশন অফ ডিসবিলিফ' আরকি।

AMARBOI.COM

যাই হোক, টমটমদিদি আমাদের শিক্ষার চার্জে। পমদিদি আর ই-দাদা বড্ড উঁচুতে, ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না। কিন্তু টম আমাদের নাগালের মধ্যে। বা, তা-ও নয়। আকাশের চাঁদ নিজে নেমে এসে আমাদের হাতের মুঠোয় ধরা দিয়েছে। টম পরীক্ষা দিলেই ফার্স্ট হয়। সব কিছুতেই। আমার আর পুনপুনের ধারণা পরীক্ষা দিলেই ফার্স্ট। ওটাই রেওয়াজ। ইনফ্যান্ট ক্লাসের প্রথম পরীক্ষা। পরীক্ষা দিয়ে আমরা বাড়ি ফিরছি। হাতে কালি মুখে কালি। ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরছি। ঠাকুর্দাদা বারান্দা থেকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করছেন—'কী রকম পরীক্ষা দিলে ?'

—'ফাঠ, ঠাকুর্দাদা'— আমি উজ্জ্বল হাসি মুখে ওপরে চেয়ে বলছি।

—'পাবন ? পুনপুন ?'

—'ফাঠ্।'

—'দুজনেই ফাঠ্।'

—'দুজনেই ফাঠ্।'

পরীক্ষার ফল বার হলে দুজনে নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরি। রোয়াকে বাবা অবিনাশজেঠুর সঙ্গে কথা বলছেন।

—'কেমন হল রে ?'

—'ভালো বাবা, খু-উ-ব ভালো।'

—'কে ফাঠ্ ?'

পুনপুন (সরু গলায়)— 'কিন্নগোপাল (কৃষ্ণগোপাল)'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'সেকেন্ড কে ?'

—'সরুজ শোভন (সরোজ শোভন)'

—'থার্ড কে রে ?'

—'ইনম্ময় (হিরণ্ময়)'

—'তার পরে ?'

তারপরে মথুরেশ, নবনীতা, বনবাণী, রুচিরা, অনিমেষ, পার্থসারথি, বিষ্ণুপ্রিয়া, টুলটুল··· এরকম দশ এগারোজনের নামতা বলার পরে বাবা হাল ছেড়ে দেন। বিদ্যা বা পাবন কোত্থাও নেই।

—'পাস করেছিস তো ?'

পাস করার নিদর্শন হিসেবে সবুজ কার্ড এগিয়ে দেয় দুজনে। বৃন্দহাসির মধ্যে দিয়ে বিজয়গর্বে প্রবেশ করে তারপরে বন্ধুদের ফার্স্ট সেকেন্ড ইত্যাদি হওয়ার গৌরবে, আনন্দে টমটমদিদির কোলে মুখ লুকোয়।

এর পরে অবশ্য স্কুলেও আমাদের নিয়ে হাসাহাসি হতে থাকে। কারণ গোরুর সম্পর্কে রচনায় আমি লিখেছি 'গোরুর হাড় থেকে চিনি হয়,' কুকুরের রচনায় পুনপুন লিখেছে 'কুকুর ছাই খায়'। অনেক ভেবে-চিন্তে দিদিমণিরা বার করেন কুকুরকে আঁস্তাকুড়ে মুখ ডুবিয়ে খাবার খুঁজতে দেখা যায়, আঁস্তাকুড়ে ছাইয়ের গাদায় হতভাগ্য কুকুরকে এই অবস্থায় দেখে পুনপুনের ধারণা হয়েছে কুকুরের প্রধান খাদ্য ছাই। কিন্তু গোরুর হাড় থেকে চিনি হওয়ার ব্যাপারটা কোথা থেকে এল ! স্কুলের দিদিমণিরা নয়। টমটমদিদিই শেষ পর্যন্ত অনেক মাথা খাটিয়ে গোরুর হাড়ের সঙ্গে চিনির সম্পর্কটা বার করে। এমন কিছু সম্পর্ক নয়। স্রেফ অন্ধকারে ঢিল। গোরু আপাদমস্তক উপকারী। তার শিঙ, তার চামড়া, তার লেজ, গোময়, গোমূত্র, গোমাংস, গোদুগ্ধ। তাহলে হাড়ের উপকারিতাটি কী ? হঠাৎ আঁধারে আলোর মতো গোরুর হাড়ের সাদাত্ব আর চিনির সাদাত্ব আমার কাছে এক জাতীয় বলে মনে হতে থাকে। বিবেকানন্দর মুখে শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বাণী জুগিয়েছিলেন, বুবুর কলমকেও তেমনি মা সরস্বতী আইডিয়া জোগান। গোরুর হাড় থেকে চিনি হয়।

আমাদের এই সমস্ত মৌলিকতার সমঝদার ছিল টমদিদি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ত্রয়োদশ অধ্যায়

হরিবংশ ৬—বুজবুজদিদি

একদিন ইন্দ্রের সভা বসেছে। উর্বশী নাচছেন, গন্ধর্ব বিশ্বাবসু গাইছেন, গন্ধর্ব মিত্রাবসু তালবাদ্য বাজাচ্ছেন। সভা নির্নিমেষে নাচ দেখছে,

তা-তা-থেই-তা
তৎ-তৎ-থেই
তেরে-কেটে-তাতা-থুন-দে-মা
এ-বার রে-হেই।
তৎ-তৎ-থুন-থুন-ভালো-লাগে-না
রোজ-রোজ-কান-ধরে-ধর-তাই তাল-লয়-সুরের তে-হেই।

যত বড় গাইয়ে-বাজিয়ে-নাচিয়ে-লিখিয়েই তুমি হও, ক্রমাগত ফরমাশি কাজ করতে করতে তোমার বিরক্তি আসবেই। তখন মনে হবে ধুত্তোর বাঁ হাত দিয়ে কোনওমতে বাজিয়ে দিই। দে মা এ বার রে হেই। সেই একই লোককে তার খেয়াল তার মেজাজমর্জিমতো কাজ করতে দাও, সে ভা-রি খুশিমুশি হয়ে তান ধরবে—তুম তুম তেরে নেরে নুম-তা-আ-আ-আ···।

এখন পুরন্দর ইন্দ্র রাজার তো কোনও অভ্যেসটাই ভালো না। বর সেজে পরের বউয়ের কাছে যান। পিতৃহত্যা করেন, নিরপরাধ ত্রিশিরা মুনিকে কিছুতেই তপস্যাচ্যুত করতে না পেরে তাঁকে বজ্রাঘাতে নিষ্ঠুরভাবে বধ করেন, সগর রাজার যজ্ঞাশ্ব চুরি করে কপিলমুনির আশ্রমে লুকিয়ে রেখে আসেন ফলে সগর রাজার ষাট হাজার ছেলে (প্রজার) কপিল মুনিকে চোর ঠাওরায় এবং তাঁর অভিশাপে ভস্মীভূত হয়ে যায়। লম্পট, পিতৃঘাতক, নিরপরাধ-হন্তা, চোর এই দেবতাটি সভায় বসে উর্বশীর মতো মহানাচিয়েকে লাস্যনৃত্য করতে বলেন, যখন হয়তো উর্বশীর তাণ্ডব নাচতে ইচ্ছে হচ্ছে, বিশ্বাবসুকে মলহার গাইতে বলেন, যখন হয়তো তাঁর সাহানা গাইতে ইচ্ছে হচ্ছে। আর মিত্রাবসুর তো কথা-ই নেই। তাই মিত্রাবসু অন্যমনা হয়ে তাল ভঙ্গ করলেন। দাদাভাই বিশ্বাবসুর মাথা নিচু, উর্বশীর চোখে জল, ইন্দ্রের হাজার চোখে হাজার আগুন।

—'যাও, নারী হয়ে পৃথিবীতে সঙ্গীত সাধনা করো গে যাও।'

ব্যাস, মিত্রাবসু ডিগবাজি খেতে খেতে নামছেন।

হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মা দু হাত মেলে, কোল পেতে রয়েছেন, দেবহূতি-মায়ের কপালেই শিকে ছিঁড়ল। মিত্রাবসু বুজবুজদিদি হয়ে জন্ম নিলেন।

আর সব বাচ্চা জন্মে-টন্মে ভ্যাঁ করে, চ্যাঁ করে, প্যাঁ করে, কিন্তু বুজবুজ কেঁদেছিল শুদ্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গান্ধার থেকে শুদ্ধ নিখাদ পর্যন্ত একটি দীর্ঘ সুরেলা মিড়ে। সে আপন মনেই গায়, দাদা বিশ্বাবসু তাকে ভোলেননি। আপন মনেই নাচে, উর্বশীও তাকে ভোলেননি। তালে তালে গায়, তালে তালে নাচে, তার সর্বাঙ্গে সর্ব-অস্তিত্বে ওতপ্রোত লয়। মিত্রাবসুর লয়।

বুজবুজ, তুমি গাইছো আমি শুনতে পাচ্ছি।

'পথিক মেঘের দল জোটে ওই শ্রাবণগগন অঙ্গনে শোন শোন রে/মন রে আ মার।'

অঙ্গনে শোন শুনতে শুনতে আমার হৃদয় ময়ূরের মতো নাচে রে হৃদয় নাচে রে।

'উর্ধ্ব গগনে বাজে মা-দল
নিম্নে উতলা ধরণী ত-ল
অরুণ প্রাতের তরুণ দ-ল
চল রে চল রে চল।'

ধরণীতল কেন বুজবুজ? ওটা তো ধরুণীতল হবে! যেমন অরুণ, তরুণ, তেমনি ধরুণী। আমি 'ধরুণীতল'ই গাইব। গাইবোই। যতই বকো।

'বঁধুয়া-আ-আ
নিদ নাহি আঁখি পা-তে
তুমিও একাকী আমিও একাকী আজি এ শ্রাবণ রা-আ-আ-আ-আ- আ-আ-আ-আতে।'

কে এই বঁধুয়া? কার জন্যে গান বেঁধেছো বুজবুজ? কে সে যার জন্যে একাকী হয়ে রয়েছো?

বাবা দাঁড়িয়ে গেছেন দরজার বাইরে। বাবার চোখ ছলছল করছে।

—ও বুজি বুজি, তোর বাবাকে কাঁদাসনি আর। কে জানে কী দিতে পারেনি তোর বাপ। তাই চৌকাঠে দাঁড়িয়ে মেয়ের 'তুমিও একাকী আমিও একাকী' শুনতে শুনতে তার বুকের মধ্যে না-দিতে-পারার বেদনা হু-হু করছে। হয়তো না-পেতে-পারার বেদনাও।

কত আশা কত সংকল্প নিয়েই তো মানুষ জীবন শুরু করে আহা। আমিও ভেবেছিলুম দেবো দেবো এই জননী জন্মভূমিকে শৃঙ্খলমুক্ত সু-উচ্চ বেদিতে বসাব। ধানের শিষে দুধ চিকচিক করবে, মন্দানিলে নুয়ে নুয়ে পড়বে সোনালি ফসলে আনত গোধূম দল। পুষ্করিণী থেকে উঠে আসবে সুপুষ্ট মাছের ঝাঁক।

মাছে-ভাতে বাঙালির ছেলে
হাপুস—হুপুস খাবে মাংস বংশ অবতংস, পরমান্ন ফেলে।

গাভীর বাঁটের দুধ বৎসের জন্য রেখে তবে আমি নিয়েছি মা ভগবতী। ছাগ-বৎসকে খুন করতে হয় বলে সুস্বাদু মটন ছেড়েছি। আমি জয়সিংহ, হে রঘুপতি জীবনের কতগুলো মূল্যবান বছর বঙ্গ থেকে নেপাল, বিহার থেকে কুমায়ুন, কুমায়ুন থেকে কিন্নরদেশ পদব্রজে ঘুরেছি। ভেদ-বমির মড়কে স্বজনপরিত্যক্ত রোগীকে নুনজল দিয়ে বাঁচালুম সে তো আমিই, আ-চণ্ডাল ভারতবাসীকে মহাজাগরণে জাগাবার জন্য অন্তরীপের জিহ্বা পেরিয়ে শেষ ভূখণ্ডের বোল্ডারে পা রাখি সেও তো আমি, আমিই একদিন এই জন্মভূমির মহাশ্মশান থেকে উড়ে-যাওয়া উপনিষদের পাতা হাতে করে উত্থিত হলুম। আমি রাসবিহারীর ছায়া পেয়েছি, সুভাষচন্দ্রের কায়া দেখেছি, সেই যখন সদ্যতরুণের কাঁধে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি ভরসার হাত রেখেছিলেন ! আমি চিত্তরঞ্জন আর বাসন্তীর জ্যোৎস্নায় একদিন স্নান করেছি। আকাশ থেকে খসে-পড়া এক দ্বাদশীর চাঁদ দেখে আমার সব ভুল হয়ে গেল। তাই কি আমায় পরিত্যাগ করলে মা ? আমার ত্যাগ আর নেবে না ? আমার ভোগ, আমার সম্ভোগ তা-ও আর নেবে না না কি মা ? দুর্গাপ্রসাদ ঠাকুরঘরে ঢুকে যান। মণিপুরের তলা থেকে নাদ টেনে বার করেন—

'আর কিছুই মা নাই গো চিতে
চিতার আগুন জ্বলছে চিতে
চিতাভস্ম চারিভিতে
রেখেছি মা আসিস যদি।
শ্মশান ভালোবাসিস বলে শ্মশান করেছি হৃদি
শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচবি বলে নিরবধি।'

বংশের আদিপুরুষ হরিনারায়ণ যাঁর সুবাদে আমরা হরিবংশ, আর বুজবুজের 'তুমিও একাকী আমিও একাকী' দুর্গাপ্রসাদের বুকের মধ্যে বিরহের বৈরাগ্যের বীজ সেই যে বপণ করল, তার মাটি ফুঁড়ে তদ্গত অঙ্কুরিত হওয়াকে আর কেউ কে-উ রোধ করতে পারল না।

বুজবুজদিদি ছিল একটি মিনিয়েচার ছবির মতো। পাঁচ ফুটের বেশি উচ্চতা কক্ষনও নয়। কমও হতে পারে। ফর্সা ? ফর্সা বোধহয় নয়। কিন্তু এমন চিকন তার গায়ের ত্বক যেন কেউ আয়নাখানা সদ্য মুছে দিয়ে গেছে। ছোট্ট ভুরু, ছোট্ট বাদামি চোখ, ছোট্ট নাক, আর ছোট্ট এক জোড়া ঠোঁট। বুজবুজের কানগুলি যেন বিধাতা অশেষ যত্নে গড়েছেন। অশেষ যত্নে এঁকেছেন তার চেরা পশমের মতো সরু সিঁথি। হাত পা সব যেন মোমে গড়া।

বুজবুজদিদি বোধহয় আমাদের পিসিমার মতো ছিল। ওই রকমই তুলতুলে, ফুলফুলে, টুকটুকে। তুলো-ভরা হাত পা। বাটালি দিয়ে কোঁদা নাসারন্ধ্র, কর্ণরন্ধ্র। তবে পিসিমার এফেক্টটা ছিল নিম-সুন্দরীর, একদিন-বোধহয়-খুব-সুন্দরী ছিলেন-এর। বুজবুজের এফেক্টটা রাজস্থানি মিনিয়েচারের ! অণুচিত্রম্।

একটা তরুণী-শালিক পাখির মতো ছটফটে, হালকা, কিচিরমিচির ছিল বুজবুজদিদি।

'আমারে তুমি অশেষ করেছো', গাইবার জন্যে সরস্বতী ইনস্টিট্যুশনের মাস্টারমশাইরা তাকে ধরে নিয়ে যান। 'আমার প্রদীপখানি তোমার পথে আজো রাতে জ্বলে' গাইবার জন্য বাসর জাগাতে তাকে দরকার হয়। 'শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও জননী এসেছে দ্বারে' গেয়ে সে পাড়া-বেপাড়ার পুজো উদ্বোধন করে। জলসাতেও উদ্বোধনী-গীত বুজবুজের বাঁধা।

বুজবুজদিদি আমাদের চারজনকে—পুটপুট-বুবু-পুনপুন-বুনবুনকে গান শেখায়। তাকে কে কোনদিন শিখিয়েছে তার নেই ঠিক, সে মহা-উৎসাহে আমাদের তাল-লয়-সুর ঠিক করে দেয়। এখন বুঝতে পারি বুজবুজ আমাদের প্রত্যেকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত ভুল সুরে শিখিয়েছিল। যেখানে কাজ নেই সেখানে কাজ, যেখানে টান নেই সেখানে টান, শব্দের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিভাগ ভুল। যা-ইচ্ছে-তাই। কিন্তু যাচ্ছেতাই নয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বুজবুজের ভুল সুরে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে অখুশি হতেন না।

'আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে কী এনেছিস'-এ বুজবুজ আমাদের 'এ-এ নে-ছিস' শিখিয়েছিল, তাকে 'এনে-এ-ছিস' করতে আমাদের প্রাণ বেরিয়ে যায়। খালি অভ্যেসে 'এ-এ নে ছিস' বেরিয়ে যায় আর সুচিত্রাদির কাছে বকুনি খাই। 'বজ্র মানিক' দিয়ে-তে 'বজ্র মা-নিক' তুমি মোটেই আমাদের শেখাওনি বুজবুজ। ষষ্ঠীতাল আর দাদরার তফাতও কখনও শেখোনি, তুমি কী করে আমাদের শেখাবে? 'স্বপ্নে আমার মনে হল' তুমি তো দাদরাতেই গাইতে। কোনও ক্ষতি হয়নি তাতে। প্রায় কোনও গানই তুমি ফ্ল্যাট গাইতে না, অজস্র ছোট ছোট কাজে ভরিয়ে গাইতে, সেই সব অনেক যত্নে আমাদের গলায় তুলে দিয়েছিলে, তা আমাদের রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার পথে প্রায় অনপনেয় বাধা হয়ে থাকে। কিন্তু বুজবুজ তুমি 'ঝরনাতলার নির্জনে' গাইছ, তোমার বৈতালিক স্বর 'কোন ক্ষণে'তে হাউইবাজির মতো ঊর্ধ্ব আকাশে উড়ে গিয়ে আবার ফিরে এলো। আর কলস্বনে ভরে উঠল বিস্ময়ে বড় বিস্ময়ে আমাদের মন প্রাণ, রোমকূপ, সে সব তো ভুলব না! 'গানের পরশ প্রাণে এলো আপনি তুমি রইলে দূরে?' সে-ই বা কী! কী গান!

বুজবুজদিদি আমাদের সবাইকে নিয়ে একটা কনসার্ট করেছিল। অং-দাদা তার ভারী গলা নিয়ে লিড করত, সঙ্গে সঙ্গে থাকত বুজবুজদিদি। আমরা সবাই যোগ দিতুম। পম আর ই-দাদা ছাড়া। পালক পর্যন্ত। আমাদের হার্মোনিয়ম, তবলা, তানপুরা এ সব ছিল না। রেডি এক দুই তিন—বলে তিনটে টুসকি দিলেই আমার শুরু করে দিতুম—

সর্বখর্ব তারে দহে তব ক্রোধ দা-হ

হে ভৈ রব। শক্তি দা-ও

কিছু মানে বুঝতে পারতুম না। সর্বখর্ব তারেদ হে-তব ক্রোধদা—হ। এই রকম ভাগ। 'খর্ব' আর 'ক্রোধ' আর পরের লাইনে 'শক্তি' এই কথাগুলো গোটা বোঝা যেত। কিন্তু 'তা-আ-রেদ'র যে কী মানে হতে পারে ভেবে ভেবে কূল পেতুম না। তবে, বীররসাত্মক গান যে, তাতে কোনও সন্দেহ থাকত না।

আরও কয়েকটা গান নিয়ে এই সমস্যা হত।

সন্ধেবেলা পমদিদির আরতি হয়ে গেলে, সবাই ভজন করত। অদ্ভুত নিপুণতায় করতাল বাজাত ই-দাদা। গাইত সবাই।

'ভবসা গরকা রণতা রণহে।' এই অদ্ভুত মাথামুণ্ডুহীন গানে আমাদের কোনও ভক্তি হত না। পুনপুন চুপিচুপি জিজ্ঞেস করত—

—' "ভবসা" মানে কী রে?'

আমি (ভেবেচিন্তে)—'বোধহয় ভ্যাপসার ভালো কথা। তুই "গরকা" মানে জানিস?'

পুনপুন (স্মার্টলি)—'একরকমের গরাদ। রণতাটা একটা মেয়ের নাম। আর রণহে!'

আমি (প্রত্যয়ের সঙ্গে)—'হে হে করে ডাকে দেখিস না! বুড়োরা ওমনি করে ডাকে। এমা! বুড়ো বললুম, বুড়ো মানুষ বলতে হয় তো! রণও একজনের নাম, রণতা আর রণ দুজনকেই হে হে করে ডাকছে।'

তা সত্ত্বেও যখন গানটার অর্থ বোধগম্য হত না, তখন আমরা চুপিচুপি ঠিক করতুম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুনবুনকে জিজ্ঞেস করতে হবে। বুনবুনের ওপর আমাদের অগাধ ভরসা। সে দাদাভাইয়ের সংস্পর্শে থাকে। কে না জানে দাদাভাইয়ের চেয়ে জ্ঞানী পুরুষ আর নেই! পমদিদি টমদিদি পর্যন্ত তাঁর কাছে সমস্কৃত পড়তে যায়, ই-দাদা সু-দাদা তাঁর কাছে অঙ্ক কষতে যায়। দিদিভাই-ই কি কম জ্ঞানী নাকি। ভী-ষণ জ্ঞানী। ঠাকুমাও জ্ঞানী। কিন্তু ঠাকুমা সব জ্ঞান নিজের ভেতরে রেখে দেন আর দিদিভাই জ্ঞান বিতরণ করেন। বুনবুন কত জানে? পলতা পাতা বেটে মটর ডাল নামক একরকম যাচ্ছেতাই ডালের সঙ্গে মিশিয়ে যে জ্বরমুখে খাবার দেবভোগ্য 'পলতার বড়া' হয়। পলতা যে পটলের পাতা মাত্র, ডুমুরের ফুল যে ডুমুর কাটলে ভেতরে গুঁড়ি-গুঁড়ি দেখা যায়, আম চুষে খেয়ে যদি টিয়েপাখির ছবি-আঁকা আঁটি পাও, তাহলে যে তুমি সেই আঁটি হাতে যা খুশি করতে পারবে, দই পাথরবাটিতে পাততে হয়, মাছ আর দুধ একসঙ্গে খেলে শ্বেতি হয়, সাহেবরা সব শ্বেতি মানুষ, ভগবান তাঁর উনুনে মানুষের পাঁউরুটি তৈরি করছিলেন, প্রথমে বেশি পুড়ে গেল—তার থেকে এলো আফ্রিকানরা, তারপরে ভগবান তাড়াতাড়ি রুটি বার করলেন তখন হল আধখানা হওয়া ফ্যাকফেকে শ্বেতি-মানবরা, আর তারপরে ভগবান সব ঠিকঠাক বুঝে গিয়ে উল্টে পাল্টে সেঁকে বাদামি মানুষরুটি বার করলেন, চমৎকার হয়েছে, তো তাদের তিনি পাঠিয়ে দিলেন আমাদের এই ভারতবর্ষ আর তার আশেপাশে, —এ সব খবর বুনবুন জানে।

কাজেই 'ভবসাগর কারণতারণ হে'-র মানে জানতে বুনবুনের শরণাগতি ছাড়া পথ কই?

বুজবুজদিদি যেন বাড়ি ছাড়া। ফাঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে চুল আঁচড়াবে, চোখে সরু করে কাজল দেবে। চিবুকে বিউটিস্পট না আঁকলে তার সাজুগুজু শেষ হবে না। ঘটিহাতা লাল বেলাউজ পরে সে কটকটে সবুজে নীলে খড়কে ডুরে পরে, চুলে দুটো বেণী ঝোলাবে, কিছুতেই বেড়াবিনুনি করবে না, করবে না, করবে না। হাওড়া হাট থেকে এক ঝাঁক শাড়ি এসেছে। পুজোর ঠিক আগেটায়। পম অদূরে দাঁড়িয়ে নিতান্ত অবহেলার সঙ্গে দেখিয়ে দেবে—'ওইটা'। সাদা খোলের শান্তিপুরী শাড়ি, ঢালা পাড়, কমলা কি সবুজ কি খয়েরি। এমন কি মার শাড়িগুলো, ঠাকুমার শাড়িগুলোও ওর থেকে জমকালো। কী সুন্দর কালো চোখ চোখ পাড় ঠাকুমার শাড়িতে, মায়ের শাড়ির চোখগুলো টুকটুকে লাল, ফরাসডাঙার গোলাপি কোরের, নীল কোরের শাড়ি মা আগে পরে দেবেন, ধোপাবাড়ি থেকে কেচেকুচে নি-বর্ণ হয়ে আসবে তবে পম সে শাড়ি ছোঁবে। টম দেখো বালি-বালি রঙ, আকাশ নীল, ফিকে গোলাপি এই সব বেছেছে। বুজবুজ সেখানে ছোঁ মেরে তুলে নেবে সবচেয়ে বর্ণময়, লাল-জরদা-ময়ূরকণ্ঠী ঝকঝকে চকচকেটা।

—'তুই ছোঁ মারছিস কেন?' টম বলবে হেসে—'তোর শাড়ি কেউ নেবে না।'

সেই শাড়ি পরে, চোখে কাজল সুর্মা টেনে, বিনুনির আগায় সবুজ ফিতের ফুল, চিবুকে বিউটি-স্পট বুজবুজ যখন কোথাও গান গাইতে বেরোবে, ঠাকুমা বলবেন —'ও মা! এ কে যায় গো? অচলা না বিমলা! দেখিস মা কারও আবার গৃহদাহ করিসনি।'

বড় নাতনি পমের মুখ অন্ধকার হয়ে যাবে সেই শুনে। সেদিকে তাকিয়ে ঠাকুমা আবার খোলের মধ্যে ঢুকে পড়বেন। পমপমদিদি আমাদের বাড়ির পোপ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুজবুজ বাড়ির মধ্যে বন্দি থাকতে ভালোবাসে না। সে পাড়ার সব্বার সঙ্গে ভাব করবে। সমবয়সী সখীদের নিয়ে নিজের ছাতে, তাদের ছাতে গল্প করবে। সন্ধে পার হয়ে যাবে। পম বলবে—'মা, শ্রদ্ধাকে একটু বকুন ! আমাদের বেলায় তো··· ।'

বুজি বাড়ি ফিরলে মা ডাকবেন—'শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা, সন্ধের আগে বাড়ি ফিরো। কেমন ?'

বুজবুজ কী করে বোঝায়—সন্ধের পর যখন সব আঁধার হয়ে যায়, একটা একটা করে বাতি জ্বেলে যায় বাতিওয়ালা, পাখিরা ঝাঁক বেঁধে ঘরে ফেরে, চামচিকেরা হাজারে হাজারে বেরিয়ে পড়ে তখনই তো মুখ-না-দেখা আলোয় বন্ধুদের সঙ্গে মনের প্রাণের কথা বলার সময়, তার স্বাদই আলাদা। তাই বুজবুজ নিজের ছাতেই বেশির ভাগ থাকে। ছাতের পাঁচিল ধরে ঝুঁকে পড়ে—'এই মঞ্জু আসিস, গোধূলির সময়ে আসিস, আমাদের ছাতে, ভারতীকে নিয়ে আসিস। ঠিক ! ঠিক তো !'

আমাদের ভারি অসুবিধে হয় এতে। কেননা ছাতটা তো আমাদেরও খেলার জায়গা।

বুজবুজদিদি ঠোঁট উল্টে বলে—'তোরা লেডিজ পার্কে যা না। কত্ত খেলার জায়গা রয়েছে ! ঋতিকে বলে দিচ্ছি, নিয়ে যাবে, ঋতি-ই-ই।'

—'ওখানে যে ছেলেদের ঢুকতে দেয় না !'

—'পুনপুন বুনবুন আবার ছেলে না কী ! ঠিক ঢুকতে দেবে।'

কিন্তু আমাদের দলে যে পুনপুনদের থেকেও বড় ছেলে আছে ! আমরা তাই গোঁজ হয়ে থাকি।

—'বাবা, বাবা, সন্ধেবেলায় একটু ছাতে বেড়াব তারও উপায় নেই।' বুজবুজ দিদি সরোষে বলবে।

আসলে আমরা লেডিজ পার্কেও খেলি, দেশবন্ধু পার্কেও খেলি। আনি মানি জানি না, ছেলে মেয়ে মানি না। কিন্তু সেখানে আমরা খেলি চু-কিত কিত। বুড়ি-বসন্তী, এইসব। আর সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে ছাতে খেলি নাম পাতাপাতি। ছোটাছুটি নেই। একটু অন্ধকার হলেও অসুবিধে হয় না। 'আয় তো আমার সূর্যমুখী !' কিংবা খেলি রুমাল চোর। টুটু পিঠে কী জোর কিল মেরেছে উঃ।

তখন বুজবুজদিদি অগত্যা গাইতে বসে।

'নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ প্রবাল দিয়ে ঘেরা
শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে সাগর বিহঙ্গেরা !
যাবোই আমি যাবোই...' কোথায় যাবে বুজবুজদিদি ?
যেও না ! যেও না !

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চতুর্দশ অধ্যায়

হরিবংশ ৭—পুটপুটদিদি

'পটলি-ই, পটলি-ই'—পিসিমা ডাকছেন।

হাঁটুর তলা অবধি ঝুল, বুকে ঝালর দেওয়া বেগনি ভয়েলের প্রচুর কুঁচির ফ্রক পরা পটলি গোলাপি উলের মোজা বুনছে। ইস্কুলের কাজ। শেষ না হলে দিদি স্কেলের বাড়ি মারবেন।

—'কেন পিসিমা?'

—'দ্যাখ তো, পম-টমের কলেজের বাস কেন এখনও দোড়গোড়ায় ডাঁড়িয়ে!'

পটলি ছুটে যেতে না-যেতেই বাস থেকে একঝাঁক প্রজাপতি নেমে আসে। লাল নীল বেগনি হলদে। এক বিনুনি, দু বিনুনি, বেড়া বিনুনি, খেজুরছড়ি, হাত খোঁপা, কলেজ খোপা। বিনুনির মধ্যে বিনুনি ঢুকিয়ে প্রজাপতি খোঁপা—'ওই ঋতি, ঋতি তোদের সেই যমজ দুটো কোথায় গেল, ডাক তো!'

পুনপুন সবেগে পালাচ্ছে। ও এক্ষুনি বাবার সেক্রেটারিয়েটের তলায় ঢুকবে। ভীষণ লাজুক ও। ওকে কেউ দেখতে চাইলেই ওর মুখ লাল হয়ে যায়। পুনপুনের লজ্জা হয়, আর বুবু হয় ভীষণ বিরক্ত। তার লজ্জা-টজ্জা নেই।

—'ওই তো, ওই তো পালাচ্ছে বুবুটা'

বুবু ঘাড় বেঁকিয়ে অটল-অচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

—'আমি পানাইনি,' সে ঘোষণা করে।

তার আত্মমর্যাদাবোধ অপমানিত। পালাবে কেন? সে কি কাপুরুষ? ভীরু? বাবাকে আর ই-দাদাকে ছাড়া কাউকে ভয় করে না সে। আর একটু ভয় করে পমকে আর টমকে, আর খাওয়ার সময় পিসিমাকে কুমড়োর ঘ্যাঁট জোর করে খাওয়াবেন বলে। আর পাশের বাড়ির প্রীতিদিদিকে, দেখলেই বলবে—

'উঁচকপালি চিরণদাঁতি বড় যে ডিঙোলি মোরে
থাক থাক থাক থ্যাবড়া-নাকি ধর্মে রেখেছে তোরে।'

আর সামনের বাড়ির বিশুকাকাকে, কেননা সে বুবুকে বলে 'বেঁটে বামন'। তার পরে একটা আলমারির ওপরে বসিয়ে দেয়। রেডিও চালিয়ে দেয়। রেডিওর মধ্যে ভূতে কথা বলে। বিশুকাকা ভয় দেখায় ওই ভূতগুলো বাইরে বেরিয়ে এসে বুবুকে নিয়ে রেডিওর মধ্যে ঢুকে যাবে। রেডিওর বাক্সে একবার ঢুকলে আর বেরোনো যাবে না। আর ভয় করে মেজদাদাভাইকে, তিনি তাকে নিয়ে লোফালুফি করেন বলে। হুই শূন্যে ছুঁড়ে দিলেন, তোমার আত্মারাম গুটিয়ে- সুটিয়ে খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম, এই বুঝি মাটিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছড়ে পড়লে। এমন সময় মেজদাদাভাই তোমাকে লুফে নিলেন। ফসকে যেতেও তো পারে। অতএব বুবুর ভয়ের লিস্টি এমন কিছু বেশি নয়।

—'পানাইনি!' কী মিষ্টি কথা বলে রে তোদের বোনটা! এই দেখো লাল-নীল চক। নেবে? এসো না!

বুবু ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। লাল-নীল চকের দিকে আড়ে আড়ে তাকায়। লোভে কম্পমান। কিন্তু লোভ সে দেখাবে না কখনওই। হাতে গুঁজে দিলে অগত্যা নেবে। তখন হলদে প্রজাপতিটা এক ঝটকায় তাকে কোলে তুলে নেয়, টেবিলের ওপর বসিয়ে দেয়।

—'আমার বাবার সেকেটেবিল।'

—'তোমার বাবার কী টেবিল?'

বুবু তাচ্ছিল্যে আর উত্তর দেয় না। সেকেটেবিলের মতো সহজ কথা যারা একবারে বুঝতে পারে না, তাদের আর কী বলা যায়?

—'সেকেটেবিল কী রে, ঋতি?'

—'সেক্রেটারিয়েট টেবল'—ঋতি মুচকি হেসে জবাব দেয়।

—'ওমা ওমা!' প্রজাপতির দল হেসে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ে।

—'বাবা নাগ করবেন—' বলতে বলতে গম্ভীরভাবে পেছন ঘষটে ঘষটে বুবু নেমে যেতে থাকে।

—'বাবা নাগ করবেন? তুমি নাগ করনি তো?'

ঋতি বলে—'বাব্বাঃ মুকুলদি, বুবু যা রাগী না। রাগ হলে আর দেখতে হচ্ছে না। ছোটরানি আছাড় খাইয়া পড়িবেন। ফোঁস ফোঁস করে কী ফোঁপাতেই পারে। সব ফল্‌স। যতক্ষণ না কাউকে মার বা বকুনি খাওয়াচ্ছে ততক্ষণ ভান করেই যাবে, করেই যাবে।'

—'তোমার ভাই কোথায় গেল? কী যেন বলো? পুপুন না?'

—'পুনপুন', ঘৃণাভরে বুবু বলে। এরা কী! তার পুনপুনকে পুপুন বানিয়ে দিচ্ছে?

—'ভুল হয়ে গেছে, নাগ করো না ভাই, তা তোমার পুনপুন-ভাই কোথায়?'

—'টেবিল-নীচে।'

—'টেবিল? এই সেকেটেবিল?'

পুনপুনকে টেনে বার করা হয়। সে হাত-পা ছোঁড়ে। প্রজাপতিরা মাথা সরিয়ে, বিনুনি দুলিয়ে আঘাত এড়ায়।

পুনপুনও টেবিলের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার মুখ দু হাতে ঢাকা আঙুল ফাঁক ফাঁক। তার মধ্যে দিয়ে চোখের অংশবিশেষ দেখা যাচ্ছে।

—'পুনপুন, তোমার আরেকটা ভাই আছে না? বুবুন?'

'বুনবুন, বুনবুন'—বুবুই জানিয়ে দেয়, তারপরে বলে—'আমার ভাই।'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ আমরা জানি তো, তোমারও ভাই বইকি!'

পুনপুনের হাতে নীল চক চলে যায়। পুনপুন কথা বলছে না। গোলাপি চক চলে যায়। পুনপুন তবু কথা বলছে না। সবুজ চক চলে যায়। তখন পুনপুন বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওঠে—'ওইটা।'

একটি মাত্র হলুদ চক অবশিষ্ট ছিল, ওরা ভেবেছিল ওইটা বুবুকে দেবে, পুনপুন সেটি হস্তগত করতে চায়। ব্যাগ থেকে শেষ লাল চক বার করে বুবুকে দিতে যায় ওরা। বুবু ঘাঁড় বেঁকিয়ে চুল ঝাঁকিয়ে বলে—'ও সব যাক গে।' বলে সে অটল গাম্ভীর্য এবং মহিমার সঙ্গে ভেতর বাড়িতে চলে যেতে থাকে।

আবার হাসি। এ ওকে, ও একে বলে—'ও সব যাক গে।'

পুনপুনের প্রতি প্রশ্ন—'বুনবুনের জন্যে মন কেমন করে না তোমার ?'

—'বুনবুন বিকেলবেলা আসবে।'

—'তাই বুঝি ? বাস, তাহলেই আর মন-কেমন করবে না ? যমজ না তোমরা ?'

—'বুবু আছে।'

বলতে বলতে পুনপুন এদিক-ওদিক তাকায়। না বুবু নেই। বুবু নিষ্ঠুরের মতো এই প্রজাপতিমহলে তাকে একলা ফেলে রেখে চলে গেছে। সে ঠোঁট ফোলাতে থাকে। সে ছেলে, সহজে কাঁদে না। শুধু ঠোঁট ফোলে।

—'কী মিষ্টি! কী মিষ্টি! দ্যাখ রাণু। এই শান্তিকে দেখতে দে। মুকুল দেখেছিস ?'

পুনপুন ঋতির দিকে দু হাত বাড়িয়ে দেয়, ভীষণ ফোঁস ফোঁস করছে সে। ঋতি অসীম গর্ব এবং দায়িত্ববোধের সঙ্গে পুনপুনকে কোলে নেয়। তার সেই বিখ্যাত, সর্বজনপ্রিয় যমজ ভাই তার কোলে আশ্রয় খুঁজছে। ভালো করে নিতে পারে না, সে-ও বিরাট বড় তো!

দুই ভাই-বোনকে দু হাতে ধরে ঋতি রোজ লেডিজ পার্কে যায়। সেখানে কানুমামা আসে, আর বুনবুন। ঋতি তার নিজের দলের খেলুড়িদের সঙ্গে মিশে যায়। কিন্তু ভাইবোনেদের ওপর ঠিক নজর রাখে।

একদিন দুটো লোক, কলকে ফুলের গাছের ওপাশ দিয়ে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল।

—'শোনো খুকু।'

—'কী বলছেন।'

—'তোমরা কী শিবশঙ্কর মল্লিক লেনে থাক ? শ্যামপুকুরের ওখানে ?'

—'হ্যাঁ।'

—'ওখানে দুর্গাপ্রসাদ বলে এক ভদ্রলোক থাকেন ?'

—'আমার বাবা তো!'

—'তোমার বাবা ? বাবার বন্ধুরা খুব আসেন, না ?'

—'হ্যাঁ।'

—'কে ? কে ? কেমন দেখতে ? চেহারা বলতে পার ? আমাদের একজন দুজন চেনা আছে কি না। তাই জিজ্ঞেস করছি।'

ঋতি অবাক হয়ে যায়, 'বাবাকেই গিয়ে জিজ্ঞেস করুন না।' সে বলে। পরে বাড়ি গিয়ে বাবাকে বলে দেয়।

বাবা বলেন— 'ঠিক আছে। কারও সঙ্গে আর কথা বলতে হবে না।'

—'জিজ্ঞেস করলে কী বলব ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'চলে যাবে সেখান থেকে।'

বাবার ভুরুতে ছোট ভাঁজ পড়েই মিলিয়ে গেল।

—'বাবা, ওরা কি ছেলেধরা ? বুবু-পুনপুনকে চুরি করবে ?'

—'বলা কিছু যায় না, কথা না বলাই ভালো।'

—'পুলিসকে বলে দেওয়া যায় না !'

বাবা এবার ভালো করে হাসলেন।

লোকগুলো এবার বুবুকে ধরেছে।

—'তোমার নাম কি খুকু ?'

—'বিদ্ দা।'

—'বা বা বা। কী সুন্দর নাম !'

—'তোমার বাবার নাম জানো ?'

—'হ্যাঁ-অ্যাঁ। দুগ্‌গি।'

—'বা বা বা। চমৎকার। বাবার বন্ধুদের নাম জানো ?'

—'আমার ভোন্দু আছে।'

—'তোমারও বন্ধু আছে ? থাকবেই তো ! বাবার বন্ধু কে ? চশমা পরা, ফর্সা করে, আসেন না ?'

—'অভিনাশ জেঠু। অখয়কাকু, নুবিমামা...'

—'না, না আর কেউ নেই ? মাঝে মাঝে আসেন ? ধরো মাঝরাত্তিরে তোমাদের বাড়ি ফিস্টি হয় না ? রান্নাবান্না ? বাবার বন্ধুরা খাবে ?'

—'নাতে আম্মা ঘুমুই।'

পুনপুন এসে দাঁড়িয়েছে। সে আরও তথ্য সরবরাহ করে, বলে—'মার পাশে। বুবু আমার গোজা খেয়ে নেয়।' হতাশ লোক দুটোকে পুনপুন যেতে দেয় না, বলে—'তোমার ঝোল্লা কই ?'

—'ঝোলা ? আমাদের কেন ঝোলা থাকবে ?'

—'ছেলেধরাদের ঝোল্লা থাকে, একানড়েদের ঝোল্লা থাকে। যে ছেলেটা কাঁ-দে ঝুলির ভেতর বাঁ-ধে—'

—'তোমাদের বাড়ি ঝোল্লা নেই। তাতে বন্দুক বোমা ?'

—'কালীপুজোয় দোমা ফেটেছিলুম।'

ঋতি এই সময়ে ছুটতে ছুটতে আসে। সে লোক দুটোর দিকে না তাকিয়ে ভাই-বোনকে বলে —'চল বাড়ি যাই।'

ভেতরে ভেতরে তার বুক দুর দুর করছে। আরেকটু হলেই হয়েছিল আরকি। কিন্তু সে বাইরে কিছু বুঝতে দেয় না।'

কিন্তু পুনপুনের যে লোক দুটোকে ভারি পছন্দ হয়ে গেছে। সে বলে—'আমি ছেলেধরাদের কাছে যাব-ও-ও।'

কী অদ্ভুত। সাধ করে কেউ ছেলেধরার কাছে যেতে চায় ? আচ্ছা ছেলে তো। লোক দুটো একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। বলছে—'যাও খোকা বাড়ি যাও।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'তুমি দোমা ফাটতে আসবে ?' পুনপুন জিজ্ঞেস করে।

—'তুমি নাতে ফিটটি খেতে আমাদের বাড়ি আসবে ?' বুবু জিজ্ঞেস করে। এ কি জিজ্ঞাসা না নিমন্ত্রণ ?

—'ইলিশ মাছের ঝোল
সপসপিয়ে তোল—' পুনপুন লোভ দেখাচ্ছে রীতিমতো।

—'আজই চলো। চলো না!' বুবু আর পুনপুন দু'দিক থেকে দুজনকে ধরেছে। কী পছন্দ যে হয়েছে লোক দুটোকে ওদের!

'দিদিভাইয়ের পদ্মকাটা আমসত্ত্ব আছে'—বুনবুনও হাজির। সে বুবু আর পুনপুনকে টেক্কা দিতে চায়।

—'আমাদের পিসিমার জারক নেবু আছে'—পুনপুন হারবে কেন ?

—'কাঁইবিচি আছে এতগুনো।' হাত ফাঁক করে বুনবুন দেখায়।

—'গুলি আছে, টলগুলি। লাট্টু আছে।'

—'টেকনের বিড়ি আছে, দুন্ডি আছে' —বুবু লোভনীয়ের তালিকায় সর্বোত্তম দ্রব্যগুলিকে হাজির করে সবার ওপরে টেক্কা দিতে চায়।

—'আমি বিড়ি খাই'—পুনপুন গোপন কথা ফাঁস করে।

—'বিড়ি বিচ্ছি।' বুবু মত দেয়। তার পরেই বলে 'বিড়ির বাকসো নিয়ে শ্বশুবাড়ি যাবো, টেকন বনেছে।' যে বিড়ি বিক্রী, তাই নিয়ে শ্বশুরবাড়ি যাবার সম্ভাবনাতে সে এত উল্লসিত কেন বোঝা যায় না।

একটা লোক পকেট থেকে সিগারেট বার করে। ধরায়। বুবু-পুনপুন-বুনবুন অসীম বিস্ময় আর প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

—'ল্যাবেঞ্চুস খাবে ?'

তিনজোড়া হাত সঙ্গে সঙ্গে প্রসারিত হয়।

আর সঙ্গে সঙ্গে ঋতি বনবেড়ালের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে।

—'ছেলেধরা। ছেলেধরা। আমার ভাইবোনকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।'

মুহূর্তে বেশ কিছু লোক, লোক দুটোকে ঘিরে ধরে।

গণপ্রহার তখন এত সুলভ ছিল না। কলার ধরাও না।

লোকগুলো তাই শুধু ঘিরে ধরে।

—'কী ব্যাপার ? কী ব্যাপার ? বাচ্চাদের নিয়ে কী হচ্ছে ? ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদে দেখোনি ?'

—'আমরা দুগগাপ্রসাদ বাবু মানে ডাক্তারবাবুর চেনা লোক। এই যে এদের বাবা। চেনা বলেই কথা বলছি।'

—'চেনা লোক ? ইয়ার্কি হচ্ছে ? এই খুকু তাহলে চেঁচাচ্ছিল কেন ?'

—'ঠিক আছে, চল্ ওঁর কাছে নিয়ে।'

দুর্গাপ্রসাদ চেম্বারে বসে আছেন, একটি সবেধন নীলমণির নাড়ি টিপে ধরেছেন। পাশেই তাঁর বাবার চেম্বারে অনেক বেশি ভিড়। আবির রঙের মিকচারের শিশি নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে রুগিরা। লোক দুটিকে নিয়ে হই-চই করতে করতে সবাই গিয়ে দাঁড়ায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোক দুটোকে শক্ত করে পাকড়ে কজন। পাশাপাশি বুবু পুনপুন বুনবুনকে আগলাচ্ছে আরও কজন। ঋতি আর কানু একটু পেছনে।

—'কী ব্যাপার ?'

—'দেখুন তো ডাক্তারবাবু এদের চেনেন কি না, আপনার বাচ্চাদের বিরক্ত করছিল। বলে না কি আপনার চেনা।'

ডাক্তারবাবু এবার মুখ তুলে দেখেন। দেরাদুনগামী ট্রেনের কামরায় এদের শেষ দেখেছিলেন। এখন, এই এত বছর পরেও এরা তাঁর পেছনে লেগে আছে ? তিনি রুগির কবজি ধরেই হঠাৎ মুখ তুলে বলেন—'স্বাধীনতা তো আর এসে গেল বলে। এর পর কার গোলামি করবেন ? আপনাদের লজ্জাও নেই !'

লোক দুটো দেঁতো হাসি হাসল।

—'ছেড়ে দেব ? ইনফর্মার বোধহয় !'— জনতা বলে।

—'ছেড়ে দিন।'

—'দে শালাকে এক ঝাপড়।'

দুই থাপ্পড় দিয়ে ওদের যেতে দেয় জনতা। বীরদর্পে বাড়ি ঢোকে ঋতি। বুনবুনে আর কানুকে পৌঁছতে যায় টেকন। বুবু-পুনপুন বুঝতে পারে না অত সুন্দর লম্বা-বেঁটে ছেলেধরা, যাদের পিঠে ঝোল্লা নেই, যাদের পকেটে চমৎকার সিগারেট থাকে, যারা বন্দুক-বোমা এই সব চমৎকার চমৎকার বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করে, পরবর্তী কালীপুজোয় যাদের আসবার শুভ সম্ভাবনা রয়েই গেল, যাদের মধ্যরাতে ইলিশ মাছ আর জারক লেবুর ভোজ খাওয়াবার জন্যে তারা নিমন্ত্রণ করেছে, এবং সর্বোপরি যারা বাবার বন্ধুদের মতো বন্ধুভাবাপন্ন বিষয়ে ইনটারেস্টেড, তাদের কেন পাড়া-বেপড়ার লোকেরা মার দিল ? তাদের বৈকালিক আড্ডাটা সম্পূর্ণ মাটি হয়ে গেল।

ঋতি অংশুকে বলে—'আমাদের ছোট তিনটে না রামবোকা। বুঝলি ছোড়দা ? কারুর কাছে মুখ খুলবে না। বড়দি মেজদির বন্ধুরা, মুকুলদি, রাণুদি, শান্তিদি... কত সাধাসাধি। আদর। রঙিন চক দিচ্ছে, লজেন্স দিচ্ছে, কিছুতেই কিছু না— 'ও সব যাগ্‌ গে।' বলে বুবুবাবু চলে গেলেন। এদিক দ্যাখ, বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি দুটো লোক, দেখলেই বাজে বলে চেনা যায়, তাদের হাত ধরে, এক গঙ্গা কথা বলে এককোর। বাড়িতে কী কী আছে, কে কে আছে, কী কী খাবার হয়, স-ব। আবার বলছে 'কালীপুজোয় বাজি ফাটাতে আসবে ? ইলিশ মাছের ঝোল খেতে আসবে ?' 'ইলিশ মাছের ঝোল কেমন খেতে হয় তোরা জানিস ? খাস তো শিঙ্গি মাছের ঝোল আর মুসুর ডাল, এখনও তো খাবার সময় হলেই মায়ের কোলে গিয়ে বসিস !'

সব কথা শুনে-টুনে ঠাকুর্দাদা ঠাকুমাকে গম্ভীরভাবে বলেন—'বুঝলে ছোট গিন্নি সুভাষ বোস যে ফিরে আসেননি এরা এখনও সেটা বিশ্বাস করতে পারছে না। এদের ধারণা উনি এসেছেন, বাঙালিদের মধ্যেই কোথাও লুকিয়ে আছেন। এদিকে কবে থেকে ক্রিপস মিশন হচ্ছে, অমুক কমিশন হচ্ছে, তমুক কমিশন হচ্ছে, ওয়াভেল-মোহাভেল ইনডিপেন্ডেন্স এরা দিতেও বাধ্য হবে। কিন্তু সুভাষকে ওরা ছাড়বে না। যেনতেনপ্রকারেণ আটক করবে। পাবলিক ওপিনিয়নের জন্যে প্রকাশ্যে মারতে পারবে না, কিন্তু গুমখুন করবে। আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তো সন্দেহ হয়, আমাদের নেতাদের সঙ্গে ওদের গোপন আন্ডারস্ট্যান্ডিং-ও আছে এ বিষয়ে।

—'আমাদের নেতা ? কার কথা বলছ ?'—ঠাকুমা অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন।

—'কার নয়, কাদের। কারা আবার ? গান্ধী, নেহরু, প্যাটেল কে নয় ? আমি কাউকে বিশ্বাস করি না। ওদিকে আবদুল গফফর, আর এদিকে শ্যামাপ্রসাদ— এই দুটি মানুষের মতো মানুষ। বাকি সব ফেক।'

—'বলছ কি গো ? মহাত্মাকেও অবিশ্বাস করো ?'

—'আরে বাবা, দুর্গ্গিকে জিজ্ঞেস করো, গান্ধীর নীতি নন-ভায়লেন্স। সুভাষ একেবারে উল্টো। রক্তের মূল্য ছাড়া স্বাধীনতায় বিশ্বাসই করে না। ইডিয়লজিতে কোনওদিন মিলবে না ওদের। গান্ধীর গোঁ বানিয়ার গোঁ। ইগো কম নাকি ? ওরা তো বলতে চাচ্ছে সুভাষ যেহেতু জার্মানি গেছে সে-ও অমনি ফ্যাসিস্ট হয়ে গেল। হিটলার মুসোলিনি তোজোকে এনে ইংরেজের সিংহাসনে বসিয়ে দেবে।'

—'আরে বাবা, সে লোকটা বিবেকানন্দের চেলা। আই.সি.এস নিলে না। কেরিয়ার কী ? ফিরে তাকিয়েছে সে দিকে ? নেতৃত্বের জন্যে হ্যাংলামি করেছে ? হরিপুরায় গান্ধী যা করল, তারপরে গান্ধীর আর মুখ দেখানো উচিত ? ছি ছি ছি। স্যাক্রিফাইস দেখেও লোক চিনলি না, মেরিট দেখেও লোক চিনলি না। ইংরেজের জায়গায় জার্মান-জাপানি ভূত এনে বসাবে সুভাষ ? ছি ছি ছি। এখন বাঙালির ঘরে ঘরে আজাদ হিন্দ ফৌজের লোকের খোঁজ করছে ? রাবিশ !'

ঠাকুমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'সূর্যি সেন গেল, বারীন ঘোষ গেল, বিনয়-বাদল-দীনেশ গেল, টেগরা, ভগৎ, চাপেকররা গেল, আরও কত গেল গো, আহা ! আর কি অমন সোনার চাঁদ সব আসবে ? ফিরবে ? অমন ভাগ্যি কি আর আমরা মায়েরা করতে পারব ? একটা মহৎ-মহান যুগ শেষ হয়ে যাচ্ছে গো ! কেউ দেখলে না, শুনলে না, জানলে না, অত রক্ত কোনও কাজেই লাগল না, এখন সব গোলটেবিল করছে।'

ঠাকুর্দা রাগত স্বরে বললেন—'বেনাবনে মুক্তো ছড়ালে এমনই হয়। এই ভারতবর্ষ একটি বৃহৎ বেনাবন। কিংবা বলতে পার একটা লম্বা ন্যাজের বাঁদর। গলায় মুক্তোর মালা ঝুলিয়ে দিলে কি আর বাঁদরে বুঝতে পারে ? তার কাছে চাপকানের বোতামও যা মুক্তোও তা। গাছের ডালে বসে বসে ছিঁড়ছে খিঁচোচ্ছে আর ছিঁড়ে গো-ভাগাড়ে ফেলছে। বোগাস।'

ঋতি আর অংশু, সবচেয়ে ছোটদের ঠিক ওপরের দুজন, বড়দের মান-সম্মান-প্রতাপ-প্রতিপত্তি আর ছোটদের আদর-আবদার-যত্ন-আত্তির মধ্যে যারা চেপ্টে গেছে, তারা মন দিয়ে ঠাকুর্দা-ঠাকুমার আলোচনা শোনে। এসব কথা সাধারণত তাদের বাড়িতে কেউ বলে না। বাবা তো নয়ই। কিন্তু ওরা জানে এই একমাত্র প্রসঙ্গ যাতে বাবা-ঠাকুর্দা একমত।

গুপ্তচর ? ওই লোকগুলো গুপ্তচর ? সুভাষ বোসকে খুঁজতে এসেছিল ? আজাদ হিন্দ ফৌজের লোকদের খুঁজতে আসে ? তাদের বাড়ি ? গান্ধীর আর মুখ দেখানো উচিত না ? নেহরু, গান্ধী, প্যাটেল এরা তো সব দেবতা ? এদের বিশ্বাস করতে পারছেন না ঠাকুর্দা ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠাকুমা ?

সুভাষ বোস—নেতাজিকে এরা মেরে ফেলবে ? গুমখুন ? হায় ভগবান ! অংশু ক্ষতির হাতে যদি ক্ষমতা থাকত তো ওরা সেই গুমখুনে লোকগুলোকে ওইরকম ঝাঁপড় দিত ! মেরে ধরে ছিঁড়ে খুঁড়ে দিত । ইতিমধ্যে সব ফেক । রাবিশ । বোগাস ।

রাবিশ, বোগাস মানে তারা মোটামুটি জানে । কিন্তু ফেক মানে কী ? ফেক ? ক্ষতি ডিকশনারি দেখবে ভাবে, অক্সফোর্ড কনসাইজ । দেখা হয়ে ওঠে না । ভুলে যায় । কিন্তু কানের মধ্যে স্মৃতির মধ্যে লেগে থাকে, চূড়ান্ত ঘৃণার আশাভঙ্গের উচ্চারণ, ফেক ! ফেক ! সব ফেক !

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঞ্চদশ অধ্যায়

প্রলম্বিত ব্যোমাসুর—শেষ আক্রমণ

কংস এবার তার তূণ থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী তীরটা বার করে। ডেকে পাঠায় ভীষণতম আততায়ীদের। অসুরের পৃথিবীতে মহা সাড়া পড়ে গেছে। কঠিন জন্মজটিলতা, শরীর-ওজন-প্রাণ তিন ভাগ করা ব্যর্থ হল। ব্যর্থ হল আকাল, বিশ্বযুদ্ধ, দাঙ্গা। কোথা থেকে ও অক্ষয় বল সংগ্রহ করছে ? কোন দেবতা একটার পর একটা কাটিয়ে দিচ্ছে সব অস্ত্র ? সব বিষ ? বেড়ে যাচ্ছে। বড্ড বেড়ে যাচ্ছে ও। ওকে খুন করো। ছলে বলে কৌশলে। পারতেই হবে। না পারলে আর ফেরা চলবে না। যাও প্রলম্ব, যাও ব্যোম, ওর খেলার সঙ্গে মিশে যাও। যাতে ও সতর্ক হতে না পারে। আক্রমণ করো যখন ও সবচেয়ে আনন্দিত, সবচেয়ে অন্যমনা। শোঁ-ও-ও করে ধুলোর ঘূর্ণি ওঠে। প্রলম্ব মিশে যায় ব্যোমেতে, ব্যোম নামতে থাকে দুরন্ত বেগে। এত বেগ যে অসুরের লক্ষাধিক কিলবিলে হাত পা দেখা যায় না। খালি হাওয়া, হাওয়া। সিলিং ফ্যান বাঁই বাঁই চললে যেমন তার ব্লেড দেখা যায় না।

ওরা খেলছে। খেলার আর ওদের শেষ নেই? আদি-অন্ত নেই। জগৎ পারাবারের তীরে শিশুরা এক নিত্য খেলা খেলছে। সাগরে ঢেউ উঠছে ঢেউ পড়ছে, বালি সরছে বালি ভরছে। কত ঝিনুক-শামুক-শঙ্খ-নুড়ি-সী হর্স, আসা-যাওয়া যাওয়া-আসা, ঢেউয়ের মাথায় ফেনার রাশি, ফেনার মালা, ঢেউয়ের পায়ে ফসফরাসের নূপুর-ঝালা, কত পানসি তীরে ফিরছে, কত পানসি ডুব খাচ্ছে, কত মাছ রুপো-চিকচিক, কত হাঙর ছুরি ঝিকঝিক, ওদের ভ্রূক্ষেপ নেই।

—কী নিয়ে খেলছ বাবু ?

—বালি নিয়ে।

অতি নশ্বর অতি ভঙ্গুর বালি, তাই দিয়েই গড় বানাই, প্রাসাদ বানাই, কুটির বানাই। বাংলো বাড়ি, শহর নগর, পাহাড়-টিলা, খেলার মাঠ, চাঁদের হাট...সকল বানাই। ভেঙে যাবে ? যাক, ক্ষতি নেই। আবার গড়ব। বারবার গড়তেই তো মজা ! জগদ্দল অচলায়তন গড়ে কী লাভ ! ভেঙে যাক। কেমন নতুন নতুন বানানো যায়।

—কী নিয়ে খেলছি ? একটা 'ছুতো' পেয়েছি।

ছুতো কী ? না সুতো। কী আনন্দ ! ক্রোশে নয়, রেশম নয়, গুলি সুতো। সুতোতে গিঁট দেয়, আবার খোলে। সুতো পাকায় আবার তার পাক খোলে, হাওয়ায় ভাসিয়ে দেয়, কাটা ঘুড়ির মাঞ্জা-সুতো ধরবার মতো কান পাকড়ে ধরে আনে। এত ধৈর্য, এত কল্পনা, এত আনন্দ কার ? তার। এই পৃথিবীতে একমাত্র তা-রই। যার চোখে এখনও সকালের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিষ্কলুষ আলো। যার মনোযোগ এখনও সূচ্যগ্রে বিঁধে আছে। ওকে, ওই মহাকবি মহাবৈজ্ঞানিক মহাপ্রাযুক্তিক আদি-ঋষিকে বিরক্ত করো না মাতৃগণ। মহার্ঘ খেলনা কার জন্য আনছ হে বিত্তগর্বী পিতর্ ? ও দাম বোঝে না। ওকে এক দাও, ও তাকে বহু করে ফেলবে আপন প্রতিভায়, বহু দাও, ও তাকে এক-একঘেঁয়ে করে ফেলবে, অবহেলায় ফেলে দেবে বহুমূল্য গাড়ি, পুতুল...।

ওই দ্যাখো, ওই শিশুটি নিউ জার্সির বিলাস কামরায় খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। ওর ঘর ভর্তি খেলনা। কত ? সংখ্যা নেই। সরল খেলনা, জটিল খেলনা। তাহলে খাওয়া ছেড়েছে কেন ? অসুখ ? মনের অসুখ হে, অসুখের মন। ও চাইছে। নতুন কী যেন একটা পছন্দ হয়েছে, চাইছে। তা বেশ তো। মাতা-পিতা কি দেননি ? এতই যদি দিলেন তো আর একটু দিতে বাধা কী ? না, না। দিচ্ছেন, নিশ্চয়ই দেবেন। দু দিন দেরি হচ্ছে। দুষ্প্রাপ্য খেলনা। অমন সব পেয়েছির দেশেও তাই দুদিন দেরি হচ্ছে। টেনশনে বালক খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। ভুরুতে ভাঁজ। কারও সঙ্গে কথা বলছে না। মাঝে মাঝে শুধু ফ্রিজ খুলে আইসক্রিম খাচ্ছে। টনসিলের ধাত। এভাবে আইস খাওয়া ঠিক না। কিন্তু ভয়ে মা বাবা বলতে পারছেন না। তার পছন্দ-অপছন্দ, তার ব্যক্তি-স্বাধীনতা...এসবে হস্তক্ষেপ করলে না জানি কী পাপ, কী অঘটন ঘটে যায় !

এ দিকে ফেরো। বেতের ঝাঁপি-ভর্তি কাশীর কাঠের খেলনা। কাঠের ওপর সুন্দর করে সবুজ রঙ করা, ফাগ রঙ করা, লাল রঙ করা। বাটি-ঘটি-থালা-গেলাস-যাঁতা। লোহার খেলনাও আছে, বদ্যিনাথধামের। উনুন, কড়া, হাতা, খন্তি, বেড়ি। যে যেখানে যায় শিশুদের জন্যে এই এথনিক খেলনা নিয়ে আসে। উপরন্তু মদনমোহনতলার রাসের মেলা থেকে কিনে এনেছে মাটির মুড়কি পুতুল, ঘোর গোলাপি রং, অনেকটা জগন্নাথের মতন গড়নের-বেনে পুতুল। ছত্রাকের ঘাগরা, ভারী বুক, গাবদা-গোবদা, গেরেম্ভারি। আর আছে কাচের পুতুল। হুবহু পারে কাচের। কিন্তু সৌখিন কিছু নয়, চোখ মুখের কোনও ছিরি-ছাঁদ নেই। তবু শিশু তাতে কী রূপ যে দেখে ! কী রূপ তার সাদা কাচের পুতুলের। আর কী আছে রে বুবু ?

—'ঠাকুদ্দাদা ঠাকুদ্দাদা, একটা চম্মা কিনে দিন না !'

তো চশমা কিনে দিয়েছেন ঠাকুর্দাদা। রঙিন কাগজের রঙিন চশমা। একজনের লাল, একজনের সবুজ, আর বুনবুন ? সে তো স্পেশ্যাল গেস্ট, দিদিভাইয়ের বাড়ি থেকে আসে, আবার ফিরে যায়। ওর চশমা সোনালি রঙের। তিনজনেই চোখে চশমা লাগিয়েছে। যদি পৃথিবীটা স্বপ্নের দেশ হয় ! তবে কেমন হত তুমি বলো তো ?

—'ঠাম্মা, ঠাম্মা, একটা ঘড়ি কিনে দিন না !'

তো ঘড়িও হয়েছে। তিনজনেরই হাতে ঘড়ি। তার কাঁটা ঘোরে না, চিরদিনের জন্যে বারোটা বেজে আছে। কিন্তু হলে কি হবে ? তিনজনেই যখন-তখন হাত আড় করে ঘড়ি দেখছে। খুব সাবধানে সবুজ কাঠের যাঁতার ফুটোর মধ্যে কাঠের ছোট্ট ডাণ্ডা দিয়ে যাঁতা ঘোরাচ্ছে বুবু। যাঁতা কখনও দেখেনি তো, ওটাই সব চেয়ে কৌতূহলের। পুনপুন তার পুরুষত্ব ভুলে লোহার উনুনে ছোট্ট লোহার কড়াই চাপিয়েছে। আলু-পটলের খোসা জোগাড় করে এনেছে। খন্তি দিয়ে নাড়ছে, চাড়ছে, খন্তির হাতল কড়ার চেয়ে লম্বা। দু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বার কড়া উল্টে গেল। তা সে যাই হোক। রান্না হচ্ছে। বুনবুন রুগি দেখতে যাবে। খুব তাড়া।

আনি মানি জানি না

ছেলে-মেয়ে মানি না।

বুনবুন বাজার করে আনল। ছেঁড়া পুরনো কাপড় সেলাই করে থলে তৈরি করে দিয়েছেন ঠাকুমা।

—'দিদিভাই, বাজার এসে গেলেন' বুনবুন থলি নামিয়ে বলে।

খেঁল্লার ঘরের দিদিভাই হল গিয়ে বুবু। একটা দিদিভাই না হলে তো আর বাড়ি হয় না, সংসারও হয় না। তাই দিদিভাই। বুবুকে দিদিভাই সাজতে হয়েছে। সে গামছা মাথায় জড়িয়ে একটা খোঁপা করেছে। গামছার প্রকণ্ড খোঁপা। মাথাটা বড্ড ভারী লাগছে। কিন্তু দিদিভাই সাজতে হলে অত বড় খোঁপা বাঁধতেই হবে, বাঁধতে হলে এটুকু কষ্ট করতেই হবে। তাই বুবু খোঁপা মাথায়, বুকে কুঁচি বেবি-ফ্রক পরে। কপালে একটা নিষিদ্ধ সিঁদুর-টিপ পরে, তিনটের অসঙ্গতিতে একটুও ঘাবড়ে না গিয়ে যাঁতা ঘোরাচ্ছে।

আর 'বাজার এসে গেলেন' কেন? বড়রা, অর্থাৎ দিদিভাই, মা, পমদিদি, ই-দাদা সব্বাই রাতদিন বলে 'আপনি' করে বলবে। 'আপনি করে বলতে হয়। তাই বুনবুন, বড় লক্ষ্মী ছেলে, বাড়ির ম্যাও পুষি লেত্তির সম্পর্কে বলে—'লেত্তি পমুর সব দুধ খেয়ে ফেলেছেন।' অর্থাৎ কি না চোর অবস্থাতেও লেত্তির শ্রদ্ধেয়ত্ব যায় না। দরজায় ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়ালেও বুনবুন তার ম্যানার্স বিস্মৃত হয় না। বলে— 'গাড়ি এসেছেন?' সে যতই ছ্যাকরা গাড়ির ড্যাকরা ঘোড়া হোক। কাজেই বাজারও আসবেন বইকি! বাজারের একটা মান-সম্মান নেই? —'টেকন বাজার যাও'—বুবু নির্দেশ দেয় পুনপুনকে। একজন দিদিভাই না হলে যেমন সংসার হয় না, একজন টেকনও তেমনি সংসারের পক্ষে অপরিহার্য—গুণ্ডির-বটুয়া-হাতে, পান-লাল-ঠোঁট চাকর টেকন, যে ব্রাহ্মণ বলে জুতো এবং এঁটোয় হাত দেয় না। পুনপুন সেই টেকন আপাতত। বুনবুনের যখন টেকন সাজতে ইচ্ছে হবে, হতেই পারে, তখন কিন্তু পুনপুনকে সরে দাঁড়াতে হবে। সেটা বিনা মারপিটে হয়তো সম্ভবও নয়। কিন্তু আপাতত বুনবুন সেটা সাজতে চাইছে না। এটাই রক্ষা। টেকনের মতো পান-লাল ঠোঁট করার জন্যে পুনপুন চুপিচুপি মায়ের আলতা একটু ঠোঁটে ঘষে নিয়েছে। তার এই আশ্চর্য বুদ্ধির প্রদর্শনীতে বুবু-বুনবুন চমৎকৃত হয়ে আছে। তাদের আলু পটলের খোসার মিছিমিছি-রান্না মিছিমিছি-খাওয়ার খেঁল্লাবাটি এমন একটা বাস্তবতা পেয়ে গেছে যে বুনবুনের মাথায় ভূমিকা-বদলের আইডিয়াটা আসছেই না, এবং যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ পুনপুন তার ক্ষণ-টেকনত্ব উপভোগ করে নিচ্ছে।

ওরা এমনই মশগুল যে দেখতে পাচ্ছে না অসুর মিশে রয়েছে জলে, হাওয়ায়, খেলনায়। তার ভয়াল হাত সে তুলেছে। লক্ষ্য স্থির করতে পারছে না অসুরটা। কোনটা ঠিকঠাক অষ্টম গর্ভ? কোনটাকে শিকার করলে অসুরের পৃথিবী ভয়মুক্ত হবে? কংসের সিংহাসন নিষ্কণ্টক হবে? এক সঙ্গে তিনটেকে বিঁধতে পারলে সবচেয়ে ভালো হত। কিন্তু ছড়িয়েছিটিয়ে আছে। কিছুতেই এক লাইনে আসছে না। আসছে না।

অধৈর্য অসুর ভাইরাসের চার ফেলে শিকার-ক্ষেত্র তৈরি করেছিল। এবার সে তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তীক্ষ্ণ বঁড়শি ছুঁড়ে দেয়, বিদ্ধ হয় অন্যদের আড়াল করে থাকা বড়সড় মাছটা। লাবণ্যে ভরপুর, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, শ্যাম-চিক্কণ শিশুদেহ, ঝুমকো ঝুমকো চুল মাথা ভরে...। গামছার কবরী উল্টে পড়ে যায় হাঁড়ির মুখের ঢাকনার মতো। বুবু যাঁতার ওপর বক্র হয়ে শুয়ে পড়ে। অষ্টাবক্র। হাত পা খিঁচতে থাকে। তার আজ দুদিন ধরে জ্বর হচ্ছে, কেউ বোঝেনি। এখন সে তো নিজে নিজে চান করে, নিজে নিজে খায়, নিজে নিজেই জামা পরতে পারে কি না! সারা দিন কোনও দ্বিতীয় মানুষের হাত লাগল না দেহে, রাত্রে ক্লান্ত মা শুতে এসে হয়তো আলতো করে হাত রাখলেন কপালে। হয়তো রাখলেন না। বুবু বড্ড পা ছোঁড়ে, বিচ্ছিরি শোওয়া, মা পুনপুনের দিকে পাশ ফিরলেন। কেউ জানে না, বুবু খেতে পারছে না। এমনিতেই খাওয়ার বড্ড ন্যাটা কিনা। বুবু ঝিমোচ্ছিস কেন? ঘুম পেয়েছে? এমন অসময়ে? তো শুতে যা! বিছানায় গিয়ে শো। খিটখিট করে বুবু, শুধু শুধু বায়না করে, সে কেমন করে বলবে তার মাথাটা কেমন করছে। মাথার যন্ত্রণা কী সে তো জানে না। বমি পাচ্ছে, গা-বমির সংজ্ঞা তো সে জানে না! কখনও হয়েছে কি এসব?

পুনপুন বলল—'এই বুবু, তুই তো দিদিভাই। শুয়ে পড়লি কেন? আগে মাছ কুটে দে, রান্না করি, খাবি, তবে তো শুবি!'

বুনবুন বলল— 'দ্যাখ দ্যাখ, কেমন মজা করছে দ্যাখ। এই বুবু, ভয় দেখাচ্ছিস কেন? আমি ভয় পাচ্ছি যে!'

পুনপুন তীরবেগে ছুটে যায়, ধাঁই করে এক কিল মারে বুবুর পিঠে, বুবু তখনও ভয় দেখাতে থাকে। তখন দু ভাই ছোটে ও-প্রান্তের কাছে একমাত্র ঠাকুমা, 'পল্লীসমাজ' পড়ছেন এই সহস্রতম বার। তিনি এখন রমা, সপসপে ভিজে কাপড় পরে তারকেশ্বরের দুধপুকুরের পাড়ে রমেশের সামনে পড়ে গেছেন। শরীরে পুলক, আবেশ, লজ্জা, শালীন মহিমা ক্ষুণ্ণ হওয়ার দরুন খেদও। বড় জটিল অবস্থা। সবটা তো শরৎচন্দ্র বুঝতে পারেননি! সবটা জানে রমা, আর জানেন মনোমোহিনী।

—'ঠাম্মা ঠাম্মা, বুবু আমাদের ভয় দেখাচ্ছে।'

—'আর দেখাবে না, বলো ঠাম্মা বারণ করছেন।'

—'শুনছে না, ভী-ষণ ভয় দেখাচ্ছে। হাত নাড়িয়ে, আঙুল মুঠো করে, চোখ কেমন উল্টেছে দেখো না এসে।'

—'বুবু! অমন করে না, ভাইদের ভয় দেখাতে নেই দিদি!'

বলতে বলতে ঠাকুমা রমেশের দিক থেকে মুহূর্তের জন্য অনিচ্ছুক চোখ ফিরিয়ে পেছনে তাকান। লম্বা দালান যেখানে পুবের দিকে বেঁকে গেছে সেই বাঁকের মুখে ঠাকুমা এক অদ্ভুত অস্থির বক্রতা দেখতে পান। বুবু কাটা ছাগলের মতো ধড়ফড় করছে।

—'মনো, অ মনো-ও-ও, বউমা-আ-আ'—একটা তীব্র আতঙ্কের চিৎকারে খান খান হয়ে যায় দুপুরের বাতাস।

—'চেচাঁচ্ছ কেন? তে তপ্পর বেলা হল, একটু ঝিমোতেও দেবে না!' —কোন সুদূর প্রান্ত থেকে মনোর কণ্ঠ ভেসে আসে।

ঠাকুমা এবার পশ্চিমের রোদ থেকে উঠে পড়েন। রমা-রমেশ মাথায় উঠে গেছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্বলজ্বলন্ত বাস্তব সামনে, যে ধরনের বাস্তব নিঃসন্তান বৃদ্ধাকে কখনও সামলাতে হয়নি।

—'জল আন, পুনপুন, শিগগির জল আন।'

কাঁপা কাঁপা হাতে তিনি জল থাবড়াতে থাকেন বুবুর মাথায়। মনোর প্রতি তীব্র অভিমানে তাকে আর দ্বিতীয়বার ডাকেন না। করতে হয়তো হয়নি। কিন্তু তিনিও ডাক্তারের বউ, ডাক্তারের মা। সঙ্কটের সামনে পড়ে কোনও একটা বিলি-ব্যবস্থা করতে পারবেন না তিনি মনোমোহিনী দেবী, এ কখনো হয়।

—'মা, মা'—মনোমোহিনী কাকে ডাকেন ? শ্মশানবাসিনী সেই শ্যামাকে ? যাঁর জন্য সমগ্র হৃদয়কেই শ্মশান করে ফেলতে হয় ?

এইভাবেই, নাতনির-মাথায়-জল থাবড়াতে-থাবড়াতে 'মা-মা' ডাকন্ত অবস্থায় তাঁকে আবিষ্কার করেন রুগি-দেখে-শেষ-বেলায়-বাড়ি-ফেরা শিবপ্রসাদ।

—'ধনুষ্টংকার হচ্ছে বুবুর, ধনুষ্...' কথা শেষ করতে পারেন না মনোমোহিনী।

দু-হাতে শিশুকে তুলে নিয়ে শিবপ্রসাদ বলেন— 'এ তো গা পুড়ে যাচ্ছে একেবারে ! দুগ্‌গি...দুগ্‌গি...'

—'কী হয়েছে বাবা ? উনি তো এখন...' বলতে-বলতে ঘোমটা-টানতে-টানতে-আসতে-আসতে প্রচণ্ড শকে দেবপ্রতি স্থাণু হয়ে যান। স্থির বিদ্যুতের মতো আশিরনখচৈতন্য জেগে থাকে ষোলই আগস্ট, উনিশ শ তেতাল্লিশ। কত কষ্টে, কী যাতনার লৌহকপাটে মাথা ঠুকতে ঠুকতে মরে-বেঁচে জন্ম দিয়েছিলেন। নিয়ে যাচ্ছে, অত্যাচারী নিষ্ঠুর নিয়ে যাচ্ছে। হে কৃষ্ণ, মধুসূদন, মধুকৈটভারি মুকুন্দশৌরি হে বাসুদেব, রক্ষা করো, রক্ষা করো।

ঘাড় শক্ত, আক্ষেপ হচ্ছে, চোখ চাইতে পারছে না, ফোটোফোবিয়া...। এক্ষুনি লাম্বার পাংচার করতে হবে, শিবপ্রসাদ রেডি হচ্ছেন।

—'না বাবা, লাম্বার পাংচার না। এখন আর সি.এস.এফ নেবার সময় নেই। দেখতে পাচ্ছি অ্যাকিউট ভাইর‍্যাল মেনিনজাইটিস, আমি ওষুধ দিচ্ছি'—ওষুধের ক্যাবিনেটের ড্রয়ার খোলা, দুর্গাপ্রসাদ অকম্পিত হাতে ওষুধ বাছতে বাছতে অকম্প্র কণ্ঠে বললেন।

—'দুগ্‌গি...'

—'বলুন'

—'ক্রিস্ট্যালাইন পেনিসিলিন এসে গেছে বাবা বাজারে। আমি...আমার নাতনিটা...' শিবপ্রসাদ যেন ভিখারি, ভিক্ষা চাইছেন।

—'সামান্য দেরি করলেও বাঁচাতে পারবেন না, যা স্টেজ। কথাটা আপনিও জানেন। যমের মুখেই যখন ছেড়ে দিতে হবে, তখন না হয় হোমিওপ্যাথির ওপরই ছাড়লেন !'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ষোড়শ অধ্যায়

কালিন্দীর দহে

একটা প্রবল ঝঞ্ঝাবাত্যা এসে তাকে যেন ঝেঁটিয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে দিল। সে পড়ছে, পড়ছে, মহাশূন্য দিয়ে পড়ছে। নীচে কোনও মেজদাদাভাই নেই যে তাকে লুফে নেবেন। তবে কি সে মাটিতে আছড়ে পড়বে ? তা হলে তো ভীষণ লাগবে ? কত লাগবে তা তো সে ধারণাও করতে পারে না ! উঃ ! ! ! সে প্রাণপণে ওপর দিকে ঠেলে উঠতে থাকে। মাথা দিয়ে ঠেলে শূন্যকে। ভীষণ লাগে মাথায়। মাথা বেড়ে যেন কী একটা জিনিস ভীষণ চাপ দিচ্ছে। সেটাকে গায়ের জোরে টেনে খুলতে যায়। মাথা থেকে সামনে ঝুলে পড়ে একটা চেরা জিভ। হিস হিস শব্দ হয়।

—'তুমি কে ?' সে গলায় সাহস এনে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করে। এবার জিভসুদ্ধু ভোঁতা মুণ্ডুটা তার মুখের সামনে এসে ঝুলতে থাকে। দুলতে থাকে।

—'আমি কাল, কালনাগ।'

—'আমার মাথায় উঠেছ কেন ?'

—'উঃ ! আকাশে যে একটা কী ভয়ংকর দানো। আমার মুণ্ডু না থেঁতলে, ন্যাজ না ধরে, দু পাক না ঘুরিয়ে শূন্যে হু-উ-শ ছুঁড়ে দিল। পড়ছি, পড়ছি, পড়ছি, তোমার মাথাটা পেলুম, শুধোলুম, —"ঠাঁই দেবে ভাই ?" তো মাথা বলল—"বেশ" তো তা-ই কোনওমতে···।'

—'তোমাকেও ছুঁড়ে দিয়েছে ? তা হলে তো তুমিও আমার একটা ভোন্দু হলে ? আমাকেও তো একটা হাওয়া না দানো না কী মেজদাদাভাইয়ের চে'ও উঁচুতে ছুঁ-ড়ে দিল। রান্নাবাটি খেলছিলুম কী মজা করে। আমার যাঁতা আছে, আমি যাঁতা ঘোরাতে পারি। ঘর্ ঘর্ ঘর্ ঘর্।'

—'অ্যাঁ ? যাঁতা ? একা দ্দানোয় রক্ষে নেই। আবার যাঁত্তা ?'

কালনাগ ভীষণ ভয়ে তার মাথা থেকে শিরদাঁড়া বেয়ে সর সর সর সর করে নেবে তাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরতে লাগল।

উঃ, তার হাড়গোড় যে গুঁড়িয়ে যাবে এবার। সুয়োরানির মতন হাড় মুড়মুড়ির ব্যারাম ধরবে যে তার ! চোখের সামনে নীলচে কালো অন্ধকার। তার মধ্যে খুনখারাপি লাল চম্‌কাচ্ছে। ওরা কি পচা, কুচান, নেড়ু, সুদামাদের মতো বাঁদুরে রং নিয়ে দোল খেলছে ?

শান্তির জল ! শান্তির জল ! শান্তির জল !

অন্ধকার ফর্সা হচ্ছে একটু একটু করে। সাপটা মুখ নিচু করে নামছিল তো ! তার মুখ থেকে পেটের জমা সমস্ত খাবার ঝুপঝাপ করে পড়ে গেছে। একটা হরিণ ! সেই সুন্দর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোনার হরিণটা যেটা সীতা চেয়েছিলেন। সোনারঙের গা, তাতে হিরে-হিরে দাগ। শিং তো নয় যেন পালিশ করা কালো মণি। চকচক চকচক করছে। শিংগুলো নাগের পেটে চুপসে এতটুকুনি হয়ে ছিল, বাইরে আসতেই ফুঁ-দেওয়া বেলুনের মতো ফুলে-ফেঁপে আপন চেহারা ধারণ করল। হরিণটা দিব্যি লাফিয়ে লাফিয়ে পালাচ্ছে।

—'হরিণ, হরিণ যেও না ; যেও না, আমি তোমাকে নেবো ভাই। তোমার সঙ্গে খেলা করব।'

কে শোনে কার কথা, হরিণ পিঠে ঢেউ তুলে তুলে দৌড়চ্ছে। কী আশ্চর্য। দৌড়চ্ছে তবু খুব দূরে যাচ্ছে না তো।

—'সাবধান, খুব সাবধান, ওটা কিন্তু মায়া হরিণ। ওই সোনা গরল, ওই হিরে খোসপাঁচড়া, ওই মণি তো মণি নয়, ফণী।'

—'বাব্বাঃ, ওকে নেওয়া যাবে না ? আচ্ছা, ও কোথায় থাকে ?'

মায়ার দেশে মায়া-কাননে সোনার হরিণ চরে
মায়ার গাছে সোনার ফুল সোনার ফল ধরে
সোনার ঘাসে মায়ার হিম, হিমের বুকে-ফুটো
ফুটোর মধ্যে হাট্টিমাটিম ডিম পেড়েছে দুটো
এক ডিমেতে সোনার ডেলা আরেক ডিমে তা
দুই মিলোলে সোনার হরিণ মায়ার হরিণ না।

—'কে ? কে এ কথা বললে ?'

সে দেখল নাগের আলগা মুখ থেকে খসে পড়েছেন এক সন্ন্যাসী। হাতে কমণ্ডলু, মাথায় জটা, গলায় নহরের পর নহর, সাত নহর রুদ্রাক্ষের মালা।

সে তো খুব নমো করতে জানে। তাই সে দু হাত জোড় করে নমো নমো জানায়। তখন সন্ন্যাসী ভারি খুশি হয়ে বললেন—

—'কাদের কুলের খুকু গো তুমি কাদের ঘরের ঝি ?
অনেক দেখি, এমন লক্ষ্মী, এমন মণি, এমন সোনা, কখনও দেখি নি।'

তখন সে বলে— 'আমি যদি লক্ষ্মী তবে কেন আমার মাথায় কালনাগ ? আমি যদি মণি, যদি সোনা তবে কেন আমায় হাওয়া-দানোয় তুলে নিয়ে যায় ? কেন আমার···'

—'কাল রাত্তির কাল পেঁচা আর কাল নাগের কষ
এই তিন কাল যে কাটাতে পারে কাল তাহার বশ।'

এই বলতে বলতে সন্ন্যাসী জটা কমণ্ডলু রুদ্রাক্ষসুদ্ধু হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন, আর নাগের মুখ থেকে ফস করে খসে পড়ল এক পক্ষিরাজ। পেট-খালি-হয়ে-যাওয়া রোগা দড়ির মতো নাগ ঘুরে এসে তাকে খাবার আগেই বুবু পক্ষিরাজের পিঠে চড়ে শূন্যের ওপর দিয়ে হু হু করে ছুটতে লাগলো।

সারা গায়ে সিরসির, বিড়বিড়, খোলা মুখ জলে ভরে যায়, ননীর দেহ আগুনে গলে যায়, দু পাশে রাক্ষসের পর রাক্ষস, খোক্কসের পর খোক্কস থাকে থাকে থাকে থাকে দাঁড়িয়ে আছে।

রাক্ষসেরা বলে— হম হম হাঃ তোকে খাবো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খোক্কসেরা বলে— তোঁকে খেঁয়ে দেঁয়ে বাঁড়ি যাঁবো।

রাক্ষসেরা চেঁচায়—

গম গম গাঃ
তোরা খাবি খাঃ।
পিলে নাড়ি ভুঁড়ি
ফেলে দিস নাঃ।

খোক্কসেরাও কম যায় না—

কুচি কুচি কেটে কেটে
কাঁচা কাঁচা খাবো মেটে
কাটা কাটা ফাটা ফাটা
খেয়ে নেবো কলিজাটা
পিলে টিলে নাড়ি ভুঁড়ি
রেঁধে নেবো চচ্চড়ি।

তোরা চলে যাঃ মোরা কাটিকুটি
মিঠে রক্তটা চাটিচুটি
পেট ভরে গেলে নখ-চুল-দাঁত
নিতে যদি চাস তবে হাত পাত।

রাক্ষসদের তখন খুবই রাগ হয়ে গেল। তারা তো বেশি কিছু চায়নি, মাত্রই একটু পিলে, ভালো পিলের দম হয়, আর একটু নাড়ি ভুঁড়ি, ছেঁচকির জন্যে! তা সত্ত্বেও খোক্কসদের এমনি কিপটেমি! আক্কেল! আস্পদ্দা! তারা নখ বাগিয়ে, দাঁত শানিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল খোক্কসদের ওপর। খোক্কসদেরও রোঁয়া ফুলে শজারুর কাঁটার মতো হয়ে গেছে, দাঁতের মধ্যে থেকে রক্তচোষা দাঁত বেরিয়ে এসেছে। পক্ষিরাজ ঘোড়ার সাদা গায়ের ডান পাশে রাক্ষস আর বাঁ পাশে খোক্কস। মহা চুলোচুলি, হুড়োহুড়ি, লড়াই বেধে গেছে।

পক্ষিরাজ বলল—

চিঁহি খুকুসোনা চিঁহি খুকুসোনা
ভালো করে ধরো হাত ফসকোনা।

ঘোড়ার পিঠের উপর দিয়ে, তার পিঠের ওপর দিয়েও রাক্ষসরা কুলোর মতো কান নেড়ে, মুলোর মতো দাঁত কিড়মিড় করে, মাথার শিং চাগিয়ে হাতের নখ বাগিয়ে রোঁয়া-খাড়া দাঁতে-দাড়া খোক্কসদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাতে তার যা ভয়ংকর লাগল তা আর বলার নয়। কুলো কানের ঝাপটায় তার ছোট্ট দেহ একবার এদিকে-কাত একবার ওদিকে-কাত, মুলো দাঁতের কিড়মিড়োনিতে তার কানে তালা ঝালাপালা, শিঙের খোঁচা নখের আঁচড়, রোঁয়ার মোচড়, দাড়ার কামড়—তার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল, তবু সে পক্ষিরাজের চাঁচর কেশর ছাড়ল না।

'চিঁহি বুবুসোনা বুবুসোনা চিঁহি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরো ভালো করে হাত ফসকোনি।'

এইভাবে পক্ষিরাজে আর বুবুতে, বুবুতে আর পক্ষিরাজে সেই রাক্ষস-খোক্কসের প্রকাণ্ড কুরুক্ষেত্তর পার হয়ে গেল।

যা ভাবা গিয়েছিল ঠিক তাই। বিরাট এক ফটক। তার ওপর তিন থাক খিলান, লাল মখমলের গালচে পাতা সাত থাক সিঁড়ি, নয় বাঁক দালান, চলে গেছে ভেতরে, অনেক ভেতরে। মাথার ওপর ঝাড়লণ্ঠনে টুং টাং, দু পাশে মণিমাণিক্যের গাছে চুনি পান্নার ফুল টুপটাপ, কিন্তু কোথাও কোনও প্রাণ নেই, প্রাণী নেই, খালি থরে বিথরে জিনিস, জিনিস আর জিনিস। নয় বাঁকের শেষ বাঁকে দাঁড়ে বসে লাল সবুজ কাকাতুয়া ঘাড় বেঁকিয়ে, ঝুঁটি উঁচিয়ে চুপ। সিঙ্গিমামা হাতের থাবায় মুখ রেখে ঘুমে। সিংহের মামা ভোম্বলদাসও হাত-পা ছেতরিয়ে, চার খুর কেতরিয়ে জ্ঞানে কি অজ্ঞানে বোঝা যায় না। যত সে এগোয় ততই সব আবছা হয়ে আসে ; অবশেষে সেই প্রাসাদের গহীন গহ্বর থেকে দলে দলে ভূত বেরিয়ে আসতে থাকে। তার আশে ভূত, পাশে ভূত, কড়িকাঠ থেকে ভূত ঝুলছে, মেঝে ফুঁড়ে ভূত বেরোচ্ছে। তখন সে নিমেষে বুঝতে পারে এটা মোটেই অরুণ বরুণ কিরণমালার সেই প্রাসাদ নয় যেখানে কাকাতুয়া রাজামশাইকে জিজ্ঞেস করবে—'তা মহারাজ, মানুষের পেটে কি কুকুর বেড়াল হয় ? তা মহারাজ, মানুষের পেটে কি কাঠের পুতুল হয় ?'— এ হল এক মায়া প্রাসাদ। সে চিৎকার করে কেঁদে উঠল—'মা ! !'

কে যেন তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। কে ও ? চাঁদের মা বুড়ি ?

'চাঁদের মা বুড়ি
ক খানা কাপড় পেলি ?
ছ' খানা কাপড় পেলাম
ছ' বউকে দিলাম।'

—'কী হয়েছে দিদি ? কিসের কষ্ট !' উনি মাথায় বরফের হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন, হাত তো নয়, বরফের পুঁটলি ! আ-হ্ হ !

সবই তার ভুল হয়ে যাচ্ছে। কিচ্ছু মনে পড়ছে না। সে তো মায়ার প্রাসাদে ছিল ! পক্ষিরাজ ? পক্ষিরাজ কোথায় গেল ? পক্ষিরাজের জন্যে কান্না পাচ্ছে যে !

চাঁদের মা বললেন—'কিসের ভয় ? কিসের কান্না। ও তো মায়া !' তা-ই।

চাঁদের দেশের হিমফল খেতে দেন চাঁদের মা।

আ-হ্ !

ভেতরটা জুড়িয়ে যায়। টাগরা ছুঁয়ে, জিভের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে যতদূর যাচ্ছে হিমফল ততদূর জুড়িয়ে যাচ্ছে। জুড়িয়ে-এ যাচ্ছে। হিমফল ! হিমফালি !! চাই মুমফালি ই-ই !!!

শিবপ্রসাদ দুর্গাপ্রসাদকে বললেন— ক্রাইসিসটা বোধহয় কেটে গেল।'

দুর্গাপ্রসাদ মনোমোহিনীকে বললেন— 'সেজমা এবার শুতে যাও।'

মনোমোহিনী দেবহূতিকে বললেন— 'কিছু মুখে দাও বউমা,'

দেবহূতি মনোরমাকে বললেন— 'দিদিমণি এবার আপনিও...'

মনোরমা বললেন— 'দুগ্‌গা, দুগ্‌গা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুর্গাপ্রসাদ শিবপ্রসাদকে বললেন— 'বলছেন ? কেটে গেল ? ঠিক ?'

শিবপ্রসাদ বললেন— 'বোধ হয় ।'

গহন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সে একা-একা পথ হাঁটতে থাকে। চারদিক স্তব্ধ। ঝিঁঝির ডাক পর্যন্ত শোনা যায় না। পায়ের তলায় বালি, কাঁকর, কাঁটা। দু পাশ থেকে সাপের মতো লতা দোলে, শপাং শপাং করে চাবুক মারে। হাত পা ছড়ে যায়, পিঠে-বুকে কাঁটালতার দাগড়া দাগড়া দাগ, তবু সে চলে চলে আর চলে। পিঠের ওপর বিষপুচ্ছ বাঁকিয়ে দেখো সড়সড় করে কাঁকড়াবিছে যায়।

—'বিছে ! বিছে !' সে ক্ষীণ গলায় ডাকে !

—'বিছে শুধু নই, আমি কর্কট বৃশ্চিক !' দাড়া বাঁকিয়ে বিছে ঘুরে দাঁড়ায়। কার এত সাহস তাকে ডাকে !

—'একলা একলা যাচ্ছি বিছে, কথা বলবার লোক নাই।

মনের মধ্যে কথা ঘনায়, ব্যথা শানায়, কাকে জানাই ? কাকে জানাই !'

—বে-শ। কিন্তু বিষ জমলে কামড়ে দেব।'

—'দি-ও। ইচ্ছে হলে দিও, নেব।'

নেই-প্রাণীর এই দেশে বিছে তো বিছে, সে-ও বুঝি ভাবো। সে বিছেকে মুঠোয় তুলে নেয়।

বিছে—'মনের মধ্যে বড্ড রিষ তাই তো বিষ তোমার মনে কী ?'

বুবু—'খেতে দেবো নাম পাতাবো বিষ ঢালতে যা ছিঃ।'

বিছে—'বিষের নামে দাড়া সুড়সুড় ন্যাজ ফুরফুর ঢোল হল যে গা ?'

বুবু—'বিছে-বুব্বু বুব্বু-বিছে বন্ধু হল না ?'

বিছে—'জেনো, আমার নামটি কিচ্ছু'

বুবু—

'জানো না তুমি কিচ্ছু

তোমার নামটি আলপনা।'

বিছে—

'সত্যি বলছি মিথ্যে আমি বলব না, বলব না।

মারছি কামড় ঢালছি বিষ বড্ড যে সুলসুলোচ্ছে।'

বুবু—ঠিক আছে ভাই মারো কামড় অতই যদি ইচ্ছে।'

বিছে দাড়া উঁচিয়েছে কী উচোয় নি, শ্যাওড়াগাছের আগডালে এক পেঁচা ছিল, ঝাঁপিয়ে পড়ল। দু মিনিটে বিছে সাফ।

—'বু বু ! বু বু !'—পেঁচা ডাকছে।

—'টু ইট টু ! টু ইট টু !' বুবু সাড়া দিচ্ছে।

পেঁচা—'আমাকে তো কই সঙ্গে যেতে ডাকলে না ?'

বুবু—'তুমিও তো কই আপনা থেকে আমার সঙ্গে আসলে না !'

পেঁচা বলল—'সামনে আসছে ভোর/ পার করে দাও পার করে দাও লক্ষ্মী বোনটি মোর।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন সে ভালো করে তাকিয়ে দেখল—ওমা ! এ তো কালপেঁচা !

কে যেন কবে যেন কোথায় যেন কখন যেন কালপেঁচার কথা বলেছিল !

বলেছে তো বলেছে ! মনে না পড়লে সে আর কী করতে পারে ?

কালপেঁচা কিন্তু উড়ে এসে বুবুর কাঁধে বসল ।

চলে, চলে, চলে । কেবলই চলে ।

ক্রমশই আঁধার ফিকে হয় । ঘন জঙ্গলের গাছপালা ভেদ করে ভোরের শুকতারা বেরিয়ে পড়ে । চাঁদ ডুবে যেতে থাকে । সূয্যি উঠছে জানান দেয়, পাখি ডাকতে থাকে ।

পেঁচাও মুখ নুকিয়ে বুবুর চুলের মধ্যে ঢুকে পড়ে । কেননা সে জঙ্গলের মধ্যে আরেক জঙ্গল । কা কা কা কা চারদিক কাকের ডাকে ভরে যায় । বুবুর চুলের মধ্যে কালপেঁচা থর থর থর থর ডর খায় ।

কিন্তু ভোরের সীমানা আর কতটুকু ? বড় জোর এক কোশ আর আধ কোশ ? জঙ্গলের সেই গঙ্গাজলী ভোর পার হয়ে বুবু দেখে কই, সকাল এলো না তো ! এ যে আরেক অমানিশা ? ঢুকব কি ঢুকব না ঢুকব কি ঢুকব না ভাবতে ভাবতে পেছনে তাকিয়ে সে দেখল এক কোশ আর আধ কোশ ভোর-সকালের রাজ্যির পরেই সেই অমানিশার রাজ্যপাট । তা হলে ? এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চরের মতো একটুখানি ভোরের রাজ্য আর বাকিটুকু সব কূলহীন অতল অচল অন্ধকার ? পেছনের কথা সে জানে কিন্তু সামনের কথা তো সে জানে না ! তাই পেছনের আঁধার পেরিয়ে সে আর সেখানে ফিরতে চাইল না । সামনে যেতে পা-টি বাড়িয়েছে আর কালপেঁচা বেরিয়ে এসে বলছে— 'বুবু এবার তবে তোর চোখ খুবলুই ?'

—'সে আবার কী ?' বুবু অবাক হয়ে বলে, 'এই না তুমি আমার পেঁচা সই ?'

—'আনি মানি জানি না

সই সয়া সব মানি না'—বলতে বলতে পেঁচা যেই পাখনা মেলে ঝাঁপাতে গেছে অমনি ভোরের রাজ্যির শেষ সীমানার বুড়ো অশথের ডালপালা থেকে হাজার হাজার কাক কালপেঁচার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে । দু মিনিটে পেঁচা সাফ ।

অত কাকের বাড়াবাড়ি কেলেঙ্কারিতে বুবুর চুলও ছিঁড়েখুঁড়ে একসা । খুবলে খাবলে ন্যাড়া বেরিয়ে একেক্কার । কিন্তু বুবু বেঁচে যায় ।

হাজার কাক কালপেঁচার হাজার পাখ মুখে করে ফিরে যায়, তখন বুবু মিনতি করে—

'পথ না পাথার পথ না পাথার !

বড্ড আঁধার বড্ড আঁধার ।

কাক-কাকিনী কাকের ছাঁ

আঁধারে চোখ চলে না.....'

বলতে না-বলতেই হাজার কাক কা কা কা কা না না না না করে চেঁচামেচি করে ওঠে । আঁধারের রাজ্যে না কি তাদের প্রবেশ নিষেধ ।

যেতে তো হবেই তাই বুবুরানি সো-জা হেঁটে যায়, সে জানে না, সে একেবারে কালরাত্তিরের লক্ষ যোজন নাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে, সেখানকার মিশমিশে অন্ধকারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালসাপের কষকুটে কষ দিনরাত্তির হিম ঝরার মতো ঝরছে। একবার যার চোখে পড়বে চোখ হবে কানা, কানে পড়লে শুনতে পাবে না না, হাতে পড়লে হাত নুলো, পায়ে পড়লে পা খুঁতো অর্থাৎ কালরাত্তিরের কোটর থেকে যদি বা বেরোতে পারলে তো শুধু বেরোতেই পারলে, কানা খোঁড়া নুলো বোবা জীয়ন্তে মরন্ত হয়ে থাকবে।

ফুস মন্তর ফুস মন্তর ফুস মন্তর ফুঁসে
জলের মধ্যে কয়েক ফোঁটা ম্যাজিক দিলেম ঠুসে।
ওং শান্তিঃ, ওং শান্তিঃ, শান্তির জল নাও,
অলখ যোজন আঁধার মরণ নিমিষে পেরিয়ে যাও।

বুবু জানে না সেই সন্ন্যাসীঠাকুর সমানে তার পেছনে পেছনে আসছিলেন। সেই যে সে ভক্তিভরে নমো করেছিল! সেই যে সে সাপকে, বিছেকে আর পেঁচাকে আশ্রয় দিয়েছিল, সেই যে সে সোনার হরিণের পেছনে ছোটেনি, পক্ষিরাজের পিঠে-উঠেছে, রাক্ষসদের ভয়ে পটেনি, খোক্কসদের পেরিয়ে ছুটেছে। এই ভক্তি, আর মমতা, বিশ্বাস আর সাহস, আর নির্ নাস্তি লোভম...এই জন্যে ম্যাজিক জলে তার আগাগোড়া এমন তেলতেলে হয়ে গেল যে মহাকালনাগের কষ বেশির ভাগটাই তার গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল। অন্ধকার ফুঁড়ে বুবুরানি বেরিয়ে এলো।

বুবু ডাকল—'মা।'

আওয়াজ কই! আওয়াজ বেরোলো না।

খড়ধারীর মতো করে ডাকো তো বুবু? তো বুবু ডাকলো 'মাজী!'

আওয়াজ বেরোলো "হাঁ জী"

কাগজওলা, চুড়িওলাদের মতো করে ডাকো বুবু?

বুবু ডাকল—

'মায়ি!' আঁই মাঁই কাঁই।'

বুবু কি রাক্ষসী হয়ে গেল? মা মুখে বেদানার রস, আঙুরের রস, কমলার রস ঢেলে দেন, সে গিলতে পারে না। তার দেহের স্নায়ু, তন্তু, কোষ, পেশী সব লক্ষযোজন কালরাত্তির পেরোতে পেরোতে নিজ নিজ কাজকর্ম ভুলে মেরে দিয়েছে।

—'ফোঁটা ফোঁটা করে দাও ড্রপার দিয়ে দাও।'

সে তাকাচ্ছে। ক্লান্ত চোখ। দিষ্টি অনেক দূরে কোথাও গুটিয়ে সুটিয়ে আছে, সেই যেখানে লাল-সবুজ কাকাতুয়া পাখা ঝটপট করছে, সিঙ্গিমামা থাবার ওপর থেকে ঝাঁকড়া মুখ তুলে তাকিয়েছে, ভোম্বলদাস চার খুরে টলমল টলমল পালাবে পালাবে করছে, সেই যেখানে হিমের মধ্যে ফুটো, ফুটোর মধ্যে হট্টিমাটিম ডিম পেড়েছে দুটো..... সেই সেইখানে তার দিষ্টি আটকে আছে। কখন কক্ কক্ কাকাতুয়া দাঁড় ছেড়ে উড়ে যাবে সিঙ্গিমামা পিঠে সওয়ারী করার জন্যে দুগ্গা-ঠাকুরকে খুঁজে নেবে, ভোম্বলদাস কখন ভোম্বলমামা কম্বলদাস হয়ে সোজা উঠে দাঁড়াবে, আর কখন হট্টিমাটিম টিমের ডিম ফুটে অবাক ছানা ছোট ছোট নলিনলি ঘাড় তুলে ভেতর-লাল ঠোঁট ফাঁক করে গুঁতোগুঁতি করবে, তখন সেই শুভলগ্নে খুলে যাবে বুবুর হাতপায়ের মায়া-শেকল, দিষ্টি তার হট্টিটির ছানা হয়ে সিঙ্গিমামার পিঠে চড়ে ফিরে আসবে মাথার ওপর কাকাতুয়া ডানা ঝাপটাবে.....। তা সে অসম্ভব কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর কোনওদিন সম্ভব হবে ?

তাই বুবু ফিরেও ফেরে না, ডেকেও ডাকে না, দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না।

পুনপুন-বুনবুনের কাছে খবর পৌঁছে গেছে, বুবুর জ্বর ছেড়েছে, বুবু চোখ মেলেছে। গুটিগুটি এসে দু-ভাই ডাকে—'বুবু ! বুবু !'

কে ডাকছে কাকে ? বুবু কোন দূরের মায়াকাননের মায়াপ্রাসাদের মহানৈঃশব্দ্যে মগ্ন আছে ! বুনবুন-পুনপুন ভয়ে ভয়ে তাকে টিপেটুপে দেখে। তাদের বোনই তো ! না কোনও রাক্ষসী তাকে হজম করে নিয়ে একটা ডিম উগরে দিয়ে গেছে ! অনেকটা বুবুর মতো, কিন্তু বুবু তো নয়।

নাঃ, মানুষের গা-ই তো ! পুনপুন-বুনবুনের পরশে সে-গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। নাকের পাটা ফুলছে।

—'থাক, ওকে বিরক্ত করো না। পাবন, বরুণ তোমরা খেলতে যাও।'

—'মা, ওর অসুখ সারেনি ?'

—'সেরেছে। আর একটু সারতে দাও।'

—'গঙ্গাঠাকুমার মতো হয়ে যাবে না তো বুবু ?'

—'ষাট ষাট পাবন, অমন বলো না।'

—'মা এটা বুবুই তো ?'

—'তা আর কে হবে ?'

—'কেন ? ডাইনি বুড়ির চাইনি ছানা ! চাই না মা, চাই না এমন বুবু চাই না।' ফোঁপাতে ফোঁপাতে দু ভাই ছুটে পালায়, তাদের চোখের জলটুকু মায়ের চোখে ফেলে রেখে।

তাদের খেলাঘরে কাশীর খেলনা, দেওঘরের রান্নাবাটি, রাসের মেলার মুড়কি পুতুল, মাটির বেহালা, কাঠের ঢোলক, কুমারের গোলক, টেনিকয়েটের রিং, ট্যামটেমি, ঝুনঝুনি, নতুন সেলেটে হাতের লেখা, পড়তে শেখা, নাচন কোঁদন, বীরমাতুনি, দস্যিপনা, টালবাহানা, আদর-আবদার, বারবার ঘরবার সমস্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে মাড়িয়ে, একবারও পেছন ফিরে না দেখে হৃদয়ের শূন্য ভরাতে দুই ভাই ঘোড়ায় চড়ে। হাতে তলোয়ার, কোমরে গেঁজেয় তিনটি মোহর, লাঠির আগায় এক পুঁটুলি ছোলার চাক, মুড়ির চাক নিয়ে টগবগ টগবগ টগবগ টগবগ করে দেশভ্রমণে বেরিয়ে যায়। সুদ্ধু অরুণ-বরুণ। কিরণমালা নেই। সুদ্ধু এক নেই-সুভদ্রা-দারুভূত জগন্নাথ-বলরাম। হতশ্রী। ছন্নছাড়া। কেউ লক্ষ করে না।

॥ প্রথম স্কন্ধ সমাপ্ত ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় স্কন্ধ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্বকথা

আপনার মনের প্রাণের কথা দুর্গাপ্রসাদ কাহাকেও বলিতেন না। আপাতদৃষ্টিতে তাঁহাকে খেয়ালি মনে হইলেও হ্যামলেটের 'মেথড ইন ম্যাডনেস-এর মতো তাঁহার খেয়ালিপনার পিছনেও একটি মেথড, একটি গুপ্ত পরিকল্পনা কাজ করিত। অন্তত তাহাই আমাদের অনুমান।

বোমার হিড়িকে তাঁহার কলিকাতা-আগমনের পিছনে তাঁহার শ্বশুরমহাশয়ের যে পত্রটির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটি নিম্নরূপ :

'কল্যাণীয়েষু বাবাজীবন,

এখন কলিকাতায় ডাক্তারের অত্যন্ত অপ্রাতুল্য। বাড়িও অতিশয় সস্তায় পাওয়া যাইতেছে। এই সময়ে যদি আসিয়া বসিতে পার কেহ তোমার পসার আটকাইতে পারিবে না। বোমার ভয় করিলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু নেতাজী যে কোনও মুহূর্তে তাঁহার আজাদ-হিন্দ-বাহিনী লইয়া কলিকাতা প্রবেশ করিতে পারেন। কানাঘুষায় এরূপই শুনিতেছি...।'

—'শ্বশুর মহাশয়ের বিষয়বুদ্ধি দেখিয়াছ ?' তিনি হাসিয়া স্ত্রীকে বলিলেন।

স্ত্রী বলিলেন—'বোঝাই যাইতেছে কথাগুলি মায়ের।'

দুর্গাপ্রসাদ—'যাইবে নাকি ?'

স্ত্রী—'বলো কি ? এত কষ্টে সংসার পাতিয়াছি। আয় ভালো হইতেছে। সমস্ত তুলিয়া...।'

দুর্গাপ্রসাদ কী কলকাঠি নাড়িলেন কে জানে, এবার তাঁহার শাশুড়ির পত্র আসিল—'আর কতকাল প্রবাসে থাকিবি ? জামাই যখন রেলের চাকুরি ছাড়িয়াই দিল তখন গ্রামে বাস করিয়া কাজ কী ? ছেলেপিলেগুলিকে যথাযথ মানুষ করিতে হইবে না ? আমরাই বা কী লইয়া থাকিব ?'

দুর্গাপ্রসাদ বলিলেন—'সত্যই তো, মা কী লইয়া থাকিবেন ?'

তরুদেবীর সন্তানদের মধ্যে মোট তিনটি জীবিত। প্রথমা দেবহূতি। ইহাকে অনেক আশা করিয়া তিনি ডফ স্কুলে দিয়াছিলেন। মিস নর্টনও ইহার শিক্ষায় বিশেষ যত্ন লইয়াছিলেন। কিন্তু বারো পুরিতে না-পুরিতেই কেমন যোগাযোগ হইয়া গেল। তাহার বিবাহ হইয়া গেল। হইল তো হইল, জামাইটিকেও কি তাঁহার স্বামীর মতো উড়নচড়ে হইতে হইবে ! তবু স্বামী শীতল প্রকৃতির, জামাইটির যেন ষাঁড়ের গোঁ ! ইহার জন্মরাশি নিশ্চিত বৃষ হইবে। হউক। শাশুড়ি-জামাইয়ে বড় ভাব। তাহার উপর তরু ভরসা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেন। তাঁহার দ্বিতীয় জীবিত সন্তান, পুত্র—ভানু। কিন্তু সে সামান্য অস্বাভাবিক, আপন খেয়ালে থাকে, স্কুলে-কালেজে কখনও গিয়া কখনও না-গিয়া সে গড়াইয়া গড়াইয়া কোনওমতে আই-এ ফেল করিল। তাহাকে দিয়া তরুলতা-অনাদিপ্রকাশের কোনও আশাই পূর্ণ হয় নাই। তবে জামাইয়ের চিকিৎসায় ইতিমধ্যেই ভানুর মতিগতির কিছু উন্নতি হইয়াছে। তিনি ভাবিতেছেন পুত্রের এইবার বিবাহ দেওয়া ভালো। যুদ্ধের বাজারে কিছু-একটা কর্মসংস্থান কি আর হইবে না ? এ বিষয়ে জামাতার পরামর্শ প্রয়োজন।

দেবহূতি বলিলেন—'রেলের চাকুরি তো তুমি পূর্বেই ছাড়িয়াছ। এখন হঠাৎ মায়ের সে-কথা মনে হইল যে !'

দুর্গাপ্রসাদ বলিলেন— 'জ্যেষ্ঠা কন্যা তো মায়ের একপ্রকার সখীই। উনি কন্যার সঙ্গ ও সান্নিধ্য কামনা করিতেছেন। ছেলেগুলির শিক্ষার কথাটিও তো ফেলিয়া দিবার নয় !'

দেবহূতি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া পিতা ও মাতার পত্রদ্বয় আবার পড়িলেন। তাহার পর বলিলেন—'তুমি কি সত্যই আশা করো নেতাজী আসিবেন ? আজাদ-হিন্দ-বাহিনী লইয়া ?'

দুর্গাপ্রসাদ জবাব দিলেন না। তিনি স্থির দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া আছেন। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি স্ত্রীকে ভেদ করিয়া বহু দূর চলিয়া গিয়াছে। কত সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াও ছিন্ন হয় না ! কত আশা পর্বতপ্রমাণ হতাশা ভেদ করিয়াও উঠিয়া আসে !

তরুলতার সহিত জামাইয়ের কিঞ্চিৎ মতভেদ হইল। ভানুর বিবাহের ব্যাপারে জামাই অত্যন্ত কঠোরভাবে 'না' বলিলেন। উপরন্তু যুদ্ধের বাজারে কর্মসংস্থানের কথা শুনিয়া তিনি চটিয়া লাল হইলেন।

—'আপনি কী করিয়া মিলিটারিতে অর্ডার-সাপ্লাইয়ের কথা ভাবিলেন ? কী করিয়া কালোবাজারের কথা ভাবিলেন ?'

তরুলতা কিছুতেই তাঁহাকে বুঝাইতে পারিলেন না তিনি এসকল ভাবেন নাই। অনির্দিষ্টভাবে কিছু সুযোগ-সুবিধার কথা ভাবিয়াছিলেন মাত্র। সুতরাং হরিপালে দেশের মেয়ের সহিত যখন ভানুর বিবাহ হইয়া গেল ডাক্তার ইহাতে যোগ দিলেন না। ভানু স্ত্রীসমেত দেশেই রহিল। তাহার খুড়ামহাশয় তাহাকে বিষয়সম্পত্তির তদবির তদারকি শিখাইতে লাগিলেন। স্ত্রী-সহবাসে ভানুর কিছু উন্নতি নিশ্চয়ই হইয়াছিল, কেননা সে খাওয়ার সময়ে খাইত, শোয়ার সময়ে শুইত। খালি স্ত্রীকে সর্বসমক্ষে ছুঁইতে গেলে স্ত্রী যখন অবগুণ্ঠন দিয়া, মুখ ভেংচাইয়া দ্রুত সরিয়া যাইত, সে কোনও অলক্ষ্য ব্যক্তির প্রতি অকথ্য গালি নিক্ষেপ করিত।

ইতিমধ্যে দেবহূতির ট্রিপলেটের ছোটটি তরুলতার কাছেই প্রতিপালিত হইতেছিল। তরুর কনিষ্ঠ কানু শিশুটির মধ্যে খেলার সাথী পাইয়া ভারি আনন্দে ছিল। তরুলতা বাৎসল্যরসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলেন।

দুর্গাপ্রসাদের কী লাভ হইল ? কেহ আসিল না। মৈরাং-এর যুদ্ধের ক্ষণসাফল্যের পর আজাদ-হিন্দ-বাহিনী যুদ্ধবন্দি হইল। সুভাষচন্দ্রের প্লেন অ্যাকসিডেন্টে মৃত্যুর কথা ঘোষিত হইল। কোনও বাঙালি ইহা বিশ্বাস করে নাই। দুর্গাপ্রসাদও করেন নাই। কিন্তু সুভাষ যে কোনও দুস্তর অসুবিধায় পড়িয়াছেন এ বিষয়ে তো কোনও সন্দেহ নাই ! দেখুন পাঠক,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনও নেতার নব্বুই বৎসর বয়স হইয়া যায়, তাহার অর্ধেক সময়ে তিনি নিরুদ্দিষ্ট, তবু আপামর জাতি তাঁহার আবির্ভাব আশা করিতে থাকে, গল্প রচিত হয়, তাঁহাকে এখানে দেখা গিয়াছে ওখানে দেখা গিয়াছে—এরূপ ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে আর নাই। এই অপূর্ব কিংবদন্তির শুরু করিয়া গিয়াছিলেন দুর্গাপ্রসাদরা।

লোকে বলিবেন বাঙালি একটি বাস্তববিমুখ, স্বপ্নবিলাসী, ভাবপ্রবণ, দুর্বল জাতি। নিজেদের সমস্ত অবদমিত উচ্চাকাঙ্ক্ষার দায় সুভাষচন্দ্রে অর্পণ করিয়া তাহারা নিশ্চিন্ত হইল। এ অভিযোগ সম্পূর্ণ উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কিন্তু লক্ষ করিবার বিষয়, অপরাপর জাতি যেখানে ধর্মীয় নেতা বা প্রফেট/নবীর সন্ধান করিয়াছে বাঙালি তখন খুঁজিয়াছে একজন সেকুলার নেতা, যিনি তাহাদের সু-নীতি, বীরত্ব ও ধর্ম-অনপেক্ষ সৌভ্রাতৃত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের অভিমুখীন করিতে পারিবেন।

যাহা হউক, দুর্গাপ্রসাদের যশোলাভ বিলক্ষণ হইল। বিত্তলাভ তেমন হইল না। দুর্গাপ্রসাদ সংসারের জোয়াল কাঁধে নিরুপায় বলদের মতো হইলেন। পূর্বে, ফসল ফলাইতেছেন, গ্রামাঞ্চলের বালকদিগকে শিক্ষালাভে সাহায্য করিতেছেন, পল্লীবঙ্গে বহুসমাদৃত ডাক্তার হইয়া জীবসেবা করিতেছেন ইহা প্রতিমুহূর্তে অনুভব করিতেন। কিন্তু শহরে মাটি নাই, আকাশ নাই, দিগন্ত নাই। মানুষ? মানুষগুলিও যেন কেমন আধা-খ্যাঁচড়া। সকলই তাহাদের ছলনা, কপটতাই যেন জীবনের মূল নীতি। বলা বাহুল্য, দুর্গাপ্রসাদ গ্রামীণ সমাজের সংকীর্ণ অন্তর্বৃত্তে বাস করেন নাই। তিনি ছিলেন ইহার আওতার বাহিরে, সম্মানিত অতিথির মতো। প্রত্যহ সকালে যখন নিজের ছেলেমেয়েগুলিকে ব্যায়াম করাইতেন, সন্ধ্যায় তারা চিনাইতেন, উদার কণ্ঠে হা-হা করিয়া হাসিতে পারিতেন। এখন হাসিবেন কী? নিজ পিতার সঙ্গে প্রতিযোগিতাতেই তিনি নাস্তানাবুদ হইলেন। দুই ডাক্তারের চেম্বার পাশাপাশি দুইটি ঘরে। পিতার একটি শাঁসালো মক্কেলকুল রহিয়াছে। পিতা হোমিওপ্যাথিতে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করেন না। যখন-তখন সেই প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়ে ধুন্ধুমার লাগিয়া যায়। আবার সেই পিতাই নিজ মক্কেলকে কনভিন্স করিয়া তাঁহার কাছে পাঠান।

—'শিশুর জ্বর আসিয়াছে? চার-পাঁচ উঠিয়া যায়? হোমিওপ্যাথি করুন।'

—'আজ্ঞা, ইহা অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নহে?'

—'আরে দুর মশাই, যাইবেন তো যান, নহিলে ভিন্ন ডাক্তারের কাছে যান।'

দুর্গাপ্রসাদ যদি বলেন—'আপনার তো বিশ্বাস নাই। আমার কাছে রোগী পাঠাইলেন যে বড়?'

শিবপ্রসাদ বলিবেন—'আরে হোমিওতে বিশ্বাস না-ই রহিল, নিজ পুত্রের মনুষ্যত্বে তো বিশ্বাস আছে!'

ইহার পর ইনি দুষ্ট হাসি হাসিবেন, বলিবেন—'হইবে তো হাম কিংবা পানবসন্ত, তুমিই বল না কোনটি! এগুলির কোনও ঔষধ নাই, সেবা ও পথ্যই আসল। তোমার হোমিওপাখি আর কত ক্ষেতি করিবে!'

দুর্গাপ্রসাদ রাগিয়া কাশিয়া অস্থির হইবেন, লম্ফ-ঝম্ফ করিবেন। মনোমোহিনী মাঝখানে পড়িয়া বিবাদ মিটাইবার চেষ্টা করিবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'ছেলেকে খ্যাপানো ছাড়া কি তোমার কোনও কাজ নাই ? দুগ্‌গি আমার বাত সারাইয়া দে তো ! আমি তোর ঔষধ খাইবো...'

—'কাহাকেও ঔষধ দিয়া আমার কাজ নাই' —দুগ্‌গি সরোষে প্রস্থান করিবেন।

কলিকাতায় দুর্গাপ্রসাদের প্রথম বিখ্যাত চিকিৎসা গোয়াবাগানের বসু পরিবারে। হাতিবাগানে বোমা পড়ার পর এই বাড়ির একটি ছেলের ভয়ানক ফিটের ব্যামো হয়। দিনের মধ্যে যখন-তখন যেখানে-সেখানে সে গোঁ গোঁ করিয়া অজ্ঞান হইয়া যাইত। পড়িয়া পড়িয়া তাহার সর্বাঙ্গে কালশিটা। এই ছেলেটিকে দুর্গাপ্রসাদ সারান ইগনেশিয়া মিলিয়ন দিয়া। তিন মাসেও যখন ছেলেটির ফিট পুনর্বার হইল না, হঠাৎ ইঁহাদের খেয়াল হয়, তাই তো ! ডাক্তারবাবু রোগী দেখিয়া-শুনিয়া নিজে একটি পুরিয়া খাওয়াইয়া দিয়াছিলেন। তিন দিন পর সকালে আরও একটি পুরিয়া খাওয়ানো হয় বটে। তখন তাঁহারা ডাক্তারবাবুর কাছে ছুটেন। আসলে, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় দীর্ঘদিনের অস্বস্তিকর রোগবালাইও যে কখন দূর হইয়া যায়, রোগী নিজেই বুঝিতে পারে না। যখন খেয়াল হয়, ভাবে এমনিই সারিয়া গিয়াছে। সুতরাং, হোমিওপ্যাথ নিজেই জানেন না, তিনি কতজনকে কিওর করিয়াছেন। রোগী ফিরিয়া আসিল না দেখিয়া প্রথম কথা যথেষ্ট আত্মপ্রত্যয় থাকিলে মনে হয় সারিয়াই গিয়াছে। নয় তো মনে হয় বিলম্ব দেখিয়া অধৈর্য হইয়া ইহারা অ্যালোপ্যাথের শরণ লইয়াছে। দেখিবেন পাঠক। আপনি যেন ইগনেশিয়া মিলিয়ন দিয়া ফিটের ব্যামো সারাইতে যাইবেন না। ইগনেশিয়া মৃগির ঔষধ ইহা মনে করিবার কোনও কারণ নাই। হোমিওপ্যাথির রীতি হইল লক্ষণ দেখিয়া চিকিৎসা করা, আগে রোগনির্ণয় পরে চিকিৎসা নয়। এই লক্ষণ বিচার একটি অতি দুরূহ ব্যাপার। রোগীর শরীর-মনের স্বাভাবিক লক্ষণ কী, কী তাহার অতীত-ইতিহাস...ইত্যাদি নানা কারণের উপর লক্ষণনির্ণয়ের কৌশল নির্ভর করে। অতি বিচক্ষণ না হইলে ইহা করা অত সহজ নহে।

ইহারা রোগ সারিয়াছে স্বীকার করিতে ফিরিয়া আসিল দেখিয়া ডাক্তারবাবু বিলক্ষণ আশ্চর্য হইলেন। আরও এক টাকা ফি ড্রয়ারস্থ করিয়া আরও কয়েকটি গুলি মোড়কে মুড়িয়া দিলেন। বাস, আর লাগিবে না। একটি কিশোর সারা জীবনের জন্য অকর্মণ্য, জড়পিণ্ড হইয়া যাইতেছিল, সে নিজে এবং তাহার প্রিয়জনেরা এরূপ দুঃখের সাগরে নিমজ্জিত হইতেছিল যাহা মৃত্যু হইতেও ভয়ংকর। মোট দুই টাকায় বিপদ হইতে উদ্ধার পাইল। ইহারা ডাক্তারবাবুকে একটি সুন্দর ওয়লক্লক উপহার দেয়। পরে অবশ্য ইহাদের মনে বড় আত্মপ্রসাদ জন্মে। মোট তিনটি পুরিয়া—ছয়টি করিয়া আঠারোটি গুলি—সব মিলিয়া একটি ফুটা পয়সাও ঔষধের দাম হইবে কী ? এদিকে দুই টাকায় দুই সের চাল তো হয় ! মাছ কিনিলে কোন না দু আড়াই সের হইয়া যাইবে ! তাঁহাদের বিবেচনায় ডাক্তারবাবুর একটি সুদৃশ্য, মূল্যবান জর্মন দেওয়ালঘড়ি হইল। ডাক্তারের একটি দেওয়ালঘড়ি না হইলে চলে !

এক প্রৌঢ় ব্যক্তির সহসা হাঁটুতে জল হইতে শুরু করিল। মহা বেদনা। শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন, যন্ত্রণায় ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতেছেন। দুই শত শক্তির গানপাউডার দিয়া ইঁহার হাঁটু সারানো দুর্গাপ্রসাদের দ্বিতীয় কীর্তি। দেখিয়া-শুনিয়া একটি মাত্র প্রশ্নই তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিয়াছিলেন—'ফুটবল খেলিতেন, না। কী ? সেন্টার ফরোয়ার্ড ?'

রোগী যন্ত্রণার মধ্যেও হাসিয়া ফেলিলেন—'ডাক্তারবাবু কি জ্যোতিষচর্চা করেন নাকি ?'

যৌবনের প্রাণপ্রাচুর্যের দিনগুলি স্মরণ করাইলে ক্ষণেকের জন্যও মানুষ যন্ত্রণা ভুলিয়া যায়।

কত বলিব ? পাকুমার সায়াটিকার ব্যথা সারার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। অধিক বলিলে আপনকার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিবে। ইহা হোমিওপ্যাথির বিজ্ঞাপনী ক্রোড়পত্র বিলিয়াও মনে করিতে পারেন। কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর সেই পঙ্‌ক্তিটি মনে আছে ? জবাব-দেওয়া একটি রোগী হোমিওপ্যাথিতে রেসপন্ড করিল। তখন লোকসমূহের বিশেষত অ্যালোপ্যাথ ও কবিরাজের মনের কথা কবি ব্যক্ত করিয়াছেন এইভাবে—'দুজনাতেই ভাবছে ওরা বাক্য-কায়-মনে/ হোমিওপ্যাথির বাঁচা রুগী মরবে কতক্ষণে ?'

সংবৃত হই। এটুকু বলিলেই চলিবে যে তুচ্ছ কতকগুলি পাউডার ও গুলির মূল্য এবং একটি-দুইটি ডোজে চুপিচুপি-সারিয়া-যাওয়া অসুখের গুরুত্ব—উভয়ই বড় হ্রাস পাইতে লাগিল রোগীদের চক্ষে। ডাক্তারবাবুর আর একটি মূঢ়তা তাঁহার গ্রাম্য অভ্যাস—'কী রে চণ্ডে, আজ তোর ছেলে আছে কেমন ? খবর দিলি না তো ?'

—'আজ্ঞে ডাক্তারবাবু, বড় ভুল হইছে। সাঁঝের বেলা ঠিক...'

—'সাঁঝের বেলা কী রে ? কাল বিকেলে তোর ওষুধ ফুরিয়েছে। এ যে-সে রোগ নয় রে, টাইফয়েড ! সকালের দিকটা জ্বর কম থাকে বলে বুঝছিস না, ওষুধ খুব নিয়মমতো দেওয়া চাই। এখুনি আয়।'

এই অভ্যাস তিনি এখানেও বজায় রাখিয়াছেন।

পিতা অভিজ্ঞ মানুষ। বলেন—'করিতেছিস কী ? উহাদের আসিতে দে।'

পুত্র বলে—'নাস্ক দিয়া দোষ কাটাইয়াছি। আজি তো আসল ঔষধ পড়িবে। নহিলে উহার কপালে বিলক্ষণ দুঃখ আছে।'

পিতা বলেন—'দুঃখ তোমার কপালেও আছে বৎস, দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি।'

যে ডাক্তার স্বগরজে রোগীর খোঁজ লয়, স্বগরজে ফলো-আপ করে তাহাকে কে পোঁছে ? তাই-ই বোধহয় আজিকালি ডাক্তারকুল ঠেকিয়া শিখিয়াছেন, অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতেই এত বিলম্ব করেন যে জানেন রোগী তাহার মধ্যেই হয় মরিবে নয় সারিবে। যতক্ষণ না দ্বিতীয় দফার পুরা দক্ষিণা লইয়া আসিতেছে ততক্ষণ রোগী বাঁচিল কি টসকাইল তাঁহারা থোড়াই কেয়ার করেন। তাঁহাদেরই বা কী বলি ? যে কোনও শ্রাদ্ধবাড়িতে যান চিকিৎসার ব্যয় ও ঘটার কথা উঠিবেই উঠিবে। 'চেষ্টার ত্রুটি করি নাই ভাই, বড় ডাক্তার ডবল ভিজিট দিয়া আনিয়াছি। অস্ত্রোপচারে তো জলের মতো খরচ হইল। ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না।' মৃত্যুশোক হইতে ব্যয়ের গৌরব বড় হইয়া উঠে। কাহার ছেলের জন্য শয়ে শয়ে টাকা বাহির হইয়া যাইতেছে, কাহার পরিবারের জন্য হেন বড় ডাক্তার নাই যিনি না আসিয়াছেন। একবার ডাঃ দুর্গাপ্রসাদ সিংহকে দেখান না ! বলিতেছ ? আচ্ছা, সবই যখন ফেইল করিল একবার ডাকি। শেষ সময়ে তো লোকে রোগীর মুখে চরণামৃতও দেয়। তা পরিবার কবে উঠিলেন, কবে বসিলেন, কবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাঁড়াইলেন, কবে আবার উঁহার আপিসের ভাতের জন্য হাতা-বেড়ি ধরিলেন কেহ খেয়ালই করিল না। যখন করিল, তখন বলিল—'এমনিই সারিয়া গিয়াছে। বরাবর খাঁটি দুধটা-ঘিটা খাওয়াইয়াছি। প্রকৃতির কর্ম প্রকৃতিই করিয়াছেন।'

শিবপ্রসাদ বলিলেন—'ওরে, দুই এক ডোজে অসুখ সারাইলে, তোর আয় কী হইবে ? হয় ফিজ বাড়াইয়া দে, নয় কয়েক ডোজ ভুয়া দে।'

ছেলে বলিল—'ঈশ্বর স্বয়ং হানিম্যানের মধ্যে আপনার চিকিৎসা-তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন বাবা। ঈশ্বরের দান আলো-বাতাসের কি ভুয়া হয় ? না মূল্য হয় ?'

শিবপ্রসাদ বলেন—'ভালো। তাহা হইলে ঈশ্বরের আলো মাখিয়া ঈশ্বরের বাতাস খাইয়া থাকো।'

তবে দুর্গাপ্রসাদের সর্বোত্তম কীর্তি একটি শিশুকে মেনিনজাইটিস-টাইফয়েডের কালগ্রাস হইতে ফিরাইয়া আনা। শিশুটি হাঁটিতে, কথা বলিতে ভুলিয়া যায়। থ্যাবড়াইয়া বসিয়া থাকে। চোখে ভেড়ার দৃষ্টি। কথা কহিতে গেলে অব্যক্ত ধ্বনি বাহির হয়। তাহার সঙ্গীসাথীরা তাহার রকমসকম দেখিয়া তাহাকে বর্জন করিল। কুশ্রী, দুর্বল, পঙ্গুকে কেহ চাহে না। প্রজাপতিসদৃশ যে কালেজ-তরুণীগুলি তাহার মিষ্ট কথা শুনিবার জন্য ছুটিয়া ছুটিয়া আসিত তাহারা করুণা করিয়া বলিল—'ইস্, মেয়েটা এমন হইয়াছে ?' ব্যাস আর কেহ তাহার খোঁজ করিল না। ঝুমকো ঝুমকো চুল দুলাইয়া সে তো আর 'ও সব যাক গে' বলিয়া কাহারও জন্য কৌতুক উৎপাদন করিবে না! পাঠক, আপনি গাবলুগুবলু শিশু অথবা তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠীদের কথা পড়িতে ভালোবাসেন, আপিনও নিশ্চয় এই হতশ্রী শিশুটির খোঁজ লইবেন না।

না লউন। উহার মাতা সকল কাজ ফেলিয়া ব্যাঙের মতো দেখিতে ন্যাড়া মাথা শিশুটিকে লইয়া বসিয়া থাকেন। সাশ্রু নেত্রে বলেন—'ও যে আমার কত সকাল-সকাল কথা কহিতে শিখিয়াছিল গো। কী মিষ্ট কথাগুলি, কত লাবণ্য ছিল! সেই মেয়ে আমার এমন হইয়া গেল ?'

তাঁহার স্বামী নীচের ঠোঁট কামড়াইয়া ধরিয়া ঔষধের ক্যাবিনেটের সম্মুখে স্থির। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্নোবিউল কি চূর্ণ-ভরা কোহল-গন্ধ শিশিগুলিকে নীরবে জিজ্ঞাসা করেন—'সূর্য আবার উঠিবে ? পাখি আবার গাহিবে ? নদী কি আর বহিবে ?'

এ পৃথিবীতে মাতার ন্যায় আর কে আছে ?

এ পৃথিবীতে পিতার ন্যায়ই বা আর কে আছে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম অধ্যায়

‘ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ’-১

একটা খোলা রোয়াকে বাবার বুকের ওপর শুয়ে আছি। কার্নিশে গোলাপায়রা। বক বকুম বক বকুম। বেশ বড় পালোয়ানি গোঁফ বাবার। গোঁফটা ধরে টানছি।

—বল তো বুবু, এটা কি স্বপ্ন ? না স্মৃতি ? বড়রা বলেন স্মৃতি। বছর দুই বয়সে আমার ডিপথিরিয়ার পর ভাগলপুরে হাওয়া বদলাতে যাওয়া হয়েছিল। আমি-তুই-পুটপুট-অংদাদা-মা-বাবা। এটা নাকি সেই বাড়ির দাওয়া। লাজপৎ পার্কের কাছে, একটা ব্লাইন্ড লেনের শেষ বাড়িটা। কিন্তু এটা আমি স্বপ্নেও দেখি। প্রায়ই। আমার মনে হয়, স্মৃতির লেন্‌স্‌টা আমার সেই সবে তৈরি-হওয়া শেষ হয়েছে। একেবারে আনকোরা নতুন, ঝকঝকে, তকতকে। সেই প্রথম ছবিটা তাই বড্ড ভালো উঠেছিল।

সন্ধেবেলা। মামার বাড়ির ভেতর-উঠোনের রোয়াকে বসে পা দোলাতে দোলাতে আমরা তিন ভাই-বোনে কানুমামুফুলের সঙ্গে বসে পায়েস খাচ্ছি। কার পা কতটা ওঠে পাল্লা দিচ্ছি। বুনবুন বেশি চালাকি করতে গিয়ে পা দুটোকে আকাশমুখো করে দিতেই চিৎ হয়ে পড়ে গেল। বাটির পায়েস ওর ভুঁড়ির ওপর পড়ে গেছে। আমরা খুব হাসছি। ছোট্ট ছোট্ট রুপোর বাটি, দিদিভাই সিন্দুক থেকে বার করেছেন আমাদের জন্মদিনের জন্যে, মনে আছে ? এটাকে কিন্তু স্মৃতি বলে বেশ স্পষ্ট চিনতে পারি। এটা ছিল আমাদের তিন বছরের জন্মদিন।

দুলারিকে মনে আছে ? হীরেমোতি সাজত। হীরেমোতি সাজার লোহার হাত একটা হাতে করে বাগিয়ে, দৌড়ে সেই ভয়-খাওয়া ছাগলির মতো কাটা দরজাটা ঠেলে উঠোনে ঢুকল।

—‘তৈয়ার হো যাও, ভাইয়োঁ সব তৈয়ার হো যাও,’ তার চোখ ঘুরছে।

—‘কী হল রে দুলারি। কে তৈরি হবে ?’ দিদিভাই শাঁখ হাতে ভাঁড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন।

দুলারি হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠোনে আছাড় খেয়ে পড়ল। ওর মরদকে নাকি নিকাশিপাড়ার লোকেরা কেটে ফেলেছে।

দিনটা ছিল হরতাল। কেউই বাড়ির বাইরে বেরোয়নি। আমরা সকালবেলা বাড়িতে এক থালায় তিন ভাইবোনে খেয়েছি। মায়ের কাছে। রাত্তিরে মামার বাড়ি নুচি-পায়েস খাব কিন্তু ! সন্ধেবেলা একটু চাখছি মাত্র। দুলারির ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতে না বুঝতেই পাড়ার ভদ্রলোকরা হই-হই করতে করতে ঢুকে এলেন, তাঁদের সঙ্গে বাবা, পালক আর ই-দাদা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবা দিদিভাইকে বললেন—'বাড়িতে তালা দিয়ে চার নম্বরে চলুন সবাই।'

—'কী ব্যাপার ?' দাদাভাই খাবার ঘরে চুপিচুপি বসে পায়েস খাচ্ছিলেন, তিনি অবাক হয়ে বেরিয়ে এসে বললেন।

—'এখন অত বলা যাবে না। যেমন আছেন বেরিয়ে আসুন, এটা ডেঞ্জার জোন।'

সবাই মিলে সব ঘরে ঘরে জানলা বন্ধ করে তালা দেওয়া হল। ডেকচিসুদ্ধ পায়েস 'রেমো'র মাথায়। কাঁধে ঝোলাঝুলিতে জামাকাপড় ভরে দিদিভাই, দাদাভাই সব্বাই। আমরা সব কোলে-কাঁধে। দুলারি আমাদের মাঝখানে। আমরা সব চার নম্বরে চলে যাচ্ছি। কী মজা ! দিদিভাই, বুনবুন, কানুমামুফুল সব, স-ব আমাদের বাড়ি থাকতে যাচ্ছে। আজ রাত্তিরে লুকোচুরি খেলব বেশ ! মরদ কী জিনিস আমরা জানি না। দুলারির মরদ কাটা পড়েছে। গরু ছাগল কিছু হবে। ব্যাপারটা দুলারির পক্ষে নিশ্চয়ই দুঃখের অত কাঁদছে যখন, কিন্তু আমরা তাতে খুব বিচলিত নই। বুনবুন চুপিচুপি বলল—'মরদ কী রকম ছাগল বল তো ? কাটবেই তো, নইলে মাংস হবে কী করে ?'

ভীষণ রেগে গেলে বাবার সেই বিচিত্র হুংকারটা মনে আছে ? বুনবুনের দিকে তাকিয়ে বাবা সেই ভয়ংকর হুংকারটা দিলেন। ই-দাদার কোলে বুনবুন হিসি করে ফেলেছিল।

তারপর থেকে সমানে আমাদের চার নম্বরের ছাতে উনুন জ্বেলে গরম জল হতে থাকল। ইঁট-পাথর-নুড়ি-আধলা জড়ো হচ্ছে তো হচ্ছেই। শুধু আমাদের বাড়ি কেন, আশেপাশে সব বাড়ি। পেছনে সুধীনবাবুদের বাড়ির ছাতে যজ্ঞির মতন উনুন। মুগের ডালের খিচুড়ির সুবাসে আমাদের জিভে জল এসে যাচ্ছে।

পাড়ার ডাকাবুকো ছেলে প্রদীপদা এসে ঠাকুর্দাকে বলল—'শিবদাদু, আপনার বন্দুকটা দিন তো !'

—'কে বললে আমার কাছে বন্দুক আছে ?'

—'যেভাবেই হোক আমরা জানি। এ-ও জানি ওটা লাইসেন্সড় নয়।'

—'জানো তো চুপ করে থাকো। ওটা মাউজারের বোল্ট অ্যাকশন ম্যাগাজিন রাইফল। ব্যবহার করা অত সহজ নয়।'

—'আপনি তো জানেন চালাতে, শিখিয়ে দিন !'

ঠাকুর্দা রাজি হচ্ছেন না।

প্রদীপদা বলল—'ওরা এসে আমাদের কচুকাটা করে যাবে এটাই কি আপনি চান ?'

—'রাইফেল দিয়ে তোমরা কিছু করতে পারবে না প্রদীপ। মাঝখান থেকে আমরা ফ্যামিলিসুদ্ধু বিপদে পড়ে যাব।'

—'দেবেন না তা হলে ?' —প্রদীপদা কী রকম চোখ লাল করে বলল। ঠাকুর্দার সঙ্গে অমন করে কেউ কথা বলে না।

সেই সময়ে দূর থেকে একটা কল্লোলের মতো ধ্বনি ধেয়ে আসতে লাগল। টেকন, আমাদের চাকর বাঁশপাতার মতো কাঁপতে কাঁপতে বাবার পায়ের কাছে বসে পড়ে বলতে লাগল—'আসি গিল-অ, বাবু, আসি গিল-অ।'

বাবা চিন্তিত হলে তলার ঠোঁটটা কী রকম কামড়ে ধরতেন। সেইভাবে দাঁড়িয়েছিলেন। এক ধমক দিয়ে বললেন—'কী আসি গিল-অ, আসি গিল-অ করছিস ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাটারিখানা নিয়ে তৈরি হয়ে থাক। ওগো শুনছ, কোথায় গেলে ? এই পুনপুনটাকে আমার পায়ের কাছ থেকে সরাও তো !'

আমি কৌতূহল সামলাতে পারছিলুম না। কিন্তু বাবাকে বিলক্ষণ ভয় পেতুম। তাই সঙ্গে সঙ্গে সটকে পড়ে তোদের সঙ্গে গিয়ে জুটলুম।

এই সময়ে পাকুমাদের বাড়ি থেকে ওঁদের বামুন ও চাকর দুটো মাদুর কাঁধে নিয়ে এসে উপস্থিত। টেকনকে ওরা বলল—'মাদুর-অ আছে ?' ওদের গলার স্বর এত কাঁপছে যে কী বলছে, বোঝা যাচ্ছে না। যখন সবাই বন্দুক, কাটারি খুঁজছে, তখন এরা মাদুর খুঁজছে কেন বোঝা যাচ্ছিল না। ওরা টেকনের সিঁড়ির তলার ঘরে গিয়ে মাদুর জড়িয়ে শুয়ে পড়ে বলতে লাগল—'মরিকিরি বাঁচি যিব।' অর্থাৎ কি না 'মরে গেলে বেঁচে যাব।' এতে দাদারা খুব হাসে, ওরা বলাবলি করছিল টেকনরা মাদুরের মধ্যে নিজেদের রোল করে নিয়ে ভেবেছে সবাই ওদের গোটানো মাদুর মনে করবে। কিন্তু এক ঘরে এত মাদুর কেন এ প্রশ্ন যদি আততায়ীদের মনে ওঠে, তবে !

একটা সুখবর অবশ্য এলো। যে হইচইয়ের শব্দ ভেসে আসছিল সেটা আসলে ঘটকদের বাড়ি বর আসার হইচই। যুদ্ধের সময়ে অনেক জায়গাতেই সকালবেলার বিয়েবাড়ি চালু হয়েছিল। ঘটকদের বাড়ি বিয়ের দিন অনেক আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে। বর আসবে খন্যান না কোথা থেকে। কোনও খবর পাওয়া যাচ্ছিল না। এখন লাঠি ছোরাধারী বরযাত্রীরা হইচই করে এসে পড়েছে। ওরা না কি হাওড়ার ব্রিজময় লাশ দেখে এসেছে। বীভৎস। বরটা দমকে দমকে বমি করছিল। তার আর বিয়েতে প্রবৃত্তি ছিল না। সে নাকি এবারের মতো তাকে ছেড়ে দিতে বলছিল। বাবাকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়। ওষুধপত্র খেয়ে বিশ্রাম নিয়ে তবে সে সুস্থ হয় এবং বিয়েতে বসে।

আমাদের ক'বাড়ি পরেই থাকতেন সেই হাবুলকাকু ! তিনি তো রোজ সন্ধে হলেই ঠক-ঠক করে কাঁপতে-কাঁপতে বাবার চেম্বারে এসে বসতেন। অদ্ভুত অদ্ভুত খবর নিয়ে আসতেন উনি। একদিন বললেন, এদিকে টাউন স্কুল ওদিকে শ্যামবাজার এ.ভি. দুটোই মুসলমানদের হাতে চলে গেছে। রাজকেষ্ট স্ট্রিটের মসজিদে দশ হাজার মুসলিম গুণ্ডা জমায়েত হয়েছে। বাবার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে উনি বললেন—'দুগগি, নাড়িটা একটু দেখো তো ভাই ! রেটটা যেন বড্ড কমে গেছে ! হার্ট হল ? না কী ?'

বাবা বললেন—'হার্ট তুমি নিয়েই জন্মেছ হাবুল, হার্ট কি হঠাৎ হয় ?

তখন উনি কাঁদো-কাঁদো স্বরে বললেন—'আমাকে গুলি করে মারতে বলো ভাই, ছোরাছুরিতে ভয়ঙ্কর কষ্ট !'

পালক হেসে বলল—'কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করে তবে আপনাকে মারবে বোধ হয় !'

হাবুলকাকু একেবারে কেঁদে ফেলে বললেন—'দ্যাখো তো পুলক, এই চেয়ারের তলায় কেউ আছে কি না ? দাড়ি-দাড়ি মতো কী যেন একটা ঠেকল !'

অনেকেই সে সময়ে সন্ধের পর এ ঘর থেকে ও ঘর যেতে পারত না। সকালে যত মজাই লাগুক, রাতে আমরা তিনজনেই বিছানা ভেজাতুম। বাথরুমের জন্য উঠতে হলে অং-দাদা করুণ স্বরে সু-দাদাকে ডাকত। পুটপুট বুজবুজ পরস্পরকে ধরাধরি করে দালান পার হত। মা উঠলে আমরা ঠিক ভের পেতুম। কাঁটা হয়ে থাকতুম একেবারে। মা বুঝি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর ফিরলেন না। মুসলমান কী তা জানি না। রাক্ষস ধরনের কিছু হবে। মা ফিরলে নিশ্বাস ফেলে একদিক থেকে আমি আর একদিক থেকে তুই ঘন করে মাকে জড়াতুম। মাকে কেউ মারলে মায়ের অঙ্গের অঙ্গ হয়ে মরে যেতেও আমাদের কোনও আপত্তি ছিল না। সে যত বীভৎস মৃত্যুই হোক।

'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ'-২

আঠারোই অগাস্ট ভোরবেলা বুনবুনদের সেই কুলসুম বুড়ি খুঁজে খুঁজে কেমন আমাদের বাড়ি দাদাভাইয়ের খোঁজে এলো। আমরা তিনজনে নাচছিলুম—'কুলসুম এসেছে, কুলসুম এসেছে'। ও এসেছিল ছেলে কাল থেকে বাড়ি ফেরেনি বলে। এ দিকে অনেক বাড়িতে সে নাকি হাঁসের ডিমও বিক্রি করতে আসে। কেউ কী তার খোঁজ জানে? বাবা তাকে অবিলম্বে বাড়ি ফিরে যেতে বললেন। কুলসুমের ডিমবেচুয়া চব্বিশ-বছুরিয়া ছেলেটি সম্ভবত নবকৃষ্ট স্ট্রিট ম্যাসাকারের প্রথম দফার মুসলিম শিকার। সে গিয়েছিল শ'বাজারের দিকে। শ'বাজারের মুসলিমরা নবকৃষ্ট স্ট্রিট দিয়ে গ্রে স্ট্রিট ধরে গোয়াবাগানের বস্তির দিকে যেতে চেষ্টা করছিল। লাঠি সোঁটা সোর্ড ছিল তাদের হাতিয়ার, ডিমবেচুয়া রসুল হয়তো তাদের সঙ্গ নিয়েছিল। এরা কেউ বাঁচেনি। নবকৃষ্ট স্ট্রিটের লড়াইয়ে আমাদের চেনাদের মধ্যে পাড়ার শান্তুদা প্রাণ হারায়। মিনুদার হাত কাটা যায়। বাকি জীবন সে নুলো মিনু নামে পরিচিত থাকে। আর একটা ঘটনা তোর মনে আছে কী না জানি না। মেটিয়াবুরুজ থেকে ইয়াসিন দর্জি পাকুমাদের বাড়ির এক বোঝা অর্ডার পিঠে নিয়ে আর সময় পেল না দাঙ্গার সময়ে আমাদের পাড়ায় এসে উপস্থিত। প্রাণভয়ে সে ঠকঠক করে কাঁপছিল। আমাদের ভিতু ভালোমানুষ দাদাভাই আর ডাকাবুকো প্রদীপদা তাকে সঙ্গে করে শ্যামপুকুর স্ট্রিট পার করে ফড়িয়াপুকুর অবধি এগিয়ে দিয়ে আসেন। প্রথমে ঠিক হয়েছিল ইয়াসিন পাকুমাদের বাড়িতেই থাকবে, গণ্ডগোল থেমে গেলে চলে যাবে। কিন্তু বুড়ো বেচারিকে কেউই রাখতে সাহস পাচ্ছিল না। কখন কোন নির্দোষ হিন্দু ছেলের খুনের খবর আসবে, মাস হিস্টিরিয়ার ব্যাপার, কে ক্ষেপে গিয়ে কী করবে বলা যায়! ইয়াসিনও যেন কাউকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। পাকুমাকে কাকুতি-মিনতি করছিল তাকে যেন মুসলিম এলাকায় দিয়ে আসা হয়। শেষ পর্যন্ত দাদাভাইকে সে বিশ্বাস করতে পারল। মা কান্নাকাটি করায় দাদাভাই বললেন নিকাশিপাড়ার বেশির ভাগ লোকই তাঁকে ভাল করে চেনে। কেউ তাঁর ক্ষতি করবে না। সুখের বিষয় দাদাভাইয়ের কোনও বিপদ হয়নি। ইয়াসিনেরও না। এই ইয়াসিন কিন্তু সেই ষণ্ডা চেহারা হাতকাটা ইয়াসিন দর্জি নয়। সে আর একজন। দাঙ্গার সময়ে তারও হাত কাটা গিয়েছিল। আমার শার্ট প্যান্ট, তোদের ভাল ভাল ফ্রক, দিদিদের ব্লাউস তৈরি করতো হাতকাটা ইয়াসিন! ভাবলে বেশ মজা লাগে, দাঙ্গা বাধালেন হুসেন শহীদ সোরাবর্দি। তাঁকে গাঁধী আঁচলের আড়ালে লুকিয়ে রাখলেন। হাতকাটা গেল ইয়াসিন দর্জি আর মিনুদাদের। সোরাবর্দিরা হলেন স্বাধীন পাকিস্তানের হর্তা-কর্তা, মিনুদা ভদ্রলোকের ঘরের বি-কম পাস ছেলে, হয়ে গেল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নুলো গুণ্ডা।

আমাদের নিস্তরঙ্গ পুঁচকে জীবনে দাঙ্গা কী উত্তেজনাই নিয়ে এসেছিল। তুই মাঝে মাঝেই এক পাক ঘুরে যাচ্ছিলি আর বলছিলি—'কী মজা, মুসলমানরা আসবে, যুদ্ধ লড়াই হবে, কচুকাটা কর-বে।' মুসলমান বলতে কী বোঝায়, যুদ্ধই বা ঠিক কী বস্তু আমরা কেউই জানতুম না। কচুকাটাও নিশ্চয় বুঝতুম না তেমন করে।

বুনবুন বলছিল (বাবার ধমকে হিসি করে-ফেলা বুনবুন)—'কচুকাটা করলেই হল, আমার তীর্ধনু আছে না?'

কানুমামু গম্ভীর সবজান্তা গলায় বলল—'তীর-ধনুকের কাজ নয়। গরমজল হাঁড়িসুদ্ধু তুলে নিয়ে ছাতের পাঁচিল থেকে সুড়সুড় করে মাথার ওপর ঢেলে দিতে হবে। দেখছিস না জল গরম হচ্ছে!'

অমনি তোর এক পায়ে বাঁই করে ঘোরাটা থেমে গেল। তুই ফ্যাকাশে মুখে বললি—'গরম জল ঢাললে যে পুড়ে যাবে!' কিছু দিন আগেই চানের ফুটন্ত গরম জল অসাবধানে লেগে যাওয়ায় তোর আঙুলে ফোসকা হয়েছিল। তুই গরম জলকে খুব ভয় পেতিস।

পুটপুট বলল—'তুই না লড়াইয়ের কথা বলছিলি!'

তুই এ কথার কোনও উত্তর না দিয়ে চট করে ছাদ থেকে পালিয়ে গেলি।

—'পমপম আমি ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা জলে চান করব। কলের জল। কল দিয়ে গরম জল বেরোবে না তো?' বলতে বলতে তুই সিঁড়ি দিয়ে দুড়দাড় করে নামছিলি। নামতে নামতে তুই পড়ে গেলি। চিল-চিৎকার শুনতে পেলুম আমরা।

—'ঋতি, দেখো তো!' ই-দাদা বলল।

বাবা জিজ্ঞাসু টমদিদির দিকে চেয়ে বললেন—'বরফ এখন আর কোথায় পাবে? ঠাণ্ডা জল দাও। আর্নিকা সিক্স ভুলো না।'

বাবা নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরেছেন। আমি ধেড়ে ছেলে সু-দাদার কোলে চড়েছি, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলছি—'সুয্যি ওদের আসতে বারণ করো। বুবু কাঁদছে, আমি ভীষণ ভয় পাচ্ছি।'

পালক আমার দিকে তাকিয়ে বলল—'আমাদের সব ছেলেমেয়েদের মিলিটারি ট্রেনিং দরকার। দেশ ভ্রমণ আর মিলিটারি ট্রেনিং মাস্ট, ও দেশের মতো।'

বাবা দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে আছেন, কিছু বলছেন না। ঠাকুরদা বলছেন—'কথাটা হয়তো এক দিক থেকে ঠিকই বলেছ পুলক। কিন্তু একটা সভ্য দেশে সিভিল লাইফে অস্ত্রশিক্ষার দরকার হবে কেন? এ প্রশ্নের আগে জবাব দাও। রাজা, শাসক, পুলিশ এরা তা হলে রয়েছে কী করতে? সোরাবর্দি কী বলে ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে ডাকলে! কার অ্যাকশন? কাদের এগেনস্টে? কাফেরদের? ময়দান মিটিং-এ কীভাবে ক্ষেপিয়েছে জানো? নে এখন ডাইরেক্ট অ্যাকশনের ঠ্যালা সামলা। নিজেরা থাকিস প্রাসাদে, আধা-বিলিতি কায়দায় থাকিস। এবার গদি চাই। না হলে আর চলছে না? তাই ক্ষেপিয়ে দিলি গরিবগুলোকে। গুণ্ডাগুলোকে সুযোগ করে দিলি। সোরাবর্দি-টর্দি তো রক্তে পুরো এদেশিও নয়। আর গরিবগুলো? দর্জি, ছুতোর, জেলে, জোলা, রাজমিস্তির—সেন্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পার্সেন্ট দিশি। কোনও এক সময়ে কনভার্টেড হয়েছিল। লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান? তা নে বাবা, সোরাবর্দি জিন্নার গদির জন্যে নে পাকিস্থান। যে-পাঁকে ছিলি সেই পাঁকেই থাকবি, মোল্লার উৎপাত এমন বাড়বে যে মাথা তুলতে পারবি না। মাঝখান থেকে জ্ঞাতশত্তুর বানিয়ে যাচ্ছিস। জিন্না যেমন মসনদে ছিল থাকবে, তোরা বসবি রাস্তায়।'

ঠাকুমা বললেন—'হুসেনেরই তো ভাই ওই শাহেদ। সেবার দ্বিজুবাবুর বাড়ি দেখলুম। কত বড় বিদ্বান, ভদ্র মানুষ। ছি ছি ছি। কুলের কুলাঙ্গার এই হুসেনটা।'

বুনবুন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী, তাকে দমানো শক্ত। সে বলল—'বাবা, মুসলমানদের কটা করে দাঁত থাকে? দাঁতগুলো বাঘের মতন না হাতির মতন?'

বাবা ঠাকুরদার সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত। জবাব দিলেন না। তখন বুনবুন বলল—

'চুলগুলো তার কটা-কটা
হাতগুলো তার লাঠি সোঁটা
চোখগুলো আ-গুনের ভাঁটা,
দেখতে পেলেই মাথা ফাটা।'

হাতের ছোট লাঠিটা দিয়ে সে ছাদে উল্টে-পড়ে-থাকা একটা ভাঁড়ের মাথায় ঢ্যাক করে মারলো। অমনি সেটা চৌচির হয়ে গেল। সে বলল—'এই একটা মুসলমান মারলুম। এই কানুমামু আর একটা মুসলমান এনে দে তো!'

কানুমামা হাসতে হাসতে আর একটা ভাঁড় এনে দিল। সেটাকেও ঢ্যাক ঢ্যাক করে ফাটিয়ে বুনবুন আরও মুসলমান-ভাঁড় খুঁজতে লাগল। না পেয়ে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে সে সপ্তমুখী জবার গাছটাতে এলোপাথাড়ি লাঠিচার্জ করতে লাগল।

বাবা অমনি দু'পা এগিয়ে এসে তার কান ধরলেন। কক্কড়িয়ে মূলে দিয়েছেন একেবারে। যত না ব্যথায় তার চেয়ে বেশি অপমানে বুনবুন ভ্যাঁ। ঠাকুরদাদার অমনি লেগে গেল। তিনি তাকে ভোলাতে লাগলেন কোলে করে।

—'অমনি কি করে দাদা? দেখছ না ফুলগাছ তো, নষ্ট হয়ে যাবে না?'

ফোঁপাতে ফোঁপাতে বুনবুন বলল—'ফুলগাছ হলেই বা, মুসলমান তো? আমাদের মারবে তো। তলোয়ারি দিয়ে, কাটারি দিয়ে, তাতে বুঝি কিছু নট্ট হবে না? তোমরাও তো ওদের মাথায় গরম জল ঢালবে, ইঁট পাটকেল ফেলবে, তাতে বুঝি কিছু নট্ট হবে না?'

—'শোনো দাদুভাই, কথাটা তা নয়। মুসলমান মানে রাক্ষস নয়, পিশাচ নয়, আমাদেরই মতো মানুষ। এই তোমার মতো। আমার মতো।'

—'তবে ওরা আমাদের কাটছে কেন? হিরেমোতির মরদকে কেটেছে কেন? আমরাও ওদের কাটব ও-ও।'

বাবা হঠাৎ একটা অব্যক্ত আওয়াজ করে উবু হয়ে বসে পড়লেন। দু'হাতে নিজের কপাল চাপড়াচ্ছেন।

—'এক কী হচ্ছে চারদিকে? এ কী পিশাচের নাচ! হে ভগবান, আমাদের পরের জেনারেশন যে মনস্টার হয়ে যাচ্ছে। ছেলেপিলেগুলো যে মানুষ হবে না!...মা।'

'মা' শব্দটা তিনি এমন করে উচ্চারণ করলেন যে চারদিক থরথর করে কেঁপে উঠল। যেন তাঁর দম বন্ধ হয়ে আসছে। শেষ নিশ্বাস দিয়ে তিনি কোনও সর্বময়ী জননীকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাকছেন।

দাদাভাই ঠাকুর্দার দিকে তাকালেন। দুজনের চোখে চোখ রেখে কী যেন কথা হয়ে গেল। দাদাভাই গিয়ে বাবার মাথায় হাত রাখলেন, বললেন—'বাবা দুগ্গা, এমন ভেঙে পড়লে চলবে কেন? এ দুর্বলতা কি তোমাকে সাজে! যা করবার তা তো আমাদের করতেই হবে!'

বাবা দাদাভাইকে কখনও সোজাসুজি বাবা বলতেন না, আজ বললেন—'আপনি ভেবে দেখুন বাবা, এক মায়ের পেটের সন্তান ছিলুম আমরা এই কপুরুষ আগেই। পাণ্ডবও তো আসলে কৌরবই। কে আল্লাহ্, কে ব্রহ্ম কেউই জানে না। সত্যস্বরূপে তিনি কি আল্লাই? তিনি ব্রহ্মাই? তিনি কোনওটাই নন। আমাদের মনগড়া নামে তিনি ধরবেন কেন বাবা? আপনারা পণ্ডিতরা যা-ই বলুন। তবু সেইটুকু, মাত্র সেইটুকু নামের আর আচারের বিভেদের ছুতো ধরে যদি কতগুলো সুযোগসন্ধানী ক্ষমতালোভী আমাদের যখন তখন খেপিয়ে দিতে পারে, আমরা এমনি করে একে অপরকে খুন করব! আমার সত্যিই হাত পা আসছে না বাবা! সব মিথ্যে মনে হচ্ছে। যা এতদিন এত যুগ ধরে করা হল সবই বাজে...বাজে।'

ই-দাদা বলল—'বাবা আপনি এমন করলে আমরা কোত্থেকে সাহস পাবো?'

ঠাকুর্দা বললেন—'তা ছাড়া দুগ্গি, যা হবার তা তো হয়েই আছে। তুমি-আমি ভেবে কী করব বলো? যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি। আর কী-ই বা আছে আমাদের হাতে! যারা মরছে তাদের তিনি মেরেই রেখেছেন। ওঠো, ঝেড়ে ফেলে দাও এসব। ভাইয়ের হাতে ভাইয়ের রক্ত তিনি যদি চান তো তাই হবে। জাস্টিসের জন্য, ডিফেন্সের জন্য যা করবার তা তো আমাদের করতেই হবে।'

বাবা উঠলেন। তিনি লম্বা মানুষ নন। দাদাভাই বেশ লম্বা। ঠাকুর্দাও মন্দ লম্বা নয়। কিন্তু লম্বা-লম্বা দেখাচ্ছে। বাবা বললেন—'যদি কারও রথের চাকা বসে যায়?'

ঠাকুর্দা বললেন—'তাকে সময় দেবে।'

—'যদি কেউ অস্ত্র ত্যাগ করে?'

—'সেক্ষেত্রে তোমাকে কি আমরা প্রহার করতে বলব মনে কর?'

বাবা জবাব দিলেন না। বললেন—'যদি কেউ কেউ এসে পড়ে আমাদের মাঝখানে?'

—'তাকে সসম্মানে ব্যূহ পার করে দেব। দিয়েছি তো আমরা। দিইনি কী?'

—'আর মিথ্যে?'

—'প্রাণরক্ষার জন্যে মিথ্যে বলা অন্যায় তো নয় দুগ্গি, প্রাণবধের জন্যে মিথ্যে তোমাকে কখনও বলতে হবে না।'

বাবা খুব দূরের দিকে তাকিয়ে বললেন—'মনে থাকে যেন।'

যেন বাবা সে-কথা ঠাকুরদাকেও বলছেন না, দাদাভাইকেও বলছেন না, বলছেন অনেক দূরে আকাশে-দাঁড়ানো কোনও পুরুষকে, যাঁকে তিনি একাই দেখতে পাচ্ছেন, আর কেউ দেখতেও পাচ্ছেন না, অনুভব করতেও পারছেন না।

সন্ধে অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে। 'আল্লা হো আকবর', 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বন্দে মাতরম্' জাতীয় অস্পষ্ট ধ্বনি দূরের জলোচ্ছ্বাসের মতো আমাদের কানে প্রবেশ করছে। ঘুম ছিড়ে ছিড়ে যাচ্ছে। কারা যেন এসেছে। ঘাম আর রক্তের গন্ধে বাতাস দূষিত হয়ে যাচ্ছে। কারা কীসব বলাবলি করছে।

—পরিস্থিতি কনট্রোলে। নিকাশিপাড়া হটছে।'

—আমি তিনটেকে মেরেছি। একটার এমন হাড় জিরজিরে চেহারা যে মায়া হচ্ছিল। খুব বিশ্রী লাগছে।'

'—ভাগ্যে বাচি শ্যামবাজারের মোড়ে স্টেনগান নিয়ে দাঁড়িয়েছিল! পুলিশ তো ওদের দিকে। কেউ কোথাও নেই।'

—'জোড়াবাগান খুব টাফ।'

'—নিকাশিপাড়ার চেয়েও?'

'—অনেক। অনেক। নিকাশিপাড়া আসলে কী জানিস তো? নিকারিপাড়া। খুচরো মাছের জেলে। খুব গরিব, ওদের আসল স্ট্রেংথ হচ্ছে গোয়াবাগান গোরুহাটার বস্তি। কালুগুণ্ডা মানে কলিমুদ্দিন, ডেনজারাস। এ রকম আরও কত আছে। শ' বাজারের ওরা নবকৃষ্ণ স্ট্রিট দিয়ে গ্রে স্ট্রিট হয়ে ওদিকে যাওয়ারই চেষ্টা করছিল। রীতিমতো আর্মড। সব ফর্সা।'

—'কই? কাকাবাবু কখন আসবেন?'

—'দুগ্‌গা-কাকা কই?'

আমি তখন পুরো জেগে উঠেছি। যদিও কাউকে জানতে দিচ্ছি না। চোখটা আদ্ধেক খুলে দেখলুম মা ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, দালানের মুখে যাচ্ছেন। মাথায় লাল পাড় মিলের শাড়ির আধ-ঘোমটা। গলায় লাল সুতোয় বাঁধা সোনার মাদুলি। হাতে দু' গাছি রুলি, আর ক্ষয়া-ক্ষয়া সোনার চুড়ি। কপালে সিঁদুরের টিপটা ধেবড়ে গেছে। মায়ের কানে ছোট্ট ছোট্ট সোনার চাকা।

—'কাকাবাবুকে ডাকছ কেন বাবা?'

—'উনি ছাড়া তো আমাদের লিড করার কেউ নেই। উনিই একমাত্র এ এলাকায় যিনি নেতাজির সংস্পর্শে এসেছেন।'

—'এতক্ষণ কী করে চলছিল তোমাদের?'

—'নিজেরা যা পারি ঝোঁকের মাথায় করেছি। এবার অর্গ্যানাইজড ওয়ার।'

—'অবস্থা তো এখন ভালোর দিকেই।'

—'মনে হচ্ছে। কিন্তু বলা কিছু যায় না। যদি বিহারি মুসলিমরা রাতের অন্ধকারে এসে যোগ দেয়?...ওরা আরও ফেরোশাস।'

—'শোনো'...মায়ের গলা একটু একটু করে কাঁপছে। মা কখনও এত পাড়ার ছেলের সামনে বেরোন না, —'এই দ্যাখো, আমার গলা খালি, হাত দেখো, যা গয়নাগাঁটি ছিল স—ব দিয়ে দিয়েছি, ওঁর অল্প বয়সটাই বরবাদ হয়ে গেছে। যাক। কিন্তু আমরা এতদিন পর্যন্ত যা করেছি সবই গোটা দেশটার জন্যে করেছি। গোটা দেশ। তোমাদের কাকাবাবু একজন বড়...মানে বড় নয় ঠিক...খাঁটি মানুষ। ওঁকে আমি দাঙ্গা মানে শুধু মারামারিতে যেতে দেব না। ওঁর খুব জ্বর এসেছে। কিন্তু শুধু সেইজন্যে না। উনি সুস্থ থাকলেও আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেতে দিতুম না। আমাকে মাড়িয়ে যেতে হত। ওঁকেও। তোমাদেরও। এখন উনি জ্বরের ঘোরে ভুল বকছেন। তোমরা শুনে যেতে পার কী বলছেন।' মা যেন পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াবার মতো করে সরে দাঁড়ালেন।

ছেলেরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। কয়েকজনের মুখে মৃদু ব্যঙ্গের হাসি।

—'ভুল বকা শোনবার দরকার নেই কাকিমা, আমরা চলি। ইন্দ্র, সূর্য, পুলক এরা কেউ ভিজিল্যান্সে যাবে কি?'

—'ইন্দ্র সূর্য যেতে পারে। পুলককে ছাড়ার আমার উপায় নেই।

পালক মাকে বোঝাবার চেষ্টা করছিল। মা শুধু বলছিলেন—'না।'

সু-দাদা বেরিয়ে এলো। বলল—'চলো নরেনদা। মা আমি যাই?'

মা স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে।

সুযযি মালকোঁচা মেরে ধুতি পরেছে। মাথার ওপর আধ-কোঁকড়া চুলগুলো ফুলে আছে। হাসি-ঠাট্টা মাখা মুখটা এখন সিরিয়াস। শার্টটা ঝুলছে। নরেনদা বলল—'শার্টটা গুঁজে নিলে পারতিস।'

—'ও ঠিক আছে'—সুযযি বলল।

ভেতরে বাবা জ্বরের ঘোরে বলছিলেন—'আঃ শাহেদ, য়ু আসক দেম টু বি রিজনেব্‌ল। বিলিভ মি, ইউ 'ড অ্যাচিভ নাথিং বাই পার্টিশন। ইজ জিন্নাহ্ এ মুসলিম? ডোন্ট ইউ সি হোয়াই সাচ অ্যান অ্যাংলোফাইল উড ইনসাইট কমিউন্যাল ফিলিংস? পিওরলি টু ফুলফিল হিজ ওন পার্সন্যাল অ্যামবিশন।...সো ইউ হ্যাভ কাম? আই নিউ ইট অল অ্যালং!'

মা মাথার ও'ডি-কোলন দেওয়া জলপটিটা পালটালেন। বাবা চোখ বুজেই আছেন। আমার ভীষণ ভয় করছে। গলার কাছ পর্যন্ত ভয়ে শুকিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে বাবা চোখ মেলছেন, দেখতে পাচ্ছি চোখ দুটো লাল। ভীষণ লাল। বাবা আমাদের কাউকে দেখতে পাচ্ছেন না। কিন্তু ঘরে আমরা ছাড়াও আরও অনেকে আছেন। তাঁদের আমরা দেখতে পাচ্ছি না। বাবা, একমাত্র বাবাই দেখতে পাচ্ছেন। কী অদ্ভুত অলৌকিক ক্ষমতা আমার বাবার! এ তো ম্যাজিক বাবা! কিন্তু ম্যাজিক বাবা নিয়ে ভেতরে ভেতরে গর্বিত হলেও আমি ভীষণ ভয় পাচ্ছি। ভয় আমার গর্বের টুঁটি টিপে ধরেছে।

ঠাকুর্দা বললেন—'শক ফিভার। আমি ওষুধ দিই বউমা!'

—'না বাবা, উনি ফেলে দেবেন।'

—'জ্ঞান নেই, বুঝতে পারবে না।'

মা একটু ইতস্তত করে বললেন—'পরে আমাকে খেয়ে ফেলবেন।'

—'পরের কথা পরে বউমা। এখন তো...'

—'বাবা, উনি বলেন, যে-জিনিস আমি লোককে দিচ্ছি অথচ বিপদের সময়ে নিজে খাচ্ছি না, সে ওষুধ পরে আর আমার কথা শুনবে না।'

—'ননসেন্স। কাঠ-গোঁয়ার একেবারে। ব্যাপারটা হল সায়েন্স। উনি তার মধ্যে অকাল্ট এনে ফেললেন। তা এখন যে দশা—ওষুধ-টষুধও তো বলতে পারবে না।'

—'যখন জ্বর আসছিল তখনই বলেছিলেন বাবা, দিচ্ছি। বেলেডোনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবা তখন স্বামীজির সঙ্গে কথা বলছেন। এবার ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে।

—'তুমি কেন বিয়ে করলে না? ইউ হ্যাড টু ডাই অ্যাট দি এজ অফ থার্টিনাইন? মার্গারেট নোবল, কি সিস্টার ক্রিস্টিনকে বিয়ে করলে পারতে। ইউ কুড হ্যাভ রেইজড এ ব্রুড অফ হিরয়িক ইউরেশিয়ানস। এ কৃষ্ণ, এ নিউ কৃষ্ণ মাইট হ্যাভ বিন বর্ন।'

বাবা চোখ বুজিয়ে বুজিয়েই হাসলেন।

—'তোমার চারিদিকে চোখ, না? রক্তচোখ সব। ভাল ভাল। তা হলে শুয়োররাই ব্রিড করুক। শুয়ার আর ইঁদুর। ইন টেন ইয়ার্স দিস কানট্রি উইল গো টু দা ডগস। শুয়ার্স অ্যান্ড র‍্যাটস। সোয়াইন! ব্লাডি বাগার্স!'

বাবা গা মোড়ামুড়ি দিতে লাগলেন। যেন ভেতরে খুব যন্ত্রণা!

মা মাথা ধুইয়ে দিচ্ছেন। ঠাকুমা কেটলির নল দিয়ে জল ঢালছেন। মা বাবার ছোট ছোট চুলগুলো বিলি কেটে কেটে ভিজিয়ে দিচ্ছেন।

—'জ্বর হলেই দুগগি ভুল বকবে'—ঠাকুমা বললেন।

মা বললেন—'কিছু মুখে আটকাবে না,' দুজনে যেন দুজনকে বুঝ দিচ্ছেন।

'ব্লাডি, শুয়ার্স, বাগার্স—', বাবার প্রলাপ-বাক্য থেকে তিনটি শব্দরত্ন আমি সন্তর্পণে জিভে তুলে নিই। সময় সুযোগমতো প্রয়োগ করা যাবে। তুই যেমন অনেক কিছু বলে আমায় চমকে দিস, আমিও তেমনই এগুলো বলে তোকে চমকে দেব। বাবার ব্যবহারের তকমা লাগানো ছোট ছোট মুখরোচক ইংরেজি শব্দ—'ব্লাডি, বাগার্স, শুয়ার্স (এটাও ইংরেজি)।' ঠিক বাবার মতো করে বলতে পারছি না। আমার গলা আবার বড্ড সরু।

তোর গলাটা হেঁড়ে। তোর গলায় অনেক কিছু মানায়। তবু আমি চেষ্টা করব, আপ্রাণ। ব্লাডি, বাগার্স (নিশ্চয়ই বেগার্স হবে, বেগার্স মানে ভিখারি, ঠাকুর্দা দেখতে পারেন না) শুয়ার্স, সোয়াইন। ইত্যকার অনুপ্রাস জিভ দিয়ে নিঃশব্দে চাখতে চাখতে আমি ঘুমের দেশে ভেসে যেতে থাকি। ভারী নিশ্চিন্ত। কেননা বাবার জিভে বেলেডোনা থার্টি পড়ে গেছে।

এখন পেছনের দিকে তাকিয়ে ভাবি—মানুষের তৈরি দু' দুটি বিপাকের পরীক্ষায় পাস করা জাতক আমরা। পঞ্চাশের মন্বন্তর। ছেচল্লিশের দাঙ্গা। কী অদ্ভুত। কথাগুলো এখন ইতিহাসের পাতার ছোট্ট ছোট্ট কোণে চলে গেছে, গুরুত্বহীন শব্দ সব। থিওরি পড়ি। পোড়ামাটি নীতি, যুদ্ধকালে শত্রু সৈন্যের আসার পথে খাদ্যশস্য নষ্ট করে দেওয়া হয়। উদাহরণ—পঞ্চাশের মন্বন্তর। থিওরি পড়ি—দ্বিজাতিতত্ত্ব, তার জনক মহম্মদ আলি জিন্নাহ্। বিশ্লেষণ পড়ি—কংগ্রেস জিন্নাহ্‌কে মর্যাদা দেয়নি। তাই প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠলেন তিনি। আ রে! কে কংগ্রেস! কে জিন্নাহ! ভারতবর্ষটা কার পৈতৃক সম্পত্তি? শতাব্দীব্যাপী গৃহযুদ্ধের সেই কি শুরু নয়? শুরু পরস্পরের প্রতি ঘৃণা, ভয়, অবিশ্বাসের। গুণ্ডা, রাজনীতি আর ব্যবসায়িক স্বার্থের গলাগলিরও সেই শুরু।

আজকের ছোটরা দুঃখ করে তারা নাকি কিছু পায়নি। আমরা ছোটরা কী পেয়েছিলুম গৌরবোজ্জ্বল স্বাধীনতার জন্মলগ্নে? আমাদের জুতোর দোকান 'ইয়াং গ্র্যাজুয়েট' লুট, আমাদের জামাকাপড় খেলনার দোকান 'ওয়াজেল মোল্লা' ধ্বংস। আমাদের দিদিদের স্কুল 'ব্রাহ্ম বালিকা', দাদাদের স্কুল 'ক্যালকাটা বয়েজ'-এ যাওয়া হয়নি, মুসলিম এলাকা পার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে যেতে হবে। আমরা অবাক হয়ে শুনেছি একজনের নাম। তিনি অনশন করছেন। বড়রা কাঁদছেন। তিনি জনতার জ্বলন্ত রোষ থেকে সুরাবর্দিকে বাঁচাচ্ছেন, বড়রা রেগে কাঁই। জঘন্যতম পাপীদের কি বাঁচাতে আছে? নৃসিংহ কি হিরণ্যকশিপুকে ছেড়ে দিয়েছিলেন ? দেশবন্ধু পার্কে যখন বিরাট মিটিং হল, গাঁধীজি পা মুড়ে তাঁর সেই অভ্যস্ত ভঙ্গিতে বসে ভাষণ দিলেন, তখন পালক আর ইন্দ্রর কাঁধে চড়ে আমি-তুই বুনবুন একে একে গাঁধীদর্শন করলুম।

—গান্ধীঠাকুর, গান্ধীঠাকুর নমো নমঃ, নমো নমঃ!

এদিকে একদিন রাগ হতে আমি তোকে বললুম—'তুই একটা মুসলমান।'

তুই সঙ্গে সঙ্গে বললি—'আর তুই? তুই তো হিন্দু!'

বুনবুন বলল—'তুই সোরাবদ্দি। বুবু পাকিস্তান।'

আমি তখন আমার সেই যুগান্তকারী প্রয়োগটি করলুম—'তুই তবে কী?'

আমি বললুম—'ব্লাডি, বেগার্স সোয়া (ই)ন, শুয়ার্স।'

এই মোক্ষম সময়ে ই-দাদার যমের মতো আবির্ভাব। আমার কানে তীব্র প্যাঁচ—'গালাগালির ফুলঝুরি বেরুচ্ছে যে অ্যাঁ? কোথা থেকে শিখেছ?'

ডান হাতের তর্জনী দিয়ে চড়াত করে এক চড় মারল ই-দাদা। আমার গালে দাগ বসে গেল। চোখের জল চেপে বললুম—'বাবা, বাবা বলেছেন তো। গালাগালি কেন হবে? তুমি? তুমিও তো নোয়াখালি, রায়ট, দাঙ্গা।'

এক মুহূর্তে থমকে গেল ই-দাদা। সেই অবসরে আমি সরু গলায় আরও চিৎকার করে বললুম—'তুমি গান্ধী। গান্ধী। গান্ধী।' ই-দাদাকেও ভয় পাচ্ছি না আমি। পালক-ইন্দ্র পরস্পরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী বলছে রে। মানে কী এর?'

তারপরেই দুজনে হো হো করে হেসে উঠল।

ব্যাপারটা কিন্তু আদৌ হাসির ছিল না। আমাদের সবই গুলিয়ে গিয়েছিল। আমাদের সবই গুলিয়ে গেছে। সেই থেকে গুলিয়েই রয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় অধ্যায়

আমরা দুটি ভাই/শিবের গাজন গাই

ঘি-ঘি-ঘি সুযযি। পুঁচকে বেলায় যে তান ধরেছিলুম তা আর কোনওদিন ছাড়িনি। এ যেন কেমন একটা জৈব টান। বুনবুনের প্রতি যেটা হওয়ার কথা, বুনবুনকে গোড়া থেকেই সরিয়ে নেওয়ায় সেটাই কি হয়েছিল সুযযির ওপর ? সু-দাদা স্কুলে যাবে, উঁচু ক্লাসে পড়ে বাব্বাঃ, কিন্তু আমাকে খাইয়ে না গেলে আমি কান্না জুড়ব। পিসিমা বলবেন—'এ কী আশচয্যি জুলুম! ব্যাটাছেলেতে বাচ্চাকে ভাত খাওয়ায় বাপের জন্মে শুনিনি বাপু। অনাছিস্টি!'

সুযযির একটা গোলাপি রঙের শার্ট ছিল। সেটা পরলে তাকে এত ভাল দেখাত যে আমি আর তাকে ছাড়তে পারতুম না। পাগলের মতো তার পকেট আঁকড়ে থাকতুম। সুযযি কিন্তু বকত না। বিরক্ত হত না। বলত—'পুনপুনি, একটুখানি নামো! স্কুল না গেলে তোমার জন্যে ম্যাজিক শিখে আসব কী করে?'

সুযযি আর অংশু ছিল এক জোড়া। তবে দুজনে দু'রকমের। দু'জনেই মজাদার। কিন্তু দু'রকমের মজা: সুযযি বলবে মজার মজার গল্প, সে খেলোয়াড়, তার স্বাস্থ্য ভাল। অংশু খেলাধুলোর ধারেকাছে যাবে না, বড্ড রোগা, সে খুব পড়ুয়া ছেলে, তা ছাড়াও ভীষণ খুনসুটিবাজ। ওরা দু'জনে মিলে তিনতলার একটা ছোট্ট চিলেকুঠরিতে একটা ল্যাবরেটরি সাজিয়েছিল। টেস্ট টিউব, বিকার, বকযন্ত্র, কিপ'স অ্যাপারেটাস, ফানেল, ব্লোপাইপ-বুনসেন বার্নার…। কত রকম যে ছিল সেখানে! বোতলে বোতলে কত রকম সল্ট! কত অ্যাসিড! এ ছাড়াও সুযযির ছিল ডাকটিকিটের অ্যালবাম, অংশুর ছিল ফেটে-যাওয়া পিংপং বলের সংগ্রহ, ওদের দু'জনের যৌথ ম্যাজিক দেখাবার সরঞ্জাম ছিল। যার সব কিছু ওরা কিছুতেই আমাদের কাছে দেখাত না। ওদের ছিল অদ্ভুত-অদ্ভুত টিনের দুটো সুটকেস। তাতে পুঁচকে পুঁচকে তালা ঝুলত। কী মহার্ঘ দ্রব্য যে তাতে আছে আমরা জানতে পারতুম না।

দুই দাদা এক রোববারে ধরুন ঘরটাকে ঝেড়েপুঁছে ঝকঝকে করে সগর্বে ঘর প্রবেশপর্ব সমাধা করল, করেই খিল তুলে দিল। অমনি জানলা দিয়ে একটা ছোট্ট মুখ দেখা গেল। কার মুখ! বুবুর! আবার কার?

—'একটু খুলে দে না রে!' —বুবুর বিনীত প্রার্থনা।

—'আবার তুই-তুই করছিস!' অং-দাদা ক্রুদ্ধ।

—'খুলে দাও না।' —বুবু সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকে শুধরে নিয়েছে।

ঘরের খিলের দিকে দৃষ্টিপাত করে সু-দাদা বলল— 'না নাঃ এখন না। পরে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন দুভাই তাদের নবপরিষ্কৃত গবেষণাগারের পরিচ্ছন্নতা ও শান্তি নীরবে উপভোগ করবে। পরবর্তী কর্মসূচিও ঠিক করবে। এখন এলেবেলেদের নিয়ে খুনসুটি করার সময় নয়।

কিন্তু বুবুকেও তো ঢুকতেই হবে! সে দুই দাদার মাঝখানে হাইফেন হয়ে তাদের আলোচনায় অংশ নিতে চায়। সুতরাং সে ছাত থেকে সংগ্রহ-করে-আনা চড়ুই পাখির ভেঙেপড়া বাসার টুকরো-টাকরা জানলা দিয়ে গলিয়ে দোলায়। এ ধরনের নানা কৌশল সে পরিস্থিতি অনুযায়ী উদ্‌ভাবন করে থাকে। আমরা তাকে বিনা শর্তে মেনে চলি।

—'এই কুটোটা তবে ফেলি?'—বুবু বাসাটা দোলাতে থাকে।

—'এই খবদ্দার, না বলছি, না!'

অংশু রেগে-মেগে দরজা খুলে বুবুকে ধরতে ছোটে। বুবুর পেছনেই আমি। সুট করে ঘরে ঢুকে যাই। ঢুকেই সু-দাদার কোলে।

—'দেখাও, ম্যাজিক দেখাও।'

বুবুও ঢুকে এসেছে অং-দাদার কড়ে-আঙুল ধরে, 'দেখাও ম্যাজিক!'

অতএব ওদের ম্যাজিক দেখাতেই হয়।

—'দেখো কেমন দৈত্য বার হবে।'

একটা টেস্ট টিউবের মধ্যে সাদা সাদা নুন ফেলে সুধাংশু। তারপরে হলুদ হলুদ নুন ফেলে। এবার তার মধ্যে জল দেয়। এদিকে বুনসেন বার্নার জ্বালিয়েছে অংশু। চিমটে করে তার ওপর টেস্ট টিউবটা ধরে, ব্যাস লাল ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে উঠতে থাকে।

—'ওটাই দৈত্য? যে "ধীবর ও দৈত্যের" গল্পে বোতলে থাকে? সু-দাদা?'

—'হ্যাঁ, সেই একই দৈত্য। ওর নাম হল— ক্রোমিল ক্লোরাইড।'

ক্রোমিল, ক্রোমিল! কী সুন্দর নাম দৈত্যের, এ যেন কোনও রাজকুমারীর নামও হতে পারত। ক্লোরাইডটা পদবি। আমি যেমন পাবন সিংঘ, দৈত্য তেমন ক্রোমিল ক্লোরাইড। পদবিটার মধ্যে একটু ভারী ভারী ভাব আছে। চোখ বড় বড় করে আমরা ভয় আনবার চেষ্টা করি হৃদয়ে। ভয় তেমন আসতে চায় না।

—'ঘাড় মটকে দেবে? সু-দাদা?'

—'দিতে পারে। দুষ্টু ছেলেমেয়েদের ঘাড়ের ওপর ওর ভীষণ লোভ।'

আমরা ঘাড়ে হাত বুলোই। কেননা জানি, আমরাই সেই দুষ্টু ছেলেমেয়ে যাদের ঘাড়ের ওপর দৈত্যদের লোভ হতে পারে।

—'তবে হ্যাঁ, যদি এবার থেকে কথা শুনবে বলো তবে দৈত্যকে আবার বন্দি করা যেতে পারে।' সু-দাদা আশ্বাস দেয়। লাল-ধোঁয়ারূপী দৈত্যকে আমরা ভয় পাইনি, কিন্তু কীভাবে সে বন্দি হতে পারে দেখতে আমাদের প্রবল ঔৎসুক্য জাগে। অতএব এবার অ-দাদা হাল ধরে। সে টেস্ট টিউবের মুখে ফুটোঅলা ছিপি দেয়। ফুটোর মধ্যে একটা বাঁকানো নল লাগায়, অনুরূপ আর একটা টেস্ট টিউবের সঙ্গে যুক্ত করে। সেখানেও কিছু বস্তু আছে। লাল ধোঁয়া দ্বিতীয় টেস্ট টিউবে যেতে থাকে। এবার হলুদ হলুদ কিছু গুঁড়ো পড়ে থাকে। দৈত্য বন্দি। ওই বেচারী হলুদ গুঁড়োগুলোর দিকে তাকিয়ে আমাদের খুব দুঃখ হয়। শেষকালে সাহস করে জিজ্ঞেস করেই ফেলি— 'এই দৈত্যটাকেই ধীবর ভয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেয়েছিল, অ-দাদা ?'

অ-দাদা চালাক ছেলে। আমাদের সন্দিগ্ধতার কারণটা অনুমান করে। বলে—'ধীববের দৈত্যটা এর বড় দাদা।'

—'যেমন ই-দাদা আমাদের ? অনেক অনে-ক বড় ?'

—'তার চেয়েও বড়।' সু-দাদা কণ্ঠে প্রত্যয় এনে বলে। ই-দাদার চেওে বড় ? এবার আমাদের সম্ভ্রম জাগে। ই-দাদার চেয়েও বড় কোনও দাদা আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

একেক দিন এই ঘরে পিকনিক হত। তেপায়ার ওপর বাটি চাপত তাইতে লুচি ভাজা হত। সু-দাদা বেলছে, অং-দাদা ভাজছে। লুচি, বেগুনভাজা, আলুভাজা। তাদের স্বাদই আলাদা। লম্ফর কেরোসিন-কেরোসিন গন্ধটা বেশ মিশে থাকত সবেতে। লুচিগুলো টিপি-টিপি, আলুভাজা ওপর-পোড়া, ভেতর-কাঁচা, বেগুনভাজা অদ্ভুত কালো। খেতে খেতে ভাবতুম—এইরকম স্বর্গীয় গন্ধ-স্বাদ যে কেন মা-পিসিমাদের রান্নায় থাকে না!

এই পিকনিকে বুজবুজ-পুটপুট অংশ নিতে এলে দুই দাদা রে রে করে উঠত। শেষকালে রফা হত—দিদিরা আচার তৈরি করবে। আচার মানে ভাঁড়ারঘর থেকে তেঁতুল, সরষের তেল, গুড়, নুন, লংকার গুঁড়ো এইসব মেখে তাল পাকিয়ে টকটক উস-আস শব্দ করতে করতে খাওয়া। এটার ভাগ আমরা পেতুম না। কান্নাকাটি করাতে একদিন বুজবুজ জিভে একটু ঠেকিয়ে দেয়, তাইতেই শিক্ষা হয়ে গিয়েছিল। ঝালের চোটে কেঁদে-রেঁদে একসা।

ছোট্ট থেকেই সু-দাদার খুব ব্যবসাবুদ্ধি ছিল। ধরুন ওকে শিব্রাম চক্রবর্তীর কিংবা হেমেন্দ্রকুমার রায়ের কোনও বই কিনে দেওয়া হয়েছে। ও সেটা আপাদমস্তক পড়ে ফেলল, তারপর সেটা ও ক্লাসের ছেলেদের সঙ্গে বদলাবদলি করে নেবে নীহাররঞ্জন গুপ্ত কি প্রেমেন্দ্র মিত্র কি 'মোহন ও রমা' ধরনের কোনও বইয়ের সঙ্গে। সেটাও পড়া হয়ে গেলে অর্ধেক দামে বিক্রি করে দেবে। সেই পয়সা জমিয়ে জমিয়ে কেমিক্যালস্ কিনবে।

সু-দাদা বোধহয় অনেকদিন আগেকার বিনিময়প্রথার দিনের লোক ছিল। ধরুন অংশু একটা খুব সুন্দর পেপারওয়েট জোগাড় করেছে। কাচের স্বচ্ছ পেপারওয়েট, তার ভেতরে লাল-নীল ফুল। সে যে কী লোভনীয়। সু-দাদার ঝোলাঝুলি সেটা ওর চাই-ই চাই। অংশু কিছুতেই দেবে না। শেষকালে সু-দাদা তার প্রাণের চেয়েও প্রিয় স্ট্যাম্পের অ্যালবামটা বদলি করতে চাইল। তখন অংশু রাজি। অ্যালবামটার ওপর তার অনেক দিনের নজর। অতঃপর জিনিস বদলাবদলি হয়ে গেল। অর্থাৎ সুযযির নীল সুটকেস থেকে অ্যালবামটা অংশুর সবুজ সুটকেসে গেল, পেপারওয়েটটা সবুজ সুটকেস থেকে নীল সুটকেসে স্থানান্তরিত হল। সুটকেস দুটো দিব্যি পাশাপাশি রইল। কিছুদিন পরেই আবার সুযযির অ্যালবামের জন্য অনুশোচনা হতে লাগল, সে অ্যালবামটা ফিরিয়ে দেবার জন্য অংশুকে পীড়াপীড়ি করতে শুরু করল। অংশু দেবে কেন ? শেষে তার নীল সুটকেসের যাবতীয় জিনিস দিয়ে সুযযি অংশুর কাছ থেকে অ্যালবামটা কিনে নিল। নীল সুটকেস, সবুজ সুটকেস একই রকম পাশাপাশি অবস্থান করতে লাগল। অর্থাৎ জিনিসগুলো একই জায়গায় থাকত, খালি তাদের মালিকানা বদল হত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই হল গিয়ে সুযযি আর অংশু। সুযযি ফুটবল খেলে। প্রায়ই দেখা যায় সে চোট খেয়েছে। চুন-হলুদ গরম করে গোড়ালিতে লাগিয়ে সুযযি নীল সুটকেসের জিনিসপত্তর খুলেমেলে দেখে। যক্ষের ধন সব। আমরা কাছাকাছি এলেই সে তার লকারের তালা বন্ধ করে দেবে। তবে হ্যাঁ, পুনপুনের ওপর তার একটু ইস্পেশ্যাল দুর্বলতা। পুনপুন যদি তার কোলে বসে পড়ে, 'নীল সুটকেসের খোল দেখাও' বলে আবদার করে সে বেশিক্ষণ রেজিস্ট করতে পারে না। এমনিভাবেই আমার মাঝে মাঝে সেই গুপ্তধন, যখের ধনের ঝাঁকিদর্শন হয়েছিল।

মোটা মোটা লাল নীল পেনসিল। একদিকে লাল, উল্টোদিকে নীল। কী আশ্চর্য! এক কৌটো ঝিনুক। কোনওটা জাপানি ছাতার মতো, কোনওটা কানের মতো, কোনওটা খণ্ড ৎ-এর মতো, কোনওটা চরকার মতো, গোলাপি আভাযুক্ত বোন চায়নার মতো কিছু। সে এক আরব্যোপন্যাসের আশ্চর্য কৌটো! এগুলি সুযযি বন্ধু-বান্ধবদের ভোগা দিয়ে সংগ্রহ করেছিল। বন্ধুরা কেউ হয় তো পুরী গেছে। প্রচুর ঝিনুক এনেছে। সুযযিকে বড্ড ভালবাসে বন্ধু। গোটাদশেক ঝিনুক সে সুযযিকে উপহার দিতে চায়। সুযযি বলে—'ঠিক আছে। আমাকে বেছে নিতে দে।' ব্যাস, বন্ধু ফাঁদে। সুযযি দেখেশুনে সবচেয়ে পছন্দসইগুলো তুলে নিল। তা সুযযিও কি তার বিনিময়ে কিছু দেবে না? দেবে বইকি! উদার গলায় গেয়ে দেবে—

'ভুল করে তুই চিনলি না তোর প্রেমিক শ্যামরায়।
ঝাঁপ দিলি তুই মরণ যমুনায়।'

এমন করে ঝাঁপ দেবে সুযযি যে সব ক্ষতি পুষিয়ে যাবে।

দেশবন্ধু পার্কে সুযযিদের ম্যাচ আছে। 'অ্যালপাইন'-এর সঙ্গে 'বেঙ্গল টাইগার্স' কিংবা 'বন্ধুদল'। আমরা জানিই না। বেড়ুর আর রামের সঙ্গে দেশবন্ধু পার্কে ঢুকে দেখি মহা উত্তেজনা। দুর্দান্ত খেলা হচ্ছে। অ্যালপাইনের একটা ছেলে নাকি খুব গোল দিচ্ছে। ভিড় ঠেলে আমি বুনবুন-কানুঝামুফুল ঢুকে গেছি। গিয়েই আমার বিস্মিত চিৎকার—নীল-সবুজ জার্সি পরে ও তো আমাদের সুযযি!

—'সুযযি! সুযযি!' চেঁচিয়ে মাঠ ফাটিয়ে দিচ্ছি আমি।

ভিড়ের লোকগুলো—'কাটা কাটা, এই কাটা, এগো, গো-ওল', বলে চিৎকার দিচ্ছিল। আমার সরু গলার গলা গলানোয় ভারি রেগে যায়, বলে—'কান ধরে বার করে দে তো। এই বাচ্চা, একদম চুপ!'

—'সুযযি, সুযযি!' আমি ভ্যাঁ। আমার সেই সুযযি যে এখনও আমাকে গরস মেখে ভাত খাইয়ে দেয়, যার কড়ে আঙুল ধরে আমি দ্বারিকের দোকানের ফুলকপির সিঙাড়া কিনতে যাই এবং চুপিচুপি রসমুণ্ডি খেয়ে আসি, সেই আমার সুযযি নীল সবুজ জামা পরে ওরকম অপরিচিত অন্য লোকের মতো একগাদা লোকের মাঝে বল খেলবে কেন?

আমার মাথায় কোনও প্রতিবেশীর চাঁটি পড়ে। আমি চিৎকার করে আধা-কান্না আধা-নালিশ করতে থাকি। 'সুযযি-সুযযি!' সুযযি উদ্‌ভ্রান্তের মতো এদিক ওদিক তাকায়। তার গোল মিস হয়ে যায়। রেফারির হুইস্‌ল্ পড়ে। 'অ্যালপাইন' এক গোলে হেরে যায়। লোকগুলো তো আমাকে এই মারে তো সেই মারে। সুযযি ছুটতে ছুটতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসে আমাকে উদ্ধার করে। উত্তেজনায়, রাগে উদ্বেগে তার মুখ লাল। খুব লজ্জার সঙ্গেই সে কবুল করে—'এটা আমার ভাই।'

তখন হঠাৎ আবহাওয়াটা বদলে যায়। ব্যারোমিটার স্বাভাবিক হতে থাকে। ভীষণ আদর শুরু হয়ে যায়। বুনবুন কার কোলে চলে যায়, পুনপুন কার কোলে চলে যায়। লোফালুফি, হ্যান্ডশেক। ম্যাজিকের মতো বেলুন, চটপটি, টফি, লজেঞ্চুষ সব বেরোতে থাকে। অনেক কষ্টে ভিড়ের আদিখ্যেতার হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করে সুযযি বাড়ি ফেরে। যতই বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছয় ততই সুযযির মুখটা কেলে হাঁড়ির আকার-বর্ণ ধারণ করতে থাকে। আমি বেশ ভয় পাই। শেষ পর্যন্ত বাড়ির চৌকাঠ পার হতে না-হতে দুম করে উঠোনের ওপর আমাকে নামিয়ে দিয়ে সুযযি গোমড়া মুখে বলে—'আর কোনওদিন, কোনওদিন যদি আমার খেলার সময়ে মাঠে গিয়েছ তো···।'

তো কী ? সেটা আর জানতে পারি না। কিন্তু অজানা শাস্তির ভয়টাই তো বেশি। এতক্ষণে অপরাধবোধ আমার মস্তিষ্কের মধ্যে থেকে চোখের দিকে আসতে থাকে। আমার জন্যেই যে সুযযির গো-ও-ল মিস হয়ে গেল অন্তরাত্মার কাছে এটা আমাকে স্বীকার করতেই হয়, সুতরাং আমার টিয়ার ডাক্টের জল বেমালুম শুকিয়ে যায়। মুখ আমসি।

ফুটবল সুযযির প্রাণ। খেলা রইল তো তার আর কোনওদিকে জ্ঞান থাকবে না। ফুটবল, ফুটবলের জন্যেই সে তার স্বাস্থ্য তৈরি করেছে, স্ট্যামিনা তৈরি করেছে। পুনপুনকেও সে ছোট্ট থেকে ফুটবলের জন্য তৈরি করতে চায়। পুনপুনটা রোগা। সেই ছোট্টবেলায় ডিপথিরিয়া হয়ে ছেলেটা একটু দুবলা হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে কী ? রোজ ভোরবেলায় মাইলখানেক দৌড়লে, পায়ের মাস্‌ল্‌ তৈরি হয়ে যাবে। পুনপুনের প্লাস পয়েন্ট এদিক থেকে তার মাথা, ঝুনো নারকোলের মতো। আর একটু বড় হোক ছেলেটা! সুযযির খেলা থাকে শুধু দেশবন্ধুর পার্কে নয়, শুধু ময়দানেই নয়, বনগাঁয়ে, রানাঘাটে, কোন্নগরে, ব্যারাকপুরে, শিলিগুড়িতে। সেসব অনেক দূর দেশ-বিদেশ। পুনপুন কল্পনাও করতে পারে না সে কত দূর, কত সুন্দর, কত অন্যরকম। একমাত্র ফুটবল খেললেই এই ধরনের বিদেশ-ভ্রমণ তার আয়ত্তের মধ্যে আসবে। ঝুনো নারকোলের মতো মাথাটা যখন তার আছেই। ইতিমধ্যে লুব্ধ, আতুর দৃষ্টিতে সে সুযযির হ্যাভারস্যাক গুছোনো দেখে। অ্যাংকলেট, জার্সি, শিনগার্ড, বুট···।

ই-দাদার মুখ গম্ভীর, পদ্মদিদির মুখ গম্ভীরতর।

—'আবার যাচ্ছ ?'

—'ক্লাবের খেলা, যাব না ?'

—'থিওরি না হয় পড়ে নিতে পারলে। প্র্যাকটিক্যালগুলো কামাই হলে কে তোমাকে পাস করাবে ? শিখবেই বা কী ? অঙ্কে তো প্রায় গোল্লা পাচ্ছ!'

—'এবারটি, এবারটি যাই দাদা, না গেলে ঝন্টুদা ভীষণ রাগ করবেন, বড় ম্যাচগুলোতেও আর চান্স পাব না।'

—'ভাল। তা তোমার উদ্দেশ্যটা কী ? কী হতে চাও ? গোষ্ঠ পাল ? না ইউ. কুমার ? মনে রেখো তুমি একটা এ-ওয়ান ফুটবল প্লেয়ার হলে আমরা যত খুশি হব, তার চেয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক বেশি গর্বিত হব, একটা এম-এসসি রিসার্চ স্কলার হলে। হও সাধারণ, দারুণ কিছু একটা হতে হবে না।

—'কথা দিচ্ছি, অঙ্কে পাস করবই। দেখো !'

সূযযি মার্টিন ট্রেনে চড়ে এর উঠোন তার দাওয়ার পাশ দিয়ে দিয়ে কোনও মজাদার গ্রামে ফুটবল খেলতে যায়। ফিরে এলে ভাইবোনেরা তাকে ঘিরে বসে।' গল্প হবে। —'বুঝলি অংশু, বুঝলি ঋতি, সে স্যাখ্খাত্তির না ? জমিদার নিজে দাঁড়িয়ে খাওয়াচ্ছে। বাড়ির পাঁঠার মাংসের কালিয়া। জমজমাট রান্না। গরগর করছে একেবারে। এক একখানা লেডিকেনির সাইজ কী ? টেনিস বলের মতো। পাশবালিশের মতো মাটন চপ। কোলবালিশের মতো চিত্রকূট। রুই মাছের ন্যাজার সাইজ কী ?'

—'খেতে পারলে ?'—অংশুর জিজ্ঞাসা।

আমরা ঝোল টানছি। আমি-বুবু-বুনবুন।

—'না পারার কী আছে ?' —অবহেলায় উত্তর ফেলে দেয় সূযযি।

—'এই যে বললে যেতেই এক জামবাটি করে মুড়ি-নারকোল-ফেণী বাতাসা-শিঙাড়া, জিলিপি দিল !'

—'দুধও। প্লাস দুধ'—সূযযি সংশোধন করে।

—'তো তারপরও এত খেতে পারলে ?'—ঋতির জিজ্ঞাসা।

—'আমরা প্লেয়ার। আমাদের কি তোদের মতো গুবরেপোকার পেট ? খাব আর হজম করব। দেদার খাব, দেদার খাটব, লোহাকে লোহা হজম হয়ে যাবে।'

—'তবে হ্যাঁ, এর পর ওরা যা খাওয়ালে না, সেটা হজম করা শক্ত। নেহাৎ অ্যালপাইনের সূর্য সিংহ বলেই পেরেছি।'

—'কী ? কী ?' —আমরা এগিয়ে বসি।

—'পেটো।'

—'পেটো ? পেটো কী খাবার ? কোনও ধরনের পরোটা ?'

অংশু বুঝেছে, অংশু হাসছে মিটিমিটি।

সূযযি বলছে—'ওরা তো পাঁচ গোল খেলো। হেরে ভূত। ওদের সাপোর্টাররা তো তখনই আমাদের এই মারে তো সেই মারে। কোনওরকমে পালিয়ে ট্রেনে চড়েছি। ট্রেন তো যাচ্ছে গরুর গাড়ির মতো। আর ওরা পেটো ছুঁড়ছে। পেটো এক রকমের বোমা। প্রাণ নিয়ে এবারের মতো পালিয়ে আসতে পেরেছি, এই ঢের।'

—'তবু কি তোমার শিক্ষা হবে ?'—ই-দাদা ঠিক শুনেছে।

পালক বলল— 'একটু-আধটু অ্যাডভেঞ্চার ভাল কিন্তু ইন্দ্র।'

পালক, ইন্দ্র, সূর্য সবাই বাড়িতে ধুতি পরত। আর বাইরে পরত ধুতি ছাড়াও থলের মতো ফুলপ্যান্ট। পালক সব সময়ে কাছা দিয়ে পরত। হিরো-হিরো লাগত দেখতে। ইন্দ্রর ঝুলন্ত কোঁচা অর্ধেক করে কোমরে গোঁজা থাকত বাবাদের মতো। আর সূর্য কী করে ধুতি পরত শুনুন। কোঁচাটা ঝুলিয়ে দিল, এবার তলার থেকে কোঁচার খুঁটটা তুলে নিল, এবার সেটাকে কোমরের পেছন দিয়ে বেড় দিয়ে সামনের দিকে একেবারে কোমর-ভুঁড়ির মাঝখানে গুঁজে দিল। এরকম করে ধুতি পরতে আর কাউকে জীবনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখিনি। যে এরকম করে ধুতি পরবে, সারা পৃথিবীতে, হলফ করে বলতে পারি সে পুনপুন-বুনবুন -বুবুদের প্রিয়পাত্র হবে। হবেই হবে। আর ধুতি ছাড়া অন্য কিছু পরে যদি পুনপুনদের প্রিয়পাত্র হতে হয় তাহলে ঝলঝলে খাকি হাফপ্যান্ট পরতে হবে। কারণ ঝলঝলে খাকি হাফপ্যান্ট পরত অংশু।

অংশু আমাদের কী পেছনেই লাগ্‌ত। অদ্ভুত অদ্ভুত সব ভাষা আর আদর ছিল অংশুর। —'শোন শোন শোন' করে সে আমাকে কাছে ডাকবে, তারপরে 'গিজদা গিজুম' করে দেবে। 'গিজদা গিজুম' কী বলুন তো ? হাত দুটো মুঠো পাকিয়ে আমাদের দুই গালের ওপর থেকে নীচে ঘষটে নামাবে। কী প্রচণ্ড লাগত ! কিন্তু ওটাই অংশুর আদর। হয়তো জ্বর হয়েছে, শুয়ে আছি। মুখ লাল। চোখ গরম। মেজাজ খিটখিট করছে। অংশু ঘরে ঢুকল, যেই আড়চোখে তাকিয়েছি অমনি অংশু বক দেখানোর মতো হাতটাকে তুলে, সাপের মতো সেটাকে নাচাবে আর মুখে বলবে—'পুশ, পুশ, পুশ্। আপুনি কি কসসেন ?'

অমনি আমার চিলচিৎকার। সঙ্গে সঙ্গে বাবার সেই বিচিত্র হুংকার। হুংকারের সঙ্গে এবার অবশ্য কিছু বোধ্য শব্দও যুক্ত হয়েছে—'রে অংশু ! !' সঙ্গে সঙ্গে অংশুর পলায়ন। বুবু ছিল অংশুর বিশেষ প্রিয়। আমার যেমন সুযযি, বুবুর তেমন অংশু।

—'বুবু-মেয়েটা, বোবা মেয়েটা' বলে বুবুকে আদর করত অংশু। আর বুবু কাঁদলেই ছড়া কাটতো :

'সে মেয়ে কে চায় বলো কথায় কথায়
আসে যার চোখে জল মাথা ঘুরে যায়'

অমনি বুবুর কান্না বেড়ে যেত, সে আর্তনাদ করে আছাড় খেয়ে পড়ত —'আমাকে কেউ চায় না—।'

সব দাদা-দিদিরা তাকে তখন বোঝাতে বসত—অংশু বাজে কথা বলেছে। সে ছিঁচ-কাঁদুনি হলেও তাকে সবাই চায়।

তখন বুবু বলবে—'আমার মাথা ঘুরে যায় না।' অর্থাৎ কি না সে কেঁদেছে ঠিকই, কিন্তু মাথা ঘুরে যাওয়ার অপবাদটা ঠিক নয়।

দাদা-দিদিরা এবার হাসতে থাকবে।

ই-দাদা হঠাৎ হাসিতে ইস্তফা দিয়ে তড়াং করে উঠে পড়বে—'ধুত, বাচ্চাগুলো সেন্টিমেন্টাল হয়ে যাচ্ছে। কিস্যু হবে না এদের।' ই-দাদা সোজা তীরের মতো শরীর নিয়ে পেছন ফিরে চলে যেতে থাকবে, আর সেইদিকে তাকিয়ে আমার মনে হবে— আর যে হয় হোক আমি কক্ষনও 'সেনিনমেনাল' হব না। কারণ তা হলে আমার কিস্যু হবে না। 'কিস্যু'টা যে আমাদের ভবিষ্যতের ইঙ্গিতে পূর্ণ সেটা আমি অন্তত ভালই বুঝতুম। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাদের যথেষ্টই উচ্চ ছিল। আমার উচ্চাশা সে সময়টায় ছিল হাইড্র্যান্টে মোটা পাইপ লাগিয়ে রাস্তায় জল দেব। কয়েকদিন কাজটা করলেই ওরা নিশ্চয় আমাকে পাইপটা দিয়ে দেবে। তখন কী হবে ?—সপ্তম স্বর্গ লাভ হবে। বুবুর উচ্চাশার পরাকাষ্ঠা সে সময়টায় ছিল অন্ন হওয়া। ওই সব উনুন নিকোনো, ছাই অদ্ভুত কায়দায় ঝেড়ে ঝেড়ে মিহি এবং মোটা আলাদা করে ফেলা, কাঁসার বাসনগুলো ঝকঝকে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে মেজে মুছে বড় থেকে ছোট পরপর সাজানো, এই সব সে অসীম প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখত এবং অন্ন হতে চাইত। অথচ তার মধ্যে এমনই স্ববিরোধ যে অন্ন কোনওদিন কামাই করলে মা যদি সেই প্রশংসনীয় বাসন মাজার কাজটা করতে যেতেন সে রোয়াকে বসে হাপুস কাঁদত—'না মা তুমি এক্ষুনি উঠে এসো। তুমি বাসন মাজবে না।' এমন করে কাঁদত যেন তার বুক ভেঙে যাচ্ছে। মা বিরক্ত হয়ে বলতেন—

—'তা হলে কে মাজবে ?'

—'পম মাজুক।'

—'পম ঠাকুরঘরের কাজ করছে।'

—'টম মাজুক।'

—'টম পড়াশোনা করছে।'

—'বুজবুজ পুটপুট মাজুক।'

—'ওদের বুঝি স্কুল নেই ?'

তখন বুবু বলত—'ঠাকুদ্দা মাজবেন।'

অন্নর বাসন মাজার পিঁড়িতে হুঁকো হাতে বৃদ্ধ ঠাকুর্দাকে কল্পনা করুন।

অবশেষে পালক আর বুজবুজ মিলে মার সঙ্গে হাত মিলোত। পিসিমা রেগেমেগে বলতেন—'ভিরকুট্টি! ঠাকুদ্দা বাসন মাজবেন। ওইটেই এবার বাকি আছে।'

ঠাকুমা হেসে বলতেন—'আহা, মায়ের জন্যে মেয়ের মায়া দেখো !'

বড় মুগ্ধ, বড় করুণ ঠাকুমার হাসিটুকু।

সেদিকে একপলক তাকিয়ে পিসিমা বলতেন—'ভিরকুট্টি !'

তবে অং-দাদার 'ক্লাস' হচ্ছে কান্না। অত বড় ছেলে আবার কাঁদে না কি ? অন্য দাদারা মায়ের খুচরো ফরমাশের আওতার বাইরে। মা খালি অং-দাদাকে হাতের কাছে পান।

—'অংশু, এক পো পোস্ত এনে দে তো !'

অংশু তখন আঁক কষছে। আঁক অংশুর প্রাণ। কয়েকবার ডেকে সাড়া না পাওয়ায় মায়ের গলা এবার রাগত।

—'অংশু, শুনতে পাচ্ছ না ?

—'আমি এখন পারব না !'

—'পারব না ? মুখের ওপর কথা ? দিন দিন অবাধ্য অসভ্য হয়ে যাচ্ছ।' এই 'অবাধ্য-অসভ্য' বিশেষণে বিচলিত হয়ে অংশু পোস্ত এনে দিল। তারপর তিনতলার ল্যাবরেটরি ঘরে চলে গেল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

আমাদের তিনজনের ভীষণ কৌতূহল। চুপিচুপি পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে গোড়ালি উঁচু করে জানলার গরাদ প্রাণপণে আঁকড়ে আমরা দেখবার চেষ্টা করতুম অং-দাদা কী করছে।

টেবিল। সামনে চেয়ার। টেবিলে কনুই রেখে অং-দাদা মুঠি পাকিয়ে চোখের জল মুঠি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মুছছে। 'অবাধ্য-অসভ্য' বিশেষণ অং-দাদার প্রাণে ভীষণ লেগেছে।

অং-দাদার জন্যে করুণায়, মমতায় আমরা দ্রব হয়ে যেতুম। তখন সবে স্নো হোয়াইট বা তুষারকণা, সিন্ডারেল্লা বা ঘুটে কুড়ুনি মেয়ের গল্প শুনেছি। সৎমার কনসেপ্টের সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিচিত হয়েছি। এদিকে সুয়োরানি দুয়োরানি। সুয়োর ছেলে, দুয়োর ছেলেদেরও চিনেছি। আমাদের তিনজনের আলোচনা-চক্র বসত।

আমি বলতুম—'দেখ, মা নিশ্চয়ই অং-দাদার সৎমা। নইলে অমন বকলেন কেন!'

বুবু বলত—'য়্যাঃ, অং-দাদা দুয়োরানির ছেলে। ওর ধুতি নেই, কাবলি জুতো নেই, খালি খাকি প্যান্ট, আর কালো শু জুতো।'

বুনবুন মত প্রকাশ করত—'অং-দাদা একদিন ঠিকই পালিয়ে যাবে। যেতে যেতে যেতে যেতে এক বিরা-ট জঙ্গল। হঠাৎ একটা পক্ষিরাজ ঘোড়া এসে চিঁহি করে পিঠ নিচু করবে। তখন অং-দাদা লাফিয়ে তার পিঠে চড়বে। ঘোড়া তাকে নিয়ে ছুটবে নীচে কত কড়ির পাহাড়, হাড়ের পাহাড়, চুর হয়ে যাবে, তারপরে অং-দাদা ঘুমন্তপুরীতে গিয়ে সোনার কাঠি রূপোর কাঠি বদল করে রাজকন্যাকে জাগাবে, রাক্ষসকে মারবে, সোনার পালক দেওয়া পাগড়ি পরে, জরি দেওয়া জামা পরে, পক্ষিরাজের পিঠে চড়ে রাজকন্যা নিয়ে আমাদের চার নম্বর শিবশঙ্কর মল্লিক লেনের বাড়িতে নামবে।'

—'তুই যাবি?' —বুবু জিজ্ঞেস করত।

বুনবুন একটু থতমত খেয়ে বলত—'কানু গেলে আর দিদিভাই গেলে, আর পুনপুন গেলে যাব।'

দিদিভাইয়ের মতো গুরুজন নিয়ে, এবং কানু ও পুনপুনের মতো ভাগীদার-প্রতিদ্বন্দ্বী নিয়ে রাজকন্যা-উদ্ধারে যাওয়াটা যে যুক্তিযুক্ত নয়, এটা তার মাথায় কে ঢোকাবে?

তবে অং-দাদার সবচেয়ে শ্লাঘ্য কীর্তি তার ম্যাজিক।

একদিন সুযযি আর অংশু ঘোষণা করল তারা আমাদের এক অলৌকিক ম্যাজিক দেখাবে। ল্যাবরেটরির দরজা বন্ধ হয়ে গেল। তিনজনে বাইরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। কিছুক্ষণ বাদে দরজা খুলল। পুটপুট আমাদের টিকিট দিল (ট্রামের টিকিট), বিনিময়ে আমাদের তিনজনকে তিনটি ডবলি দিতে হল। ম্যাজিকের প্রতিটি ডিটেইল বিশ্বাসযোগ্য হওয়া চাই কি না! ঘরে মৃদু সবুজ আলো জ্বলছে। টেবিলটি আপাদমস্তক কালো কাপড়ে ঢাকা (বুজবুজের শাড়ি)। টেবিলের ওধারে অংশু দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এ আমাদের চেনা অং-দাদা নয়। এইটুকুনি বেঁটে হয়ে গেছে। জুতো পরা পা টেবিলের ওপর ন্যস্ত। মুখ কাঁধ সব একই মাপের। কালো কোট (বাবার) পরে আছে, তাঁর হাফপ্যান্টই এখন ফুলপ্যান্ট হয়ে গেছে। টাইও পরেছে। টেবিলের ওপর দাঁড়ানো এক অদ্ভুত অংসাহেবামন (অংশু+সাহেব+বামন)।

আমার বুকটা হু হু করছে অং-দাদার এই পরিবর্তনে। গলার কাছটা ডেলা পাকিয়ে উঠেছে। বুনবুন শক্ত করে আমার হাতের মুঠো ধরে আছে। বুবু যে কখন কালো কাপড় ভেদ করে ওপার দিয়ে ফুঁড়ে উঠেছে কেউই লক্ষ করেনি। তার হেঁড়ে গলার চিৎকারে আমরা চমকে উঠলুম।

—'এই তো অং-দাদার গোটাটা। হাতে আবার জুতো-মোজা পরা হয়েছে,' খিলখিল করে বুবু হাসছে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে তার বিশ্বাসঘাতী শয়তানির পেছনে একটা উদ্বেগ এবং আপাতত উদ্বেগ-মুক্তি কাজ করছিল। তার অং-দাদা যদি অ্যালিসের মতন হঠাৎ ছোট হয়ে গিয়ে আর বড়সড় সাইজ-মতো হতে না পারে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুযযি এবং অংশু এতে ভীষণ রেগে যায়। প্রতিজ্ঞা করে জীবনে কখনও আমাদের ম্যাজিক দেখাবে না। আমরা নাকি ম্যাজিক দেখাবার উপযুক্তই নই। অংশু তার মোজা-টাই এসব টেনে টেনে খুলতে থাকে। বেশ রুষ্ট। কিন্তু পুটপুট হেসে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়ে ; 'ঠিক হয়েছে, ঠিক হয়েছে' বলতে বলতে তার প্রায় চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যাবার জোগাড়। তার এত উল্লাসের কারণ, ম্যাজিকের কেন্দ্রবিন্দু অর্থাৎ বেঁটেটো সে-ই হতে চেয়েছিল। দাদারা তাকে পাত্তা দেয়নি। তা-ই তার এই অন্তর্ঘাতী হাসি।

তবে যতই রেগে যাক, অংশুকে শেষ পর্যন্ত বুবুকে কোলে নিতেই হয়। বুবু সম্ভবত স্বচক্ষে সব ধাপ্পা দেখেশুনেও উদ্বেগমুক্ত হতে পারেনি। অংশুর কোলে উঠে তার দৈর্ঘ্য এবং গোটাত্ব উপলব্ধি করে নিতে চাইছিল।

প্রচণ্ড মজার ছিল অং-দাদা। আপনারা বাজের আওয়াজকে কীভাবে ব্যক্ত করেন ? 'কড় কড় কড়াৎ।' তাই তো ?

অং-দাদা একটা বিশাল বজ্রপাতের আওয়াজকে এইভাবে অনুকৃত করেছিল—'গটাফিল ডামা-ন, গুহুম, ভার্ ভার্ ভার্ ভার্ ভার্ ভার্ ভার্ ভার্।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় অধ্যায়

শীত-বসন্ত

যাই বলো আর তাই বলো, ইন্দ্র তুমি ছিলে আসল জাদুকর। তুমি কিনা দেবহূতি-দুর্গাপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ সন্তান, তাই তোমাকে তাঁরা মনের মতো করে সাজিয়েছিলেন। মাথায় তোমার বিবেকানন্দর পাগড়ি—'হে ভারত ভুলিও না নীচ জাতি, মূর্খ দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি মেথর তোমার ভাই, সদর্পে বলো...মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই,' গায়ে তোমার সুভাষচন্দ্রের মিলিটারি পোশাক তরুণদের সব স্বপ্ন দেখাচ্ছ, রক্তের বদলে স্বাধীনতা এনে দেবে, পায়ে গলিয়েছিলে বিদ্যাসাগরের শুঁড়তোলা ঠনঠনের চটিজোড়া, শিক্ষার জগতে তুমি বিপ্লব আনবে, সমাজজীবনে আনবে সংস্কার-মুক্তির জোয়ার, আর হাতে তোমার তাঁরা ধরিয়ে দিয়েছিলেন আইনস্টাইনের অন্যমনস্ক বেহালা। তোমার হাতে একটা জাদুদণ্ড সেটা ঘোরাচ্ছ আর তোমার চেহারা, তোমার ভূমিকা পাল্টে পাল্টে যাচ্ছে। অন্য সবার ভূমিকাও তো তুমিই ঠিক করে দিতে। কখনও তুমি ভাইবোনেদের যোগাসন ও আরও নানা ব্যায়াম করাচ্ছ। দুর্বল দেহে কিনা বেদান্ত বোঝা যায় না। তোমার তত্ত্বাবধানে সুষযি শরীরটাকে চাকার মতো ঘোরাতে ঘোরাতে হাতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে চলে যাচ্ছে। অংশু পিকক হয়ে হাতে ভর দিয়ে দু' হাত চলেই দাঁড়িয়ে গেল, পমদিদি টমদিদি পদ্মাসন করে মিনিটের পর মিনিট বসে আছে। পালক বসেছে উবু হয়ে। বুজবুজ, পুটপুট টকটক করে দু'দিক থেকে তার কাঁধে উঠে পড়ে পরস্পরের দিকে হেলে গিয়ে হাত ধরাধরি করল। এইবার পালক আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াচ্ছে। হাততালিতে ফেটে পড়ছে ছাত। দি গ্রেট সিংঘিবাড়ি সার্কাস।

পিসিমার অসুখ করেছে। তুমি আর পমদিদি মাকে সাহায্য করছ। তোমার তৈরি মেনু আজকে টিক্কর আর অড়হর ডাল। দুই হাতে উল্টে পাল্টে মোটা মোটা টিক্কর গড়ছ তুমি, উবু হয়ে বসে। মা সেঁকছেন। মার মুখ ভীষণ সিরিয়াস, টিক্করের প্রতি সুবিচার করতে হবে তো? এঁচড়-ফুলকপি-মটরশুঁটির মাতৃকৃত আচার নিয়ে ঢুকলো বুজবুজদিদি। সবাইকার আসন হয়েছে, টিক্কর গরম গরম খেতে হবে, আচার আর অড়হর ডাল দিয়ে। আমাদের অবশ্য সনাতন ভাত-মাছ আছে। তবু আমরা টিক্করের জন্যে হা-পিত্যেশ করে বসে থাকি।

—ঠিক আছে, দেওয়া হবে, না খেলে কিন্তু দেখবে মজা!

মজা দেখতে আমরা রাজি। টিক্করের ভাঙা কোণা, চার ভাগের এক ভাগ করে আমাদের পাতে পড়ে। ঘন অড়হর ডাল একটু করে।

পোড়া পোড়া গন্ধটা চমৎকার লাগে, কিন্তু দাঁতে কাটতে পারি না জিনিসটা আমরা। বুবু ফিসফিস করে বলে—অড়র ডাল কী রম রে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি (ফিসফিসিয়ে)—বিচ্ছিরি। আর টিক্কর?

বুবু ইশারায় দেখায় সে টিক্করের টুকরো কীভাবে থালার তলায় চালান করে দিয়েছে। আমিও অবিলম্বে তাই করি। ধরা পড়ে যাই। আমাদের মজা দেখাবার আগেই মা একটি ছোট্ট মন্তব্য করেন—'অন্যদের থালার তলাগুলোও একটু দেখো ইন্দ্র।' ইন্দ্র মায়ের দিকে তাকায়। মা কি হাসছেন? উঁহু! মা কখনও হাসতে পারেন! তাঁর বিদ্যাসাগর ছেলে টিক্কর গড়েছে! ঠাকুর্দাদার তালতলার চটির আওয়াজ পাওয়া যায়। তিনিও একখানা টিক্কর চেয়ে নিয়েছেন, 'খাসা হয়েছে তোর টিক্কর, তবে আমার চলবে না, বুঝলি ইন্দ্র!' আমরা ভাবি ঠাকুর্দাকেও মজা দেখাবার কথা বলছে না কেন ই-দাদা? এ ভারি অন্যায় কিন্তু! এক যাত্রায় পৃথক ফল হবে কেন?

কোনও কোনও ভোরবেলায় সকাল সকাল ঘুম ভাঙলে ছাতে গিয়ে আমরা দেখতুম সারি সারি মাটির মুণ্ডু শুকোচ্ছে। বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সরস্বতী, অসুর, কালী। ই-দাদা আর পালক মিলে গড়েছে। মুণ্ডু এখন শুকোচ্ছে। রাত্রে একটা স্বপ্ন খুব দেখতুম, ই-দাদার কাছে দেব-দেবীরা যুদ্ধ করতে আসছেন আর ই-দাদা তাঁদের মুণ্ডু কচাকচ কেটে ফেলেছে।

ইন্দ্র, তোমার সুড়সুড়ি খাওয়ার কথা মনে আছে? তুমি কেমন উপুড় হয়ে সটান শুয়ে পড়তে, আমরা মাছির মতো তোমার চারপাশে ভনভন করতুম! তুমি গল্প বলবে বলে!

সুরুলের ধানক্ষেতের আল দিয়ে তুমি যাচ্ছ এমন সময় বিপিনবাবুর সঙ্গে দেখা। ছাতা হাতে আল ফুঁড়ে ওপরে উঠে এসেছেন। পড়বি তো পড় একবারে ইন্দ্র সিংহের মুখোমুখি। আমতা আমতা করছেন বিপিনবাবু।

—'তুমি চিনতে বিপিনবাবুকে, ই-দাদা? আগে থেকে চিনতে?'

—'বিপিনবাবুকে চিনব না? বিপিনবাবু রে? আমাদের বিপিনবাবু!'

—'কোন বিপিনবাবু?'—আমরা কোনও বিপিনবাবুকে মনে করতে পারি না। আমাদের সুড়সুড়ির আঙুল থেমে যায়। ইন্দ্রর গপ্পোও থেমে যায়।

—'সেই যে সে-ই বিপিনবাবু!'

গল্প এগোচ্ছে না দেখে এবং বিপিনবাবুকে না চিনতে পারার দরুন ই-দাদার হাসির খোরাক হচ্ছি দেখে বলি—'ও হ্যাঁ হ্যাঁ সেই বিপিনবাবু। বিপিনবাবু তো?'

ই-দাদার হাসিটা একটু বেড়ে যায়, কেন কে জানে, কিন্তু গল্প এগোয়। বিপিনবাবু কিছুতেই ইন্দ্রকে কাটাতে পারেন না। অবশেষে তাকে নিয়ে যান আলের তলায় তিনি যে পৃথিবীব্যাপী সুড়ঙ্গ তৈরি করেছেন তার মধ্যে। লাল কার্পেট দেওয়া সুড়ঙ্গে নামলে তোমাকে আর চলতে হবে না, সুড়ঙ্গই চলবে। তারপর তুমি পৌঁছে যাবে আজব দেশে যেখানে কল খুললে কমলালেবুর রস পড়ে, নদীর সামনে দাঁড়ালেই নৌকা এসে ঘাটে ভেড়ে, দেশটা ছোট ছেলেমেয়েদেরই দেশ। কত রকম খেলনায় ভরা।

—'মা নেই ই-দাদা? বাবা নেই ওখানে?'

—'কাদের?'

—'ওই ছেলেমেয়েদের?'

—'কেন? বাবা-মা চাই?'

বাবা মা চাই আবার কী? ছেলেমেয়েরা কি বাবা-মা বিনা থাকতে পারে? এ আবার কেমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশ্ন?

বুবু বলে—'চাই।'

বুনবুন বলে—'দিদিভাইও চাই।'

—চাইলেই বাবা-মা-দিদিভাই সব পাওয়া যাবে, তবে তার সঙ্গে সঙ্গেই দাদা-দিদি, কানমলা, চড়চাপড়, এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা সব এসে যাবে, স-ব। আর সঙ্গে সঙ্গে দেশটা ঠিক এই দেশটার মতো হয়ে যাবে।

কী অদ্ভুত উভয় সঙ্কট আমাদের! আজব এক ইচ্ছাপূরণের দেশও চাই, আবার বাবা-মা-দিদিভাই এইসব সম্পর্কের মাধুর্যও চাই। কিন্তু একটা হলে অন্যটা পাওয়া যাবে না। নাও এবার কোনটা নেবে! অঢেল স্বাধীনতা, অতুল ঐশ্বর্য, বিলাস, সমবয়স্ক বন্ধুবান্ধবের সাহচর্য আর মজা—এক দিকে, আর এক দিকে স্নেহ-শ্রদ্ধা-নানা সম্পর্কের স্বাদ, এক রকমের অধীনতা কিন্তু আশ্রয়ও। শাসন কিন্তু শিক্ষাও। ই-দাদা কি জেনেশুনে জীবনের এই মৌলিক উভয় সঙ্কটের মাঝখানে আমাদের দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল? তখনও ঠিক করতে পারিনি এই দেশ ছেড়ে বিপিনবাবুর সুড়ঙ্গপথে ঢুকব কি না, আজও পারি না। ই-দাদা, দুটো কি কিছুতেই একসঙ্গে পাওয়া যায় না? আচ্ছা, আজ পর্যন্ত কি কেউ চেষ্টা করে দেখেছে? সত্যি-সত্যি চেষ্টা?

—হ্যাঁ, ব্যাসদেব নামে ভদ্রলোক মানে লেখক চেষ্টা করেছিলেন।

—কেমন চেষ্টা? কোথায়?

—ওই তো, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর ওঁর নায়করা ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী-কুন্তী-বিদুর এঁদের সঙ্গ এবং যা চাইছিলেন সেই রাজত্ব, অতুল ঐশ্বর্য, ভাইয়েদের আনুগত্য, সহযোগিতা, প্রজাদের সন্তোষ একসঙ্গে পাননি?

—কিন্তু এই পাওয়া আর বারণাবতের জতুগৃহ থেকে পালিয়ে দিশি-দিশি ছদ্মবেশে ঘোরার সময়ে কুন্তী আর তাঁর পঞ্চপুত্রের যে নিবিড় বন্ধনের দিন—তা কি আর ফিরে এল? ভেবে দেখো পাণ্ডবদের এই সহজতঃসুখ বারবার ছলনা করে কেমন ফিরে গেছে! ইন্দ্রপ্রস্থের দিনগুলোয় একবার পেলেন। কিন্তু রাজসূয় যজ্ঞের যে পরিকল্পনা তা-ও কি একটা ঔদ্ধত্য নয়? এই ঔদ্ধত্যই তো সর্বনাশ ডেকে আনল। আসলে, ঐশ্বর্য আর সুখ পেলেই আমরা তার বিজ্ঞাপনে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। কী দরকার ছিল দুর্যোধনের মতো হিংসুক মানুষকে উপহার-সামগ্রী গ্রহণ সংরক্ষণের ভার দেওয়ার? সৌহার্দ্যের ছলে এ কি যন্ত্রণা দেওয়া নয়?

—সে যাক গে। রাজা-রাজড়াদের ও সব করতেই হয়, রাজসূয়-টুয়? এর সঙ্গে আমাদের সাধারণ মানুষদের জীবনের তো মিল নেই? কোথায় যুধিষ্ঠির-ভীম-ভীষ্ম-অর্জুন-দুর্যোধন আর কোথায় পুনপুন-বুনবুন-ই-দাদা-বুবু-দিদিভাই...?

—না, না, ভাই মন দিয়ে দেখো ভাবো, আমরা অনেকেই একটা জঙ্গলাকীর্ণ, রুক্ষ-অনুর্বর খাণ্ডবপ্রস্থ পাই, তাকে ইন্দ্রপ্রস্থে পরিণত করবার পরই রাজসূয় যজ্ঞে আমাদের পেয়ে বসে, আর তত্ত্ব দেখবার জন্যে আমরা দুর্যোধনদের খুঁজে খুঁজে বার করি।

—আচ্ছা, ঠিক আছে। তো কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর তো ওঁরা পেয়েছিলেন সেই সমূহসুখ!

—ওকে কি পাওয়া বলে? বংশলোপ, আত্মীয়বধের দায়ভাগ? দিবারাত্র শোক আর পাপবোধ বহন করা! কোন আগুনে পুড়ে মরলেন ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী-কুন্তী-বিদুর? সে কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্যিই দাবানল? না জীবনযন্ত্রণার আগুন? পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীর মহাপ্রস্থান? সে তো সুখ-শান্তি-আনন্দ সব কিছু অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাওয়ার গল্প? সমস্ত পার্থিব সুখ—শারীরিক, মানসিক, ঔপকরণিক একেবারে বিস্বাদ হয়ে যাওয়ার গল্প! পরমার্থের সন্ধানে যাত্রা, কেন? এত কাণ্ডের পরেও সব প্রাপ্তি নিরর্থক লাগে বলে! এই অন্তিম বিষাদযোগ থেকে ওঁদের তো কেউই আর বাঁচাতে পারল না। একে একে পড়ে যাচ্ছেন, শিথিল সত্তা সমর্পণ করছেন চূড়ান্ত অবসাদের হাতে, একমাত্র যুধিষ্ঠিরেরই এখনও আছে যন্ত্রণাভোগের সামর্থ্য, তিনি নরক দেখেন, অন্যরা একেবারে নিঃসাড়, আধিদৈবিক তুষারে জমাট শবদেহ সব।

ই-দাদা, তোমার গল্প যে এমন জীবনবাসনার রূপকে দাঁড়াবে তা কি তুমি নিজেই বুঝেছিলে? বুঝেছিলে?

ইন্দ্র আর পুলককে ছায়া-কায়া বলা হত। কে যে কায়া আর কে যে ছায়া বলা শক্ত। ভক্তি বলত ওরা সেই রূপকথার গল্পের শীত-বসন্ত। ওদের বোধহয় মাঝে মাঝেই ভূমিকা বদল হত। পুলক/পালক যে আমাদের নিজের দাদা নয় এ কথা যে কেউ কানে ধরে বলে দিয়েছিল এমন নয়। কিন্তু কীভাবে ভাগলপুরে পালকের বাবা অত্রিবাবুর সঙ্গে আমার বাবা দুর্গাপ্রসাদের ভাব হয়, তারপর কী করে আবিষ্কৃত হয় অত্রিকুমার দুর্গাপ্রসাদের আপন মামাতোভাই, দু'জনে তখন কী রকম কোলাকুলি করেন, ইন্দ্র এবং পুলক সে সময়টা কুস্তি করতে কী রকম ব্যস্ত ছিল—এ গল্প আমাদের পারিবারিক পুরাণ যা বহুবার শুনলেও আমাদের বিরক্তি আসে না, কিন্তু অন্যদের আসতে পারে। আমাদের ধারণা ছিল সব পরিবারেই একজন পালক থাকে, যে নাকি আপন দাদা নয়, কিন্তু দাদারই মতো। কারও বাড়িতে গিয়ে আমরা যদি সে-বাড়ির পালককে আবিষ্কার করতে না পারতুম তা হলে এত অবাক হয়ে যেতুম যে সে আর বলার নয়। বাড়িতে এসে আমাদের তিনজনের মধ্যে আলোচনা হত—'কী অদ্ভুত জানিস, দেবাশিসদের কোনও পালক নেই।'

AMARBOI.COM

বুবু তাতে বলত—'য্যাঃ!' অর্থাৎ একেবারেই অবিশ্বাস্য বলে কথাটা উড়িয়েই দিত।

চৌত্রিশ সালের কুখ্যাত ভূমিকম্পে ভাগলপুরে অত্রিকাকাবাবুদের বাড়ি তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছিল। পালক তখন আমাদের বাড়ি পিঠে খেতে এসেছিল, তাই বেঁচে যায়। পালকের ছোট বোন ও মা বাড়ি চাপা পড়ে তৎক্ষণাৎ মারা যান। অত্রিকাকাবাবু আহত অবস্থায় হাসপাতালে কিছুদিন বেঁচেছিলেন, সে সময়েই তিনি বাবা-মাকে পালকের ভার নিতে অন্তিম অনুরোধ করেন। পালককে তাই আমরা জন্ম থেকেই আমাদের একজন বলে দেখে আসছি। পালকের নাকি এক থলি গিনি ছিল। আমাদের কোনও ভাল কাজে উৎসাহিত করবার প্রয়োজন পড়লেই পালক আমাদের তার গিনির লোভ দেখাত।

—'ভাল করে কুচকাওয়াজ করো, তা হলে একটা গিনি দেব।

—'যে সবচেয়ে আগে কালমেঘের রস খেয়ে নিতে পারবে (সারা জীবন) তাকে আমি উইল করে গিনি দিয়ে যাব।'

এখন, গিনি মানে যে সোনার মোহর—এ আমরা জানতুম না। আমাদের পরিধিতে গিনি বলতে বোঝাত আমাদের পাড়ার একটি মেয়ে যার রঙ খুব ফর্সা, এবং যার নাক দিয়ে সব সময়ে সর্দি ঝরত। তাই গিনি যা-ই হোক, তার ওপর আমাদের তেমন আকর্ষণ ছিল না। এ কথা পালকের জানবার কথা নয়। তাই আমাদের কুচকাওয়াজ বা কালমেঘ খাওয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোটিভেশন যে কেন বেশ শক্তিশালী ও ফলদায়ী হচ্ছিল না তা সে বুঝতে পারত না।

আমরা তিনটে বোকা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতুম—'গিনি আমাদের চাই না, বল! নাকে শিকনি, বিচ্ছিরি!'

পালকের গিনি আর পাড়ার মেয়ে গিনি যে এক নয়, সেটুকু আমরা বুঝতুম। কিন্তু দুটোর মধ্যেই একটা শিকনি-জাতীয় নোংরা ব্যাপার রয়েছে—এমনই ছিল আমাদের অস্পষ্ট ধারণা।

পালক যে আলাদা, এটা বড়দের ব্যবহার থেকেও স্পষ্ট বোঝা যেত। ঠাকুর্দা যেন তাকে একটু সমীহের চোখে দেখতেন, একটু দূরের থেকে কথা বলতেন। আর ঠাকুমা তো সবার থেকেই একটু দূরের মানুষ। পিসিমার সঙ্গে পালকের আবার বড্ডই আড়াআড়ি। সুযোগ পেলেই পালক পিসিমার পেছনে লাগত। পিসিমাও তার সমুচিত জবাব দিতেন। যেটা আমাদের কাছে সৎমা না হোক সৎ-পিসিমাসুলভ ব্যবহার মনে হত। আর মা-বাবার ব্যবহারে ছিল অঢেল প্রশ্রয়। ওঁরা যেন সব সময়ে তটস্থ হয়ে থাকতেন পাছে পালকের কোনও অযত্ন হয়। আত্মীয়স্বজন যারা জানে না তাদের কাছে তাঁরা পালকের পরিচয় দিতেন সুবোধ ঘোষের 'সুজাতা'র সেই বিখ্যাত বাক্যবন্ধের আদলে—'ছেলে নয়, কিন্তু ছেলেরই মতো।' বস্তুত আমার বাবা-মা এই ব্যাপারে ছিলেন সুবোধ ঘোষ মহাশয়ের পূর্বসূরী।

বাবারা যখন ভূমিকম্প বিধ্বস্ত হয়ে সুরুলে গিয়ে স্থিত হলেন তখনও বোধহয় পালকের সম্পর্কে মন স্থির করতে পারেননি। পরের ছেলের দায়িত্ব! কী ভাবে পালন করবেন? তাঁদের ছেলেমেয়েরা তাঁদের ওপর নির্ভরশীল হলেও পুলক তো তা নয়, তার বাবার রেখে-যাওয়া টাকাকড়ি কিছু আছে। তাঁরা ভেবে-চিন্তে তাকে শান্তিনিকেতনেই দিলেন, চরিত্র খারাপ হয়ে যাওয়ার ভয় থাকা সত্ত্বেও। ছেলেটির চরিত্র-রক্ষার প্রশ্ন বড় না আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী তার লালন-পালন বড় এটা নিয়ে বাবা-মা বেশ দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। ফলে আট বছরের কাছাকাছি সময় পালক শান্তিনিকেতনে শিক্ষার সুযোগ পেয়ে গেল। সে নাকি একেবারে বদলে যায়। ছিল ভীষণ দস্যি, পাজির পাঝাড়া যাকে বলে, উপরন্তু আদুরে। শান্তিনিকেতন থেকে ফেরে খুব স্বনির্ভর হয়ে। দুষ্টু, কিন্তু আর দস্যি নয়। উপরন্তু আরও কিছু বিশেষ গুণের গুণী হয়ে ওঠে। তা সত্ত্বেও বাবারা যখন কলকাতায় চলে এলেন, তাকে নিয়েই এলেন। কেননা তাকে কলেজে পড়তে হবে, তার বাবার মতো এঞ্জিনিয়ার হতে হবে। তার বাবা আজকালকার অর্থে এঞ্জিনিয়ার ছিলেন না অবশ্য। হাতে-কলমে কাজ করে করেই তিনি 'সাহেব'দের নেকনজরে পড়ে বেশ পদস্থ হয়ে উঠেছিলেন। শিবপুর কলেজে ছেলেকে এঞ্জিনিয়ারিং পড়াবার বাসনা তিনি হয়তো দুর্গাপ্রসাদের কাছে ব্যক্ত করে গিয়েছিলেন। আমরা জন্মে থেকেই শুনছি পালক পুল তৈরি করবে, কারখানা তৈরি করবে, পালক ময়দানবের বংশধর।

কিন্তু আই এসসি-তে প্রায় ডিগবাজি খেয়ে পালক যখন নিজে নিজেই আর্ট কলেজে ভর্তি হয়ে এল তখন বাবা-মা ভয়ানক ধাক্কা খেয়েছিলেন। তাঁদের ছেলে ইন্দ্র জলপানি পেয়েছে, এদিকে বন্ধুর অনাথ ছেলেটির এই রেজাল্ট? তাঁরা কি তাঁদের কর্তব্যে অবহেলা করেছেন?

কারও কাছে কৈফিয়ত যেন তাঁদের দিতেই হবে। বাবা কাঁচুমাচু মুখ করে ঠাকুর্দাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলছেন—'এমন কেন হল বলুন তো! নিয়মিত টিউটরের কাছে গেছে। অঙ্কে উইক, তা ইন্দ্র তো সমানে হেলপ করেছে!'

ঠাকুর্দা—'ঘোড়াটাকে তুমি পুকুর অবধি নিয়ে যেতে পারো দুগ্‌গি, জলটা তো জোর করে খাওয়াতে পারো না! পারো? তা ছাড়া...'

—'তা ছাড়া কী?'

—'বড্ড আশকারা দিয়েছ। ভেবে দেখো, নিজের ছেলেপিলেকে যতটা শাসন করেছ, ওকে কি তা করেছ? বাজার যাবে কে?—ইন্দ্র। ফরমাশ খাটবে কে?—সুযযি। কেন? পুলক নয় কেন? যে পরিবারে রয়েছে তার জন্যে ওকে কিছু করতে দেবে না কেন? টিউটর রইল কার? না, পুলকের। এগুলো ঠিক নয়।'

—'আপনি বলছেন শুধু সেই জন্যেই ওর হল না?'

—'তা নয়। তবে এটা একটা কারণ বটে। মাথা নেই। বোঝাই তো যাচ্ছে।'

পালক যে ভাল আঁকতে পারত এটা বাবারা জানতেনই না। তবে ছোট্ট থেকেই পালক আমাদের আঁকত। কার্টুন ছবি। দেখে সবাই হেসে গড়াত। আমরা যখন পেনসিল ধরতে শিখলুম তখন সে আমাদের আঁকা শেখাত। কুমড়োর ফালি সোজা করে রাখলে হাসিমুখ। আর উল্টো করে রাখলে গোমড়া মুখ হয়। আড়চোখে তাকানোর জন্যে গুলি এঁকে তার ডান দিকে কিংবা বাঁ দিকে একটুখানি করে ভরাট করে দিতে হয়। ট্যারা চোখ যদি চাও তো গুলির মুখোমুখি জায়গা দুটো ভরাট করো। খাঁদা নাকের জন্য দুটো ফুটকিই যথেষ্ট। খাড়া নাক হলে একটা সোজা লাইন দু চোখের মাঝখান দিয়ে নামাতে হবে, এ সব পালক আমাদের শেখায়। কুচো কাগজে লেড পেনসিল দিয়ে ঘিজিঘিজি করে ঘষতে হবে তারপর তাই দিয়ে আঁকার কাগজে ঘষলেই ভোর কিংবা সন্ধে হয়ে যাবে। এবার ওপরে একটা গোল সূর্য এঁকে দিয়ে রবার দিয়ে সূর্য থেকে ভোরের ঘিজিঘিজি অন্ধকারের মধ্যে পর্যন্ত সোজা পুঁছতে হবে। তা হলেই সূর্যের আলো পৃথিবীতে এসে পড়েছে বোঝা যাবে। দূর থেকে দেখা নারকেল গাছ আঁকবে? তো একটা দাঁড় লাইন আঁকো, তারপর ওপরটায় কাটাকুটি করে দাও এ-ও পালকেরই শেখানো পদ্ধতি। আরও অনেক কায়দা শিখিয়েছিল পালক, তা সমস্ত আর দেখানো যায় না! তাই ইচ্ছে থাকলেও কলম সংবরণ করলুম।

তবে আমাদের ছবি পালক যা আঁকত, সে একেবারে ফাস্টো কেলাস। কাগজের পাতায় বুবুর মুখটা পুরো ফুটে উঠল ধরুন। তার থোকা-থোকা চুল, খুদে-খুদে চোখ, খাঁদা নাক, আর ফুটো পয়সার মতো ঠোঁট সমেত। আমি ফুটে উঠলুম টলগুলির মতো চোখ, মাঞ্জা দেওয়া খাড়া চুল, খণ্ড ৎ-এর মতো কান নিয়ে, বুনবুন ঠিক আমার মতো, খালি তার চুলগুলো বেশ মেরে পাট করে দেওয়া, চোখের দৃষ্টির মধ্যে আমার যদি নিরীহ নিরীহ ভাব, তো বুনবুনের চোখ দিয়ে উঁকি মারছে ফিচলেমি। ক্যারিকেচার আঁকতো পালক দু চার টানে, কিন্তু পোর্ট্রেটও সে আঁকবে। তার জন্য তার দাবি টুলে বসে, বা জানলার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। তবে আমরা বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে বা বসে থাকবার ধৈর্য দেখাতে পারতুম না, বসতে না-বসতেই আমাদের মশা কামড়াত, হাত-পা সুড়সুড় করত, উল্টো দিকে কী আছে দেখতে ইচ্ছে হত, ফলে আমাদের ছবি অসম্পূর্ণই থেকে যেত। কিন্তু বুজবুজদিদি তো বড় হয়ে গেছে। সে তো আর মিছিমিছি উসখুস করবে না। তাই তার একটা আশ্চর্য ছবি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এঁকেছিল পালক। সুদ্ধু পেনসিল স্কেচ। সেই ছবিটা দেখলেই বোঝা যেত বুজবুজদিদি 'তুমিও একাকী আমিও একাকী' গান গায়, খড়কে ডুরে শাড়ি পরে, আচার খেতে ভালবাসে আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছাতে বেড়ায়।

পালক যখন জানাল সে আর্ট কলেজে ভর্তি হয়ে এসেছে, তখন বাবা একটু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন—'তোমার কি ছবি আঁকার অভ্যেস-টভ্যেস আছে না কি?'

আসলে, এটাই হল শান্তিনিকেতনের সেই বিশেষ গুণ। পালকের ছবি-আঁকার ক্ষমতাটাকে বাইরে টেনে বার করা, নিজেকে চিত্রকর বলে চিনতে পারার শক্তি জাগানো। জিনিসটাকে গুরুত্ব দেওয়া। তা নয়তো, ইন্দ্রও তো মূর্তি গড়ত, সে তো শিল্পী হবার কথা স্বপ্নেও চিন্তা করেনি! পড়াশোনার বাইরের জগৎটা তার কাছে তো ছিল নেশার জগৎ, হবি-র জগৎ। সূর্যর ফুটবলকেও সে এক কথায় উড়িয়ে দিয়েছিল, বুজবুজের গানকেও। শান্তিনিকেতনে রবি ঠাকুরের ইস্কুলে রবি ঠাকুরের সেই শেষ বয়সের দিনগুলোতে পড়বার সুযোগ পেলে ই-দাদা তুমি কি অন্যরকম হতে?

পালক এবার বুজবুজের ছবিটা বাবাকে দেখায়। দেখে বাবা হতবাক হয়ে বলেছিলেন—'তুমি এমন পোর্ট্রেট আঁকতে পারো? এ যে ফটোগ্রাফের চেয়েও সত্যি।'

পালক তার স্কেচখাতাটা টেনে নেবার চেষ্টা করলেও বাবা জোর করে পাতা উল্টে গেলেন। নুড ছবি। নানা ভঙ্গিতে। পুরুষ এবং নারীর। ঠাকুর্দাও দেখছিলেন। বাবা গম্ভীরভাবে খাতাটা পালকের হাতে দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। পালক বলল—'আঁকা শিখতে গেলে হিউম্যান অ্যানাটমি মানে ফর্ম শিখতে হয় কাকাবাবু।'

বাবা কিছু বললেন না।

ঠাকুর্দা বললেন—'উচ্ছন্নে যাবার পথটি খুলে গেল। কেউ আর আটকাতে পারবে না।'

যে পালকের মুখে সর্বদা খই ফুটত, তাকে একেবারে কাঁচুমাচু দেখে আমরা ছোটরা খুবই অবাক হই।

পালক আর ইন্দ্র প্রায় প্রতি শনিবারই সিনেমা দেখতে যেত। সাধারণত ইংরেজি। টার্জান, ড্রাকুলা, কাউবয়েদের নিয়ে ধুন্ধুমার ছবি সব। কিন্তু মাঝে মধ্যেই তারা হিন্দি দেখতেও যেত। দেখতে গিয়ে তারা মুকেশ, মধুবালা ও লতার ফ্যান হয়ে পড়ে। কী জানি কী ছবি দেখে এসে তারা একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত 'মহল'। মধুবালার বিউটি দু'জনকেই নির্বাক-করে দিয়েছিল। তারপর লতার গান। ইন্দ্র তার দৃঢ় মত জানায়—বিয়ে যদি করতেই হয়, তবে মধুবালার মতো কাউকে, সে রকম যেহেতু পাওয়া যেতে পারে না, তাই মধুবালাকেই। পালকও ভাগ্যিস মধুবালাকেই হৃদয় অর্পণ করেনি। তার মত ছিল লতা, লতা মঙ্গেশকর নামধারী সেই স্বর্ণকণ্ঠী, নাইটিঙ্গেল কণ্ঠীকেই সে বিবাহ করবে। মধুবালা এবং লতা যথাক্রমে ইন্দ্র ও পালককে গ্রহণীয় বলে মনে করলেন কি না এ চিন্তা এদের মাথায় একবারও আসেনি। ব্যোমকেশ ইন্দ্র, কালো ফ্রেমের চশমা পড়া, ভীষণ সিরিয়াস পড়ুয়া-পড়ুয়া মুখ, গালে কয়েকটা বয়ঃব্রণের ফেলে-যাওয়া দাগ, সকাল-সন্ধে যোগাসন করে—পার্ফেক্ট পদহস্তাসন, চক্রাসন, যোগনিদ্রা, আকর্ণ ধনুরাসন ইত্যাদি—তাকে মধুবালার পাশে স্থাপন করুন! মধুবালাকে তো তার পর দিনই পড়তে বসতে হত, ফিজিক্স-কেমিস্ট্রির টেক্সট বুক, অন্তত পক্ষে নেসফিল্ডের গ্রামার, ম্যাকমর্ডির ইডিয়ম, পড়া না পারলেই ডান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতের তর্জনীর সেই চড়াত করে চড়! আর পালক? পালক নিশ্চয় লতার প্রত্যেকটি গানের প্যারডি করে তাঁর কান ঝালাপালা করে দিত। সেই স্বর্ণকণ্ঠী অষ্টাদশীর সঙ্গীতসম্রাজ্ঞী হওয়া আর হয়ে উঠত না। স্রেফ বিরক্ত হয়েই তিনি গান ছেড়ে দিতেন। এইভাবে ঈশ্বর মধুবালা ও লতাকে রক্ষা করেন। কত শত ইন্দ্র, কত শত পালকের হাত থেকে ঈশ্বরই জানেন।

তবে আমাদের প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ আলাদা। আমাদের সৌন্দর্যবোধের আওতায় মধুবালা আসতেন না। আমার কাছে অন্তত সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা ছিল—এক নং—টিয়াদি। টিয়াদির গায়ের রঙ কালো, বাঁ দিকে সিঁথি কাটা, চৌকো চেহারা, ঠোঁট জোড়া প্রায় আকর্ণ বিস্তৃত। ইনি ছিলেন ঠাকুমার কোনও ভাইঝি। বিবাহিতা। মাঝে মাঝে পিসির কাছে থাকতে আসতেন। টিয়াদি এলেই বাড়িতে সেলাই-ফোঁড়াই-এর ধুম পড়ে যেত। পায়ের বুড়ো আঙুলে টান টান করে পাড় বেঁধে, সেই পাড়ের সুতো বার করা হত। কাঁথা সেলাই হবে। ছাঁটাফুলের আসন তৈরির পাঠ নিত বুজবুজ-পুটপুট। অনেক লাছি উল গুটোনো হত, তাই দিয়ে দিদিরা আমাদের সোয়েটার করবে—টিয়াদিদি এসেছে। সাবুদানা, জোড়াসাপ, ছাতা, পাখা, বরফি এবং আরও অনেক জটিল প্যাটার্ন তার কণ্ঠস্থ, মুখস্থ।

আর একজন ছিল পাঁকুদি। পাঁকের মতো নরম বলে পাঁকু। পাঁকুদি ছিল অবিনাশজেঠুর মেজ মেয়ে, যার বিবাহে আমরা বরযাত্রী যাই। বিয়ের কনের সাজে তুলতুলে নরম ধবধবে ফর্সা প্রায় ভুরুহীন, কটা-কটা চোখ, একেবারেই ফর্মলোপা পাঁকুদি আমাদের চোখে ছিল অপ্সরীতুল্য। অর্থাৎ রঙ, চেহারা, চোখ-নাক-মুখ এ সবের ওপর আমাদের সৌন্দর্যবোধ নির্ভরশীল ছিল না মোটেই। সত্যি কথা বলতে কি কোনও নতুন বউকে দেখেই আমার অর্থাৎ পুনপুনের অদম্য বিয়ের ইচ্ছে হত। আমার বড়মামার বিয়েতে আমরা উপস্থিত থাকিনি কিন্তু সেই মামিমা যখন বারোঘরে থাকতে এলেন তখন তিনি কাকে খাইয়ে দেবেন আমাকে না বুনবুনকে এ নিয়ে আমাদের মধ্যে বেশ প্রতিযোগিতা পড়ে যেত। শেষে মামিমা আর কী করেন এক থালায় ভাত মেখে দুজনকেই খাইয়ে দিতেন।

‘উচ্ছে ভাজা পটল পুরি
দই তো খুরি খুরি
সন্দেশ তো ভূরি ভূরি
এখন মাছ গোটা দুই পাই
তো কপকপিয়ে খাই।’

এই মতো ছিল মামিমার ছড়া। মামিমার চুড়ি-বালা-কাঁকন-পরা হাতের গরস খাবার লোভে আমরা দু' ভাই উচ্ছেও খেয়ে নিতুম, পাকা পটলের প্যাটপেঁটে পেট খেতেও আপত্তি করতুম না। নতুন বউয়ের এমনি ছিল মোহ। মধুবালা-টালা আমাদের কাছে পাত্তা পেত না।

তবে হ্যাঁ 'আয়গা আনেবালা' গানের কথা সম্পূর্ণ আলাদা। এই গান যদি কোথাও বাজত, বিশেষত সিনেমা বাক্সওয়ালাদের চলন্ত গাড়িতে, অর্থাৎ দূর থেকে কাছে এগিয়ে আসছে, আবার দূরে চলে যাচ্ছে তিনটে 'আয়গা'—এই ভাবে, তা হলে আমরা তিনজনে যে যেখানে আছি পড়ি-মরি করে ছুটে যেতুম, ছাতের পাঁচিলের নীচের ধাপে পা রেখে বিপজ্জনকভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুণ্ডু বাড়িয়ে দিতুম, কেননা আমাদের ধারণা ছিল, এই গানে নেতাজির আগমনবার্তা ঘোষিত হচ্ছে। এ গান মন্ত্রস্বরূপ। পুরোহিত যেমন পুজোর জলে, ঘটে সর্বত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবতাকে আহ্বান করেন 'অস্মিন জলে সন্নিধিং কুরু', 'ইহাসনে সন্নিধিং কুরু' বলে লতা তেমনি নেতাজিকে ডাকছেন। তিনি আসবেনই, আসবেনই, আসবেনই—এই আনন্দবার্তা জানাচ্ছেন। এবং ওই অপূর্ব মধুর মোহময় 'আগমনী' ব্যর্থ হবার কোনও প্রশ্নই নেই। 'আয়গা আনেবালা' বহু দূরে চলে গেলে যখন বাতাসেও আর সে সুরের রেশ থাকত না, তখনও আমরা তিন 'তেমজ' নেতাজির আবির্ভাবের আশায় রাস্তার শেষ বিন্দু, যেখানে আনন্দ লেন নবকৃষ্ণ স্ট্রিটে মিশেছে, সেই বিন্দুর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতুম। আরও আরও আরও ঝুঁকে পড়লে পালক কিংবা ইন্দ্র কিংবা সূর্য আমাদের টেনে নামাত। সকলেই ধরে নিত গান, গানের জাদুই আমাদের এমন করে টানছে। কাউকে আমরা জানতে দিতুম না আমাদের টানছে একটা নাম, একটা আশা যার স্বরূপ আমরা বুঝিই না। আমাদের রক্তে, আমাদের হৃদয়ে অজান্তেই আমরা বহন করছি এই ত্রিখণ্ড উপমহাদেশের জনসাধারণের আশা-ভরসা।

কিন্তু ইন্দ্র-পালকের আসল কেরামতি ছিল 'ঘরোয়া' আর 'কেয়া'। আইডিয়াটা হয়তো পালক শান্তিনিকেতন থেকেই পেয়েছিল। বলতে পারব না। 'ঘরোয়া' হল একটি মাসান্তিক বৈঠক; যাতে ঠাকুর্দা থেকে আরম্ভ করে বুনবুন পর্যন্ত সব্বাইকে উপস্থিত থাকতে হবে। এবং কিছু না-কিছু করতে হবে। বয়ঃক্রম অনুসারে নয়। যার যখন ইচ্ছে হবে, আজকালকার ভাষায় অ্যাংকর হত দাদা-দিদিরা পালা করে। ইন্দ্র, ঋত্বিক, ঋদ্ধি ভক্তি পর্যন্ত। এই 'ঘরোয়া'তেই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে স্মার্ট বুনবুন একদিন হঠাৎ লাফিয়ে উঠে আবৃত্তি করল—

'ঠাকুর্দা গো ঠাকুর্দা
তোমার ছেলে আমার বাবা
তোমার বাবা আমার বাবার ঠাকুর্দা।
দিদিমা গো দিদিমা
তোমার মেয়ে আমার মা
তোমার মা যে আমার মায়ের দিদিমা।'

তখন বুবু তার ফ্রক ছড়িয়ে বসে দু হাত জোড় করে প্রবল হেঁড়ে গলায় গাইল—

'প্রভু রাখিও মনে
করিলে স্মরণ'—ইত্যাদি ইত্যাদি

সেই গানের এফেক্ট বুনবুনের কবিতার চেয়েও মজার হয়েছিল। সব্বাইকার মুখ চাপা হাসিতে উদ্ভাসিত হয়েছিল। সেই উদ্ভাসন ক্রমশই দাঁত-বের-করা এবং কারও কারও উচ্ছ্বসিত হাসির ক্লাইম্যাক্সে পরিণত হয়, যখন আমি আমার স্বভাবসরু গলায় গাই—

'ভালোবাসা মোরে ভিখারি করেছে তোমারে করেছে রানি-ই।'

সব্বাই শেষ পর্যন্ত হাসিতে ফেটে পড়লে গান থামিয়ে আপাদমস্তক লাল হয়ে আমি পালাবার উপক্রম করলে ঠাকুমা আমাকে খপ করে ধরে কোলে বসিয়ে নেন, এবং আমার মুখটি নিজের কোলে গুঁজে—'চমৎকার গান করেছ দাদা, থামলে কেন?' বলে আমাকে সান্ত্বনা দিতে থাকেন।

পালকের আঁকা এবং বুজবুজের হাতের লেখা 'কেয়া' পত্রিকা অবশ্য অনিয়মিত বার হত। ভক্তি বা টমদিদি ছিল তার সম্পাদিকা। সহ-সম্পাদক অংশু। বুজবুজের রোমাঞ্চকর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোয়েন্দাকাহিনী 'সুনীল সিরিজ' 'কেয়া'তেই বার হয়। অংশুর 'অদ্ভুতুড়ে'গুলোর প্রকাশকও 'কেয়া'। সুযযির 'সত্যি অ্যাডভেঞ্চার' ঠাকুমার 'ছোটবেলার স্মৃতি', পমপমের উপনিষদের অনুবাদ এবং টমটমের রোম্যান্টিক কবিতা ছিল 'কেয়া'র বিশেষ আকর্ষণ। পুটপুট লেখে 'কর্তা-গিন্নি'র মজাদার কাহিনী, ইন্দ্রকে প্রচুর সাধাসাধি করে লেখা বার করতে হত, তার একটা কিম্ভূত ছড়া ছিল এই রকম:

'ফড়েপুকুরের ধা-রে
বসে থাকে ফ-ড়ে
মাথাও যা মুণ্ডুও তা
বকের কেন হল ছাঁ
বক দেয় তা
তাই তো হল ছাঁ।'

এর চেয়ে বেশি তার কাছ থেকে বার করা মুশকিল ছিল। বেশি চাপাচাপি করলে এটুকুও দেবে না।

পরে 'কেয়া'র পরিচালনা ও সম্পাদনা আমাদের ওপর বর্তায়। তবে সে পরের কথা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চতুর্থ অধ্যায়

তৃণাবর্ত

স্বাধীনতা-দিবসে, অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট, সন্ধে-রাত্তিরে দুর্গাপ্রসাদের ছেলে পাবন হারিয়ে যায়। এর আগের বছর কলকাতা শহরে এক ভয়ঙ্কর দাঙ্গা লেগেছিল, সবাই জানেন। আত্মরক্ষার জন্য সব বাড়িতেই ছাতে ইটপাটকেল জড়ো করা হতে থাকে। ছোট্ট পাবনও ইটপাটকেল জড়ো করছিল। বারণ করলেও শুনছিল না। শুধু পাবন কেন? তার যমজ বোন বিদ্যা ওরফে বুবু আর ভাই বরুণ ওরফে বুনবুনও সোৎসাহে হাত লাগিয়েছিল। তবে এদের এক এক জনের মনোযোগ ছিল এক এক বিষয়ে। যেমন, বুবু ব্যস্ত ছিল নাচা-কোঁদা করতে, বুনবুন লাঠি-তীর-ধনুক প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র ক্ষেপণে নিযুক্ত ছিল। ইটপাটকেল কুড়োনোয় সবচেয়ে নিবেদিত ছিল পাবন। কত বিভিন্ন আকার ও আয়তনের ক্ষেপণাস্ত্র সে সংগ্রহ করেছে, তাদের রং এবং গুণাগুণ কী তার একটা হিসেবও সে রাখছিল। হঠাৎ তার হাত-পা খুব জ্বালা করতে থাকে। সে 'জ্বলা-জ্বলা' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে তার বুজবুজদিদির কাছে আবেদন জানায়। তখন দেখা যায় তার হাতের পাতা, পায়ের পাতা বেশ কেটেকুটে গেছে। তার দাদা সুয-যি বাবার নির্দেশমতো ক্যালেন্ডুলার মলম লাগিয়ে তাকে শুইয়ে দেয় এবং পাবন প্রচুর পরিশ্রমজাত ক্লান্তি ও 'জ্বলা'-র আরাম হওয়ায় অবিলম্বে ঘুমিয়ে পড়ে।

মাত্র একদিন আগেই তাঁর ত্রিপ্রেতটের জন্মদিন গেছে। ঠাকুরকে পুজো দিয়ে পরমান্ন ভোগ দেওয়া হয়েছে। আর সেইদিন থেকেই এমন রক্তারক্তি কাণ্ড? চতুর্দিকে সন্ত্রাস! দুর্গাপ্রসাদের মন খুব খারাপ। পেছনে দু হাত দিয়ে পায়চারি করছিলেন তিনি। মাত্র কিছুক্ষণ আগেই একটু ঘুরে-ঘেরে এসেছেন। দেখেছেন সাধারণ নিরীহ ভদ্র পরিবারের কোমলমতি তরুণ দলও কীভাবে প্রাণের ভয়ে, খুন করতে বাধ্য হয়ে রক্তের-স্বাদ-পাওয়া নেকড়ের বাচ্চায় পরিণত হচ্ছে। এই সময়ে ঘুমন্ত পুত্রের দিকে তাঁর নজর পড়ে। মায়ের বুকের কাছে ছোট্ট বালিশে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে পাবন। মাথা এক দিকে কাত, চোখের জল গালের ওপর শুকিয়ে মুখখানি শীর্ণ দেখাচ্ছে। দু হাত দু দিকে ছড়ানো। একটি মায়ের বুকের ওপর, আর একটি পার্শ্ববর্তী বালিশে। পা দুটি কিন্তু জড়ো করা। হাতের তালুতে, পায়ের পাতার ওপরে রক্ত ফুটে রয়েছে তুলোর ওপর দিয়ে।

দুর্গাপ্রসাদ ইশারায় এই দৃশ্যটির দিকে স্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। স্ত্রী শিউরে উঠে বললেন— 'যা দেবার সব দিয়েছ তো?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'লেডাম পল দিচ্ছি, টিট্যানাসের ভয় নেই।'

—'কী জানি বাবা, চারদিকে যা পচা মড়া, বাতাসে কত কি রোগের জীবাণু ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

ডাক্তার ভাবুক মানুষ। ধর্মপ্রাণ। সেই ধর্ম যার খোঁজে মহাভারত হন্যে হয়ে গিয়েছিল। এক দিকে বিজ্ঞান বাস্তব, অপর দিকে পুরাণ অতিবাস্তব দুইয়েরই কেমন অদ্ভুত একটা মিলমিশ রয়েছে তাঁর বিশ্বাসে। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। যা তিনি স্ত্রীকে দেখাতে চেয়েছিলেন, স্ত্রী তা দেখতে পাননি। মহামায়ার অংশ এরা। অপরকে যেমন, নিজেকেও তেমনি ভুলিয়ে রাখতে কি এদের জুড়ি আছে? মাতা মেরীর ইম্যাকুলেট কনসেপশনে তাঁর বিশ্বাস নেই। যিশু মেরী-যোসেফের বিবাহপূর্ব-প্রণয়কালীন সন্তান। যিশুর জন্মের এমন ব্যাখ্যাই তিনি মানেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী যে গর্ভাবস্থায় নূপুরধ্বনি শুনতেন, চন্দনগন্ধ পেতেন তা কি তিনি ভুলে গেলেন? এই তো সেই সময়! চতুর্দিকে অরাজকতা, ঘৃণা, নৃশংসতা, মানুষ আর মানুষ নেই, রক্তলোলুপ হিংস্র দানবে পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্রের ভাগ্যবিধাতাগণ স্বার্থান্ধ। রোমের অধীনতায়, ইহুদি ভুলে গেছে তার জাতীয় ঐতিহ্যের শুদ্ধতা। এই সময়েই তো মসিহা আসেন। ধনী সাদ্দুকি, ফরিসিদের ঘরে তো নয়। সামান্য ছুতোরের ঘরে। ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক, জমিদারের ঘরে নয়, সাধারণ গ্রাম্য পুরোহিতের ঘরে জন্মেই তো গদাধর পৃথিবী জয় করেছেন! পড়তি বংশ, সংগ্রাম, যাতনা, কারাগার ... এই তো তাঁর আবির্ভাবের প্রেক্ষাপট? 'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত! ...' এই ধর্ম কোনও আনুষ্ঠানিক প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম তো নয়! কৃষ্ণ তো বলেননি এই দেবতা কী ওই দেবতার পূজা করছে না বলে কেউ উচ্ছন্নে যাচ্ছে! তিনি স্থিতপ্রজ্ঞর কথা বলেছিলেন। যোগস্থ হওয়ার কথা বলেছিলেন। সে সময়ে ইন্দ্র, সূর্য, অগ্নি ইত্যাদি শক্তির পরোৎকর্ষকে শ্রদ্ধা করত ভারতের মানুষ। কিন্তু এঁরাও তো বলে দিতে পারতেন না কখন কী করণীয়! এঁদেরও কেউ পরম বলে মানত না! পরাক্রান্ত, কিন্তু পরম নয়। ধর্ম বলে এক অস্পষ্ট দেবতার কথা 'মহাভারত' বলেছে, কিন্তু তাঁর পুত্র বলে পরিচিত যুধিষ্ঠিরকে বারবার দাঁড় করিয়ে দিয়েছে উভয় সঙ্কটের সামনে। মিথ্যা বলিয়েছে, ক্ষমা করেনি সেই মিথ্যা। ক্ষমা করেনি তো কৃষ্ণেরও অপরাধ! মিথ্যাচরণ করতে বাধ্য করেছে তাঁকে। সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য মিথ্যাচরণ। এন্ডস এবং মিনসের মধ্যে সামঞ্জস্যের সেই চিরায়ত প্রশ্ন তুলে ধরেছে, অভিশাপ দিয়েছে কৃষ্ণকে, কৃষ্ণের বংশকে! বিদুর, যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ, কৃষ্ণা, অর্জুন, গান্ধারী এঁদের সবার চোখ দিয়ে, মস্তিষ্ক ও হৃদয় দিয়ে 'মহাভারত' ধর্ম খুঁজেছে। কোন মহাসংকটে কী করা উচিত। প্রচলিত আইন বড় না বিবেক বড়? গোষ্ঠী বড় না মনুষ্যত্ব বড়? অধিকার বড় না কর্তব্য বড়? এত বড় দ্বন্দ্ব, এমন দুর্মীমাংস্য উভয়সঙ্কটের কথা কে আর কবে কোথায় বলেছে?

সত্য কথা বলো তো মুসলমান, যখন পাকিস্তান চাও তোমার মধ্যে দীর্ঘদিনের মুঘল-তুর্কি শাসকের দৃঢ়মূল সংস্কার কাজ করে না? ১৮৫৭-র বিদ্রোহেও তোমাদের অশক্ত শেষ মুঘল বাহাদুর শা'র কথাই মনে হয়েছিল, কেন? এ কি সেই মুঘল সাম্রাজ্যবাদেরই তলানি অহমিকার হুংকার নয়? লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান? এ তো 'বিনাযুদ্ধে নাহি দিব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচ্যগ্র মেদিনী'রই রকমফের! গান্ধী তুমি কি যুধিষ্ঠির? লক্ষ্য এবং উপায়ের শুদ্ধতায় নিঃসংশয় হয়ে এসেছ এবার? বল্লভভাই তুমি গোঁয়ারগোবিন্দ ভীম বটে, আর নেহরু? তুমি কি এখনও রয়ে গেলে দ্বিধাগ্রস্ত, অস্ত্রভীরু অর্জুনের ভূমিকায়? তা হলে এই মহাভারতে কৃষ্ণ কোথায়? কোনও বিবর্তিত কৃষ্ণ, যার লক্ষ্য থাকবে উপায় ও লক্ষ্যের সুষ্ঠু সামঞ্জস্যবিধান করা? কৃষ্ণ এখন জার্মানিতে, জাপানে, রাশিয়ায়, ইতিমধ্যে কপটদ্যূতে বাজি রাখা হচ্ছে বাংলা-পঞ্জাবের ভাগ্য। তবে কি ওই 'সম্ভবামি' একটা অনুপ্রাণিত দিব্য মুহূর্তের ভবিষ্যদ্বাণী নয়? সৎ-সাহস জোগাবার একটা ভঙ্গিমাত্র? না কি বেমালুম আত্মম্ভরিতা?

কিন্তু একটা কথা। 'মহাভারত'-এ তো জনগণের কোনও ভূমিকা ছিল না! তাদের রাজা যা করবে, তাদেরও তাই করতেই হবে। তারা নারায়ণী সেনা, দুর্দান্ত মার্সিনারি সৈন্য দল, তারা সংশপ্তক-সুইসাইড-বম্বার। বিরাট বিরাট সমরযজ্ঞে তারা হয়তো সরবরাহক, সেবক, হয়তো ভেরীবাদক। নানা কাজে নিযুক্ত, কিন্তু যুদ্ধটা রাজস্বার্থের জন্যই। দুর্যোধনের রাজত্বেও তারা সুশাসনে ছিল, যুধিষ্ঠিরের রাজত্বেও তারা সুশাসনেই থাকবে। নীতির বিশেষ কোনও বদল হবে না। কিন্তু এ উপমহাদেশ তো এখন আর কারও পিতার সম্পত্তি নয়? যে মুহূর্তে দেশ স্বাধীন হবে, প্রত্যেক ব্যক্তি যে যেখানে দাঁড়িয়ে সে অন্তত সেইখানে স্থিত হবার অধিকার যদি না পায়, তা হলে স্বাধীনতা কী? কার স্বাধীনতা? আমার বাপের বাড়ি কিশোরগঞ্জে, কত পুরুষ ধরে এখানে আমার বাস, হঠাৎ ও মূর্খ সাহেবের এক কলমের খোঁচায় আমি উৎখাত হব? আমার নাম আসাদুল্লা, মুর্শিদাবাদে মুর্শিদকুলী খানের সময় থেকে বাস করে আসছি, আজ জিন্নাসাহেব বলবেন—'এসো, এসো, এই করাচিতে না হোক ঢাকা-বিক্রমপুরেই তোমার জন্যে দুধ-ভাত রাখা আছে।' হায় এই শান্তিপ্রিয় মহামূর্খদের প্রতিনিধির দরকার হয়। কে আত্মপ্রতিনিধি, আর কে অপর সকলের প্রতিনিধি বোঝবার কোনও উপায় থাকে না। তাই নেতা আসে, আর নেতা এলেই ভিন্ন চেহারায় ফিরে আসে রাজতন্ত্র, গোষ্ঠীতন্ত্র, পুরোহিততন্ত্র।

শায়িত পাবনের ভঙ্গিতে ও চেহারায় ক্রুসবিদ্ধ যিশুর আদল দেখেও দুর্গাপ্রসাদের শুধু মসিহার একাদশ আবির্ভাবের আশাই হতে লাগল। ক্রুসের আশঙ্কার দিকটা তিনি তলিয়ে ভেবে দেখলেন না। আর সেই পাবন যখন ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট সন্ধে-রাত্তির হারিয়ে গেল, তখন তিনি কপালে করাঘাত করে স্বাধীনতাকে অভিশাপ দিতে লাগলেন। স্বাধীনতা তাঁর যিশুপ্রতিম পুত্রকে কেড়ে নিয়েছে।

ঘটনাটা ঘটেছিল এইরকম।

দুর্গাপ্রসাদের স্ত্রী আবদার ধরলেন চারদিকে কেমন উৎসব হচ্ছে দেখতে যাবেন। সকাল-সকাল রান্না-বান্না সেরে বাচ্চাদের খাইয়ে বার হতে হবে। বেশ কিছুক্ষণ উৎসব দেখে ফেরা। কিন্তু দুর্গাপ্রসাদের মত হল না। তিনি রাগত কণ্ঠে বললেন— 'তোমার কি ভীমরতি হল? এর নাম স্বাধীনতা? ছিঁড়ে কেটে দেশটাকে তিন টুকরো করে, নিরীহ মানুষগুলোর রক্তে রক্তগঙ্গা বইয়ে স্বাধীনতা? স্বাধীনতা মাই ফুট। নেহরু হ্যাজ ফেইলড আস, গান্ধী হ্যাজ ফেইলড আস। তিনি অনশন করতে পারতেন না? আমাদের সবাইকে অনশনের ডাক দিতে পারতেন না? এমন কি সুভাষবাবুর ওপরও আমি আর আস্থা রাখতে পারছি না। যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুভাষবাবুকে আমি চিনতুম, তিনি এমন হেরে যাবার পাত্র ছিলেন না। হয় তিনি সত্যি মারা গেছেন, নয়তো ইংরেজ তাঁকে লোপাট করে ফেলেছে। এদিকে এরা সবাই মিলে স্বাধীনতার নামে আমাদের একটি অশ্বডিম্ব উপহার দিয়েছে। এর আবার উৎসব? জলুস? আমি এর মধ্যে নেই।'

স্ত্রী বললেন— 'সে তুমি যাই বলো, মানুষের জীবনে এরকম দিন একবারই আসে। যাব না?'

তিনি হঠাৎ কী রকম স্বাধীনা স্বাধীনা হয়ে গেলেন। দিদিমণি ও সেজমাকে সঙ্গে নিলেন। ঋতি-অংশু দু ভাইবোনকে সঙ্গে নিলেন। বড়দের কাউকে বললেন না, সাধলেন না। পাবনকে নতুন চাকর খড়ধারীর কোলে দিয়ে মুগার ধাক্কা-দেওয়া লালপাড় শাড়ি পরে বেরিয়ে গেলেন।

চতুর্দিকে আলোয় আলো, বাড়ির ছাতে ছাতে তেরঙা পতাকা উড়ছে। বাজি পুড়ছে। দলে দলে লোক আনন্দে মত্ত হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে আর যাকে পাচ্ছে, বিশেষ করে ধুতি-পরারা ফেজটুপি দেখলেই আর ফেজটুপিরা ধুতি-পরা দেখলেই আলিঙ্গন করে আনন্দাশ্রু বিসর্জন দিচ্ছে।

মনো বললেন— 'ভিরকুট্টি! এমন ন্যাকা জাত আর দুটো নেই দুনিয়ায়।'

মনোমোহিনী বললেন— 'আমায় বেলেঘাটায় নিয়ে চলো বউমা, আমি মহাত্মাকে জিজ্ঞেস করে আসি একবার— এ তিনি কেমন করে বরদাস্ত করছেন। নোয়াখালি তো তিনি স্বচক্ষে দেখে এসেছেন।'

শাশুড়ি-ননদকে সামলাতে দেবহূতি একেবারে নাজেহাল।

মাঝে মাঝেই খোলা ট্রাক ভর্তি দলকে দল হইহই করতে করতে যাচ্ছে। গোলাপজল বর্ষিত হচ্ছে পথচারী জনতার ওপর। লাড্ডু বিতরণ করছে কোনও ট্রাক। কোনও ট্রাক হাতায় করে খিচুড়ি পরিবেশন করতে করতে যাচ্ছে।

—'পুনপুন দ্যাখ, কী সুন্দর স্বাধীনতা লেখা হয়ে যাচ্ছে হাউইয়ে!' কই পুনপুন? খড়ধারীই বা কই? প্রচণ্ড ভিড় রাস্তায়। যথাসাধ্য খোঁজাখুঁজি হল। পাবন সমেত খড়ধারী উধাও। রাস্তার মাঝখানে দেবহূতি দাঁড়িয়ে পড়লেন। 'পাবনকে না নিয়ে আমি আর এক পা-ও যাব না। তিনি কাঁদো-কাঁদো মুখে বললেন। পেছনে হেদুয়ার জলে আলো ঝলকাচ্ছে, বিডন স্ট্রিটের বাড়িতে বাড়িতে আলো জ্বলছে-নিবছে। ঋতি অংশু খোঁজাখুঁজি করছে। দুই মনো থমথমে উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে। বিবেকানন্দ রোডের দিক থেকে উদভ্রান্ত খড়ধারীকে আসতে দেখা গেল।

—'কী রে খড়ধারী? পুনপুন কোথায়? ছোট খোকন?'

খড়ধারী ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলল— 'গাড়ি ... গুড়া।'

অর্থাৎ সে গাড়ি এবং ঘোড়া দেখেছে। দেখে বিহ্বল হয়ে গেছে।

—'খোকন কোথায় রে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন খড়ধারী বলল— 'হইছ্বে।' কী যে হয়েছে তা বোঝা গেল না।

স্বাধীনতা দিবসের উৎসব দেখে আত্মবিস্মৃত খড়ধারীকে অবশেষে যখন স্মৃতিতে ফিরিয়ে আনা গেল, তখন জানা গেল খোকন অর্থাৎ পুনপুন অত্যন্ত শয়তান, ভিড় দেখে খড়ধারী তো তাকে কোলে নিয়েছিল, কিন্তু সে কিছুতেই কোলে থাকতে চায়নি, নেমে হাত ধরে হাঁটছিল। তারপর খড়ধারী এই মাত্রই হৃদয়ঙ্গম করেছে যে খোকন তার সঙ্গে নেই।

অংশু তাদের সেইখানে দাঁড় করিয়ে রেখে (কেননা তার মা নড়বেন না) পুনপুনকে খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে বাড়ি গিয়ে বাবাকে সঙ্গে করে ফিরে এল। দুর্গাপ্রসাদ হাত-পা কামড়াতে লাগলেন এই ভিড়ের মধ্যে এদের খড়ধারীর ভরসায় ছেড়ে দেবার জন্য। মেয়েদের সব বাড়ি ফিরতে বলে তিনি স্থানীয় থানায় খবর করতে গেলেন। থানার বড়বাবু তাঁকে বসিয়ে রেখে একটার পর একটা থানায় টেলিফোন করতে লাগলেন। একটি বছর চারের ফর্সা ছেলে, পরনে সেলরস্যুট, মাথার পেছনের চুল খাড়া-খাড়া, কোথাও জমা পড়েছে কিনা। কোনও খবরই পাওয়া গেল না। রাত এগারোটা নাগাদ হা-ক্লান্ত, উদ্বেগে মৃতপ্রায় হয়ে বাড়ি ফিরলেন দুর্গাপ্রসাদ। পাবন যেন কর্পূরের মতো উবে গেছে। একটা দুরন্ত হাওয়া, একটা টর্নেডো যেন সবার মাঝখান থেকে শিশুটিকে শুষে নিয়ে গেছে।

সারা রাত ঘরে আলো জ্বালা। ভোর হলেই আবার থানায় ছুটতে হবে। হাসপাতালে খোঁজ চলছে এখন। ডি রতন স্টুডিওয় মিছিমিছি থামের পাশে মিছিমিছি সিঁড়িতে দাঁড়ানো পুনপুনের সাম্প্রতিক একমাত্র ফটোটি পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ফটোটি অবশ্য তার একার নয়, তিন ভাই-বোনেরা বুবু-পুনপুন-বুনবুন। পুনপুনকে টিকমার্কা করে দেওয়া হয়েছে। কেননা বুনবুনের সঙ্গে তাকে গুলিয়ে ফেলা খুবই সম্ভব।

পুনপুন অত্যন্ত লাজুক ছেলে। মুখচোরা। ভিড়ভাড় সে পছন্দই করে না। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। লোক দেখলে লুকোয়। কী হবে! বিশেষত ওই গাড়ি! ট্রাক! হিস্টিরিক মানুষের উচ্ছ্বসিত ভিড়। ভোর চারটের সময়ে আবার থানায় চললেন দুর্গাপ্রসাদ, সঙ্গে ইন্দ্র, পুলক। পুনপুনের মা বুবুকে বুকে জড়িয়ে মড়ার মতো শুয়ে আছেন। অসুস্থ মেয়েকে ফেলে আনন্দ করতে গিয়েছিলেন সেই পাপেই এই শাস্তি। মেয়ে তো থেকেও নেই, ছেলেও ...। তিনি আর ভাবতে পারেন না।

বৈঠকখানা থানায় একটি বাচ্চা জমা পড়েছে। না, ফটোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়নি এখনও। ইন্দ্র বলল— 'বাবা, আপনি বাড়ি যান, আমরা দেখছি।'

পাঁচটা নাগাদ বাড়ির গলিতে ঢুকে বুক ধড়াস করে উঠল। চার নম্বরের সামনে একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে। দরজা খোলা। কম্পিতবক্ষে ভেতরে ঢুকে দেখলেন, সেজমা আর বাবা সামনে দাঁড়ানো। তাঁর বাবা। তিনি বাবার খোকন। বাড়িসুদ্ধু সব উঠোনে ভেঙে পড়েছে। সদ্য-ঘুম-ভাঙা পুনপুনকে একজন যুবকের কাছ থেকে কোলে নিচ্ছেন দেবহূতি। এক দল যুবক। এরা পার্ক সার্কাসের ছেলে সব। আনন্দ করতে বেরিয়েছিল। ছোট্ট ছেলেটিকে একা-একা রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে দেখে নিজেদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ট্রাকে তুলে নেয়। তারা যে-যে রাস্তা দিয়ে গেছে চেঁচিয়ে ছেলেটির কথা ঘোষণা করতে করতে গেছে। বিডন স্ট্রিট দিয়ে কর্নওয়ালিসে বেরিয়ে তারা শ্যামবাজারের মোড় পর্যন্ত যায়, তারপর সার্কুলার রোড ধরে মৌলালির মোড় হয়ে ধর্মতলা ঢোকে। চৌরঙ্গি থেকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল পর্যন্ত আবার যায়। মাঝে তারা ছেলেটিকে ক্যাভেন্টার্সের দুধ খাইয়েছে, কে সি দাসের রসগোল্লা খাইয়েছে, জলি চ্যাপ আইসক্রিম খাইয়েছে। খোকা দিব্যি খেয়েছে।

বাবার নাম জিজ্ঞেস করতে খোকা বলে— দুগ্‌গি। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সে তার মায়ের ভালো নাম দেবু এবং খারাপ নাম— বউমা তাও জানায়। বুবুর যে অসুখ করেছে, গলায় ব্যথা বলে ভালো করে কথা বলতে পারছে না। গেলাসকে 'গেয়াল' এবং কাগজকে 'কাজক' বলছে এ তথ্যও সে উদঘাটন করেছে। আরও জানিয়েছে বুনবুন দিদিভাইয়ের কাছে থাকে এবং দাদাভাইয়ের নাম শিববাবু। খালি ঠিকানা জিজ্ঞেস করলে সে চার নম্বর আর বারো নম্বর ছাড়া কোনও তথ্য দিতে পারে না। এই ভোরবেলায় এক ঘুম দিয়ে নেবার পর তার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে শাংপুকুর আর শিবংকর মালিক লেন। ছেলেগুলি তাই শ্যামপুকুর এলাকায় খুঁজতে খুঁজতে এই ঠিকানা শেষ পর্যন্ত পেয়ে গেছে। তারা সার্টিফিকেট দিয়ে যায় ছেলেটি খুব সাহসী, স্মার্ট, বুদ্ধিমান। দু-একবার কাঁদবার উপক্রম করেছিল ঠিকই, কিন্তু কাঁদেনি।

লোক দেখলেই খাটের তলায় নুকোনো পুনপুন সাহসী? স্মার্ট? আশ্চর্যের কথা বটে! তবে বাড়িসুদ্ধু সব্বাই এবার হৃদয়ঙ্গম করে তাদের বাচ্চারা বাড়ির ঠিকানা জানে না, ঠিকানা কাকে বলে তা-ও ভালো করে জানে না। অথচ কত কী-ই তো তাদের জানা আছে। ইংরেজ রাজত্ব করছিল, চলে গেছে, জাতীয় পতাকায় তিনটে রং আছে— কমলা, সাদা, সবুজ, মাঝখানে অশোক রাজার চক্র থাকে, ষোলো আনায় এক টাকা হয়, চার পয়সায় এক আনা, স্বাধীনতাকে বলে ইনডিপেনডেন্সডে ইত্যাকার কত কী জানে এই বাচ্চারা। খালি নিজেকে পরিচিত করবার অত্যাবশ্যক তথ্যগুলোই জানে না।

AMARBOI.COM

এবার যথাযথ প্রশিক্ষণের ধুম পড়ে যায়।

—'তোমার নাম কী?'

—'পাবন-পুনপুন সিংঘ।'

—'বাবার নাম কী? পুরোটা বলো।'

—'দুগগাপ্রসাদ সিংঘ।'

—'কোথায় থাকো?'

—'চার নম্বর শিবংকর, না, না, শিবশংকর মল্লিক লেন, পি.ও শ্যামপুকুর, থানা— শ্যামবাজার, কলকাতা—চার।'

—'বাইরে লোককে কি মায়ের নাম বলবে?'

—'না।'

—'কে দিদিভাইয়ের কাছে থাকে, কার অসুখ করেছে এসব খবর কি দেওয়ার দরকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে?'

—'না।'

—'ঠাকুর্দাদার নাম কী?'

—'ডক্টর শিবপ্রসাদ সিনা।' অর্থাৎ বাবা সিংঘ, কিন্তু ঠাকুর্দাদা সিনা।

—'বাবা কী করেন?'

—'মিষ্টি-ডাক্তারি।'

—'তার মানে? ঠাকুর্দা কী করেন?'

হোমিওপ্যাথির অভিধা যদি মিষ্টি-ডাক্তারি হয়, অ্যালোপ্যাথির অভিধা তা হলে হওয়া উচিত— তেতো-ডাক্তারি। কিন্তু পুনপুনের উত্তর হল—

—'হুঁকো খান।'

—'চমৎকার!'

ঠাকুর্দাদার সারা সকাল রুগি দেখা, সারা বিকেল রুগি দেখা সবই তার নজর এড়িয়ে গেল। শুধু মাঝে মধ্যে হুঁকো-খাওয়াটুকুই সত্য হয়ে রইল। অন্য কোনও কর্মই আর রইল না তাঁর। তিনি সত্যি-সত্যিই এক হুঁকোমুখো হয়ে রইলেন শ্রীমান পুনপুনের রিপোর্টে।

এইভাবে পুনপুন/পাবন স্বাধীনতা দিবসে হারিয়ে যায়, ফিরে আসে, স্মার্ট হতে আরম্ভ করে এবং বাস্তব জীবন সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞান সঞ্চয় করে। সে যে বিপদে পড়লে ভয় খায় না, নিজের ব্যক্তিত্ব হারায় না, যেটুকু সংবাদ তার গোচরে আছে জানাতে পারে, এবং হারানো মায়ের জন্য উদ্বেগে খাওয়া-ঘুম বন্ধ করে একটা স্নায়বিক সমস্যা তৈরি করে না, এটা পরিবারের কারও কারও কাছে আশাজনক মনে হল। যেমন ঠাকুর্দা-ঠাকুমা। দাদারা দোলাচল। দিদিরা উদ্বিগ্ন। পিসিমা গালে হাত দিয়ে বললেন— 'যার-তার হাত থেকে দুধ খেলে, মিষ্টি খেলে, দিব্যি ঘুমোলে, এ তো সব্বোনেশে ছেলে গো! যতি বলো কেন তো বদলোকের খপ্পরে পড়লে, সে লোক মন্দ কিছু খাওয়ালে? এ ছেলেকে তো ছেলে-ধরা ধরলো বলে!'

ঋতির তখন মনে পড়ে অল্পতর বয়সে পুনপুন ছেলেধরাদের কাছে যাবে বলে বায়না ধরেছিল। শুধু সব্বোনেশে নয়, কিম্ভুত ছেলে এই পুনপুন। সমস্ত ব্যাপারটা একটা পারিবারিক গল্প হয়ে রইল। একটু-আধটু রং চড়তেও আরম্ভ করল। যেমন আনন্দ লেনের বস্তির লোকেরা শ্রীমতী অন্নর মুখে একটি রোমহর্ষক কাহিনী শোনে, কীভাবে পুনপুনখোকা একদল ডাকাতকে তার মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে ভালিয়ে বাড়ি নিয়ে এসেছিল, এবং ডাক্তারবাবু এই ডাকাতদের দয়া করে কেমন ছেড়ে দেন। খড়ধারীর দেশোয়ালিরা জানল তার মনিবের ছোট ছেলের ভূতেদের সঙ্গে কাজ-কারবার আছে। সে খড়ধারীকে বিপদে ফেলবার জন্যে উবে যায়। আবার তার মাকে দুঃখে প্রাণত্যাগ থেকে বাঁচাবার জন্যে দৃশ্যমান হয়। শিবশঙ্কর লেনের পরবর্তী প্রজন্মের বাচ্চাদের পাবনদাদার মতো স্মার্ট ও সাহসী হতে উপদেশ দেওয়া হবে অল্পদিন পরেই। শুধু দুর্গাপ্রসাদ স্বাধীনতা দিবসের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্ধেবেলা পুনপুনের হারিয়ে যাওয়া এবং ফিরে আসার মধ্যে একটা বহু-প্রচলিত কাহিনীর আদল দেখতে পেলেন। কংস সেবার পাঠায় তৃণাবর্তাসুরকে। ক্রীড়ারত যশোদাদুলালকে সে বাতাসের ঘূর্ণির রূপ ধরে উড়িয়ে নিয়ে যায়। সারা ব্রজ যখন শিশুর জন্যে হায় হায় করছে তখন দেখা যায় এক বিকট অসুরের মৃতদেহের বুকের ওপর শিশুটি তার গলা জড়িয়ে হাসছে।

তবে কি এখনও আশা আছে? এই ছেঁড়াখোঁড়া হতশ্রী দেশ, চতুর্দিকে অমঙ্গলের চিহ্ন। সুভাষ মৃত বলে ঘোষিত। তবু, তবু কি সব শেষ হয়ে যায়নি? আছে? আশা?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঞ্চম অধ্যায়

নিও-যশোদা

মানিক আমায় ডাকছে। রোজ ডাকে। ওদের তিনতলার জানলা থেকে। তারপর দোতলার জানলা থেকে, তারপর ছাতের কোণ থেকে, তারপর একবারে একতলার দেউড়ি দিয়ে ওর চোখ টুকি করে। আমার চোখ ওদের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে ওপরে চলে যায়, আবার নীচে নামে, কখন কোথায় দেখা দেবে মানিকের কোঁকড়া মাথা, টুকি চোখ। হাতের ফণা তুলে মানিক আমায় ডাকে। আমি তো আজকাল একা-একাই থাকি। বুবুকে আমি কিল মেরেছি কিনা, শিরদাঁড়ার মধ্যিখানে ভীষণ কিল। সেই থেকে বুবুর জ্বর, বুবু শুয়ে থাকে, কথা বলে না। আমরা আর দেশবন্ধু পার্কে যাই না তো! পমপমদিদি, আমি চলে যাচ্ছি, হ্যাঁ? আমার পা এগোচ্ছে কিন্তু। শেষ রাস্তাটুকু দৌড়ে যাচ্ছে পা। মানিকের মুখে হাসি, সুযযির মতো। আগেও মানিকদের বাড়ি গেছি। বাবার সঙ্গে সঙ্গে। আমি বুবু। বাবা স্টেথোস্কোপ আটকে দেবেন পাকুমার বুকে পিঠে, দেশের কথা বলাবলি করবেন। ততক্ষণ আমরা চুপিচুপি মানিকের দিকে, মানিক চুপিচুপি আমাদের দিকে...। কিন্তু ভাব হবে না। মানিককে তো বাড়ির বাইরে দেখাই যায় না। কী করে ভাব হবে?

দেউড়ি দিয়ে ওদের চৌকো উঠোনটায় ঢুকছি কিন্তু পুটপুট। আরও একটা দেউড়ি আছে। আরও একটা উঠোন। রোয়াকের ওপর পাকুমা। এখন সবে বিকেল। চারটে বাজছে ডং ডং। পাকুমার তুলো তুলো চুল। কাঁসার বাসনে রোদ্দুর ঠিকরোচ্ছে পাকুমার গায়ে। ধবধবে সাদা বসন। গলায় ছোট ছোট রুদ্রাক্ষের মালা।

পাকুমা মানে ঠাকুমা। মানিকের বাবারও পাকুমা, মানিকেরও পাকুমা, গোবর্ধন-মোক্ষদাদেরও পাকুমা, আমারও পাকুমা হন। পাকুমা চোখে হেসে আমাকে দেখছেন কেন? আমার লজ্জা পাচ্ছে যে! বাব্বাঃ, কত ছেলেমেয়ে মানিকদের বাড়িতে! নিতুদা, সুজনদা, বাচ্ছা, খোকন, পল্টু সব্বাই কী ফিটফাট! প্যান্টের ভেতর শার্ট গুঁজে বেল্ট দিয়ে পরেছে। পাকুমা ওদের জলখাবার দিচ্ছেন। টমদিদি বলেছে কারও খাবার সময়ে সেখানে থাকতে নেই। আমি গৌড়িগুগলি গুটি গুটি পিছু হটছি।

—'কোথায় যাচ্ছ মণি?' পাকুমা আমাকে খপ করে ধরে ফেলেছেন। উনি আমাকে আসনে বসতে বলছেন। টমদিদি, আমি বসব? বড়রা বললে কথা শুনতে হয়, না? কী সুন্দর বাহারি বাহারি গদি গদি আসন! রুপোর থালায় আঙুর, বেদানা, কমলালেবুর কোয়া ফুল করা, খেজুর, কিসমিস। কী সুন্দর সাজানো। নিতুদা হাসছে— 'এবার কোথায় পালাবে?' নিতুদা গুণ্ডামতন। চোখ টেরিয়ে মিটমিট করে হাসছে।

—'না না। ও পালাবে না, খুব লক্ষ্মী ছেলে, বাড়িতে বলে এসেছ?' নিজে হাতে একটা একটা করে কিসমিস আমার মুখে তুলে দেন পাকুমা আমি মাথা নাড়ি। না, না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি কাউকে বলেটলে আসিনি। কাকে বলব ? কেউ তো আর আমার দিকে নজর রাখে না। বর্মা থেকে এক জ্যাঠাবাবু এসেছেন, তিনি চুরুট খান, সাহেব সাজেন। ঠাকুর্দা-ঠাকুমা, বাবা-মা, সবাই তাঁকে নিয়ে ব্যস্ত। তাঁর বাড়ির সব্বাই মারা গেছে কি না। তাঁর বউ, ছেলে, মেয়ে স—ব। বাবা নিজের ঘর তাঁকে ছেড়ে দিয়েছেন। উনি কী খাবেন, কেমন করে সুখে থাকবেন তাই নিয়ে সবাই ব্যস্ত। আমাকে আর কেউ দেখে না তো। খালি ট্রাম-রাস্তায় যাওয়াই আমার বারণ। তাই বুনবুনের কাছে আমি যেতে পারি না। যাবই বা কেন ? আমি তো খুব পাপ করেছি, শুধু বুনবুনই সে কথা জানে। আমি বুবুকে খুব মেরেছিলুম তো তাইতে বুবুর জ্বর হয়ে গেল। বুনবুন যদি সবাইকে বলে দেয় ?

পাকুমা কাকে যেন ডাকছেন। ও, ও তো মানিকদের বাড়ির মোক্ষদা! —'যাও তো, ডাক্তারবাবুদের বাড়ি বলে এসো তো খোকা আমাদের বাড়ি আছে!'

মানিকদের বাড়ি আমাদের বাড়ির উল্টো দিকে। কোনাকুনি। রাস্তার দুদিকে দুটো পেঁয়াজ-খোসা রঙের ডানা বাড়িটার। জানলা দরজায় আরশুলার পিঠের মতো রং। লম্বা লম্বা বারান্দা বাড়িটাকে ঘিরে। কিন্তু সেখানে কোনওদিন কাউকে দেখা যায় না। ঘরগুলো কী উঁচু! এরা ঝুল ঝাড়ে কী করে ? মানিকের সঙ্গে খেলতে যাবার আগে আমি জানতুমও না, এদের পেছনে একটা অত বড় বাগান আছে। এ বাড়িটাকে সবাই বলে সিংবাড়ি। সিং-বাড়ি মানে সিংহবাড়ি। কেননা এদের ছাতের ওপরে ঠিক মাঝখানটায় দুটো পাথরের সিংহ লড়াই করে। কত যে ঘর, কত যে সিঁড়ি আর কত যে দালান। কখনও সেসব ঘরের মধ্যে যাইনি। মাঝে মাঝে পর্দা উড়ে ভেতরের কার্পেট, সোফা-কৌচ, আলমারি, বিরাট বিরাট ছবি, আর অদ্ভুত সুন্দর সব শব্দ-অলা ঘড়ি, দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের খেলাধুলো রান্নাবাড়ির উঠোনে। অনেক বাচ্চা আছে এদের বাড়ি। সবাই রোজ থাকে না। কোথা থেকে আসে, কোথায় চলে যায়। যেমন ছবিরানি। বেশির ভাগই মামাবাড়ি থাকে। এই বাচ্চারা আর লোকজন আর পাকুমা— এরা এই বাড়ির জ্যান্ত মানুষ। আর সব ছায়া। ছায়ামানুষ।

এই যে গোবর্ধন পাঁউরুটির ওপর মোটা করে মাখন লাগিয়ে চিনি দিয়ে খাচ্ছে আর ন্যাজ-মোটা বেড়ালটাকে পেসাদ দেবার চেষ্টা করে যাচ্ছে, বাইধর একমনে চৌত্রিশ জোড়া জুতো পালিশ করছে আর ঝুঁকে ঝুঁকে নিজের মুখ তাতে দেখবার চেষ্টা করছে কেননা ছোট খ্যান্ত বলেছে— 'যতখন না নিজের মুখ দেখবি, ততখন জানবি পালিশ হলনি' আর ছোট খ্যান্ত নিজে ? সে রান্নাবাড়ির রকে পা ছড়িয়ে বসে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলছে— 'এবার উঠোনটি ঝাঁট দুব, তা পর কাপড়গুনি কাচবো, তা পর চানটি করবো, তাপর নারকোলটি কুরবো...' আর বিরিঞ্চি ঠাকুর ? সে রান্নাঘর থেকে রেগে টং হয়ে বেরিয়ে এসে বলছে— 'মোর গুণ্ডি বটুয়া ? অ মা! কে নিই গিলা ? কারুচি করুচি, মু বহুৎ কাম-অ করুচি, ন দব ত তাকর সমস্তে ব্রহ্ম অভিশাপর জ্বলি যিবে জ্বলি যিবে—।' তাল তাল বাটনা বাটছে অনিলা, রাশি রাশি কচুর শাক কুটছেন বামুন ঠাকরুন, ছিধর ছিদাম দু ভাই বাজার থেকে ফিরে ধড়াস করে কতকগুলো মাছ এনে ফেলল উঠোনে— 'আজ একেবারে ধড়ফড়ে কাতলা আর চন্দনা এনেছি পাকুমা, বাগদা চিংড়িও আছে। থোড়, মোচা, চিচিঙ্গা, পটল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুমড়োশাক, ডেঙর ডাঁটা... ফর্দ মিলিয়ে সব দেখে নিন...।' এরা আমাদের চোখের সামনে ঘোরাফেরা করে, এরা সব জ্যান্ত। আমরা জানি বিরিঞ্চি ঠাকুরের বটুয়া বাচ্ছা চুরি করে নুকিয়ে রেখেছে, ওটা এবার তাকে বার করে দিতে হবে, নইলে পাকুমার কাছে এখুনি নালিশ যাবে, আমরা এ-ও জানি, এই যে গোটা চার বড় বড় মাছ, ধড়াস ধড়াস করে পড়ল, এবার সে-সব কাটাকুটি হবে, আমাদের কুচো-কাচার দলকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। পরবর্তী খেলার মাঠ— পেছনের বাগান। পেয়ারা গাছে চড়ে দোল খেতে খেতে নিতুদা বলবে— 'জস্তি গাছ জানিস! জস্তি গাছ! ও পারের জস্তি গাছে জস্তি কত ফলে! সেই জস্তি খাচ্ছি। তোরা সব গো-জস্তি খেতে যা।' ডাঁশা পেয়ারায় কামড় দিয়ে চোখ বুজিয়ে সে দোল খেতেই থাকবে। আমরা দল বেঁধে এখন অ্যাডভেঞ্চারে যাব। আমি, মানিক, মিণ্টু, পুতুল, বাদল, বাবুই, বাচ্ছা সব। পাকুমা রান্নাবাড়ির পেছনের দাওয়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন। লম্বা ঢলঢলে শেমিজের ওপর গেরুয়া থান এখন, কপালে চন্দনের ফোঁটা, মাথায় ঝুঁটিবাঁধা পাকুমা। যদিও চাঁদের দেশে চরকা ফেলে নেমে এসেছেন তবু কিন্তু পাকুমা একেবারে সত্যিকারের মানুষ।

আমি পাকুমাকে ভালবাসছি। আমাদের ছাতে টবের গন্ধরাজ ফুল ফুটলেই আমি ওঁর জন্যে নিয়ে যাই। বুজবুজদিদি টমটমদিদি রাগ করে—'দুদিনও কি গাছে ফুলগুলো থাকতে দিবি না তুই?'

মা বলেন— 'নিক না নিক, ও বাড়ির পাকুমার জন্যে নিচ্ছে। উনি ভালবাসেন।'

টমদিদি হেসে বলবে— 'মা, আপনিও পাকুমা বলবেন?'

—'ওমা, তবে কী বলব? তোরা কী বলিস?'

—'তাই তো কী বলবে? আমরা কী বলি? ডাকবার দরকার হয় না, কিন্তু উল্লেখ করতে হলে পাকুমাই তো বলি।'

ফুলের সাজি নিয়ে নীচে নামতে নামতে আমি ভাবি— কী বোকা! পাকুমাকে পাকুমা ছাড়া আবার কী বলবে? বড়দের যে কবে বুদ্ধি হবে? আমি পাকুমাকে 'আপনি' বলি। মানিক কিন্তু বলে না। পাকুমা আমাদের দুজনকে বলেন—জোড়মানিক, কিংবা বলেন মণি-মানিক্য, আমি যত বলি আমি পুনপুন, পাকুমা আমি পুনপুন, পাকুমা হেসে আমায় হামি খেয়ে বলেন 'তুমি আমার মণি-মাণিক্য, তুমি আমার সাতরাজার ধন এক মানিক।'

মানিক তখন বলে—'আর আমি? আমি?'

—'তোমরা যে জোড়মানিক জাদু!'

—'পাকুমা, আমি তো তোমার নিজের, আমি বেশি না?' মানিক বলে।

পাকুমা হেসে বলেন, —'ঠিক আছে তুমি তাহলে চোদ্দো রাজার ধন এক মানিক।' মানিক বেশ খুশি হয়ে যায়। আমি পাকুমার দিকে চাই। উনি চোখ দুটো একসঙ্গে চট করে বন্ধ করে একসঙ্গে খোলেন। তার মানে— মিছিমিছি। মানে সাত রাজার ধনও যা চোদ্দ রাজার ধনও তা, বেশি কম নেই। মানিককে একটু ধোঁকা দেওয়া হল আর কি!

তখন পাকুমার গল্প বলার সময় হবে, ঠিক যখন গোধূলি গিয়ে সন্ধেতে মিশবে। আমাদের খেলাধুলো হয়ে গিয়ে, ঘাম-জবজবে হয়ে গেছি, আবার ঠাণ্ডা হাওয়ায় সেই ঘাম শুকিয়ে যাচ্ছে। আমরা সবাই শরবত খাবো। মিষ্টি মিষ্টি টকটক শরবত, খেলে খুব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরাম হয়, তারপর পাকুমা আমাদের গল্প বলবেন। একেবারে সত্যি গল্প।

পাকুমার প্রথম গল্প

আমি তখন ছোট্ট এই এতটুকুনি। একটা টুনটুনি পাখির মতো উড়ে বেড়াই।

—'পাকুমা, ছোটবেলায় আপনার পাখা ছিল বুঝি?'

—'ছিল, ছিল।'

—'এখন কোথায় গেল?'

—'পিঠের ভেতর গুটিয়ে রেখেছি। দরকার হলেই বার করব। তারপর শুনবি?'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন। উড়ে বেড়াতেন। ... তারপর?'

—'আমাদের দেশে ভয়ানক বর্ষা হত। বর্ষার সময়ে নদী-ডাঙা সব একাকার হয়ে যেত। জলের মধ্যে খালি ভেসে থাকত, বড় বড় গাছের মাথা। সেইসব গাছের ডাল ধরে সাপ ঝুলত। বাঁদর বুকে বাচ্চা নিয়ে বসে থাকত। আর গোরু মোষ সব ভেসে চলে যেত। আমাদের অনেকের বাড়িতেই নৌকো থাকত। সোমবচ্ছর পড়ে থাকত। বর্ষার আগে রং করে, রাঙঝাল লাগিয়ে সারাই করে, তার ভেতরে বেশ কয়েকদিন চলবার মতো চাল-ডাল-আলু-পেঁয়াজ মশলাপাতি, কাঁঠাল পাতা সব বোঝাই করা হত।'

—'কাঁঠাল পাতা কী হত পাকুমা।

—'বাঃ ছাগলে খাবে না? আমাদের যে তিনটে ছাগলী ছিল, আর একটা ছাগল, আর কালো-ধলো দুই ছাগল ছানা। আমার বাবার কী যেন অসুখ করেছিল বলে বদ্যি বারোমাস ছাগল দুধ খেতে বলেছিলেন তাই ছাগলী আর কালো-ধলো সবসময়ে আমাদের সঙ্গে থাকত।'

—'নাদি ফেলে নোংরা করত না পাকুমা!'

—'করত, কিন্তু আমরা তাদের খুব ভালোবাসতুম বলে কেউ কিছু মনে করতুম না। বাবা-মা, ভাইবোন সবাই মিলে পরিষ্কার করতুম।'

—'নৌকোতেও?'

—'হ্যাঁ, নৌকোতেও।'

—'তারপর?'

—'গোয়ালঘর হত খুব উঁচুতে। সেখানেও বেশ কিছুদিনের মতো খড়, বিচালি গাদা করে রাখা হত। গরু-বাছুরের খোঁটা আলগা করে দিয়ে তবে আমরা নৌকোয় গিয়ে বসতুম। জল একটু একটু করে বাড়ত। আর আমাদের নৌকো উঁচু হয়ে উঠত, শেষে ভাসতে ভাসতে আগড়ের ওপর দিয়ে গাঁয়ের রাস্তায় বেরিয়ে পড়ত।'

—'তাহলে ভীষণ মজা হত বলো!'

—'মজাই বটে। খুব মজা। নৌকোয় বসে আমরা মাছ ধরতুম। গামছায় করে, ছিপে করে, অনেক সময়ে খালি হাতেও এত্ত বড় মাছ ধরে ফেলতুম। রাত্তিরের অন্ধকারে আকাশ আর বানের জল এক হয়ে যেত, গলাগলি করে তারা আমাদের ঘিরে ফেলত, নৌকোয় নৌকোয় লণ্ঠনের আলো টিপ টিপ করছে, জলের মধ্যে দিয়ে বড় বড় ডালপালা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুদ্ধু গাছের ডাল ভেসে যাচ্ছে, খড়ের চাল-ছাউনি ভেসে যাচ্ছে, জলের স্যাঁতা-স্যাঁতা আঁশটে গন্ধ চারদিকে। নৌকোর খোলে মাছ ভাজা হচ্ছে। আমরা মুড়ি দিয়ে মাছভাজা খাব।'

—'কেন ? মুড়ি দিয়ে কেন ? ভাত দিয়ে নয় ?'

—'ওরে বাবা, অত মাছ, সে খেয়ে একটু মুড়ি খেয়ে নিলেই ঢেঁকুর উঠে যেত। অত ভাত রাঁধবার মতো শুকনো কাঠও তো নৌকোয় তোলা যেত না।'

—'তারপর ?'

—'তারপর আমরা মুড়িসুড়ি দিয়ে ছইয়ের মধ্যে মায়ের কোল ঘেঁষটে শুয়ে পড়তুম।'

—'কে কে মুড়িসুড়ি দিয়ে শুতেন পাকুমা ?'

—'আমি আর আমার দুটি ভাই।'

—'তাদের নাম কী ?'

—'তাদের নাম সরল আর সুন্দর।'

—'আপনার নাম কী ?'

—'আমার নাম সুভগা। তারপর দেশে একবার হল প্রলয়ঙ্কর বিষ্টি। সাতদিনেও বিষ্টি থামে না, থামেই না। মঙ্গলবারে আরম্ভ হল। সবাই বললে, 'শনির সাত মঙ্গলের তিন।' আর সব দিন দিন। আকাশ যেন চৌ-চাকলা হয়ে ফেটে গেছে। জল ঝরছে তো ঝরছেই। ইস্কুল বাড়ি আর জমিদার বাড়ি এই দুটো মাত্র পাকা বাড়ি। তার মধ্যে অনেক লোক আশ্রয় নিয়েছে। নৌকোতে নৌকোতে ঠোকাঠুকি হয়ে যাচ্ছে এত নৌকো। কিন্তু ঝুঁঝিয়ে জল পড়ছে, নৌকো সামলানো যাচ্ছে না। সরল-সুন্দর-সুভগাদের বাড়ি ছিল একটু উঁচুতে। নৌকোতে সবাই উঠে বসেছে এমন সময় নদীর দিক থেকে কলকল করে ডাকতে ডাকতে এলো একটা বিরাট ঢেউ। সেই ঢেউয়ের মুখে অনেক নৌকোই উল্টে গেল। মানুষ ঝপাঝপ জলে পড়ছে আর চিৎকার করছে। রাক্ষুসে নদীর চোরা টানে সব টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আর সকলের সঙ্গে সুভগাও জলে পড়েছিল, প্রাণপণে সাঁতার দিয়ে নদীর উল্টো দিকে আসবার চেষ্টা করছিল। চেষ্টা করতে করতে তার যেন মনে হল দম বন্ধ হয়ে আসছে, বুকে ভীষণ লাগছে, চোখে সে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। সামনে দিয়ে কী একটা ভেসে যাচ্ছে সে প্রাণপণে সেটাকে চেপে ধরে তার ওপর উঠল, তারপরে অজ্ঞান হয়ে গেল।'

—'কে অজ্ঞান হয়ে গেল পাকুমা ?'

—'সুভগা।'

—'আর তুমি ?' মানিকের চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছে।'

—'আরে আমিই তো সুভগা রে পাগলা।'

—'তারপর ?' রুদ্ধ নিশ্বাসে আমি বলি।

অজ্ঞান অবস্থায় সুভগা শুনতে পেল কারা যেন কত কী কথা বলাবলি করছে। একজন বলছে— 'আহা আহা সুভগা না অভাগা, কী হাল হল দেখো দেখি মেয়েটার ?' আর একজন বলল— 'না না, দেখোই না, শেষ পর্যন্ত কী হয়। এত বড় পৃথিবী, তাতে এত মানুষজন, এত কাজকর্ম, এত যজ্ঞি চলছে দিনরাত্তির, এইটুকু একটা ছোট্ট মেয়ের কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপায় হবে না ?' আর একজন বলল— 'পৃথিবী তো মস্ত বড়। কিন্তু তাতে যে ক্রমশই স্থানের অকুলান হচ্ছে গো! কে আর এখন কার কড়ি ধারে!' সারা রাত এইরকম ফিসফিসুনি চলল। ভোর রাতে যখন জ্ঞান ফিরল সুভগা দেখল সে একটা কুঁড়েঘরের চাল আঁকড়ে শুয়ে আছে, আর তার হাতের কাছে নেতিয়ে রয়েছে এক পদ্ম-গোখরো। ভয়ে শিউরে উঠল সে প্রথমটায়। তারপর চারদিকে তাকিয়ে দেখল শুধু জল, জল আর জল। কোথাও একটা বাড়িঘর গাছপালা কিচ্ছু নেই। পাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে মানুষের মড়া, গরু-বাছুরের মড়া। সে এক অতি ভয়ংকর দৃশ্য। তখন তার মনে হল কোথায় গেল বাবা-মা। কোথায় গেল দুটি ভাই সরল- সুন্দর, কোথায় গেল কালো-ধলো তাহলে সে-ই বা আর বেঁচে কী করবে ? রাত্তিরের সেই ফিসফিসে কথাগুলো তাঁর মনে পড়ছিল। অভাগা, অভাগা, সত্যিই সে কী ভীষণ অভাগা।

—'এমন সময়ে কে যেন বলল— শোনো গো মেয়ে, আমি টের পাচ্ছি দূর থেকে একটা ভটভটি আসছে। তাতে লোকজন আছে। তোমাকে তুলে নেবে। আমাকে নেবে না। ভয় পেয়ে আমাকে মেরে ফেলে দেবে। তুমি আমাকে বাঁচাবে ?'

—'কে ? কে বলছে কথাগুলো ? চারদিক চেয়ে কাউকেই সে দেখতে পেল না।'

—'এই যে গো, তোমার সামনে। এমন নেতিয়ে পড়েছি যে গলারও তেমন জোর নেই।'

সাপটা বলছে না কি ? সুভগা একটু সাহস পেয়ে বলল— 'গোখরো, তুমি কথা বলছ ? তা তোমাকে আমি কেমন করে সঙ্গে নেব ? ওরা তো তোমাকে দেখে ফেলবে !'

—'পাকুমা, সাপ কথা বলতে পারে ? এখানে যখন সাপুড়ে আসে তখন তো সাপ খালি ফণা দোলায় আর হিস হিস করে।'

—'কথা বলে কখনও কখনও, দেখাই যাচ্ছে।'

গোখরো বলল— 'আমাকে তুমি তোমার পেট-কাপড়ে বেঁধে নাও। যখন সুবিধে পাব আপনিই নেমে যাব।' ওমা! কী সর্বনেশে কাণ্ড! গোখরো সাপকে কোঁচড়ে করতে হবে ? ভয়ে সুভগার বুক শুকিয়ে গেছে। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে দূরে ভটভটির আওয়াজ সে পেল। তখন যা থাকে কপালে বলে সেই পদ্ম-গোখরোকে সে তার কোমরের কাপড়ের ভেতরে গুঁজে নিল। জলে ভিজে ভিজে সমস্ত অঙ্গ অবশ। কোমরের কাছটা যেন হিম! দেখতে দেখতে ভটভটি এসে গেল। তার ওপর মানুষজন, সুভগা প্রাণপণে হাত নাড়ছে। একজন চেঁচিয়ে বলে উঠল— ওই তো চালের ওপর একটা বাচ্চা মেয়ে। ভটভটির ঢেউয়ে চাল ভীষণ দুলতে লাগল, তখন একটা মোটা দড়ি ওরা সুভগার দিকে ছুঁ-ড়ে দিল। সেই দড়ি ধরে কোনওমতে ভটভটিতে উঠে, সুভগা অজ্ঞান-অচৈতন্য। কিন্তু তার হাত দুটি কোমর আঁকড়ে আছে।

—'গোখরোর জন্যে ? পাকুমা ?'

—'আবার কী !'

আস্তে আস্তে তার জ্ঞান হল, রিলিফ-ক্যাম্পে শুকনো কাপড়, খাবার সব মিলল। চারদিক থেকে বানভাসা মানুষজন কত এসে উঠছে। কোথাও সরল নেই, সুন্দর নেই, মা-বাবা নেই। গাঁয়ের পরিচিত দু-একজনকে সে দেখতে পেল, কিন্তু তারাও কোনও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খবর দিতে পারল না। একদিন সন্ধেবেলায়, ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে সুভগা একটু নিরিবিলি দেখে বসেছে, রেল-লাইনের ধারে একটা শিরিষ গাছে ঠেস দিয়ে। হঠাৎ তার কোমর থেকে সড়সড় করে পা বেয়ে সেই পদ্ম-গোখরো নেমে গেল। তিন হাত দূরে ফণা মেলে দুলতে লাগল সে। সুভগা শুনতে পেল সাপ বলছে— 'তুমি খুব ভালো মেয়ে গো, আমি তোমার ওপর খুব খুশি হয়েছি। তোমার ভালো হবে। সব হবে তোমার। স-ব হবে। খালি এই পাথরটি নিজের কাছে রেখে দাও।' বলে সাপ ছোট্ট একটি কালো মসৃণ পাথর উগরে দিল। বলল, —'এটি সাতরাজার ধন এক মানিক, পরশমানিক। এটা তোমার কাছে যদ্দিন থাকবে তদ্দিন...' বলে সাপ ফণা নামিয়ে সড়সড় করে চলে গেল।

—'যদ্দিন থাকবে তদ্দিন কী পাকুমা ?'

—'তা তো জানি না ধন ! সেই সময়ে ঝিকঝিক করে ট্রেন এসে পড়ল আর তাতে ভয় পেয়ে সাপ কোথায় লুকিয়ে পড়ল।'

—'পরশমানিক তো লোহায় ঠেকালেই সোনা হয়ে যায়, না পাকুমা ?'

—'সে রকমই বলে বটে। তবে সুভগার পরশমানিক সে রকম ছিল না।'

'—তবে ?'

—'সুখ-সৌভাগ্য এইসব টেনে আনত সেই পাথর। চারদিকটা আলো হয়ে থাকত, সুভগা দেখতে পেত।

—'বাবা-মা ? তাদের খোঁজ পেয়েছিলে ?'

—'তাঁরা কি আর ইহলোকে ছিলেন বাবা, স্বর্গে চলে গেছিলেন।'

—'আর সেই সরল-সুন্দর ?'

মানিক বলে—'সুভগা মানে তো তুমি ? তোমার কাছে আছে সে পাথর ?'

পাকুমা নীরবে কীরকম রহস্যময় হাসি হাসতেন। বলতেন— 'বাপ রে। এসব বিষয়ে কী আর কথা বলতে আছে ? বলা বারণ।' তিনি হাত জোড় করে কপালে ঠেকাতেন। নমো নম। আমরাও দেখাদেখি নমো করতুম।

—'আর সেই সরল-সুন্দর ?' আমি আবার বলি।

—'তারা আছে। কোথাও না কোথাও আছে ধন। তাদের খুঁজতে খুঁজতেই তো আমার জীবন গেল।'

—'সেই জন্যেই তুমি মাঝে মাঝে ফিটন গাড়ি করে একা-একা চলে যাও।'

—'ঠিক ধরেছিস।' মানিকের গালে আলতো করে চুমো দিতেন পাকুমা। হঠাৎ রান্নাবাড়ির আলোগুলো সব জ্বলে উঠত। চায়ের কাপ, চামচের ঠুং ঠাং আওয়াজ। চায়ের সুবাসে আস্তে আস্তে ভরে উঠছে রান্নাবাড়ির দাওয়া। বড় বড় ট্রেতে করে চায়ের পট, দুধের পট, চিনি, কাপ-ডিস সব সাজিয়ে, পুতুল-অলা সুন্দর ঢাকনা দিয়ে পট ঢেকে, দোতলায় তেতলায় সব চা নিয়ে যেতে আরম্ভ করত লোকজনেরা। পাকুমা উঠে রান্নাবাড়ির দক্ষিণের ঘরে ঢুকতেন। তারপরেই শাঁখের শব্দে গমগমে হয়ে যেত সিংহবাড়ির বাতাস।

বর্ষা। আকাশে প্রথম মেঘের ডাক। আস্তে আস্তে আকাশ কালো চরাচর কালো। কালো আকাশ মুখ ঝুঁকিয়ে রয়েছে, কখন ছোট ছোট গর্তে জল জমে আয়না তৈরি হবে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে মুখ দেখবে। বিশ্বভুবন ছায়াময়। গুড়গুড় গুড়গুড় করছে থেকে থেকে। পাখি ডাকছে। কাক। গোল হয়ে একদল পায়রা উড়ে বেরিয়ে গেল। গঙ্গাফড়িং ঢুকে এসেছে একটা ঘরের ভেতরে। কাদের জানলা থেকে মিলিত কণ্ঠে বাচ্চারা ডেকে উঠল— 'আয় বিষ্টি ঝেঁপে, ধান দেবো মেপে।' জানলার দিকে তাকিয়ে পুনপুন দেখে হঠাৎ একটা ভীষণ ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা উঠতেই চড়বড় করে দু-চারটে মস্ত বড় দানার মতো বৃষ্টি ঝরে পড়ল। চড়ুইপাখির বাসা উড়ে বেরিয়ে গেল ঘুলঘুলি থেকে। ভীষণ চেঁচাচ্ছে চড়ুই। শিল পড়ছে শিল। পুটপুটদিদি দৌড়তে দৌড়তে ছাতে যাচ্ছে, বুজবুজদিদিও— 'পুনপুন, শিগগিরই আয়, শিল কুড়োব, শিল...'

'শিল শিশিতে ভরে রেখো ঋতি-ই'—মা ডেকে বলছেন।

দমাদ্দম করে শিল পড়ে, ঝমাঝ্‌ঝম করে বৃষ্টি পড়ে এখন সব পরিষ্কার হয়ে গেছে। ফুটফুট করছে গাছপালা। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। বেগনি গোলাপি রং ফুটছে আকাশে। ছাতের টং-ঘরে সে মন-কেমন হয়ে বসে আছে। আস্তে আস্তে আকাশ ছাই, তারপর নীল, তারপর কালচে, খুব তারা ফোটে, খুব জোছনা হয়, ছাতের গাছ থেকে যুঁইয়ের গন্ধে ভরপুর হয়ে যায় চারদিক। নীচ থেকে দিদিদের মিলিত গলার গান ভেসে আসে— 'শ্রাবণের গগনের গায়/ বিদ্যুৎ চমকিয়া যায়'...। তার সামনে আকাশে একটা বিরাট পদ্ম-গোখরো ফণা ধরে। তার লেজ কোথায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। আস্তে আস্তে দুলছে ফণা, ফণার ওপরে পদ্ম-ছাপ। চেরা জিভ বাতাসে ঝলকাচ্ছে। ফণাটা উঠতে উঠতে চলে গেল আকাশের সবচেয়ে উঁচু কোণটাতে যেখানে সূর্যঠাকুর মাঝ দুপুরে চড়েন।

—'তুমি খুব ভালো ছেলে পাবন, কী চাও ?'

—'বুবুকে ভালো করে দিন গোখরো-ঠাকুর।'

সাপ আস্তে আস্তে একটা চকচকে কালো পাথর উগরে দিচ্ছেন। অনেক উঁচু থেকে পড়ছে সেই পরশমানিক। পড়ছে, পড়ছে। কিন্তু যতই পড়ুক, এত নিঃসীম সেই আকাশ যে পাথর যেন একই জায়গায় থমকে আছে। সে তার ঠিকোরনো আলো দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু তার হাতের নাগালে সেই পাথর কিছুতেই আসতে চাইছে না। কিছুতেই না।

রূপ-তরাসী

বুকজল ঠেলে সে এগোয়। কালো, ময়লা, ভারী জল। পাশ দিয়ে নোংরা ভেসে যায়। মড়ার হাত, মড়ার পা, ছিন্ন মুণ্ডু, খোবলানো নাক-মুখ নিয়ে বিকট মুখ ব্যাদান করে ভাসতে ভাসতে চলে যায়। সে প্রাণপণে কাত হয়ে যায়, মুণ্ডু তাকে ধরে ধরে ধরতে পারে না, নোংরা জলে হাবুডুবু খেয়ে সে আবার উঠে দাঁড়ায়। সে কিনা আধখানা, আর তার ভাইয়েরা দুজনে মিলে আধখানা। তিনজনে মিললে তবে একজন হবে, বেশির ভাগটা তার হাতে, তাই তাকে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না, চলবে না। রাক্ষসীর প্রাণভোমরা তার কাছে। সে সন্তর্পণে বুকের কৌটোয় বয়ে নিয়ে চলেছে। ভিমরুল-ভিমরুলি জীয়নকাঠি মরণকাঠি। সেই এক সোনার তালগাছ ছিল। তার ওপরে তালপত্র খাঁড়া ছিল। সেই খাঁড়া নিয়ে সে স্ফটিকস্তম্ভ ভেঙেছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাতফণা সাপের খোঁজ পেয়েছে, সে সাপকে বুকের ওপর রেখে এক ফোঁটাও রক্ত পড়তে না দিয়ে মারা কি সোজা কাজ? কোন ঘনঘোর ঘুমের মধ্যে সে এই ভয়ঙ্কর শক্ত কাজটা করে ফেলেছে, নইলে এই জীয়নকাঠি মরণকাঠি তার হাতে এল কী করে? এত রাক্ষস মরল কী করে? এই পাতালগঙ্গার জলে যেসব বিকট বিকট হাত পা ভেসে আসছে সেসব কি সেই রাক্ষসদেরই নয়? পাশ দিয়ে যেতে যেতে কাটা হাত আঙুল বাগিয়ে তাকে খিমচে দেবার চেষ্টা করে, কাটা পা তাদের গোছ চাগিয়ে গোড়ালি বাগিয়ে তাকে লাথি মারতে আসে, কাটা মুণ্ডু তাঁকে গেলবার জন্যে হাঁ করে। কিন্তু সে তো সার সার করে বেঁচে যায়। সে জানে এ সব-ই সেই 'মরিতে মরিতে মরণ কামড়ি'। দাঁত বিকটী রাক্ষসী—এইবার নিপাত যাও।

সে শুধু সার সার করে সরে যেতেই পারে। বুকের ভেতরে যে রাক্ষসীর জীয়নকাঠি-মরণকাঠি এতটা পথ বয়ে আনল, তাদের তো বুকের কৌটো থেকে সে বার করতে পারছে না। পারেনি তো! তা হলে কে বার করে দিল? ও এ তা হলে সেই পক্ষিরাজ ঘোড়া। কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। আবার ফিরে এসেছে। কিন্তু পক্ষিরাজের চিঁহি তো সে শুনতে পাচ্ছে না? পক্ষিরাজের তো হাতও নেই। কী করে তুলবে? মুখ দিয়ে তুলতে পারে অবশ্য। ও পক্ষিরাজ, তুমি কি তোমার অত বড় বড় দাঁতওলা মুণ্ডুটা আমার মাথার মধ্যে দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছ? দেখো আবার জীয়নকাঠি মরণকাঠির কৌটো তুলতে গিয়ে আমার ফুসফুস আমার হৃৎপিণ্ড আমার প্রাণ তোমরা তুলে নিও না। কামড়ে ধরো না দাঁতে করে!...ও তুমি? সন্নিসি ঠাকুর: সেই কবে থেকে আমার পিছু নিয়েছ? এত দয়া তোমার বুবুর ওপরে? সন্নিসি বলেন—'সেই যে একজন দুগগি ছিল, সেই দুগগির যে একজন দুষ্টু মেয়ে ছিল, যার ঝুঁটি ঝুঁটি চুল, গুলি গুলি চোখ, মিটি মিটি হাসি, আর দুষ্টুমি ঢাকবার জন্যে ভীষণ যে গম্ভীর হয়ে যায় মাঝে মাঝে, সেই মেয়ের যে এক বাবা ছিল, সেই বাবাই আমাকে একটা ছোট্ট শিশি থেকে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বার করেছে, কী করে না এসে পারব, বলো?'

—'সে কী? দুগগি তো আমার বাবা, আর আমার বাবা-ই তো দুগগি!'

—'তাই তো তাই।'

জল তার কোমরের কাছে চলে এসেছে। আরও ভারী এখন। পায়ের তলার মাটি ভীষণ পেছল। কাদাগোলা জলের মধ্যেও সে দেখতে পায় হাজার হাজার ছেলে হাজার হাজার মেয়ে নুড়ি পাথর হয়ে ডুব গেলে রয়েছে। সে দাঁড়ায় না। এগিয়ে চলে। পেছন থেকে কারা ডাকে—'রাজকুমারী রাজকুমারী ফিরে চা-ও রাজকুমারী রাজকুমারী কোথা যাও।' সে পেছন ফেরে না, কেননা সে তো রাজকুমারী নয়। আরও খানিকটা যেতে আশে-পাশে রব ওঠে—'আমি কুঁঠে আমাকে ফেলে যেঁও না।'

—'আঁমি কুঁজো বড় কষ্ট, যেও না', কে বলে—'আমরা কতদিন খেতে পাইনি—যেও না।' কে বলে...। কিন্তু বললে কী হবে? সে তো জেনে গেছে এই সব কুঠে সাজা-কুঠে, সত্যিকারের কুঠে হলে এমন আর করতে হচ্ছে না। সে জানে এই কুঁজোও সাজা কুঁজো। পিঠে একটা তুলোর বস্তা বেঁধে কুঁজো সেজেছে। যে বলছে খেতে পাইনি, সে পেটপুরে খেয়ে এসেছে, কত মানুষের হাড়গোড়, মাংসমজ্জা চুষে চুষে খেয়ে এসেছে, এ সবই মায়া। তাই সে আশে তাকায় না, পাশে তাকায় না, সোজা বুকের কৌটোয় নিজের প্রাণভোমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে জল ঠেলতে থাকে ঠেলতে থাকে। চারিদিক থেকে দৈত্যদানা, বাঘ ভালুক, সাপ, হাতি, সিংহ, মোষ, ভূত পেত্নীতে এসে তাকে ঘিরে ধরে।

এ ডাকে—

'হাম হুম হাঁই।
আয় তোকে খাই।'

ও বলে—

'হুম হাম হিলি
আয় তোকে গিলি।'

জলের তলায় বাজনা বাজে—

'তা কাটা ধা কাটা ধাং
রাজকন্যের কেটে নে রাং।
ত্রেকেটে ধিনি ধিনি ধ্যাং।
রাজকন্যের কেটে নে ঠ্যাং।
থই থই ত্রেকেটে তা-থা
রাজকন্যের কেটে নে মা-থা।'

কিন্তু সে এখন দেখতে পাচ্ছে দুরে তীরভূমিতে ছবির মতো দাঁড়িয়ে আছেন মা। সে শুনতে পাচ্ছে বাবা ডাকছেন—

চি তো তো চিত্ত চিত্ত বিনো-দন
একটু আরও কষ্ট কর আর একটু-এ-গুপ্ত ধন
বিনোদন বিনোদন।
চি তো তো চিত্ত বিনোদনচিত্ত
মৃত্যুও সনাতন জী-বনও নিত্য
তার ওপরে জী-বন বড়-ই প-বিত্র।
বড্ড পবিত্র।
বড্ড প-বিত্র...

পাড়ের কাছে পৌঁছতে না-পৌঁছতেই বাবা টেনে নেন। মায়ের কোলে সোনার খাটে গা, আর বাবার কোলে রুপোর খাটে পা সে খুব আরামে শুয়ে থাকে। চৈতন্যের মধ্যে থেকে অআকখ এক দুই তিন চার পালং টেবিলচেয়ার দেরাজ সব মুছে গেছে। মাঝে মাঝে জলের মধ্যে থেকে ঘাই দিয়ে ওঠে—ওর নাম পম দিদি না? ওই যে ওই ছেলেটা আমায় কোলে নিয়েছে ওকে বোধহয় সুযযি বলে। কে যেন চলে যায় দরজার সামনে দিয়ে চুল দুলিয়ে ও কে? পম পম টম পমটম না টমটম? টমটম একটুখানি এসো না, কিন্তু কাছে এলে সে ভয় পায়। এ বুজবুজের ছদ্মবেশে কোনও রাক্ষসী নয় তো? কি পুটপুটের বেশ ধরে সেই সাপটা? সেই রাক্ষস খোক্কস কালনাগ রাক্ষসী আর সেই নানা রকমের জ্বর তার মাথার মধ্যে অহর্নিশি হট্টগোল করতে থাকে। একমাত্র মা, বাবা, আর পুনপুন-বুনবুনকে বিশ্বাস করতে তার অসুবিধা হয় না। তবে সেই বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের কথা তো সে ভাল করে জানাবার মতো ভাষা আয়ত্ত করেনি।

অংদাদা তাকে আদর করতে এসে তার হরলিক্স খেয়ে যায়, সে কি খোক্কস নয়?— তাই সে চিৎকার করে অংদাদা ঘরে ঢুকলেই। তার চিৎকার শুনলেই বাবা চেঁচিয়ে উঠবেন—'রে অংশু!!' পিসিমা শুনতে পেলে বলবেন—'হ্যাঁ রে, সেজখোকা, রোগা মেয়েটাকে না কাঁদালে তোর ঘুম হয় না, না?' —এই কথাটা অনেকবার শুনতে শুনতে বুবু বলে—'সেজ? রোগা না কাঁদলে তোর ঘুম নেই, না?'

পমদিদি বলে—'আর একবার আসুক না, দেখাচ্ছি মজা! খাক না হরলিক্স। বুবুর হরলিক্স খেয়ে যাওয়া?'

বুবুও বলে—'আসুক না, দেখাচ্ছি মজা!'

সে পুনপুন-বুনবুনের জন্যে অপেক্ষা করে। কিন্তু বুবু কালনাগকে যত ভয় পায়, পুনপুন বুবুকে তার চেয়েও বেশি ভয় পায়। সে একটা গণ্ডির আশেপাশে ঘুরঘুর করে, তার ভেতরে ঢোকে না। যেন কে মন্ত্র পড়ে দিয়েছে। দরজার চৌকাঠ থেকে সে উঁকি মারে, জানলার গরাদ ধরে সে উদাস হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, মাঝে মাঝে টেরিয়ে টেরিয়ে তাকায় বুবুর দিকে, যেই বুবুর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়, অমনি তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। সে সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

বুবুর কেমন একটা অব্যক্ত কষ্ট হয়। কী তার হয়েছে যে, পুনপুন তার কাছে আসে না। কে বারণ করে দিয়েছে? পুনপুন কেন তার ওপর রাগ করেছে? রাগও না, রাগের চেয়েও বেশি, ঘেন্না। পুনপুন বুবুর ঘরের মধ্যে পা রাখে না। এত অভিমান হয় বুবুর যে, সে হাত তুলে ইশারায় তাকে ডাকে না পর্যন্ত। এবং যতক্ষণ জেগে থাকে ততক্ষণ পুনপুনের প্রতীক্ষা করে থাকে। যদিও মুখে তার বিপরীতটাই দেখায়। পুনপুনের নাম-মাত্র না করে সে চেঁচায়—

'টেকন কেন আসছে না-আ-আ?'

টেকন খুব খুশি হয়ে এসে যায়। খুকি তাকে ডেকেছে, রোগশয্যায় শুয়ে। মরতে-মরতে বেঁচে-ওঠা খুকি আর কাউকে নয় তাকে, টেকনকে ডাকলো? কিন্তু টেকন এসে দাঁড়ালেও বুবুর ব্যথা যায় না, সে টেকনের হাতও মাথার ওপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

বুনবুন অবশ্য ব্যূহ ভেদ করে ঢুকে পড়ে। চৌকাঠের বাইরে থেকে সে হুড়ুম করে লাফিয়ে ভেতরে পড়ে।

—'এই হনুমান সাগর পার হল।'

এবার সে আর এক লাফে টেবিলে ওঠে—'এই হনুমান লংকার মাথায় উঠল', তারপরে সে বুবুর বিছানায় লাফিয়ে পড়ে —'এই হনুমান অশোকবনে এসে গেল।'

এই রকম লাফিয়ে পড়ায় তক্তপোশের বিছানায় একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং বুবু সেটা সহ্য করতে না পেরে কাঁদতে থাকে।

তখন বুনবুন—'সীতা কাঁদছে, সীতা কাঁদছে' বলে রে রে করে ছুটতে ছুটতে বাইরে চলে গিয়ে, এক দমে সিঁড়ি লাফিয়ে নীচে ঠাকুর্দার চেম্বারে ঢুকে যায়।

—'সীতা কাঁদছে, সীতা কাঁদছে'— সামনে কোনও রোগী বসে রয়েছেন, বুনবুনের দৃকপাত নেই। ঠাকুর্দা অমনি রোগীর কথা ভুলে বুনবুনের সঙ্গে খোশগল্পে মেতে যান—

—'কে সীতা?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'ওই যে মায়ের ঘরে যে মে'টা শুয়ে থাকে!'

—'ও, আর তুমি?'

—'আমি হনুমান।'

—'তো ন্যাজ কই?'

প্যান্টের পকেট থেকে একটা রুমাল বার করে পাকিয়ে পাকিয়ে টেবিলে রাখে বুনবুন।

—'এইটুকু ন্যাজ? তা এ দিয়ে কি আর লংকা ধ্বংস করা যাবে ভাই? —হ্যাঁ কী বলছিলেন? গাল ফুলে যাচ্ছে? দেখি। দেখি...' রুগীকে টিপে-টুপে ঠাকুর্দা বলেন—'এ তো মাম্পস হয়েছে, দেখছি!'

—'আমার তেতাল্লিশ বছর বয়স হল, এখন মাম্পস্?'

ঠাকুর্দা মুচকি হেসে বলেন— 'হয়তো আপনার বয়স কমে যাচ্ছে মশাই। শিগগিরই ছেলেপুলের সঙ্গে খেলা করতে পারবেন।'

—'ওই তো রাবণ।' রুগিমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে বুনবুন অবলীলায় ঘোষণা করে। তারপর ঠাকুর্দার কোলে উঠে, কাঁধ খামচে বলে— 'আর এই হল রাম।' তাঁকে রামের রোল দেওয়ায় স্পষ্টতই ঠাকুর্দা খুব খুশি হয়ে যান, জিগগেস করেন—'লক্ষ্মণটি কে?'

ঠাকুর্দার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বুনবুন চুপিচুপি বলে 'দুগগি লক্ষ্মণ। কাউকে বলো না।'

রুগি প্রথমটা হাসে। রাবণ হিসেবে চিহ্নিত হওয়ায় একটু অপ্রতিভ বোধ করে। তারপরে মনে মনে ভাবে— 'এই বুড়ো ডাক্তারের কাছে আসাটাই ঝকমারি। এখন শুরু হল নাতির সঙ্গে আদিখ্যেতা।'

পুনপুন বুঝতে পারে বুবু হয়তো তার কিল মারার কথাটা অসুখের মধ্যে ভুলে গেছে। তবে তার মনে হয় সে খুব সামনাসামনি গেলে কথাটা বুবুর মনে পড়ে যেতেও পারে। কিন্তু যেটা সে বুঝতে পারে না, সেটা হল—বুনবুন ব্যাপারটা খেয়াল করেছে কি না, মনে রেখেছে কি না। একদিনও বুনবুন এ বিষয়ে তাকে কিছু বলেনি, কিন্তু বুনবুন যেমন দুষ্টু, হঠাৎ একদিন সব্বাইকার মাঝখানে বলে দিতে পারে কথাটা, তখন? তখন কী হবে? পুনপুন তাই বুনবুনের থেকেও আলাদা হয়ে যায়। মন খুলে তার সঙ্গে খেলা করতে পারে না।

তা ছাড়া বুনবুন যদি কাউকে না-ও বলে দেয়, তাতেই কি পুনপুনের পাপ যাবে? কোনও দিন যাবে না। পাপীদের নরকে নিয়ে যায়। মস্ত উনুনের ওপর মস্ত কড়ায় সেখানে মানুষভাজা হয়, যেমন কুমড়োভাজা, পটলভাজা। পুনপুনকে ঝপাং করে সেই কড়ার তেলে ফেলে দেওয়া হবে। উঃ! ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চমকে ওঠে পুনপুন। আর তার চেয়েও বড় শাস্তি হবে যদি বুবু মরে যায়। রোগা কাঠির মতো, ন্যাড়া-মাথা বুবুকে দেখলে মনে হয় সে এক্ষুনি মরে যাবে। সেদিন পাড়ার একজন জ্যাঠাইমা তাকে দেখতে এসেছিলেন, বললেন— 'ও দেবু, মেয়ের এ কী ছিরি হয়েছে গো? ওকে বিয়ে দেবে কী করে?'

মা সে সময়ে চুপ করে দেয়ালের দিকে চেয়েছিলেন। পালক তখন এক লাফে বুবুকে কোলে তুলে নিয়ে চলে গেল। পুনপুন আতঙ্কিত হয়ে পালককে জিগগেসই করে ফেলেছিল—'পালক, বুবুকে বিয়ে দেওয়া যাবে না? কেউ বিয়ে করবে না?'

পালক তাতে হেসে বলল—'আরে পুঁটকে। তোর এত ভাবনা কেন? তারপরে তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোখে জল দেখে, ঠোঁট ফুলছে দেখে পালক তাকে আদর করে বলল—'আচ্ছা ঠিক আছে, আর কেউ বিয়ে না করলে, আমিই বিয়ে করে নেবো ওকে। তা হলে তোর দুশ্চিন্তা যাবে তো?'

কিন্তু পুনপুন ঠিকই বোঝে তার দায়িত্বটা যাচ্ছে না। পিসিমার ভাষায় সে 'দায়িক' থেকে যাচ্ছে বুবুর এই দুর্গতির জন্য।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ষষ্ঠ অধ্যায়

অঘাসুর

অঘাসুর নগাসুর করালবদন
সড়সড়ি আসে যেথা হাসে বৃন্দাবন।
আকাশপাতাল বিন্ধি বদন ব্যাদিয়া
যোজনপ্রমাণ দেহ রহে বিস্তারিয়া।
ল্যাজামুড়া কোথা তার জঠরকন্দরে?
দংষ্ট্রাগুলি চূড়া যেন গিরিশিরোপরে।
চক্ষুগুলি দাবানল নিশ্বাসে গরল
অঘাসুর নগাসুর ফোঁসে অবিরল।
ব্রজের রাখাল সবে খেলিতেছে খেলা
শিখিপাখা বান্ধি কেশে গলে গুঞ্জামালা।
সর্পজিহ্বে পথ ভাবি হরষ উপজে
নাগের জঠরে সবে কুতুহলে পশে।

'এই পুনপুন, পুনপুন, আয় না, আয়।'—মানিক ডাকছে, পেছনে বাচ্চা, কাতু, নিতুদা, বাবুই।

—আশ্বিন মাসের দুপুরবেলা। সারা সকাল পাখি ডেকেছে, সারা দুপুর পাখি ডাকছে। শিউলি ফুটেছে মানিকদের বাগানে। ওই ফুল দেখলে আমার ভীষণ আনন্দ হয়। কিন্তু মানিক না ডাকলে আমি যাই না তো। একদিন ধরো গেলুম, খেলা করলুম, আবার দুদিন গেলুম না। তার পরের দিন মানিকের মুখটা আবার ওদের তেতলার বারান্দায় দেখা যাবে। ঝুঁকে পড়বে। —'এই পুনপুন, পুনপুন, আয় না।' তখন আমি আবার এক পা এক পা করে এগোই। কেন এমন করি আমি তো জানি না। ওই বাড়িটা আমার কেমন লাগে, ঠিক যেন এক ভুতুড়ে বাড়ি। রাত্তির বেলায় যেন সব জেগে উঠল। খাওয়া-দাওয়া, হই-হল্লা, নাচ-গান, আবার হঠাৎ ভোজবাজির মতো সব উবে যায়। একদিন পুটপুটদিদি বুজবুজদিদিকে ডেকে বলছিল— 'সেজদি, সেজদি, দেখে যাও সিং-বাড়ির ছাতে ওদের মেম-বউ উঠেছে।' বুজবুজদিদির সঙ্গে আমিও পাঁচিলের ফোকরে চোখ রেখে দেখলুম নীল রঙের গাউন পরা, বাদামি চুল, ঝাঁঝালো ফর্সা একজন সিঁদুরপরা মেমসাহেব। এক ঝলক দেখলুম তারপরই যেন হাওয়ায় উবে গেল। টমদিদি বলল—' ছিঃ বুজবুজ, ওভাবে পরের বাড়ির দিকে দেখো না, টের পেলে কী ভাববে বলো তো। কক্ষনও ওরকম করো না।' কিন্তু আমি ভাবলুম—

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলেই বা কী। ও কি আর এ পৃথিবীর? হয় বিলেত থেকে হাওয়ায় শাঁ করে আসা-যাওয়ার মন্তর জানে, আর নয়তো একেবারে খাঁটি মেমভূত।

একদিন দেখি ওদের বিরাট সাদা স্টুডিবেকার গাড়িটা এসে রাস্তা জুড়ে দাঁড়ালো। ভেতর থেকে খুব লম্বা, সাহেব-সাজা ছোট্ঠাকুর্দা মানে পাকুমার ছোট ছেলে আর কোঁচানো ধুতি গিলে-গিলে পাঞ্জাবি পরা রাঙাজেঠু মানে পাকুমার মেয়ের বড় ছেলে নেমে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেলেন। ছোট্ঠাকুর্দা লম্বা, রোগা, টিয়ে-টিয়ে নাক, ফ্যাকাশে রঙ, চোখে সোনা-চশমা। আর রাঙাজেঠু একটু মোটা থপথপে, চোখের তলায় কালচে থলি, চিবুকের তলায়ও কয়েক থাক। কিন্তু মুখটা হাসিতে জ্বলজ্বলে। ওঁরা যেখান দিয়ে চলে গেলেন একটা ঝাঁঝালো-বুনো-বুনো গন্ধও ওঁদের পেছন পেছন চলে গেল। মানিককে চুপিচুপি জিজ্ঞেস করলুম— 'কিসের গন্ধ রে মানিক?' বলেই বুঝতে পারলুম জিজ্ঞেস করতে নেই। কিন্তু মানিক বলল— 'তুইও পেয়েছিস? ছোট্ঠাকুর্দা আর রাঙাজেঠু একসঙ্গে গেলেই আমি এই গন্ধটা পাই। কেউ একা গেলে কিন্তু পাই না। কী আশ্চর্য, না?' আমাদের কথা শুনতে পেয়ে গোবর্ধনের ছেলে নিতাই বলল— 'কিসের গন্ধ শুনবে দাদাবাবু? আমি জানি। কাউকে বলবে না কিন্তু। ও হল ঘোড়ার পেচ্ছাবের গন্ধ।' আমরা কাউকে বলিনি। কিন্তু দায়ুদ মাস্টারের কানে চলে গিয়েছিল কথাটা। দায়ুদ গোবর্ধনকে দশ ঘা বেত মেরেছিল, বাগানে খেলতে খেলতে আমরা মুখবাঁধা গোবর্ধনের চাপা চিৎকার শুনতে পেয়েছিলুম। গোবর্ধন কি না দায়ুদের দেশের লোক, গোবর্ধনের ছেলে বেসহবৎ হলে তাই গোবর্ধনকে দায়ুদের হাতে মার খেতে হয়। কিন্তু ছোট্ঠাকুর্দা বা রাঙাজেঠুকেও আমরা রোজ দেখতে পেতুম না। ছোট্ঠাকুর্দা তো বাড়ির ছোট ছেলেদের চিনতেন কি না সন্দেহ।

মানিক আমাকে ডাকছে। আমি যাচ্ছি। ওদের ভেতর-উঠোন এখন কেমন ঝিমঝিমে। কাউকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। আমরা লুকোচুরি খেলছি এখন। উবু দশ, কুড়ি, তিরিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর, আশি, নব্বুই, শ'— এমনি করে গুনে বাবুই চোর হয়েছে। চোখ বোজ, চোখ বোজ বাবুই, আমরা সব যে যেদিকে পারি দৌড়ে নুকোচ্ছি। মানিক বলল আমি দোতলায় যাচ্ছি, তুই তিনতলায় চলে যা—বাবুই খুঁজে পাবে না।

ওদের সিঁড়িতে কার্পেট পাতা থাকে, শব্দ হয় না, আমি উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়েছি, এমন নুকোব না! বাবুইকে আর খুঁজে-পেতে হচ্ছে না। ওরা সব সময়ে আমাকে খুঁজে বার করে আর আমাকেই তখন চোর দিতে হয়। আমি ওদের কী করে খুঁজে পাবো? এই বাড়ির কোণ-কানাচ তো আমি চিনি না! একটা পর্দা-ফেলা বেশ অন্ধকার ঘর। আমি টুক করে ঢুকে আলমারির ওপাশে নুকিয়ে পড়েছি। প্রথমটায় তো ঝোঁকের মাথায় ঢুকেছি, তার পরে ভয় হচ্ছে। বাপরে এটা কোনও ভূতের গুহা নয় তো! ভূতটা হয়তো তার হাঁ পেতে রেখেছিল আমার জন্যে। বেরোতে যাব, দেখি খাট। খাটের ওপর নতুন কাকু মানে রাঙাজেঠুর ভাই আর মানিকের এক কাকিমা। কোন কাকিমা আমি বলতে পারব না। দুজনে গলা জড়াজড়ি করে শুয়েছিলেন। মুখ তুলে নতুনকাকু শব্দ করে চুমো খেলেন ওই কাকিমাটাকে। সেই শব্দে আমি দাঁড়িয়ে গেছি। এরপর হঠাৎ কাকু কাকিমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ভয়ের চোটে আমার মুখ দিয়ে কী যেন শব্দ বেরিয়ে গেল। অমনি নতুন কাকু বলে উঠলেন 'কে? কে ওখানে?' বলতে বলতেই নীচে নেমে তিনি অন্ধকার কোণ থেকে আমাকে কান ধরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেনে বার করলেন। আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছি। নতুনকাকু আমার কান পেঁচিয়ে বললেন— 'ডাক্তারদের বাড়ির ছোঁড়াটা না? পাকা পক্কান্ন একেবারে। এখানে ঢুকেছ কেন?' আমি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে বললুম— 'লুকোচুরি খেলছি।'

—'লুকোচুরি? বার করছি তোমার লুকোচুরি খেলা। বড়দের ঘরে ঢুকে ইয়ার্কি?' বলে একটানে আমার হাফ-পেন্টুল খুলে আমাকে আলমারির মাথায় তুলে দিলেন। শাসিয়ে বললেন— 'যদি টুঁ আওয়াজ করিস টুঁটি টিপে মেরে ফেলব।' বাইরে থেকে ছিটকিনি লাগিয়ে নতুন কাকু চলে গেলেন। এখন আমি কী করে ছাড়া পাই? সারা জীবন মানিকদের বাড়ির অন্দরমহলের তেতলার ঘরের আলমারির মাথায় শুকিয়ে মরব? অনেক, অনেক কাল পরে আমার ছোট্ট কঙ্কাল এখান থেকে পাওয়া যাবে? 'কাকিমা আ' আমি কান্না গলায় বললুম। ওই কাকিমা যাঁকে আমি খুন হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচালুম তাঁকেই আমি ডাকছি। কিন্তু কী আশ্চর্য, ঘরের মধ্যে তো কোনও কাকিমা নেই। ছাত থেকে যেমন মেম-বউ উঠে গিয়েছিল, ঘর থেকেও কাকিমা তেমনি একেবারে অদৃশ্য, তবে কি ভুল দেখেছি? এ-ও কি ভূতের কারসাজি?

অনেকক্ষণ পরে ভয়ে ভয়ে কিন্তু যৎপরোনাস্তি কাতর গলায় ডাকলুম—'পাকুমা-আ।' তারপরে আরও জোরে, গলায় কান্না মিশিয়ে—'পাকুমা-আ।' তারপর একেবারে কেঁদে ফেলে ভেউ ভেউ করে 'পাকু ম্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ।'

ঘরের দরজা খুলে গেল।

বিকেলের পড়ন্ত আলো পেছনে নিয়ে পাকুমা দাঁড়িয়ে। অন্ধকারে তিনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না। আমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছি। বরাভয়দাত্রী দেবী দুর্গা স্বয়ং যেন বা। যদিও তাঁর হাতে প্রহরণ নেই, তাঁর আলুলায়িত কেশ একেবারে ধবধবে সাদা। পরনে সাদা থান, বৃদ্ধ মুখ। সুইচ টিপে তিনি আলো জ্বাললেন। আমি এবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছি। পেছন থেকে তীরবেগে নতুনকাকুর প্রবেশ। তিনি আমাকে আলমারি থেকে নামিয়ে নিলেন।

পাকুমা বললেন— 'এ কী কাণ্ড নতুন? ও এখানে কী করে এলো?'

—'আরে লুকোচুরি খেলতে গিয়ে ঢুকবি তো ঢোক একেবারে বাঘের গুহায় ঢুকে বসে আছে। তাই বাঘ একটু রসিকতা করছিল।'

—'এ কী রকম রসিকতা নতুন? ছোট শিশুর সঙ্গে?'

—'ছোট শিশু? পরের জন্মে ও আবার ছোট শিশু হবে।'

—'ওর প্যান্ট কোথায়? তুমি খুলে দিয়েছ? ছি! ছি!'

নতুনকাকু জিভ কেটে বললেন— 'দিব্যি গেলে বলছি পাকুমা আমি খুলিনি, ছোঁড়াটা এমন আলগা পেন্টুল পরে এসেছে যে যেই আলমারির মাথায় তুলতে গেছি, খোসার মতো পেন্টুলটা পড়ে গেল।'

নতুনকাকু খুঁজেপেতে আমার প্যান্টটা বার করলেন— 'আয় পরিয়ে দিই।'

প্যান্টটা তাঁর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে পাকুমা বললেন, 'মিথ্যে কথা বলো না নতুন, তোমার স্বভাব আমি জানি।'

পাকুমার পেছন থেকে তীব্র একটা দৃষ্টি হেনে আমাকে শাসিয়ে নতুন কাকু দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন। ফোঁপাতে ফোঁপাতে পাকুমার কাছে প্যান্ট পরে নিয়ে আমি সিঁড়ির দিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দে-দৌড় দিলুম।

কিন্তু নতুনকাকুর হাত থেকে অত সহজে রেহাই পাই কি আমি? আমরা আর তো ওপরে যাইনি। বাগানে খেলি, উঠোনে খেলি, কিন্তু যেখানেই খেলি নতুনকাকু ঠিক কোথা থেকে উদয় হন। লাল ঠোঁটে হাসি নিয়ে লালচে মুখ ঝাঁকিয়ে আমাকে হাত নেড়ে নেড়ে ডাকেন তিনি। নিতুদাদা বলে—'নতুনকাকু কতক্ষণ ধরে তোমাকে ডাকছেন পুনপুন, যাও না। বড়দের কথা শুনতে হয় জানো না?'

আমি পায়ে পায়ে পিছিয়ে যাই, আর নতুনকাকু পকেট থেকে একটুখানি বার করে হার্সেস চকলেট দেখান। —'দেব, আমার সঙ্গে আয়।'

আমি পেছন ফিরে দৌড়তে যাই। তখন হঠাৎ খপ করে আমাকে পাঁজাকোলা করে নতুনকাকু দৌড়ন। পেছনে আমার খেলার সাথীরা মজা পেয়ে হাসতে থাকে। আমি হাত-পা ছুঁড়ছি। কিন্তু চিৎকার করতে পারছি না। আমার মাথাটা নতুনকাকুর পেটের ওপর প্রচণ্ড জোরে আটকে আছে। পেছনের ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে একেবারে সেই তিনতলার ঘরে নিয়ে গেলেন নতুনকাকু। দরজা বন্ধ করে দিচ্ছেন। আমি হাঁ করছি। নতুনকাকু দৌড়ে এসে আমার হাঁ বুজিয়ে দিচ্ছেন।

—'ভয় পাচ্ছিস কেন? একদম ভয় পাবি না। আমি একটা ভীষণ ভা-লোক। আর তুই ভী-ষণ ভা-ছেলে। নয়? মোটেই তোকে আলমারির ওপর তুলে দেবে না ভা-লোকটা।' বলতে বলতে তিন-চারটে চকলেট আমার হাতে গুঁজে দিচ্ছেন নতুনকাকু।

—'মৌরি লজেন্স খাবি? টফি? দাঁড়া।'

পকেট থেকে রঙিন কাগজে মোড়া দুদিক মোচড়ানো টফি বার করতে লাগলেন নতুনকাকু, আর ঠোঙা ভর্তি মুড়ি লজেন্স তাদের নীল, লাল, হলুদ, গোলাপি, বেগুনি রঙে আমার চোখে ধাঁধা লেগে গেল। তা হলে নতুনকাকু আমায় ক্ষমা করে দিয়েছেন! তা ছাড়া আমিও তো ভোজবাজিই দেখেছি। নতুনকাকু তা হলে একটা ভী-ষণ ভা-লোক? অনেক সাধ্য-সাধনার পর সেই মুড়ি লজেন্স মুখে দিয়ে তার সুগন্ধে বিভোর হয়ে আছি। নতুনকাকু বিদ্যুদ্বেগে আমার প্যান্ট খুলে নিলেন। আমি নিচু হয়ে নিজেকে ঢাকতে গেছি, নতুনকাকু হেসে বললেন— 'তোর জন্যে সুন্দর প্যান্ট এনেছি, মিকিমাউজের ছবি দেওয়া গেঞ্জি এনেছি হগ মার্কেট থেকে, এই প্যান্টটা ডাক্তারবাবু কোত্থেকে কিনেছে? তোর মতো সুন্দর ছেলেকে মানায়? এই দ্যাখ' বলে স্পঞ্জের মতো কেমন একরকমের কাপড়ের অদ্ভুত সুন্দর একটা লাল রঙের প্যান্ট, আর হলুদ রঙের মিকিমাউজ আর ডোনাল্ড ডাক ছাপ দেওয়া হাত-অলা গেঞ্জি বার করলেন তিনি। আমি কেন নতুনকাকুর প্যান্ট নেব? এ রকম নিতে নেই। কিন্তু নতুনকাকু দেবেনই। তাঁর সঙ্গে কি আমি জোরে পারি? প্যান্টটা আমাকে পরাতে পরাতে নতুনকাকু প্যান্টের নীচে আমার ছোট্ট চুটকিটা হাতড়াতে চটকাতে লাগলেন, আমার গা সিরসির করতে লাগল। আমি হাঁ করে চ্যাঁচাতে যেতেই তিনি আমার মুখে সশব্দে একটা চুমো খেলেন। আর ফোঁস ফোঁস করে বলতে লাগলেন— "জিনি বউদির থেকে অনেক, অনেক সু তুই, পুনপুন। আবার আসবি। আমি তোকে কত কী জিনিস দোব, ধারণাও করতে পারবি না, এই নে তোর পুরনো প্যান্টটা পরে নে। নতুন জামাগুলো প্যাকেটে করে নিয়ে যা। আবার আসবি। ডাকলেও আসবি, না ডাকলেও আসবি, অ্যাঁ!' আমাকে দু হাতে উঁচু করে তুলে ধরে, বেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে চুমু খেয়ে নতুনকাকু ছেড়ে দিলেন, আর আমি সেই প্যাকেট ঘোরানো সিঁড়ির ধাপে ফেলে রেখে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে নতুনকাকুর থুতু মুছতে মুছতে পালিয়ে এলুম। এইটেই কি আমার পাপের শাস্তি?

তারপর অনেক দিন। অনেক অনেক দিন যাইনি মানিকদের বাড়ি। প্রথমটা ভয় হয়েছিল আমি আর কোনওদিন হিসু-পায়খানা করতে পারব না। প্রথমবার হিসু পেতেই ভয়ে লাল হয়ে গেছি। ঘামছি। পমদিদি বলল—'ও কি পাবন, এরকম লাল হয়ে যাচ্ছিস কেন? কোঁতাচ্ছ কেন? কী হয়েছে?'

আমি কেঁদে ফেলে বলি—'পমপম আমি ছোট-বাইরে করতে পারছি না।'

পমপম বলল—'সে কী?' একটু পরে বাবাকে নিয়ে মা ও পমপমের প্রবেশ। বাবা বললেন—'খেলাধুলো করতে গিয়ে বোধহয় অনেকক্ষণ চেপে ছিল, তাইতেই... দাঁড়াও একটা ক্যানথারিস দিচ্ছি। পাবন, একটু চুপটি করে শুয়ো থাকো তো।'

বাবা ওষুধ দিয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরে বুঝতে পারলুম আমার প্যান্ট ভিজতে শুরু করেছে। দৌড়, দৌড়, কলঘরের দিকে দে দৌড়। মুক্তিতে স্বস্তিতে আমার মুখ চোখের জলে ভিজে যাচ্ছে। মানিকদের বাড়ি আমি আর যাব না। মানিক ডাকলেও না। এমন কি পাকুমা ডাকলেও না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সপ্তম অধ্যায়
শিব-পুরাণ

কিন্তু মানিকদের বাড়ি না গেলে কী হবে? পাকুমার গল্প আমায় তাড়া করে। সে যে কতদিন আগেকার গল্প-কথা সব, কোনও অন্য দেশের, চেনা অথচ অচেনা মানুষদের গল্প। পাকুমা বলবেন, অনেকটা হয়ে যাওয়ার পর আমাদের মনে হবে(ওমা, এ তো সত্যি! গল্প কখনও সত্যি হয়? সত্যি কখনও গল্প হয়? পাকুমা সেই গল্প-হলেও-সত্যি আমাদের বলেন।

পাকুমার দ্বিতীয় গল্প

সে একজন মানুষ ছিলেন। ঠাকুরদেবতা, শাস্তরের বিধান, ভূতপ্রেত, ওঝা-ঝাড়ফুঁক। সন্নিসি-মন্নিসি কিছুতেই বিশ্বাস করতেন না। তাঁকে ঘিরে ছিল এক চৌ-মহলা পড়ো বাড়ি আর মা আর ছোট্ট বউ। বাড়ির আঙনে এক শিবমন্দির, ভেতরে শুধু ত্রিশূল পোঁতা। লোহার সেই ত্রিশূলে মরচে ধরেনি কখনও। এমনি আশ্চর্যি! সবাই বিশ্বাস করত ত্রিশূলেশ্বর জাগ্রত দেবতা, দূর-দূরান্ত থেকে লোকে মানত করতে আসত। পুজো দিত, সিধে দিত, প্রণামী দিত, গরিব-গুরবো লোকে যে যেমন পারে। তাঁর মা সেইসব জড়ো করে সংসার চালাতেন। দুবেলা মাছ-ভাত, মোটের ওপর দাসী-চাকর, জামা-কাপড়-গামছা, ছেলের লেখাপড়ার খরচা এসবের কোনও ভাবনা ছিল না। ছেলে কলকাতায় থেকে পড়তেন। আর ছুটি-ছাটাতে বাড়ি আসতেন। এসে মায়ের কাজ-কর্ম দেখতেন আর গুম হয়ে যেতেন। একদিন মা আর বউ প্রণামীর বাক্সের টাকা-পয়সা গুনে-গেঁথে তুলছে আর টাকা, আটানি, চারানি, ফুটো পয়সা সব থাক দিয়ে দিয়ে সাজিয়ে রাখছে, এমন সময়ে ছেলে এসে বলল— কী হচ্ছেটা কি? বলি হচ্ছেটা কী?

মা বললেন—'দেখতেই তো পাচ্ছিস।'

—'আর কতদিন এই বুজরুকি চলবে?'

—'বুজরুকি? কী বলছিস রে শিবু?'

—'ঠিকই বলছি। বোকা অজ্ঞ লোকে একটা লোহার কাঠিকে ভক্তিভরে পয়সা দিয়ে যায়, তুমি সেইগুলো ...'

—'চুপ কর রে শিবু চুপ কর। ত্রিশূলেশ্বর শুনতে পেলে আর রক্ষা থাকবে না।'

ছেলে তখন অট্টহাসি হেসে বললে—'ও তোমার ঈশ্বর তাহলে এই বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেটায় শুনতে পান, তার বাইরে আর কান চলে না।'

মা তো ভয়ে চুপ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'শোনো মা, ওসব শিব-ফিব নেই। বোকা লোকে নিজেদের ঠকাতে পারে কিন্তু তুমি শিবশঙ্করের মা হয়ে তাদের ঠকাতে পারো না।'

—'আমি তো কিছু চাই না বাবা, মানত করে যায় সব, মনস্কামনা পূর্ণ হলে কিছু না-কিছু দেয়। কে পাঁচ আনা, কে সোয়া চার আনা, কে পাঁচটা টাকা, কে একটা গিনি।'

—'কাকে দেয়?'

—'বাবা ত্রিশূলেশ্বরকে।'

—'তো তুমি কেন আত্মসাৎ কর?'

—'আত্মসাৎ কী পাকুমা?'

—'তুই বড্ড বিরক্ত করিস পুনপুন, পাকুমা তারপর?'

মা বললে—'আমি বাবার পুজোর ব্যবস্থা করি, মন্দির পরিষ্কার রাখি, ভোগের ব্যবস্থা করি।'

—'ত্রিশূল খায়?'

—'ত্রিশূলেশ্বর খান।'

—ত্রিশূলেশ্বর যদি সত্যি দেবতা হতেন তোমার ভোগের অপেক্ষা রাখতেন? বিশ্বসংসারে তাঁর আর খাবার জুটত না?'

(আমাদের বাড়িতে পমপমও পুজো করে। পমপমও ভোগ দেয়, সকালে সন্দেশ আর রাত্তিরে বাতাসা। হরির লুঠ হয় একেক দিন 'হরির লুঠ পড়েছে আনন্দের আর সীমা নাই/ চাঁদবদনে হরি বলো ভাই।' আমাদের ঠাকুরঘরে কৃষ্ণঠাকুরের মূর্তি আছে, চকচক করে, আর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঠাকুর আর ভোলাগিরি ঠাকুর আর মহাত্মা কাঠিয়া বাবা আর বালানন্দ ব্রহ্মচারী। একেক দিন যেমন জন্মাষ্টমীতে নুচি, ক্ষির, এইসব ভোগ দেওয়া হয়। আমি ভাবি কৃষ্ণ আর বিজয়কৃষ্ণ আর ভোলাগিরি সব এক পাতে খাচ্ছেন, যেমন বুবু-বুনবুন- পুনপুন খায়। কিন্তু অতজন মিলে খেলেও অনেক থেকে যায়, আমাদের আধখানা করে নুচি-ক্ষির পেসাদ হয়ে যায়। পেসাদের জন্যে কতক্ষণ আরতি দেখতে হয়, ভজন শুনতে হয়।)

—'জোটে তো নিশ্চয়ই' —শিবশঙ্করের মা বললেন, 'তবে তাঁকে দিয়ে আমাদের তৃপ্তি।'

—'কিসের তৃপ্তি? পরিবারবর্গ নিয়ে খ্যাঁট হচ্ছে তার তৃপ্তি?'

—'যা তা বলিস নে শিবু', এবার মা রেগে গেছেন —'জানিস আমার ত্রিশূলেশ্বর জাগ্রত ঠাকুর, কত বছর ধরে তাঁর গায়ে এতটুকু মরচের দাগও পড়েনি!'

—'তেল দিয়ে রোজ নাওয়াও না, বেশ চুকচুকে করে?'

—'না নাওয়ালেও মরচে পড়বে না।'

—'দিল্লিতে একটা মৌর্যযুগের লোহার স্তম্ভ আছে। তাতেও মরচে পড়েনি। সেটাকে কিন্তু কেউ স্তম্ভেশ্বর বলে না। বরং সেটা নিয়ে দেশ-বিদেশের লোক গবেষণা করছে।'

—'তাতে কী হল? আমার ত্রিশূলেশ্বর স্বয়ং কল্যাণময় শিব। তাঁর দয়া না হলে আজ আর বেঁচে থাকতে হত না। জ্ঞাতিরা তো সমস্ত জমিজমা হাত করে নিয়েছে। নিরাশ্রয়টা তো করতে পারেনি।'

—'এর পরে কোনওদিন বলবে ছেলে ডাক্তারি পাস করেছে ঠাকুরের দয়ায়। নাতিপুতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হচ্ছে ঠাকুরের দয়ায়। আমি ওর মধ্যে নেই। আজ থেকে তোমার ওই বুজরুকির অন্ন আমি খাবো না।'

(নাতিপুতি তো ঠাকুরের দয়াতেই হয়। শিবশঙ্কর এটা যে কেন বুঝলেন না! আমার মা তো ছাতে কোল পেতে বসে বসে একটার পর একটা পমপম, টমটম, ইন্দ্র, সূর্য চেয়েছেন, পুনপুন-বুনবুন বুবু চেয়েছেন তাই আমরা সবাই এসেছি। আমরা 'তেমজ' কী করে হলুম বলো তো? মা তিনবার বলেছিলেন—'চাই, চাই, চাই।' প্রথম 'চাই'টা খুব জোরে বলেছিলেন তাই বুবু হল মোটাসোটা, তারপরের 'চাই' দুটো আস্তে হয়ে গিয়েছিল বলে আমি আর বুনবুন রোগা হই।)

—'তো কী খাবি? তোর ডাক্তারি পড়ার খরচ আমাদের খোরাকি সব জুটবে কোত্থেকে?'

—'শিবোহহম। শিব যদি এখানে কেউ থাকে তো সে আমি। তুমিও শিব। কিন্তু তুমি মূর্খ, বৃদ্ধ, মেয়ে-শিব বলে তোমায় ছেড়ে দিচ্ছি। তোমার বউমাও বালিকা, অজ্ঞ, ভীরু শিব। আস্তে আস্তে চৈতন্য হলেই সাহসী শিব হয়ে উঠবে। আজ থেকে নোটিস টাঙিয়ে দেবে মন্দিরে কেউ প্রণামী দিতে পারবে না। আমার নিজের খরচ আমি যেমন করে প্যারি চালিয়ে নেবো।'

(আমাদের তে-রাস্তার মোড়ে একটা শিবমন্দির আছে। শিবরাত্রির দিনে সেখানে মেয়েদের খুব ভিড় হয়। মা-ঠাকুমা-পিসিমা সারাদিন উপোস করে পুটপুট দিদি আর আমাকে সঙ্গে নিয়ে পুজো দিতে যান তো। ভেতরে শিবলিঙ্গ আছে, সামনে মাটিতে একটা ত্রিশূল পোঁতা আছে। শিবলিঙ্গের গায়ে চন্দ্রবিন্দু আছে। ডাব আর বেল, ডাব আর বেল পুজো পড়ে। মেয়েরা দুধ ঢালে শিবের মাথায়, তখন আমার খুব ভালো লাগে, আমাদের খাওয়ার দুধগুলোও কেন যে মা শিবের মাথায় ঢেলে দেন না! শিবলিঙ্গের গৌরীপটে অনেক পয়সা পড়ে থাকে। সামনেও। এই সব প্রণামী। একজন বুড়োমতন মানুষ বসে থাকেন ভেতরে। খুব চুপচাপ, গম্ভীর। খালি থেকে থেকে বলেন, 'একটু ধৈর্য ধরুন, মা একটু ধৈর্য ধরুন।' তিনি চ্যাঙারির পুজো শিবলিঙ্গের গায়ে ঠেকিয়ে ফেরত দেন। আমি জানি উনিই আসল শিব। লোকে বুড়ো শিব বলে না? ঠাকুর তো মানুষের মতো, একটা পাথরের হামানদিস্তের ডাঁটি তো আর আসল ঠাকুর হতে পারে না! শিবশঙ্করের ধারণার সঙ্গে আমার ধারণা কোথাও কোথাও মিলে যাচ্ছে।)

নোটিস নিজ হাতে টাঙিয়ে শিবশঙ্কর কলকাতা চলে গেলেন। মা ভেবে ভেবে সারা। তখন আমি বুজিয়ে সুঝিয়ে বললুম—'ভাবছো কেন মা? ভাবতে বারণ করেছেন যখন তখন নিশ্চয়ই কোনও ব্যবস্থা হয়েছে। বরং এসো, আমরা আমাদের ব্যবস্থা আরম্ভ করি। আমরাও তো শিব গো! তো আমাদের যা বুদ্ধি আসবে মাথায় সে-ও শিবের বুদ্ধি।'

প্রণামী বন্ধ হলে কী হবে। মানতের জিনিস তো আর বন্ধ হল না। ঠাকুরকে কাঁচা সিধে দিত সব। সে তো বন্ধ হল না। গোয়ালা শিবঠাকুরের জন্যে দুধ দিত, শিবকে নমো নমঃ করে আমরা সব পেট্টায় করতুম।'

—'আপনি সেখানে কোত্থেকে এলেন পাকুমা?'

—'আরে শিবশঙ্করের সেই ছোট্ট বউটাই তো আমি?'

—'তুমি? সুভগা? সরল-সুন্দরের যে দিদি বানের জলে ভেসে গিয়েছিল?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'যে পরশমানিক পেয়েছিলেন গোখরোর থেকে?'

—'হ্যাঁ রে হ্যাঁ, আমিই সেই।'

—'তারপরে?'

তারপরে শিবশঙ্কর তো দিব্যি পাস-টাস করে গ্রামে এসে বসল। বলল—'ইংরেজ সরকারের চাকরি করব না।'

—'তবে প্র্যাকটিস কর।'

—'সে অনেক টাকার ব্যাপার। দেখা যাক কী হয়।'

শেষে একদিন এক রাজ-এস্টেটে চাকরি হল শিবশঙ্করের। সে চাকরি পাওয়াও ভারি মজার ব্যাপার। সদরের দোকানে ভালো দরজিকে চোগা চাপকান তৈরি করতে দিলে শিবশঙ্কর। ইন্টারভিউ দিতে যেতে হবে রাজামশাইয়ের দেওয়ানের কাছে। আগের দিন গিয়ে দেখে—চাপকানটা হয়নি। ব্যস তক্ষুনি সেটা ফেরত নিয়ে চলে এলো। মাকে বলল—'বাবার একটা চাপকান ছিল না তোরঙ্গে?'

—'সে তো ছেঁড়া। পচা!'

—'বারই করো না।'

সেই চাপকানটারই আগাগোড়া সেলাই খুলে ফেললেন শিবশঙ্কর। আস্তর টাস্তর সবসুদ্ধু। তারপর তার মাপে বসিয়ে বসিয়ে কাপড় কাটলেন। এক রাত্তিরের মধ্যেই সেই চাপকান হাতে সেলাই করে তার পরদিন সকালের ট্রেনে রওনা হয়ে গেলেন।

মা কিছুতেই ত্রিশূলেশ্বরকে ছেড়ে যেতে চাইলেন না। তখন স্ত্রী আর ছোট্ট ছেলেটিকে নিয়ে শিবশঙ্কর রাজ এস্টেটে চলে গেলেন। সেই রাজ্যে শিবশঙ্করের মস্ত বড় দোতলা বাড়ি, দাস-দাসী, কত আসবাব, কত ঐশ্বর্য, কালো ওয়েলার ঘোড়ার টমটম গাড়ি। শিবশঙ্করের সেখানে এমন সুনাম হল যে রাজামশাইয়ের অনুমতি নিয়ে তিনি সাধারণ লোকেদেরও চিকিৎসা করতে লাগলেন।

এদিকে হল কি, শিবশঙ্কর তো মায়ের কাছে নিয়মিত টাকা পাঠাচ্ছেন, আর মা সেই টাকা দিয়ে একটু একটু করে সেই চৌমহলা সারিয়ে তুলছেন। একবার ঘটল এক কাণ্ড। রাজামশাইয়ের মা রানিমার পেটে অসহ্য যন্ত্রণা। শিবশঙ্কর দেখে বললেন, পাথরি। পিত্তথলিতে অস্ত্র করতে হবে। আয়োজন করুন। আমি জিনিসপত্রের সব ফর্দ করে দিচ্ছি, শহর থেকে আনান। অস্ত্র করলেই ভালো হয়ে যাবেন।' তা পুরনো এক রাজবৈদ্য মাথা নেড়ে বললেন, —'মেয়েমানুষের পেটে পাথর হয় জীবনে কখনও শুনিনি।' আশেপাশের রাজ্যে যত বৈদ্য যত ডাক্তার ছিলেন, ওই একই কথা বললেন। তখন রাজামশাই একটু ভয় খেয়ে বললেন, 'ডাক্তারবাবু, কলকাতা থেকে একজন সাহেব ডাক্তার আনাই, কী বলেন? আর একজনের কথা শোনা ভালো।'

—'আনান,।'

তা কলকাতার সাহেব ডাক্তার এসেও ওই একই কথা বলল।

—'গল ব্লাডারে স্টোন হয়েছে, অপারেশান করাতে হবে।'

রানিমা উঠে বসে বললেন—'আমি তখনই বলেছিলাম, ডাক্তারবাবুর ভুল হতে পারে না। আমি ওঁর হাতেই অপারেশান হব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজা তো স্বয়ং গাড়ি নিয়ে ছুটলেন।

—'কী গাড়ি পাকুমা, স্টুডিবেকার না টমটম?'

—'সে এক মস্ত হাওয়া-গাড়ি তার নাম রোলসরয়েস।'

দেখেন ডাক্তারবাবুর গাড়িতে মাল উঠছে। তোরঙ্গ, সুটকেস, বোঁচকা-বুঁচকি।

—'এ কি ডাক্তারবাবু, কোথায় চললেন?'

—'দেশে যাচ্ছি রাজাবাবু।'

—'সে কি? মায়ের অপারেশান করতে হবে না?'

—'ডাক্তার তো এসেছেন, তাঁকে দিয়েই করান।'

—'রাগ করেছেন ডাক্তারবাবু?' রাজামশাই থতমত।

(এইখানে আমার আর মানিকের মনে দুটো প্রশ্ন জাগে। আমরা তর্ক বাধিয়ে দিই। মানিক বলে—ডাক্তারবাবুর রাগ করার কী আছে? লোকের পেট কাটার মতো বিচ্ছিরি কাজ থেকে কেউ যদি অব্যাহতি পেয়ে যায় সে তো ভালো কথা! আমি ডাক্তারের ছেলে, ডাক্তারের নাতি, আমি রক্তের মধ্যে ডাক্তারদের মান-অভিমানের ব্যাপারটা বুঝি, তাই মানিকের সঙ্গে সহমত হই না। আমার আবার অন্য একটা ব্যাপারে সংশয় জাগে। রাজামশাইরা থতমত খান? খান নাকি?)

—'তোরা কি শুনবি?' পাকুমা বললেন। তিনি আরও বললেন— 'সাহেব ডাক্তারের শ্রেষ্ঠত্বে রাজামশাই বিশ্বাস করেছিলেন বলেই শিবশঙ্কর আরও রেগে যান। আমাকে তিনি বলেন—রাজামশাইরাও অবশ্যই থতমত খান। এঁরা রাজাই কি আর ইংরেজদের মতো ত্যান্ডাই ম্যান্ডাই!

যাই হোক, হাজার সাধাসাধিতেও শিবশঙ্করকে নড়ানো গেল না। তিনি বললেন—'রাজামশাই, ডাক্তার বিজ্ঞান মেনে চিকিৎসা করেন ঠিকই। কিন্তু তার আত্মবিশ্বাসের অনেকটাই আসে রোগী ও তার আত্মীয় পরিজনের বিশ্বাস থেকে। আমাকে ছুটি দিন। খোলা মনে আমি ছুরি ধরতে পারব না।'

দেশে ফিরে এসে শিবশঙ্কর দেখেন চৌমহলা বাড়ির দু মহলা মা ভেঙে ফেলে দিয়েছেন। সেখানে সেগুন চারা লাগানো হয়েছে। আর বাকি দু মহল সারাই ঝালাই হয়ে ঝলমল করছে। বাপ-পিতেমোর আমলের আসবাবগুলি পালিশ পেয়ে জ্বলজ্বলে, ঝাড়লণ্ঠন, দেওয়ালগিরি, নতুন গদী, নতুন বিছানা। শিবমন্দির ধবধবে সাদা, ভেতরে ত্রিশূলেশ্বর তেলচানের পর এবার দুধচান করছেন। কাতার দিয়ে লোক এসেছে ঠাকুর দর্শন করতে।

শিবশঙ্কর বললেন, 'মা, এ কী?'

মা বললেন—'শিবোহহম। তুইও শিব, আমিও শিব বাবা। তুই শিব যা পারিস করেছিস। আমি শিবও করেছি আমার বিবেকবুদ্ধিতে যা বলে।'

(এইখানে মানিক আর আমি মুখে হাত চাপা দিয়ে খুকখুক করে হাসি। 'শিবোহহম'টা দুবার দুজনের মুখে শুনেই প্রধানত আমাদের হাসিটা পায়।)

—'বিবেকবুদ্ধি? না বিষয়বুদ্ধি?' শিবশঙ্কর গর্জন করলেন।

মা বললেন—'ভেতরের শিব যা বুদ্ধি দিয়েছেন তাই করেছি বাবা, বিবেক না বিষয় অত মাথা ঘামাইনি। তবে ত্রিশূলেশ্বরের পুজো বন্ধ করবার চেষ্টা করলে এবার দশ গাঁয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকে তোকে দেশছাড়া করবে তা বলে দিলুম।'

তখন শিবশঙ্কর রেগেমেগে বললেন—'ঠিক আছে। তুমি বিষয়বুদ্ধিতে মূর্খ লোকের কাছ থেকে আত্মসাৎ করেছ, আমি তা যতদূর পারি ফিরিয়ে দিই।'

তিনি দেশে গ্যাঁট হয়ে বসলেন। বিনি পয়সার ডাক্তারি। কোনও রাজ এস্টেটের ডাক্তার অমুক গাঁয়ে এসে বসেছেন, এ-ও ত্রিশূলেশ্বরের আরেক দয়া বলে দশ গ্রামের লোক ডাক্তারবাবুর কাছে উপুড় হয়ে পড়ল। ডাক্তারবাবু পয়সাকড়ি তো নেন না। ওষুধের দাম সচ্ছল অবস্থার রুগিদের কাছ থেকে নেন শুধু তবে লোকে তাদের ভক্তি-ভালোবাসার চিহ্নগুলি অন্দরে মা-ঠাকরুন, বউ-ঠাকরুনের কাছে দিয়ে যায়। ক্রমে গাঁয়ের লোকেদের চেষ্টাতেই এঁদের যে বিশাল বাগানগুলো বেহাত হয়ে গিয়েছিল সে সব এঁরা ফিরে পেলেন।

কিন্তু শিবশঙ্করের স্ত্রী খালি খুঁতখুঁত করে। ছেলেরা মানুষ হবে না? বাবার মতো ডাক্তার হবে না? শিবশঙ্কর বলেন—'ডাক্তার হতে হবে না, ওরা চাষ-আবাদ শিখুক। এত জমি জায়গা।'

ভালোভাবে চাষবাস করুক, ভদ্দল্লোক বলেই সব গ্রাম ছেড়ে শহরে যাবে, চাষ-আবাদের কাজে গা দেবে না—এ ভাল নয়। তারপরে দেখা যাক না কী হয়। মায়েরও তাই মত। খালি বউয়ের মনের খুঁতখুঁতনি যায় না। শিবশঙ্কর কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে পড়েছেন, রাজ-এস্টেটে কাজ করেছেন, কত তাঁর দাপট, কত তাঁর পালিশ, ওরকম ব্যক্তিত্ব কি আর জগৎসংসারে পাঁচটা জিনিস না দেখলে-শুনলে হয়। ছেলেগুলো যেন গেঁয়ো ভূত হয়ে যাচ্ছে দিন-কে-দিন। না সত্যিকারের চাষী, না ঠিকঠাক ভদ্দল্লোক।

(আমরা ভালো হয়ে বসি। ঠিকঠাক ভদ্দল্লোক হতে হবে তো? ঠিকঠাক ভদ্দল্লোক মানে বাবা, ঠাকুর্দা, দাদাভাই। আমি বাবু হয়ে বসে বাঁ হাতটা ত্রিভুজের মতো করে বাঁ হাঁটুতে স্থাপন করি। দাদাভাই এমনি করে বসে খান। এইটাই বোধহয় ভদ্দল্লোকের সবচেয়ে বড় লক্ষণ। মানিকও আমার দেখাদেখি ওইরকম করতে যায়।)

এই সময়ে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। শিবের থানে এক বিদেশি বিধর্মী মহিলার ভর হল।

—'ভর কী পাকুমা?'

—'বামুন ঠাকুরনের ওপর মঙ্গলচণ্ডীর ভর হয়, দেখিসনি?'

—'ওইরকম চোখ লাল করে ঘোরাবে আর হারানো জিনিস কোথায় আছে বলে দেবে?'

—'ঠিক। ওইরকম।'

ভদ্রমহিলা সাদা রঙের পোশাক পরা এক মেমসাহেব। জার্মানির য়িহুদি। তিনি শিবমন্দিরের চাতালে বসে পড়ে বলতে থাকলেন—ইয়াওয়ে বলেছেন সব ধ্বংস হয়ে যাবে। জার্মানি ধ্বংস হয়ে যাবে, য়িহুদিরা নিঃশেষ হয়ে যাবে। তারা ইউরোপ থেকে পালিয়ে যাক। তিনি বলছিলেন জার্মানে আর ভাঙা ভাঙা ইংরাজিতে। লোকে তাই শিবশঙ্করকে ডেকে আনলো। শিবশঙ্করের বাড়ির দুই ইয়া ইয়া চেহারার দাসী তাঁকে চ্যাংদোলা করে তুলে এনে অন্দরবাড়িতে শোয়ালো। মুখে-চোখে জলের ঝাপটা, শিবশঙ্কর ইনজেকশন দিলেন। ভদ্রমহিলা ঘুমিয়ে পড়লেন। ওমা অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে-টুমিয়ে উঠে তিনি চেঁচাতে লাগলেন—'চ্যান্নামিট্টা চ্যান্নামিট্টা।' অনেক চেষ্টা করে বোঝা গেল তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ত্রিশূলেশ্বরের চরণামৃত চাইছেন।

—'পাকুমা, আমার পিসিমা বলেন চন্নামিত্তির, ঠাকুমা বলেন চরণামৃত, ঠাকুদ্দা বলেন চরণামিত্র, কোনটা ঠিক?'

মানিক পাকুমাকে বলতে দেয় না। সে বলে—'চরণামিত্রটাই ঠিক। আর মেয়েরা তো সব কথাই ভুল বলে তাই পিসিমা-ঠাকুমারটা ভুল। মেয়ে বলে চলে যায়।'

পাকুমা বোধহয় একটু বিপদে পড়ে যান। আমার গুরুজনদের ভুল-ঠিক বিচার করার ভার তাঁকে দেওয়ায় তিনি ভারি অস্বস্তিতে পড়েছেন। তিনি বললেন('গল্পটা শুনবি তোরা? না খালি বাধা দিবি?'

—'আচ্ছা, আচ্ছা, বলুন/বলো,' আমরা সমস্বর।

শিবশঙ্কর কঠোরভাবে বললেন—'আপনি একজন শিক্ষিত ইউরোপীয় হয়ে এসব বাজে বুজরুকিতে বিশ্বাস করেন?'

বলতে না বলতেই, তাঁর মা তুলসীপাতা দেওয়া দুধ-মেশানো এক চামচ জল তাঁর মুখে ঢেলে দিলেন, তিনিও কোঁৎ করে সেটা গিলে নিলেন। তারপর বললেন—ছ মাস আগে এই মায়ের কাছে চ্যান্নামিট্টা খেয়েই তিনি ইউরোপ ভ্রমণে যান, এবং তখন থেকেই তাঁর এই অলৌকিক ক্ষমতা হয়েছে। মাঝে মাঝেই তাঁর ভর হয়। এবং তিনি ভবিষ্যৎ দেখতে পান। সেমিটিক জাতির খুব দুর্দিন আসছে এ তিনি জার্মানির হাইডেলবার্গ শহরে বসে বলেছিলেন। আর এইজন্যেই তিনি তাঁর একমাত্র মেয়েকেও ইন্ডিয়াতে রাখতে চান। এখানকার স্কুলেই সে পড়বে তাকে আর জার্মানি যেতে হবে না।

শিবশঙ্কর বললেন—'তোমার হিস্টিরিয়া হয়েছে। ছ মাস আগে হঠাৎ এখানে এসেছিলে কেন?'

—'আমার স্বামীর দুরারোগ্য অসুখ হয়েছিল, সব কিছু করা হল, কিছু হল না, তখন এ দেশীয় কজন বন্ধু আমাদের ত্রিশূলেশ্বর শিবের কথা বলেন। আশায় আশায় মানত করি।'

—'তোমার স্বামী বেঁচে উঠেছেন?'

—'না। আমি স্বামীর জীবন প্রার্থনা করিনি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যন্ত্রণাহীন মৃত্যুকামনা করেছিলাম। তাই হয়েছিল।'

—'কেন? ত্রিশূলেশ্বরের কাছে মানত করলে যদি সবই মেলে তো স্বামীর জীবন চাইলেই তো পারতে?' শিবশঙ্কর শ্লেষ করে বললেন। ('শ্লেষ' কেন বললেন পাকুমা? কথাটা তো 'শ্লেষ্মা', ঠাকুর্দা বলেন। শিবশঙ্কর কি ঘড়ঘড়ে গলায় কথা বলেছিলেন?)

—'না, তা কী করে চাইব? গ্যাংগ্রিনে আমার স্বামীর হাঁটু পর্যন্ত কাটা পড়েছিল। দুটো পা-ই বাদ। বেঁচে থেকেই বা তিনি কী জীবন যাপন করতেন? তাঁর ইচ্ছা অনুসারেই তাঁর মৃত্যু চেয়েছিলাম। মাস ছয়েক আগে সেই প্রার্থনা পূর্ণ হওয়ায় মন্দিরে মানতের অর্ধাংশ দিয়ে গেছি। আর অর্ধাংশ আনতে ইউরোপে গিয়েছিলাম।

—'কী দিয়ে গেছো? শিবশঙ্কর অবাক হয়ে জানতে চাইলেন।'

—'আমার সম্পত্তির দলিল।'

—'তার মানে—

শিবশঙ্কর তাঁর মার দিকে চাইলেন ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা বললেন—'আমি তো কিছু জানি না বাবা!' তখন প্রণামীর বাক্স উপুড় করে তলায় সেই দলিল পাওয়া গেল।

শিবশঙ্কর বললেন—'এ সব কী করেছেন? এ তো পাগলামি।'

—'না। ওই সম্পত্তি তোমাদের পরিবারকে আমি দানপত্র করেছি। মেয়েকে আনতে গিয়েছিলাম। মেয়েকেও তোমাদের দিয়ে দিয়েছি। সে-ই আমার মানতের দ্বিতীয় অর্ধ।

শিবশঙ্কর রেগে কাঁই হয়ে বললেন—'এরকম দান করা যায় না। এ সব পুতুলপুজো না তোমরা ঘৃণা করো?'

—তুমি বললেই হল?'—ইহুদি মহিলা বললেন—'আমরাও এক সময়ে পৌত্তলিক ছিলাম। বাল, লট এইসব কত দেবতার পুজো করতাম। যাগযজ্ঞ করতাম, বলি দিতাম। এখন অবশ্য করি না। কিন্তু এইটুকু বুঝি যে ইয়াওয়ে সর্বভূতে আছেন। সাধনা-একাগ্রতার ফলে তিনি কোথাও কোথাও জাগ্রত হয়ে ওঠেন। যেমন তোমাদের এই ত্রিশূলেশ্বর। এ তো পুতুল নয় একটা প্রতীক। আমরাও তো গ্রন্থ পুজো করি। যাই হোক, এখানে যে ইয়াওয়ে জাগ্রত হয়েছেন তাতে আমার কোনও সন্দেহ নেই। আমি এখানেই থাকবো। তোমাদের বাড়িতে থাকতে না দাও, আমার স্বামীর যেটুকু টাকাপয়সা আছে তাই দিয়ে এখানে কুটির বেঁধে থাকবো। মেয়েকে তো তোমাদের নিতেই হবে, সে ত্রিশূলেশ্বরের সেবা করবে।'

শিবশঙ্কর বললেন—'তোমার সম্পত্তি আমরা নেব না। মেয়েকে দেওয়া আবার কী? জন্মেও এরকম বিদঘুটে কথা শুনিনি। আমি তোমার চিকিৎসা করছি। স্বামীর রোগ আর মৃত্যুর শোকে তোমার গুরুতর নার্ভের অসুখ হয়েছে। তবে ভালো হয়ে যাবে।'

মহিলা বললেন—'চিকিৎসা করো তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু সম্পত্তি না নিলে আমি না খেয়ে মরব। ওষুধ তো দূরস্থান, জলগ্রহণ পর্যন্ত করব না। আর মেয়েকে দেওয়াই বা হবে না কেন? আব্রাহাম কি আইজাককে বলি দিতে যাননি? আমি ভগবানের সেবায় দিচ্ছি...'

শিবশঙ্কর এবার রেগে জ্ঞানহারা হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

(আমার আর মানিকের চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছে। মেমসাহেবের মেয়েকে কখন বলি দেবে। জানতে আমরা উৎসুক।)

শিবশঙ্করের স্ত্রী বলল—'আচ্ছা মেমসাহেব, তুমি তো দিলে, কিন্তু তোমার মেয়ে তো ঘটিবাটি নয়। সে তো একজন মানুষ, তারও তো মতামত আছে। সে যদি রাজি না হয়?'

মেমসাহেবের নাম অ্যালিস। সে ভাবিত হয়ে বলল,—'সে সম্ভাবনা যে একেবারে নেই তা নয়। কিন্তু আমার মেয়ে অত্যন্ত লক্ষ্মী মেয়ে, যা বলব তাই শুনবে বলেই মনে হয়।'

তখন শিবশঙ্করের বউ বললে—'তার চেয়ে এক কাজ করলে হয় না! ডাক্তারবাবুর চিকিৎসায় তুমি অন্তত মাস ছয়েক এখানে থাকো। তারপরেও যদি তোমার মত না বদলায়, তুমি আমার এক ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দাও।'

—'ঠিক বলেছো, ঠিক বলেছো'—অ্যালিস উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

ছ মাস কেটে গেল। অ্যালিসের আর ভর হয় না। কিন্তু সে তার সংকল্পে অটল। অনশনে প্রাণত্যাগ করবে তবু দানপত্র ফেরত নেবে না।

অবশেষে ঠিক হল শিবশঙ্করের স্ত্রী ওই সম্পত্তি দিয়ে কলকাতায় একটা বাড়ি কিনবেন। সেখানে শিবশঙ্করের তিন ছেলে ও অ্যালিসের মেয়ে তাঁর তত্ত্বাবধানে পড়াশোনা করবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই হল। অ্যালিস দেশে বিদেশে তীর্থযাত্রা করেন, আর কলকাতার বাড়িতে বিশ্রাম করতে আসেন। গ্রামে যান না শিবশঙ্করের গালাগালি খাবার ভয়ে।

শিবশঙ্কর এত রেগে গেলেন যে তাঁর স্ত্রী ছেলেদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করলেন। তাঁদের একটি মেয়েও ছিল। রাগ করে মেয়েটির বিয়ে দিয়ে দিলেন। আর কালক্রমে অ্যালিসের মেয়ে নেলীর সঙ্গে শিবশঙ্করের বড় ছেলের বিয়ে হল।

পাকুমা এতক্ষণ যেন ঘোরে ছিলেন। এবার বললেম—'বলো তো মণিমাণিক্য কাজটা ঠিক হল না ভুল হল।'

—'কোন কাজটা?'

—'এই যে শিবশঙ্কর " না" করা সত্ত্বেও তাঁর বউ ছেলেদের শহুরে শিক্ষার জন্য অ্যালিসের কথা মেনে নিয়ে কলকাতায় বাড়ি করে থাকতে লাগলেন। শিবশঙ্কর তো আর তাঁর সঙ্গে সম্পর্কই রাখলেন না। বলো তো মানিক ঠিক হল কি না।'

মানিক বলল, —'ঠিকই তো হয়েছে, না হলে ছেলেরা শহরের ইস্কুলে পড়বে কী করে?'

আমি বললুম, —'তা ছাড়া, নইলে তো অ্যালিস অনশনে প্রাণত্যাগ করত পাকুমা!'

—'তবে?' পাকুমা অন্যমনস্ক হয়ে বললেন। বলে বসেই রইলেন।

—'পাকুমা ও পাকুমা শাঁখ বাজাবেন না?' আমি তাঁকে আলতো করে ঠেলি।

(ত্রিশূলেশ্বর, তুমি যদি সত্যকারের ঠাকুর হও, তাহলে খুকুকে আগের মতন করে দাও।)

পাকুমা কথা বলেন না। উঠে পড়েন। একটু পরেই ঠাকুরঘর থেকে শাঁখের আওয়াজ ভেসে আসে। আমি এক শাঁখের আওয়াজ থেকে আর এক শাঁখের আওয়াজে ভেসে যাই। পাকুমার শাঁখ থেকে মায়ের শাঁখ। সিংবাড়ি থেকে সিংহবাড়ি। মেমসাহেবের ভর হওয়ার অদ্ভুত দৃশ্য চোখে নিয়ে। রাত্তিরে, খাবার সময়ে, যখন খুব ঢুল এসেছে, তখনই একবার মনের মধ্যে চিড়িক করে খোঁচা মারে একটা কথা—আরে, শিবশঙ্করের বউই তো পাকুমা, পাকুমাই তো সুভগা! তাহলে সেই অ্যালিস, সেই নেলী, সেই তিন ছেলে, তারা কি এই সিংবাড়িতেই বাস করেছিল? এই বাড়িটায়? আমাদের সামনে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অষ্টম অধ্যায়

মাঠে-গোঠে

পুনপুন মানিকদের বাড়ি যাবে না নতুন কাকুর ভয়ে, বারো নম্বরে যাবে না বুনবুনের ভয়ে, তাহলে পুনপুন কোথায় যাবে?

শীত-শীত রবিবারের সকালে উঠে দাঁত মাজতে মাজতে পুনপুন তাই ছোট চৌবাচ্চায় নিজের ছায়া দেখে। একবার করে কুলকুচি করে আর জলে ইঁ করে দাঁতের ছায়া দেখে, কিছুতেই আর পছন্দমতো হয় না। তাই সে বাঁ হাতের পাতায় সাদা মাজন আর একটু ঢেলে নেয়, ডান হাতের তর্জনী আঙুল দিয়ে আবার বারকয়েক ঘষে ঘষে মাজে। তারপর আবার ঝুঁকে পড়ে চৌবাচ্চায় নিজের ছায়া দেখে, মুখ থেকে টুপ করে এক ফোটা সাদা-মাজন ফেনা-থুতু চৌবাচ্চার জলে পড়ে। পুনপুন এদিক-ওদিক তাকিয়ে মগে করে সেটা তুলে ফেলে দেয়। সবটা কি আর পারে? খানিকটা চৌবাচ্চার জলে মিশে যায়। এই ভাবে পুনপুন স্রেফ অনবধানতায় তার দ্বিতীয় পাপ করে ফেলে। এটা যে পাপ সেটা তার গোড়াতে মনে হয়নি অবশ্য। পিসিমা যখন রান্নাঘর থেকে উঁকি মেরে বললেন— 'পুনু, চৌবাচ্চার কাছ থেকে সরে গিয়ে দাঁত মাজ, এক্ষুনি ছিষ্টি নোংরা করবি। নোংরা জলে হাত ধুয়ে তারপর চোদ্দো পুরুষ নরকস্থ হোক,' তখন পুনপুনের জ্ঞান হয়।

চোদ্দোপুরুষ মানে সে জানে। ঠাকুর্দা, বাবা, পালক, ই-দাদা, সু-দাদা, অংদাদা, সে, বুনবুন, কানু মামুফুল, দাদাভাই, বড়মামা, বর্মার জ্যাঠাবাবু আর টেকন— এই চোদ্দোজন তাদের বাড়ির চোদ্দোটি পুরুষ, এরা সবাই নরকস্থ হবে। সেই কড়া, সেই তেল, সেই ছ্যাঁক-ছোঁক করে যমদূতের মানুষ-ভাজা। কিন্তু পাপ সম্পর্কে সচেতন হবার পরও তার এমন সৎসাহস হয় না যে সে স্বীকারোক্তিটা করবে। চৌবাচ্চার জলটা ছেড়ে দেওয়া উচিত। সে অবশ্য এখানে চার হাত পা মেলে শুয়ে শুয়ে সাঁতার কাটে। কিন্তু এখন খুব গা সিরসির করছে শীতে, তা ছাড়া চৌবাচ্চার মধ্যে ডুবে গেলে, গর্তের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে হড়হড়ে মতো ছিপিটা খুলতে হবে ভাবলেই তার ভীষণ ভয় করছে। ওপর থেকে দেখছো জল, বেশি গভীরও নয়। কিন্তু ডুব গেলে যদি সে দেখে এ আরও গভীর। যদি অক্টোপাস, তিমি, হাঙর তাকে তেড়ে আসে? এরা তো বড় বড় জীব, কিন্তু এমন কি ভোঁদড়, জলসাপ, এরাও তো থাকতে পারে। তা ছাড়া এই চৌবাচ্চার ভেতরে সে আর বুবু কতবার জলহস্তীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। অত ঘোর যুদ্ধ হল, জলহস্তীর লাল হাঁ তারা দুজনে দুদিক থেকে টেনে চিরে দিল একবারে। অথচ সেই জলহস্তী একটা দুটো গজিয়ে যাবে না চৌবাচ্চায় তা কখনও হতে পারে? অনেক ভেবে-চিন্তে সে তাদের নিউ ইন্ডিয়ান স্কুলের মাস্টারমশাই রবার্ট ভজহরি বিশ্বাসের মতো বুকে ক্রস আঁকে তারপর ঝুপ করে চোখ বুজে চৌবাচ্চায় নেমে পড়ে। চোখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খোলে না সে, জলহস্তী দাঁত বসাতে এলেই সে পিছলে পিছলে হস্তীটার গলার দিকে চলে যাবে ঠিক করে। হড়কে তারপর একেবারে তার পাকস্থলিতে...। চোখ মেলে এবার সে জলের ওপর থেকে জলের ভেতরের বাস্তবতা নিরীক্ষণ করে। কী সুন্দর সবুজ রঙের শ্যাওলা, পুতুলদের মাঠ, সেইখান থেকে বুড়বুড় করে ওপর দিকে বুড়বুড়ি উঠছে। সাহস করে হাতটা আর একটু বাড়ায় পুনপুন, চোখ বুজিয়ে ছিপির সুতলিতে টান দেয় আর অমনি হুড়হুড় করে জল পড়া শুরু হয়ে যায়। জলের আওয়াজে ভেতর-উঠোনের দরজার কাছে জড় হয়ে যায় চোদ্দোপুরুষের বেশ কজন, নারীর সংখ্যাও নেহাত মন্দ নয়।

বুবু অনেকদিন পরে হাসছে। হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠল— 'জলপ্রপাত! জলপ্রপাত!'

বাবা বললেন, 'যাঃ, জলটা ছেড়ে দিলে? কালই... বুবু কী বলল?'

বুবু ছুটে আসছিল, কেননা তার ক্ষীণভাবে মনে পড়ছিল এই জলপ্রপাতের তলায় আঙুল পেতে অনেক রঙিন নুড়ি পাওয়া যায়, রঙিন মাছও পাওয়া যেতে পারে। এমন কি জলকন্যা পেয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়। এইসব প্রত্যাশা কোন অতল থেকে ভেসে উঠছে সে জানে না।

মা তাকে খপ করে ধরে ফেলে বলেন—'কোথায় যাচ্ছ বিদ্যা। তোমার মুখ ধোওয়া হয়ে গেছে না? যাও একটা সোয়েটার পরে এস আগে।'

বুবু হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে—'ট্রাম, ট্রেন, ট্রাঙ্ক, সোয়েট্রা'—সে ভেবেছে সে 'সোয়েট্রা' বলতেও পারবে না, বুঝতেও পারবে না, তাই মা ভেঙে 'সোয়েটার' বললেন। জলপ্রপাত বলবার পরেও যে কেন মায়ের এই ভুল ধারণাটা রইল! তাই ক্ষোভে, নিজেকে প্রমাণ করার তাগিদে সে সব টয়-এ রফলা পরপর উচ্চারণ করে। 'ট্রাম, ট্রেন, ট্রাঙ্ক, সোয়েট্রা।'

আর যায় কোথায় একতলার দালানে উৎসব শুরু হ য়ে যায়। বাবা মধ্যমণি। বুবুকে কোলে তুলে নিয়েছেন। হাততালি দিয়ে বলছেন 'ট্রয়, ট্রাক, ট্রিপ, ট্রাই।' বুবুও দাগা বুলোচ্ছে—'ট্রয়, ট্রাক, ট্রিপ, ট্রাই।' লজ্জায় সে বাবার কোলেই কোমর মোচড়াচ্ছে পিসিমা মুখে কাপড় দিয়ে বলছেন 'রগড় দেখো,' মা হাসছেন। বর্মার জ্যাঠাবাবু হাততালি দিচ্ছেন। দাদা-দিদিরা সব এখানে সেখানে দাঁড়িয়ে গেছে, কার কাঁধে গামছা, কার হাতে খবরের কাগজ, কে চায়ে চুমুক দিচ্ছিল। বাবা নাচছেন

বুবুটা ট্রয় ট্রিপ
বুবুটা ট্রাক ট্রাই
বুবু যাবে ট্রেনে চড়ে
ত্রো সবাই বাই বাই
সোয়েটার সোয়েট্রা হলে
কোয়ার্টারও কোয়াট্রা হয়
ওয়াটারকে ওয়াট্রা বলো
কম্ফর্টার কি কম্ফর্ট্রা নয়?

বুবু অধোবদন। পুনপুনও অধোবদন। বুবু বাবার একটা মজার ছড়ার বিষয় হয়েছে, সব্বার হাসির কারণ, এর পরেও তারা অধোবদন হবে না? বুবু লজ্জার বিষয় হলে পুনপুনকেও অগত্যা লজ্জা পেতেই হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এইবার মঞ্চ ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। পুনপুনের দ্বিতীয় পাপ স্খলন হয়ে গেল ফাঁকতালে। সে একটু একটু করে বুবুর দিকে এগোয়। আঙুলে ভাব-ভাব নিয়ে। কড়ে আঙুলে থুতনির নীচে রেখে দু-তিন বার টেনে নিলেও আড়ি হয়। কিন্তু সেই বুড়ো-আঙুলই যদি আবার আরেকজনের বুড়ো আঙুলে ঠেকিয়ে ভাব বলো, তো তাকে ভাব বলতে হবে, ভাব করতে হবে। বুবুর বুড়ো আঙুলে পুনপুনের বুড়ো আঙুল ঠেকে যায়। সে বলে ভাব। হায়, বুবু ভুলে গেছে কী বলতে হয়। পুনপুন তখন বলে—'বল্ "ভাব, ভাব।" বুবু বলে ভাব। তখন পুনপুন ফিসফিস করে বলে—'তোর কি খুব খু-উব লেগেছিল?'

বুবু কিছুই বুঝতে পারে না। কেন লাগা, কিসের লাগা। কিন্তু কিছু একটা বুঝতে পারছে না— এটা জানান দিতে সে চায় না। কিছু বলবার আগে সে সমস্তটার মহড়া দিয়ে নেয় মনে মনে, সে বলে — 'না।'

ব্যাস, পুনপুনের বুকের ভেতর থেকে একটা বিরাট বোঝা হুশ করে নেমে যায়। বুবু সেরে গেছে, তার কিলে বুবুর লাগেনি, বুবু 'ট্রাম ট্রেন, জলপ্রপাত' বলেছে..... ভাবও করেছে। সুতরাং পুনপুন নিজেদের ঠাকুরঘরে গিয়ে চুপিচুপি নমো করে বলে— 'ত্রিশূলেশ্বর ঠাকুর ওং শ্রী শ্রী, নমো, নমোঃ। ওং শ্রী শ্রী গোখরো ঠাকুর নমো নমঃ।' তাদের ঠাকুরঘরের বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বালানন্দ ব্রহ্মচারী এঁরা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাকিয়ে থাকেন।

আকাশ রোদে রোদ। ছাত নীলে ভেসে যায়। কুলো, নতুন কাপড়ের টুকরো, বড় থালা, তেল, ডালবাটার গামলা নিয়ে বাহিনী উঠবে এবার ছাতে। মা বুজবুজ, পুটপুট, পুনপন, বুনবুন, বুবু। বড়ি দেওয়া হবে। ছাত পরিষ্কার করে ঝাঁট দিয়ে গেছে টেকন। মা কুলো উল্টে রাখলেন। তার ওপর নতুন কাপড়ের টুকরো দিয়ে ঢেকে দিলেন। কাঁসার বড় থালা তেল মাখিয়ে রাখলেন। এই থালায় কী বড়ি হবে বলুন তো?— কাঁচা বড়ি। তার মানে ওর ওপর বড় বড় বড়ি দিয়ে ঘণ্টা দুই তিন কড়া রোদ খাইয়ে নেওয়া হবে। তারপর তেলমাখা থালা থেকে বড়িগুলো তুলে ফেলতে হবে সাবধানে। বাইরেটা শুকিয়ে যত টেনে যাবে, ভেতরটা তত নরম থাকবে—এইবার একে সর্ষের তেলে ভেজে, সর্ষে-বাটা দিয়ে কাঁচালঙ্কা দিয়ে ঝাল করুন। অতি চমৎকার খেতে। বড়ির ডাল মা গোটা মুঠো ডুবিয়ে দিয়ে ফটাফট শব্দে ফেন্নান আর থাপুস-থুপুস বড়ি দেন। হাতের পাঁচ আঙুলের কায়দায় মন্দিরের চুড়োর মতো ছুঁচলো করে তুলে দেন বড়ির ডগা, তারপর সবচেয়ে বড় বড় দুটো বড়ির মাথায় পড়বে ধান দুর্বো সিঁদুর। এদের নাম বুড়ো-বুড়ি। মা যতই ওদের নাক টেনে তোলেন, ততই ওরা খাঁদা হয়ে যায়। কিন্তু ওদের দেখলে ঠিক মনে হবে, সাদা চুলে মাথা ভরা এক বুড়ো আর পাকা মাথায় সিঁদুর এক বুড়ি আসনপিঁড়ি হয়ে বসে আছে। শীতের প্রথম আলু কপি মটরশুঁটির ঝোলে এই বড়ি পড়বে। বুড়োটা বাবা খাবেন। আর বুড়িটা মা। বাবা মা আর কোনও জিনিস একা-একা খান না তো! বাবা দুপুরবেলা খেতে বসে বলবেন—'আহাহা, ইলিশ মাছের এই জোড়া পেটি কেন আমায় দিলে? শ্রদ্ধা, ঋতি মাঝখানে গর্ত মাছ মাঝখানে গর্ত মাছ করে।'

পিসিমা বলবেন—'ওদের দেওয়া হয়েছে।'

—'ভেটকি মাছের ন্যাজা? অংশু খেতে ভালোবাসে, আমাকে দিলে কেন?'

—'ছ্যাঁচ্ড়াতে যে মুড়ো দিয়েছ তার গোটাটাই তো আমাকে দিলে দেখছি—ইন্দ্র-পুলকের আর রইল না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পিসিমা বলবেন—'এত বড় সংসারের ছ্যাঁচড়া কি একটা মুড়োয় হয় দুগগি? শান্তি করে দুটো খা না!'

—'দুধের সর? সেজমাকে দাও, মাছ খায় না।'

—'ধোঁকা চারটে দিয়েছ কেন?' —দুটো বাবা তুলে রেখে দেবেন। জানেন এ সব জিনিস অন্যদের বঞ্চিত করে কর্তাদের পাতে বেশি বেশি দেওয়া হয়ে থাকে।

বুড়ো-বুড়ি রান্নার সময়ে পুনপুনরা হুড়মুড় করে রান্নাঘরে ঢুকে যাবে। পিসিমা মোটেই বরদাস্ত করবেন না সেটা। 'যা পালা পালা,' বুড়োবুড়ির রান্না এমনই একটা পবিত্র অনুষ্ঠান যে বালখিল্যদের উপস্থিতি পর্যন্ত তাকে অপবিত্র করে দিতে পারে।

বাবার অভ্যেস প্রথমে খানিকটা ঝোল চুমুক দিয়ে খেয়ে নেওয়া। খানিকটা খেয়ে তারপর বাবা টের পান মস্ত কাঁসার বাটির তলার দিকে শ্রীলশ্রীযুক্ত বুড়ো মহাশয় বসে আছেন। শিরে ধান-দূর্বো সহ। বাবা তাদের লোভের কথা জানেন।

—'এঃ, আগে বলবে তো। এঁটো করে ফেললুম।'

পিসিমা বলেন— 'ওদের সব্বাইকার আচে, তুই খা, ওটা তোকে খেতে হয়।'

—'তা ঠিক।' —বাবা ক্ষুণ্ণ মুখে তাঁর প্রিভিলেজের সদ্ব্যবহার করতে থাকেন। কিন্তু বুড়ির সদ্গতির সময়ে বুবু-পুনপুন, বুনবুন যদি থাকে তো তারও ডাক পড়ে। শ্রীযুক্তা বুড়িকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে মা তিন ছেলেমেয়ের মুখে তুলে দেন। কী অপূর্ব স্বাদ! সেই একই ডালবাটা, একই কুলো, একই রোদ, কিন্তু কাচ্চা-কাচ্চা বড়ির থেকে বুড়ো-বুড়ির স্বাদ আলাদা।

এ মা, কাউকে বলো না, বুনবুনের মনে হয় মা বাবা ঠাকুর্দা-ঠাকুমাকে খাচ্চেন। বুড়ো-বুড়ির সঙ্গে ঠাকুর্দা-ঠাকুমার সাদৃশ্যটা বড্ডই বেশি। দিদিভাইও বুড়ো-বুড়ি বড়ি দেন, সেই বুড়ো-বুড়ি দাদাভাই আর দিদিভাই খান, তখন কিন্তু মনে হয় ওগুলো বড়িই, আর কিছু না। কিন্তু চার নম্বরে এলেই সব কেমন বদলে যেতে থাকে। বুবু বলে মে'টা বন্দিনী সীতা হয়ে যায়, দুগ্‌গি লক্ষ্মণ, পুনপুন কেন কে জানে বিশ্বামিত্র মুনি, ই-দাদা জনক রাজা... এবং বুড়োবুড়ি ঠাকুর্দা-ঠাকুমা। চার নম্বরটা এইভাবে রূপকের রাজ্য। এখানের চৌবাচ্চা চৌবাচ্চা নয়, সমুদ্র একেবারে প্রশান্ত আটলান্টিক মহাসাগর, দালান দিয়ে হারুন-অল-রশিদ প্রজাদের অবস্থা দেখতে ছদ্মবেশে বেরোন, পিসিমার ভাঁড়ার ঘরে আলাদিনের প্রদীপটা পড়ে আছেই—এটা বুনবুন পুনপুন জানে। পিসিমার যে একদিনও জ্বর হয় না। হলেই ওরা প্রদীপটা বার করে নিতে পারে। দৈত্যকে পুনপুনের ভয় করে, বুনবুনের করে না।

—'কী দিদি! বড়ি-হাত করলেন?' পাশের ছাত থেকে অবিনাশ জেঠি বলছেন। পাঁচিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দুই বাড়ির গিন্নির কিছুক্ষণ বিশ্রম্ভালাপ চলে। কী ভীষণ টেকনিক্যাল সব বিষয়ে কথাবার্তা হয়, বড়দের কথা সব—আলুর দর কত, ঘি কত করে যাচ্ছে, একরকম ভেজিটেবল ঘি উঠেছে। সস্তা। চিনি কন্ট্রোলে না উঠলে কী বিপদ। ইত্যাদি ইত্যাদি। বুবুর কানে গিয়ে ধাক্কা দেয় শব্দগুলো। কী ভীষণ প্রশংসনীয়ভাবে শক্ত কথাগুলো। এইরকম সব কথা বলা তার জীবনে হবে কি? মায়ের মতো ফটাফট শব্দে ডাল ফেঁটাতেই কি সে কোনওদিন পারবে? মায়ের মতো বেশ চুড়ি ঝমঝম করতে করতে সে কুটনো কুটত! বঁটির ওপর তোমার আঙুল পড়ছে, অথচ আঙুল কাটছে না। চুলও কী বড়! নিজের কানের কাছ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবধি গজানো চুলগুলোয় হাত বুলোয় সে। মা কুটনো কুটছেন, বড়ি দিচ্ছেন, চুল লুটিয়ে রয়েছে মেঝেতে। একটু-একটু পাকা মেশানো চুল। এই-ই উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরাকাষ্ঠা এখন বুবুর। কিন্তু অত লম্বা চুলও তার হচ্ছে না। অমন করে আলুর খোসা ছাড়ানোও তার আর এ জন্মে হতে হচ্ছে না।

আগে সে একসময়ে ভেবেছিল পিনুদিদিকে চু-কিতকিত খেলায় হারিয়ে দিতে পারলেই তার একটা কাজের মতো কাজ করা হবে। কিন্তু সে উচ্চাশা ইদানীং তাকে বিসর্জন দিতে হয়েছে। সে তো আর খেলতে পারে না। হাতে পায়ে বড্ড আলস্য। সঙ্গীসাথীরা তাকে ঠকায়। এই তো সেদিন রুবি বলল—'ভগবান দেখবি?'

ভগবান দেখতে বুবুর বড্ডই ইচ্ছে। সে ঘাড় হেলায়। ভগবান মানে কী? মা কালী? কৃষ্ণঠাকুর? বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী? এইরকম কতকগুলো প্রশ্ন তার মনে না উঠে পারে না। কিন্তু না, মনের মধ্যে খুব চুপিচুপি তার ধারণা কৃষ্ণ ঠাকুর কৃষ্ণ ঠাকুরই, কালীমাও কালী মা-ই। আর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে যতই ভক্তিভরে পুজো করা হোক না, অত ভুঁড়ো-পেটা, অতখানি ছারপোকা উকুন-অলা জটা মাথায় কেউ ভগবান হতে পারেন না, পমপম যতই বলুক। ভগবান অন্যরকম কিছু, অন্যরকম কেউ। তা রুবি যদি ভগবান দেখার একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারে তো ভালো তো। সে রাজি হয়ে যায়। রুবি বলে—'একশোবার গুনে গুনে কপালের মাঝখানটা ঘষ, ওই খান দিয়ে দেখতে পাবি।'

বুবু তো এখন আর একশো গুনতে পারে না, সমস্ত সংখ্যা সমস্ত অঙ্ক তার মাথায় তালগোল পাকিয়ে গেছে। রুবিই গুনে দিল, তারপরে বলল—'এইবার এক ফোঁটা জল দে।'

ওরে বাবা, সে কী জ্বলুনি। রুবি ফিকফিক করে হাসতে হাসতে যেতে যেতে বলছে— 'ভেলভেটিটা তু তু তু তু ভেলভেটিটা তু তু তু তু', রাগেও বটে, কষ্টেও বটে। 'ভেলভেটিটা' বললে বুবু ভীষণ ক্ষেপে যায়। পালিয়ে যাচ্ছে। বুবু হাপুস নয়নে হাতে করে মুখ ঢেকে ছটফট ছটফট করে।

টমদিদি বলে—'কাঁদছিস নাকি? বুবু? দেখি কী হল?'

বুবু প্রাণপণে মুখ ঢেকে থাকে। দেখাবে না, সে দেখাবে না। জোর করে হাত সরিয়ে টমদিদি বলে—'এ কী হয়েছে রে? এমন করে নুনছাল উঠে গেল কী করে?' —বুবু কিচ্ছু বলে না। সে কেন বোকা! তাই-ই তো তাকে সবাই ঠকায়।

একদিন খেলাঘরের রান্না হচ্ছে। ছোট ছোট চাকিতে ছোট ছোট লুচি বেলা হয়েছে। পিনুদিদি সেই কাঁচা লুচি মিছিমিছি ভেজে বুবুকে খেতে দিল। বেগুনের বোঁটার দিকটা কেটে এনেছে।

—'নে, নুচি-বেগুনভাজা খা বলছি।'

পিনুদিদিকে সব্বাই ভয় করে। যখন-তখন এক চড় মেরে দিতে পারে। চুলের ঝুঁটি না ধরে ঠাস করে চড়। কাজেই, পিনুদিদি যখন বলেছে তখন খেতেই হবে।

পুতুলের ছোট্ট কাঠের থালায় কাঁচা লুচি নিয়ে বুবু হিম শরীরে বসে থাকে। —'কী হল? খেলি না?'

হঠাৎ পুনপুন বলে—'ওগুলো তো কাঁচা, ও কী করে খাবে?' মরিয়া হয়ে বলে ফেলেছে পুনপুন। নয়তো এমন বিদ্রোহ করা তার সাহসে কুলোয়ই না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'ঠিক আছে যা, খেতেও হবে না, খেলতেও হবে না'—পিনুদিদি দুরদুর করে তাদের তাড়িয়ে দিল।

তাই লোভ হলেও বুবু পারতপক্ষে কোথাও যায় না। না খেলে খেলে গা ব্যথা করে, তবু সে জানলার গরাদ আঁকড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সিংবাড়ি আর সেনবাড়ির মাঝখান দিয়ে রায়চৌধুরীদের এক জটলা সুপুরি গাছ দেখা যায়। অন্য সব গাছের মাথা দুলবে, ডালপালা দুলবে, পাতা কাঁপবে, শুধু সুপুরি গাছ পিনুদিদির মতো একটা তালঢ্যাঙা মেয়ে গাছেদের সংসারে, সে একেবারে তলা থেকে পুরোটা দোল খাবে। দেখতে দেখতে বুবুও দোল খায়, দোল খায়, দোল খায়।

সেনগুপ্তদের বাড়ির পেছনে, তারও পেছনে, অনেক দূরে গোলাপি ছাতের একটা বাড়ির ওপর একটা ঢ্যাঙামতন লোক দাঁড়িয়ে থাকে। মাথায় টুপি, গায়ে আলখাল্লা। যখন সূর্য ডোবে লোকটার পেছন দিয়ে তখন ওকে কালো চৌকোমতন দেখায়। বুবু দূর থেকে ওর সঙ্গেই ভাব করে। রুবি ঠকাবে, পিনুদিদি মারবে, পুনপুন মানিকদের বাড়ি যাবে, তা হলে সে কী করবে? সে তাই ওই লোকটার সঙ্গে ভাব করে।

—'থিনুবাবু, থিনুবাবু, কেমন আছেন?'

লোকটার নাম নিশ্চয় থিনুবাবু, কেননা ওকে থিনুবাবুর মতোই দেখায় ঠিক।

—'থিনুবাবু, থিনুবাবু আপনারও কি অসুখ করেছিল?'

থিনুবাবু উত্তর দেন না। তাঁকে বড় বিষণ্ণ দেখায়।

—'এখন কেমন আছেন?'

থিনুবাবু কিছু বলেন না, কিন্তু বুবু বুঝে নেয় থিনুবাবু ভালো নেই।

—'আপনাকেও কি কেউ ঠকিয়েছিল? কেউ কাঁচা লুচি খেতে দিয়েছিল? ও থিনুবাবু!'

রকম দেখে মনে হয় ঠকানোর চেয়েও, কাঁচা লুচি খাওয়ানোর চেয়েও খারাপ কিছু কেউ করেছে থিনুবাবুর ক্ষেত্রে। থিনুবাবু তাই স্থাণু হয়ে গেছেন। গোলাপি ছাতে পাঁচিল ঘেঁষে স্ট্যাচু হয়ে রয়েছেন। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই বুবুর পশ্চিমের জানলায় ছুটে যাওয়া চাই। হ্যাঁ, ঠি-ক। থিনুবাবু দাঁড়িয়ে আছেন।

—'থিনুবাবু, আপনি কি সারারাত দাঁড়িয়েছিলেন? ঘুমোতে যাননি?'

জবাবের দরকার হয় না, বুবু বুঝতে পারে থিনুবাবু সারারাত ঘুমোননি।

—'আপনার মা বকেননি থিনুবাবু?' —বলতে গিয়ে সামলে নেয় বুবু। থিনুবাবুর মতো হ্যাট কোট পরা লোকেদের কি মা থাকেন? থাকলেও কি বকেন?

তার মা তো তাকে দুপুরবেলাও জোর করে শুইয়ে রাখেন। সে-ও ঘুমিয়ে পড়ে, কিন্তু মাঝদুপুরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়, সে বলে— 'থিনুবাবু, আপনি কি এখনও দাঁড়িয়ে আছেন? দুপুরবেলা একটু ঘুমিয়ে নিন না।' মা বলেন, 'কী বিড়বিড় যে করে মেয়েটা ঘুমের ঘোরে!'

মাঘ মাসে সেবার হাহা করে বৃষ্টি পড়ে। ছুঁচের মতো সরু ধারালো ফলার বৃষ্টি উপেক্ষা করে বুবু সবার চোখ এড়িয়ে দৌড়ে ছাতে চলে যায়। ঠিক। থিনুবাবু ভিজছেন।

পদ্মদিদি তাকে ধরে নিয়ে আসে। ভিজে চুল মুছিয়ে দেয়। ভিজে জামা ছাড়তে ছাড়তে বুবু নিজের মনকে বোঝায়, থিনুবাবু তো আসলে একটা লাঠির ডগায় একটা ঝুড়ি। আর লাঠিটাতে একটা কী যেন কাপড়ের মতো আটকে আছে। ভিজলেও থিনুবাবুর কিছু হবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু তবুও তার বুকের মধ্যেটা হু হু করে—থিনুবাবু সত্যি-সত্যি না থাকলেও থিনুবাবু সত্যি-সত্যিই আছেন। কিসের এত অভিমান থিনুবাবুর? কেন রোদে জলে দিনে রাতে ঝাঁঝে হিমে থিনুবাবু একঠায় দাঁড়িয়ে থাকেন? কেন বাড়ির ভেতর যান না? ঘুমের মধ্যে সে বিড়বিড় করে—'থিনুবাবু, থিনুবাবু, এবার ঘরে যান, রাগ করে আর ভিজতে হবে না, আপনাকে কেউ আর ভেলভেটিটা তু তু তু তু বলবে না।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নবম অধ্যায়

শ্রীদাম-সুদাম-সুবল সখা

পাকুমা এসেছেন আমাদের বাড়ি। সঙ্গে মানিক। আমি বুনবুনের সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলছি। মা ডাকছেন। আমরা দু-ভাই গেছি। পাকুমা অবাক হয়ে দেখছেন।

—'আশ্চর্য। কোনটা পুনপুন?'

ঠাকুমা হাসছেন—'আপনিই চিনে নিন না।'

পাকুমা তাকাচ্ছেন আমাদের দিকে। ভালো করে দেখছেন। এবার আমাকে খপ করে ধরে কাছে টেনে নিলেন।

—'ঠিক হয়েছে,' মা-ঠাকুমা বলছেন, মুখে হাসি।

—'কী করে চিনলেন।'

—'বাঃ, আমার মণি-মাণিক্য আমি চিনব না,' পাকুমার রহস্য নিশ্চয় কেউ বুঝতে পারল না।

আমি তো ছোট নই। পাকুমা আমাকে কোলে বসিয়েছেন বলে আমার লজ্জা করছে। বুনবুন পরে ঠিক আমাকে ক্ষ্যাপাবে। পাকুমা বুনবুনকে ডাকছেন।

—'এসো, তুমিও এসো। তোমাকে কী বলব? সোনা?'

বুনবুন পাকুমার হাত ছাড়িয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

মানিক বলল 'কেন রে পুনপুন, কত দিন যাস না।'

পাকুমার মুখে হাসি, কিন্তু দৃষ্টি স্থির আমার মুখের ওপর। চোখের ভেতর দিয়ে একেবারে মাথার ভেতর, বুকের ভেতর চলে যাচ্ছে।

মাণিক বলল— 'জানিস তো মেজদিমণির বিয়ে। কী মজা যে হবে! সারা হপ্তা মজা। খালি মজা করব। মাস্টারমশাইদের ছুটি করে দিতে বলেছি। মাসিমণি, পুনপুনের মাস্টারমশাইকেও ছুটি দিতে বলুন। বলুন না?'

মা হাসছেন—'হ্যাঁ, হ্যাঁ তোমার মেজদিমণির বিয়ে যখন তখন তো ওরও ছুটি হওয়া চাই-ই। কিন্তু ইস্কুলে কি মাস্টারমশাই ছুটি দেবেন?' মায়ের হাতে পত্তর। পাকুমা নিজে এসেছেন নেমন্তন্ন করতে। ডাক্তারবাবুর বাড়ি বলে কথা। যে ডাক্তারবাবু পাকুমার সায়াটিকার ব্যাথা সারিয়েছেন। ছোটদের কৃমি, টনসিল, গ্ল্যান্ড, মাম্পস, হামজ্বর স-ব যাঁর কাছে একেবারে কাবু হয়ে গেছে!

মানিক বুনবুনকেও সাধাসাধি করছে। 'চল না, চল না।'

আমার নিজের লোক এতগুলো, আমার একটু সাহস হয়।

বুনবুনের আগে পুনপুন এই ভাবে হাত ধরাধরি করে ওরা রাস্তা পার হয়। এখন পুনপুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিড করছে, কেননা সিং বাড়িটা পুনপুনেরই চেনা এলাকা।

দীপুদা এসেছে, দীপুদা এলে সে মেজর-জেনারেল। 'সৈন্যগণ তোমরা নিশ্চয় জানো তোমরা আজাদ হিন্দ ফৌজ। মেয়েরা তোমরা ঝাঁসীর রানি বাহিনী। আমাদের উত্তর-পূর্বাঞ্চল দিয়ে মাতৃভূমি ভারতবর্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।চলো ইম্ফল। লাইন আপ বয়েজ অ্যান্ড গার্লস।'

আমরা সব বাইরের উঠোনে সার বেঁধে অ্যাটেনশনে দাঁড়িয়ে গেছি। 'স্ট্যান্ড অ্যাট ইজ', 'স্ট্যান্ড ইজি', বুনবুনের প্রত্যেকটা করতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। একবার দীপুদার বেটনের বাড়ি খেল। আমি শিউরে উঠছি। বুনবুন কাঁদবে না তো। দীপুদা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে বলছে 'ডোন্ট মাইন্ড, আ অ্যাম নেতাজি ফলো মি।' বুনবুন কাঁদো-কাঁদো হয়ে ছিল। কান্নাটা গিলে নিয়েছে।

—'ভাই সব' দীপুদা/নেতাজি চিৎকার করে বলল 'চারদিকে ভী-ষ-ণ যুদ্ধ। বোমারু বিমান ঘোরাফেরা করছে আকাশে দলবেঁধে, আমরাও অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান নিয়ে রেডি আছি। ক্যাপটেন শাহনাওয়াজ,' বুনবুনের দিকে তাকিয়ে বলল দীপুদা 'গেট রেডি'। ওঁ-ওঁ-ওঁ-ওঁ-ওঁ। বাস খেলা শুরু হয়ে গেল।

আমরা বাইরের উঠোন থেকে ভেতরের উঠোন। ভেতরের উঠোন থেকে অন্দরে, দোতলায়। আজকে আর কোথাও কোনও বাধা নেই। মানিকের বাবার ঘরে টেবিলের ওপর মস্ত বড় চাদর বিছিয়ে দিয়েছি আমরা, বিছানা থেকে তুলে। চারদিকটা ঝুলে পড়ে টেবিলের তলাটা তাঁবু হয়েছে। আমি মানিক আর বেলী সেখানে। চাদর ফাঁক করে দীপুদা একবার দেখে গেল, খুব খুশি, বলল—'বাঃ, গুড, ঠিক আছে। কিন্তু ক্যাপটেন ধীলন, হবিবুর রহমান, লক্ষ্মী স্বামীনাথন তোমরা বলো এটা কী?'

আমরা বলি—'তাঁবু, টেন্ট।'

—'উঁহু, এটা ট্রেঞ্চ। সোলজার্স, সিপাগিরই কিন্তু শেল ফাটবে তখন তোমরা মরে যাবে।'

পকেট থেকে একটা হুইসেল বার করে দীপুদা ফুঁ দিল তাতে। জোরসে।

ব্যাস আমরা ট্রেঞ্চের ভেতরে ঢুকে গেলুম।

গায়েহলুদের তত্ত্ব এসেছে। সারা দালানটা ভরে গেছে। 'ছেলেরা খাবার নিয়ে খাও।' ট্রে থেকে তুলে তুলে আমাদের হাতে ইয়া ইয়া খাবার তুলে দিলেন মানিকের বড় জেঠিমা। খাস্তানিমকি, শিঙাড়া। বড় জেঠিমার শাড়ির পাড়ে বড় বড় হাতি চরে বেড়াচ্ছে। চুড়ি ঝমঝমে মোটা মোটা হাত। ছোট ছোট পুতুলের বালিশ তাঁর হাতের পাতায়। গায়েহলুদের তত্ত্ব এখনও আসছেই আসছেই। লাল ডুরে-শাড়ি-পরা দাসীতে দালান ঝমঝম করছে।

জেঠিমা বললেন, 'আমাদের—এর ডবল যাবে।'

একজন কাকিমা বললেন—'এস্টেটের পয়সায় এখন কত লপচপানি করবে করে নাও দিদি, আমাদের ছেলেমেয়েগুলোর বেলায় ফক্কা।'

—'মুরোদ থাকে তো বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে এলেই হয়', কে একজন ঝংকার দিলেন।

—'কার বাপের বাড়ির কিসের পয়সা জানা আছে।'

এ বলল—'আমারও জানা, সকলেরই জানা, আমার বাবা ইয়ের টাকায় বড়লোক নয়।'

ও বলল—'যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা? ঠাকুমা তুলছো?'

সে বলল—'থামো থামো, জিনুর উনি তো ঠাকুমা নন, পিসিমা। বড় লোকের ধাইগিরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে অনেক পয়সা ....'

এই রকম কথা ছোঁড়াছুঁড়ি চলতেই থাকল, আমরা টেবিলের তলায় শেল ফেটে মরে গিয়ে শুনতেই থাকলুম শুনতেই থাকলুম। মাঝখানে নিমকি, শিঙাড়া, কচুরিগুলো নিয়ে এসে আবার মরে গেছি। দীপুদা যদি এসে দ্যাখে মরবার নাম করে আমরা কচুরি-নিমকি খাচ্ছি, কী করবে বলা শক্ত। হঠাৎ তিন চারটে শাঁখের শব্দ। হুড়মুড় করে ছুটেছি সবাই। নীচে উঠোনে আলপনা, আলপনার মধ্যে শিল, চার দিকে কলাগাছ নিয়ে হলুদ হলুদ ডুরে শাড়ি পরে মানিকের মেজদিমণি চান করছে। কপালময় জবজবে তেল-হলুদ।

চারিদিকে মেয়ে মেয়ে খালি মেয়ে। মেয়েতে মেয়েতে ছয়লাপ। খিলখিল করে হাসতে হাসতে নামছে, উঠছে এ ওর গায়ে হেসে হেসে ঢলে পড়ছে। মেয়েগুলো ভারি ঢঙি হয়। পিসিমা বলেন—'ঢঙি, ধিঙ্গি, ভিরকুট্টি।' কতরকম রঙের শাড়ি, চুলের কী বাহার। গয়না ঝমঝম করছে। এত সাজতে হয় নাকি? ছিঃ আমাদের দিদিরা তো কখনও খোঁপা করে না। সব সময় বিনুনি। পাকা পাকা মেয়েরা খোঁপা করে। না রে বুনবুন? বুনবুন দেখ, ওরা কেমন মেঝেতে আলপনা আঁকছে, চুল আঁচল লুটিয়ে রয়েছে, ওদের শাড়িতেও আলপনা। কী ভালো লাগছে না রে? আমরা যেমন পেঁয়াজ রসুনের উগ্র গন্ধ সহ্য করতে পারি না, তেমনি বেশি সাজ, বেশি গয়নার মেয়েও সইতে পারি না। ভেতরটা কুঁকড়ে যায়। বুনবুনকে আমি মনে মনে জিজ্ঞেস করি, বুনবুন মনে মনে উত্তর দেয়। তারপর যেই আমরা দুজনে দুজনের দিকে তাকাই আমনি বুঝতে পারি বুনবুন কী বলছে, বুনবুন বুঝতে পারে আমি কী বলছি। এখন সুগন্ধ উঠছে চারদিকের বাতাসে। কেশতৈলের সুবাস, সেন্টের সুবাস। নিতুদা থেকে থেকে আমাদের গায়ে গোলাপ জল দিয়ে যাচ্ছে। আরও কত নতুন নতুন খেলুড়ি আসছে। ওই যে গোলাপি পাঞ্জাবি আর ধুতি পরা গালফুলো হাবলুহবলু ছেলেটা ও মানিকের পিসির ছেলে রথীন। বেনারসি ফ্রক পরা চুলে বো করে ফিতে বাঁধা যে মেয়েটা খালি একটা ঘরে ঢুকছে আর পান খেয়ে আসছে ও চামেলি, বেলীর দিদি। দীপুদার ছোট ভাই হীরুদার হাতেও একটা হুইসেল। মাঝে মাঝেই সেটা পকেট থেকে বার করে জোর ফুঁ দিয়ে দেয়। তার মানে স্ট্যাচু। আমরা যে যেখানে আছি দাঁড়িয়ে পড়েছি। কেউ সিঁড়ির এক ধাপ থেকে আরেক ধাপে পা বাড়িয়ে, কেউ উঠোনে তিড়িং তিড়িং নাচের মাঝখানে, কেউ হা হা করে হাসছে সেই অবস্থায়।

শানাই বাজছে সমানে। শানাই বাজলে আমার কান্না পায়। দীপুদা বলেছে সন্ধেবেলায় আর খেলা নয়। ফিটফাট হয়ে অনেক কাজ করতে হবে। পদ্য বিলি করা, গোলাপফুলের বোকে আর বেলকুঁড়ির মালা দেওয়া। গোলাপজল স্প্রে করা। আমি গোবর্ধনকে ফুলের বোকে দিয়ে বকুনি খেয়েছি। নিতুদা সেই সকাল থেকে একটা গোলাপপাশ হাত করেছে। কিছুতেই হাতছাড়া করছে না। একদল ভদ্রলোকের ওপর দ্বিতীয়বার স্প্রে করতে একজন চোখ রাঙিয়ে বললেন—'আঃ ঃ ঃ ঃ!! কী হচ্ছেটা কী?' মানিকের নামে পদ্য হয়েছে। একজন ভদ্রলোক মানিককে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—'বারে মানিক বাঃ বেশ লিখেছিস তো। বল দিকিনি পদ্যটা একবার।' মানিক খানিক ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে কোঁচা গুটিয়ে দে ছুট। মানিক জানে না ও কী পদ্য লিখেছে? কী বোকা রে বাবা?

কিন্তু এতসব লোকের মধ্যে আমি নতুন কাকুকে খুঁজছি। আমার ভয় নতুন কাকু পেছন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে আমাকে খপ করে ধরে তুলে নিয়ে যাবেন। তার চেয়েও ভয় আমাকে নয়, বুনবুনকে আমি ভেবে, ধরে নিয়ে যাবেন। তখন বুনবুন পেচ্ছাপ আটকে মরে যাবে। আমি বুনবুনের দিকে তাকাই, বুনবুন ধুতি আর লাল সিল্ক সিল্ক পাঞ্জাবি পরেছে। বুনবুন পুনপুনের দিকে তাকায়, পুনপুন ধুতি আর সবুজ সিল্ক সিল্ক পাঞ্জাবি পরেছে। পুনপুন ভাবে বুনবুন নতুন কাকুর ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। কিন্তু বুনবুন মোটেই বুঝতে পারেনি, কেননা ও তো নতুন কাকুকে দেখেইনি। মানিক আমায় বলছে—'ভয় পাচ্ছিস কেন? নতুন কাকু তো নেই। দেশের জমি-জমা দেখাশোনা করতে পাকুমা নতুন কাকুকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে। এত কাজ যে বিয়েবাড়িতেও আসতে পারেননি।' বলে মানিক এক রকম অদ্ভুত মুখ টিপে হাসি-কান্নার মাঝামাঝি মুখ করে আমার দিকে তাকাচ্ছে। আমি বুঝতে পারছি মানিক নতুন কাকুকে ভয়ের কারণটা জানে। কী করে জানল? নতুন কাকু বলেছেন? যেদিন নতুন কাকু আমাকে নিয়ে দরজা দিয়ে দিয়েছিলেন সেদিন কী মানিক আগে থেকেই আলমারির পেছনে লুকিয়ে ছিল?

রান্নাবাড়িতে মিষ্টির ঘরের সামনে চেয়ার পেতে কর্তামাকে বসে থাকতে দেখলুম। কর্তামাকে চেনেন না? উনি পাকুমার মেয়ে। এই মোটা। ভীষণ ফর্সা। চুলগুলো কুঁচি কুঁচি কুঁচি দেওয়া, সাদা- কালো ধবধবে সিল্কের থান কাপড় পরে হাতে কালো ভেলভেটের বটুয়া নিয়ে বসে আছেন। হঠাৎ খুব হই-চই কাণ্ড। রাঙাজেঠু, কর্তামার ছেলে বরযাত্রীদের মাঝখানে হাততালি দিয়ে নাচছেন, মুখ লাল, মুখের ফোলা জায়গাগুলো আরও ফুলে গেছে। কাছাকোঁচা খোলা আবস্থা। গোবর্ধন আর মধুদি চ্যাংদোলা করে শেষে রাঙাজেঠুকে নিয়ে যাচ্ছে। মানিকের বাবা বরযাত্রীদের বলছেন —'ওই সব নানান পোষ্য, জ্ঞাতগুষ্টি রয়েছে, বুঝলেন না?'

কর্তামা দেখি ফোঁস-ফোঁস করে কাঁদছেন। এতক্ষণে পাকুমার দেখা মিলল। পাকুমা বলছেন—'অনেক দিনই তোমায় বলেছি উমা, ছেলেদের বিলাস-ব্যসনের মধ্যে ডুবিয়ে না রেখে মানুষ করো, এখন কাঁদলে কী হবে?'

কর্তামা বললেন—'তাই বলে পাঁচজনের সামনে চিনতে চাইবে না? পোষ্য-টোষ্য বলে হাত ধুয়ে ফেলবে? অ্যাতো অপমান?'

—'এর চেয়েও বেশি অপমান কাজ-কর্ম না করে বসে থাকা। কিন্তু সে তো তুমি বুঝবে না!'

—'শুধু একটা করে বিয়ে দিয়ে দাও ছেলে দুটোর আমার..... এ কথা তোমাকে বলে বলে আমার মুখ পচে গেল মা, শুনলে আর এমন অবস্থা হত না।'

রাঙাজেঠু তো আমার বাবার চেয়েও বড়? রাঙাজেঠুর বিয়ে? শুনে আমার ভীষণ হাসি পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পাকুমা হাসছেন না, গম্ভীরভাবে বলছেন—'কর্মহীন, উদ্যমহীন পুরুষের বিয়ে দিয়ে কোনও মেয়ের নাককাটা আমার দ্বারা হবে না বীথি।'

কর্তামা এক থলো চাবি ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন —'এই নাও তোমার মিষ্টির ঘরের চাবি।'

পাকুমা কোনও কথা না বলে দক্ষিণের ঘরে ঢুকে গেলেন। এদিক ওদিক চেয়ে কর্তামা আবার চাবিখানা তুলে নিচ্ছেন, চোখ মুছে ভারিক্কি হয়ে বসছেন চেয়ারে।

মানিকের এক কাকিমার মেয়ে ছবিরানি। একেবারে গোরিলার মতো মোটা। তার ভুরু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই। চোখের পাতা নেই। নাক নেই। সমস্ত থাক থাক মাংসর তলায় যেন চাপা পড়ে আছে। ছবিরানি আমাদের থেকে বড়। কিন্তু কেন জানি না আমাদের দাদা বলে। আজকে বেগনী বেনারসী কাপড়ের কী একরকম মুসলমানী পোশাক পরে গড়গড়িয়ে গড়িয়ে বেড়াচ্ছে। তার ভুরু ধনুকের মতো করে আঁকা, ঠোঁটে লাল টুকটুকে লিলিস্টিক, গাল গোলাপি হয়ে আছে রং দিয়ে। নিশ্চয়ই ছবিরানিকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে, তাই না? তার গলায় কত মালা, হার, কত রকম। কানে ঝুমকো। পায়ে ঝুমঝুম করছে মল। ছবিরানির সঙ্গে এক দিনেই আমার খুব ভাব হয়েছে। বলল,—'একটা জিনিস দেখবে'সো পুনপুনদা-বুনবুনদা। এসো না, এসো।' দোতলার কোণে ওদের ঘর। ঘরে কেউ নেই, খালি ছবিরানির খাস দাসী ক্ষ্যান্ত আছে। ছবিরানি বলছে—'এই ক্ষ্যান্ত, এই দাদাদের দেখা তো আমার সব জিনিস।' ক্ষ্যান্ত আঁচল থেকে চাবি বার করে খটাস করে একটা ট্রাঙ্ক খুলে ফেলল ভেতরে শুধু কাচের চুড়ি, রকম রকম কত রকম।

ছবিরানি বলল—'সব আমার বিয়ের তত্ত্বে যাবে।' বড় ক্ষ্যান্ত খটাস করে আর একটা ট্রাঙ্ক খুলল—তাতে শুধু মুক্তোর গয়না।

ছবিরানি বলল—'দেখেছো? কত্ত? ক্ষ্যান্ত দেখা দেখা আরও দেখা!'

ক্ষ্যান্ত বলল—'এমনি কত আছে। সোনা, হীরে, পান্না, চুণি সে সব বউদিমনির হুকুম না পেলে দেখাতে পারবে না।'

আমি বললুম—'থাক, আর দেখব না।

বুনবুন বলল—'থাক দেখব না। মে'দের গয়না দেখে কী করব?'

ঘরের একদিকে পরপর দশ বারোটা ট্রাঙ্ক। ছবিরানি বলল—'আলমারিতে আরও কত আছে। মা ছুঁচের কাজ করছে কত বালিশের ওয়াড়, কত চাদর, বেড কভার, টেবিল কভারে। সব আমার বিয়ের তত্ত্বে যাবে। একদিন মার সময় হলে দেখাব।'

হাসতে হাসতে ছবিরানি দরজার দিকে গড়াতে লাগল। পেছন থেকে বড় ক্ষ্যান্ত বলল—'বারো বছর বয়স হলেই তো মরে যাবে, কার ভোগে এ সব লাগবে কে জানে? ছবির দিদি তো দু বছর আগেই গেছে। তার আগেরটি গেল তা বছর পাঁচ তো হবেই। শাঁপ আছে, শাঁপ!'

বুনবুন বলল—'মে'গুনো মরে যায়? আর ছেলেগুনো?'

—ব্যাটাছেলে পেটে ধরতে পারে না গো। যাও পালাও দিকিনি, আমি এখন যক্ষির ধন আগলাই,' বলে ক্ষ্যান্ত ডিবে থেকে পান নিয়ে মুখে দিল।

অনেক অনেক লোকের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে খেতে চলেছি, এক পাশে মানিক আর এক পাশে ছবিরানি মাঝে আমরা দু ভাই। বুনবুনকে আমি একবারের জন্যও কাছছাড়া করছি না। নতুন কাকু না থাকতে পারেন, কিন্তু এই বাড়ির পেটের ভেতরে অনেক গা-ছমছমে ব্যাপার আছেই আছে। ভুতুড়ে মেমসাহেব বউ, ভ্যানিশ-কাকিমা। আমার দায়িত্ব বুনবুনকে রক্ষা করা।

মানিক বলল—'আমি শুধু প্যাটিস আর আইসক্রিম খাব, ছবি তুই?'

ছবিরানি বলল—'আমি শুধু নুচি আর চপ। শেষকালে চাটনি দিয়ে পোলাও মেখে খাব, আর পাঁপর ভাজা। পুনপুনদাদা তুই?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললুম—'আমি চপ, কাটলেট, প্যাটিস স-ব খাব।'

বুনবুন বলল—'আমি খালি মাংস খাব, মাংস। তোদের মাংসতে ঝাল দেয় না তো রে? আর আইসক্রিম।'

ছবি তার চুল ঝুলিয়ে বলল—'আর পান? পান খাবি না?'

—'নাঃ। সারা দিন পান খেয়েছি। এখন আমার দাঁত ব্যথা করছে। জিভ কেমন অসাড় ঠেকছে। আর পান খাব না।'

—'আমিও আর পান খাব না', ছবিরানি আমার হাত ধরে নাচতে নাচতে বলল—'আমারও সারাদিন ধরে পান খেয়ে খেয়ে গলা ব্যথা করছে, দাঁত যেন অসাড় ঠেকছে।'

রাত্তির বারোটার সময়ে যখন বর-কনে উলু দিয়ে দিয়ে বাসর ঘরে গেল তখনও চোখ টেনে টেনে জেগে থেকেছি। বাজি, বাজি হবে। বাবা বাড়িতে সাবান-নীল দিয়ে কাচা ধুতি পাঞ্জাবি পরে নেমন্তন্ন খেয়ে গেছেন। চুনোট করা ধুতি আর গিলে করা পাঞ্জাবি পরা লোকেদের আমার ভালো লাগে না। আমারে বাবাকে ভালো লাগে। কিন্তু এটাও ঠিক, এত লিলিস্টিক-রুজ মাখা লোকগুলোর মাঝখানে বাবাকে একটু বেমানান দেখায়। আমার মনে হয় বাবাকে আড়াল করে থাকি। বাবাকে মলিন দেখালে আমি সইতে পারি না।

বাজি আরম্ভ হল। কে যেন বলল—'ভাগ্যিস বৃষ্টিটা হয়নি।' আরেক জন ভারী গলায় বলল—'রূপেন রায় বাজি পোড়াবে ঠিক করেছে, বৃষ্টি হবে?'

বাজির আলোয় হঠাৎ হঠাৎ দেখতে পাচ্ছিলুম দক্ষিণের ঘরের সামনে পাকুমা দাঁড়িয়ে। চুপটি করে। মুখটা বড্ড গম্ভীর। গম্ভীর না দুঃখী-দুঃখী? হঠাৎ মনে হল পাকুমা তো আসলে সুভগা যার সরল-সুন্দর দুটি ভাই হারিয়ে গেছে। পাকুমা তো আসলে শিবশঙ্করের বউ, যাঁর সঙ্গে শিবশঙ্কর রেগেমেগে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। পেছন থেকে বাবা এসে খপ করে আমায় তুলে নিয়েছেন। বুনবুন বাজির লোভ ছেড়ে অনেক আগেই চলে গেছে। বাবার কোল থেকে দেখছি আকাশে আগুনের অক্ষরে লেখা হয়ে যাচ্ছে—গুডবাই, ফেয়ার ওয়েল।

সকাল বেলা। বর-কনে ভোরবেলা চলে গেছে। অনেক দূরে যেতে হবে। আমাদের রাস্তাটার কী বিশ্রী দশা হয়েছে। কলাপাতা, মাটির গেলাস, খুরি, আর লোকের ফেলে যাওয়া উচ্ছিষ্টের পাহাড়, তার ওপর বাসি ফুল, ভিখারি আর কুকুর জড়ো হয়েছে কত। পেছনের দরজা দিয়ে কাঙালি বিদায় হচ্ছে। যা-যা সব বেঁচেছে কাঙালিরা পাচ্ছে। কিন্তু গন্ধে আমার গা-বমি করছে। কার যেন কী অসুখ, বাড়াবাড়ি হয়েছে। পাকুমা ডেকে পাঠিয়েছেন বাবাকে।

বাবা বললেন—'পাবন এখন যেও না, কাজে যাচ্ছি।'

মা বললেন—'যাক না। ছটফট করছে তখন থেকে। ও তো মানিকের সঙ্গে....'

বাবা তাঁর ওষুধের ব্যাগ নিয়ে যাচ্ছেন। এর ভেতরে খোপ খোপ কাটা আছে তাতে রকমারি ওষুধ সাজানো। বাবার গলায় স্টেথোস্কোপ।

ছবিরানির বাবার অসুখ। তাই আমার ভীষণ কৌতূহল। মানিককে নিয়ে আমি ছবিরানির বাবার ঘরে ঢুকেছি। ট্রাঙ্কের ঘরটার পাশে। বিরাট ঘর! নিচু খাটে ছবিরানির বাবা শুয়ে! কী বিচ্ছিরি চেহারা। দাড়ি গোঁফ। গায়ে ঢাকা দেওয়া। বাবা একটা ওষুধ দিলেন।

পাকুমা বললেন—'ভাল হবে তো? ডাক্তারবাবু!'

বাবা খুব গম্ভীর। দেয়ালের দিকে চেয়ে বলছেন'এ রোগ তো আপনার অনেক দিনের।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কখনও ইনজেকশন নেননি? ওষুধ পালা কিচ্ছু করেননি? ছিঃ ছিঃ!' ছবিরানির মা কাঁদছেন। এই প্রথম ওঁকে দেখলুম। ছবিরানি ঠিক যতটা মোটা, ওর মা ঠিক ততটাই রোগা।

—'ছেলেমেয়ে হয়েছে?' বাবা জিজ্ঞেস করছেন।

পাকুমা জবাব দিচ্ছেন—'মেয়ে হয়, বেশ হয়, যত বড় হতে থাকে কেমন যেন হয়ে যায়। তারপর দশ-বার বছর বয়স হলেই...।'

—'হুঁ', বাবা বললেন 'আপনি যদি বলেন ওঁকে, মানে ওঁর স্ত্রীকে আমি একটু ওষুধ দেব, এবারের সন্তানটি স্বাভাবিক হবে, মারা যাবে না।' বাবা ওষুধের ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে এসেছেন।

পাকুমা বলছেন—'রুগিকে ওষুধ দিলেন না?'

—'দেব। হয়তো কষ্ট একটু কমবে, কিন্তু পাকুমা...বুঝতেই পারছেন...আপনারা বিধান রায় মশাইকে একটা কল দিয়ে দেখুন। কিন্তু ওঁর স্ত্রীর জন্য যে পুরিয়া দিয়ে যাচ্ছি, তা নিয়মিত খাওয়াবেন। নইলে আমাকে আর ডাকবেন না।'

ছায়ার মতো আমি আর মানিক সরে গেছি পেছনে। ছবিরানির মা বললেন 'অসুখের ঘরে ছোট ছেলেদের থাকতে নেই। কেন এসেছ?'

সত্যিই তো? কেন এসেছি? কিসের টানে? রোগ, যন্ত্রণা, মৃত্যুর টানে? না ছবিরানির মা বাবাকে দেখবার জন্য, যে ছবিরানির বিয়ের গয়না আর কাপড়ে একটা পুরো ঘর ঠাসা। না, বোধহয় মৃত্যুর টানেই! ছবিরানি আর মৃত্যু এক। দিন সাতেকের মধ্যেই মানিক ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল, ছবিরানি মারা গেছে। এত মোটা হয়ে গিয়েছিল যে ফেটে গিয়ে মারা গেছে। আমি ছবিরানির শব দেখতে পাইনি। খালি ওর বাবা-মার চোখ দেখেছিলুম। বাবা চোখ বুজিয়ে শুয়েছিলেন, আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না ছবিরানি নেই। মরে গেলেও কোথাও না কোথাও আছেই। খাটের তলায়, আলমারির কোনায়। আমার দৃষ্টি ছিল খাটের তলায়। হঠাৎ ওর বাবা ফটাস করে চোখ দুটো খুললেন, আবার ফটাস করে চোখ বন্ধ করলেন, যেন বাক্সের ডালা বন্ধ করা হল। ছবিরানির মা মেঝের ওপর একটা জরিপাড় ডুরে শাড়ি পরে বসেছিলেন। চোখ দুটো খোলা, কিন্তু যেন কাউকে দেখতে পাচ্ছেন না।

ছবিরানির বাবা ঠিক কবে মারা গেলেন, আমি বুঝতে পারিনি। কিন্তু পরে যখনই ও ঘরে গেছি দেখেছি কেউ নেই। বিছানা সুজনি দিয়ে ঢাকা, ঘরে এত ধুনো-গুগগুল দেওয়া হচ্ছে যে সুগন্ধ ধোঁয়ায় ঘরে টেকা যায় না। শাদা কাপড় পরা রোগা মাকে দালান দিয়ে আস্তে আস্তে নিয়ে যাচ্ছে ক্ষ্যান্ত দাসী। তারপর একদিন নিউ ইন্ডিয়ান স্কুল থেকে ফিরতে মানিক ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিলে ছবিরানির মায়ের একটা খোকা হয়েছে। খোকা দেখতে অমনি ছুটেছি। ডাক্তারবাবু, নার্স, সাদা এপ্রন পরে বাইরে বেরিয়ে এলেন, পাকুমাকে বললেন—'ভয় নেই। উনি ভালো আছেন। বাচ্চা সেন্ট পার্সেন্ট নর্ম্যাল।'

পাকুমা হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বললেন—'ডাক্তারবাবুর দয়া।'

ডাক্তার হেসে বললেন—'দয়া-টয়া কিছু নয় মা, সায়েন্স, মেডিক্যাল সায়েন্স।'

পাকুমা বিষণ্ণ হাসি হাসছেন। আমি বুঝতে পেরেছি উনি এই ডাক্তারবাবুর কথা বলছেন না। আমার বাবার কথা বলছেন। পেছন ফিরে আমায় দেখে মাথায় হাত রাখলেন পাকুমা।

—'খোকা দেখবে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'হ্যাঁ, পাকুমা।'

—'ক্ষ্যান্ত, দেখাও তো।' ক্ষ্যান্ত কোলের ওপর ধবধবে সাদা তোয়ালে-জড়ানো, মুখ-কুঁচকোন, লোমশ একটা সাদা মতন বাচ্চা দেখাল। কাঠি কাঠি হাত পা।

—'কেমন, ভালো?'

মানিক বলল—'বিচ্ছিরি, বাঁদরের মতন।'

আমি বললুম—'বেরালছানা ভিজে গেলে এরকম হয়।'

ক্ষ্যান্ত হেসে বললে—'তিন চার মাস যেতে দাও তখন এই বাচ্চাকে দেখে দেখেই আর তোমাদের আশ মিটবে না, ঘর আলো করা খোকা হয়েছে, আহা।'

এ তো গেল জন্মকথা। মৃত্যু কিন্তু ছবিরানির সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে দুটোকে আলাদা করতে পারতুম না। তাই কিছুদিন পরে যখন আমার ঠাকুর্দা মাঝরাতে হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে মারা গেলেন, তখন আমি চোখের সামনে যেন দেখতে পেলুম সাদা, পিপের মতো, মাখনের মতো, ভুরুহীন, চোখের পাতাহীন, ছবিরানি মুসলমানি পোশাক পরে গড়াচ্ছে, গড়াতে গড়াতে ফুলে যাচ্ছে, আরও ফুলে যাচ্ছে, তার পর দুম করে ফেটে গেল। ব্যাস আমার ঠাকুর্দাও মারা গেলেন। এই ছবিরানি। এই-ই মৃত্যু।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দশম অধ্যায়

নাচিকেত

পুনপুনের মৃত্যুবোধ আর বুনবুনের মৃত্যুবোধ কিন্তু কখনওই এক নয়। কী করে হবে? এক ডিম ভেঙে দুজনে তৈরি হলে হবে কী। পুনপুন দেখেছে ছবিরানিকে তার মৃত্যুময় জীবনকে, বুনবুন তো এত সব দেখেনি, তাই তার চিৎ-মণ্ডলে ভিন্ন ছবি সৃষ্টি হল। বুনবুনের জীবনে কতকগুলো সমকেন্দ্রিক বৃত্ত আছে। সবচেয়ে কেন্দ্রীয়, ছোট্ট বৃত্তটাতে দিদিভাই ও কানুমামা, সেখান থেকে লাফ দিয়ে সে ঢুকে পড়ে দ্বিতীয় বৃত্তটাতে যার মধ্যে অহর্নিশি ঘুরে যাচ্ছে পুনপুন, বুবু। রুলেতের বলটার মতো কী এক অজ্ঞাত রহস্যময় টানে পুনপুন, বুবু, ঘেঁষে ঘেঁষে আসে ঘনিষ্ঠ বৃত্তের খোপে আবার আরও রহস্যময় কোনও কারণে ছিটকে যায় পরিধির দিকে। তৃতীয় বৃত্তটাতে মা, ঠাকুর্দাদা, দাদাভাই। তার পরের বৃত্তগুলোতে বাড়ির আর সবাই। ভেতর থেকে এমনি করে বাইরে ছড়িয়ে যাচ্ছে সে। অবশ্যই চতুর্থ, তার পরে পঞ্চম বৃত্তেই পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কের অনুভূতি শেষ হয়ে যাচ্ছে না তার জীবনে। পঞ্চমের বাইরেও রয়ে যাচ্ছে কত খেলুড়ি, কত দাসদাসী, প্রতিবেশী, মাটি ও গাছ। বৃষ্টি রোদ হিম স্যাঁতা। তারপরেও বৃত্ত ছড়ায়। অনেকটা পরমাণুর গঠনের মতো জিনিসটা। কতটুকুই বা ভর এই সব কিছুর, তবু চৌম্বক টানে মহাশূন্যের গায়ে সব ঠিকঠাক লগ্ন থাকে এবং তড়িৎ সৃষ্টি হয়। কিন্তু ঠাকুর্দা যে মুহূর্তে মারা গেলেন বুনবুনের বৃত্ত নিচয়ে একটা ভ্যাকুয়াম সৃষ্টি হল। এই ভ্যাকুয়ামটার নামই মৃত্যু।

খেলনার আলমারির মাথায় চড়েছিল সে। কানুমামু বারণ করছিল। সে শুনছিল না। কেননা কানুমামু যেখানটায় দাঁড়িয়ে আছে সেখানটা তো আসলে হেদুয়ার পুকুর, আলমারির মাথাটা ডাইভিং বোর্ড। তাকে ডাইভ খেতে হবে তো! না কি হবে না! তা সেও ডাইভ খেলো, আলমারিও ডাইভ খেলো। ডাইভিং বোর্ডের এই জাতীয় ধৃষ্টতায় বিরক্ত হয়ে সে জল ঝাড়ার মতো কাচের টুকরো গা থেকে ঝেড়ে ফেলেছিল। এবং আবিষ্কার করেছিল হেদুয়ার পুকুরের তলদেশে কতরকম মণিমুক্তো। পোর্সিলিনের মেমসাহেব, এখন মুণ্ডুভাঙা, হাতির দাঁতের এক্কাগাড়ি খুব ছুটেছে, ফুটিফাটা কৃষ্ণনগরের ফলের ঝুড়ি, পাখা হাতে কিমোনো পরা জাপানি পুতুল কী মন্ত্রবলে বেঁচে গেছে, জয়পুরী পেতলের ফুলদানি, মোষের শিং-এর জোড়া বক আরও কত কী! এগুলো যখন আলমারির মধ্যে ছিল, স্বপ্নের কুহেলির মধ্যে ছিল, বাইরে ছড়িয়ে পড়ে আছে এখন যেন স্বপ্নগুলো সব কেলাসিত হল। সেই মণিমুক্তো কুড়োতে গিয়ে সে দেখে হাত নাড়তেই পারছে না। ডাক্তার সুতরাং হাত সেট করে স্লিং-এর মধ্যে হাত ঝুলিয়ে দিলেন। কোন ডাক্তার? সেই ডাক্তার যিনি হুঁকো খান। অর্থাৎ ঠাকুর্দা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরদিন খুব ভোরবেলায় দিদিভাই তাকে ডেকে দিচ্ছেন। মুখ গম্ভীর। চোখ ছলছল।

কানুমামা লাফিয়ে কী বলতে যাচ্ছিল। দিদিভাই বললেন, 'থাক ছোটকু, আমাকে বলতে দাও, তুমি চুপ করো।'

কানুমামার হাঁ বুজে যাচ্ছে। দিদিভাই বলছেন, 'দাঁত মেজে নাও।' 'দাঁত মেজে নাও তো সোনা,' এমন নয়, 'দাঁত মেজে নাও।' এই নির্দেশের মধ্যে কোনও সুর নেই। বেসুরো, বেতালা নয় ঠিক। কিন্তু সুর আর বেসুরের মধ্যে একটা অস্বস্তিকররকম ফাঁকা জায়গা আছে। সেই জায়গাটাকে ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে দিদিভাইয়ের অদিদিভাই কণ্ঠস্বর, 'দাঁত মেজে নাও।' এইটা মৃত্যু।

জামাকাপড় পরিয়ে দিচ্ছেন দিদিভাই, স্লিং-এ হাত ঝুলিয়ে থরথর মুখে দুধ খেয়ে দাদাভাইয়ের-দিদিভাইয়ের মাঝখানে চার নম্বরে যাচ্ছে বুনবুন—এইটা মৃত্যু। আরও কতবার কতরকমভাবে এই একই মানুষদের সঙ্গে যাওয়া তো আছে! কিন্তু এই যাওয়াটার সময়ে যে চারিদিকে একটা শীতালো হাওয়া, একটা প্রয়োজনীয় কিন্তু আবার বৃথা যাওয়ার বোধ, সেটা, সেটাই মৃত্যু।

চার নম্বরে থিকথিক করছে লোক। কিন্তু শব্দ নেই। উঠোনে নামানো ফুলসাজানো খাটে কে একজন অচেনা লোক শুয়ে আছে। বুনবুন দাদাভাইয়ের হাত ছাড়িয়ে ছুটে যাচ্ছে দোতলায়, ঠাকুর্দার ঘরে। খাটটা শূন্য। কয়েকটা ফুল ছড়িয়ে রয়েছে, অ্যান্টিসেপটিকের গন্ধ, খাটের ওপাশ থেকে বাবা উঠে দাঁড়াচ্ছেন, অদ্ভুত সোজা হয়ে, মুখটা মুখোশের মতো— এইটা মৃত্যু।

অসংখ্য উৎসব, অসংখ্য মজা হইহট্টগোলে ভরা জীবনের মাঝখানে এইরকম একটা অচেনা, সোজা, মুখোশের মতো ব্যাপার থাকে।

জীবনে কখনও ঘুমন্ত ঠাকুর্দাকে বোধহয় দেখেনি সে। হয় রুগি দেখছেন, নয় অনেকের সঙ্গে গল্পগাছা করছেন, গম্ভীর মুখে খটখট করে বেড়াচ্ছেন, দিদিভাই বা দাদাভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হা হা করে হাসছেন, হুঁকো টানছেন। কিন্তু ঘুমন্ত ঠাকুর্দা? নাঃ, দেখা হয়নি তাই মৃত্যুঘুমন্ত ঠাকুর্দাকে তার একেবারেই চেনা লাগেনি, লাগেনি, লাগেনি।

ব্যস। সেই যে দেখলো, আর কখনও ঠাকুর্দার কথা জিজ্ঞেস করেনি সে। কেন, প্রশ্ন করলে সে ভাল করে বলতে পারবে না। কীরকম একটা জটিল অনুভূতি। তার মনে হয়েছিল কেউ ডাকতে এসেছিল ঠাকুর্দাকে, তিনি কাউকে কিছু না বলে চলে গেলেন, কাজটা ঠিক করলেন না। আবার এমনও মনে হয়, মৃত্যুটা অতর্কিতে লাফিয়ে পড়েছে ঘুমন্ত ঠাকুর্দার ওপর এবং ঠাকুর্দা বিষয়ে আলোচনা করলে সেও ওই মৃত্যুর আওতার মধ্যে এসে যাবে। ঠাকুর্দার নেই হয়ে যাওয়াটা ভীষণ দুঃখের, কিন্তু আলোচনা করলে তিনি যদি ফিরে আসেন? আকাশ থেকে খটখট খটাস খটাস করতে করতে, কিংবা ধরো বুনবুন যেখানে ঠাকুর্দার কথা বলছে বা ভাবছে সেইখান থেকে মেঝে ফুঁড়ে উঠে আসেছেন। মেঝের মার্বেলের টালি মাথায় নিয়ে, তবে? সে মহা-আতঙ্কও বুনবুন সহ্য করতে পারবে না। ঠাকুর্দা তো অবিকল আগের মতো ফিরে আসতে পারবেন না, কোথাও কিছু একটা পরিবর্তন তাঁর ঘটে যাবেই। হয় তো দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু যদি বুনবুনকে আদর করতে গেলে, ঠাকুর্দার আঙুল বুনবুনের এক পাশ দিয়ে ফুঁড়ে আর এক পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়! কিম্বা ঠাকুর্দা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুনবুনের মুঠোটা হুঁকোর মতো করে ধরে মুখের কাছে নিয়ে গেলেন, গুড়ুক গুড়ুক শব্দ হচ্ছে, আর বুনবুনের আঙুল, নখ, হাতের পাতা সব ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

অথচ সে কি ঠাকুর্দাকে ভালোবাসছে না আর? তাঁর অভাবে কষ্ট পাচ্ছে না? ভালোবাসছে। কষ্ট পাচ্ছে অথচ ঠাকুর্দা ফিরে আসুন এটাও সে চাইছে না। একই সঙ্গে এই ভালোবাসা আর ভয় কী, কেন, সে কাউকে বোঝাতে পারবে না।

এর কিছুকাল পরেই যখন তার আর কানুমামার একসঙ্গে টাইফয়েড হল, ঝিমঝিমিয়ে মাথার মধ্যে প্রায় সবসময়েই সে একটা ডাক শুনতে পেত। মাঝে মাঝে চমকে উঠত একেবারে এত স্পষ্ট ডাকটা। কোথায় যেন এই ডাকটার একটা দৃশ্যরূপ সে দেখেছে, ক্ষীণভাবে হাতড়াত সে। সর্বক্ষণ তাদের কাছে বসে থাকতে থাকতে একবার সংসারের কাজে গেছেন দিদিভাই, দাদাভাইকে বলে গেছেন দেখতে, দাদাভাই পড়ছেন, সে বারবার উঠে পড়ছে, চিঁ চিঁ করছে তবু উঠে পড়া চাই, সেই সময়ে দাদাভাই অন্যমনস্ক হয়ে তার চুলের মুঠি ধরে বসে পড়ছিলেন। সে চেঁচাচ্ছিল, তখন এক ঝলকের জন্যে বুনবুন ঠাকুর্দাকে দেখতে পায়। ফ্যানের তলায় ঠাকুর্দা ভেসে উঠলেন। চোখ খুব সামান্য ফাঁক হয়ে রয়েছে, আধখোলা চোখ ঠাকুর্দা, তখন বুনবুন প্রাণপণে চিৎকার করে উঠেছিল। দিদিভাইয়ের কানে ঠিক গেছে, তিনি ছুটে এসে দেখেন, বুনবুন অজ্ঞান, দাদাভাই বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েই যাচ্ছেন, তাঁর হাতে বুনবুনের চুল মুঠো করে ধরা।

—'এ কী করছ? ওর চুল ধরেছ কেন অমন করে?'

—'উঠে উঠে পড়ছিল যে।'

—'তাই তুমি চুল ধরে শুইয়ে রাখবে?'

কিন্তু কই বুনবুন মারা যায়নি তো! আসলে, ঠাকুর্দার মূর্তিটা মৃত্যু নয়। কানুমামুর হাঁ বুজে যাচ্ছে, দিদিভাই বলছেন, 'দাঁত খেলে দাও।' এইরকম আর একবার ঘটলেই আর একটা মৃত্যুও ঘটে যাবে।

আপাতত মৃত্যু নেই। মৃত্যুর বিপ্রতীপ কিছু বোনা হচ্ছে তার সামনে। শীর্ণ, মাথা-ন্যাড়া বুনবুন আর কানু পাশাপাশি দুটো পিঁড়িতে বসে আছে। অদূরে দিদিভাই চুবড়ির পেছন দিকে ঘষে ঘষে তালের লেই বার করছেন। এর সঙ্গে চালের গুঁড়ো মেশানো হবে, গুড় মেশানো হবে, ছাঁকা ভাসা তেলে তালের বড়া ভেজে তুলবেন দিদিভাই। মামিমা উনুনে হাওয়া দিচ্ছেন, মস্ত কড়া বসেছে, তাতে তেল কলকল করে ডাকছে। তেল হল স্নেহপদার্থ। সেই স্নেহ এখানে উষ্ণ হচ্ছে। উষ্ণতার আশ্রয়ে ফুলে উঠবে তালের বল। প্রকৃতি সমস্ত আয়োজন করে রেখেছে, জোগাড় দিয়েছে, এবার নিজের মনের মশলা দিয়ে মায়েরা, দিদিমারা তৈরি করুন খাদ্যসুখ। মুখের মধ্যে যাবে, যতদূর নামবে ততদূর অবধি স্নেহ তার কাজ করতে থাকবে।

বড়মামু দোতলা থেকে নেমে এসেছেন। একটা হাই তুললেন, দুটো তুড়ি দিলেন। তারপরে বললেন, 'মা, এত আর্শি কী হবে?'

—' কীসের আর্শি? কী বলছে ভানু, বউমা?'

মামিমা মুখ টিপে হাসছেন, খানিকটা অবজ্ঞা, খানিকটা মজা-পাওয়া হাসি।—'ওই যে মেজকাকাবাবু বিজনেস করতে বলেছেন না? আর্শির বিজনেসের কথা হচ্ছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'তা ভাল তো। কিছু করা ভাল।'

বড়মামা আঙুল মটকে বললেন—'সি টু এ ট ন। বুঝলে?'

—'কী বুঝব?'

—'সি টু এ ট ন। ধরো এক হাজার আর্শি বিককিরি করলুম। এক হাজারটা মানুষ ক্রয় করল। তারপর? কবে সেই আর্শি ভাঙবে, তবে আবার বিক্রিবাটা। সবাইকার ঘরেই কি আর এই বুনটুর মতো দুরন্ত ছেলেপিলে আছে? বছরে যদি দশখানা আর্শি ভাঙল তো দশটা ব্যবসাদার হামলে পড়ল, তখন? তখনকার কথা কে ভাববে? আমি ধরো এগারো নম্বর সাপ্লায়ার, তো দশ বাই দশ কী হচ্ছে? এক। পার সাপ্লায়ার একটা করে আর্শি। আমার ভাগে? সোজা হিসেব—শূন্য।'

—'কোন ঘরে যাবে, কখন ভাঙবে, কটা লাগবে—এসব ভেবে আবার ব্যবসা করা যায় নাকি? তোমার তো অতশত ভাববার দরকার নেই! কতগুলো অর্ডার পাচ্ছ সেই অনুযায়ী তুমি তৈরি করবে।' দিদিভাই বললেন।

বড়মামা কথাগুলো কানেও তুললেন না। বললেন—'শিলনোড়ার কথা ভাবলে তো আমি তাজ্জব হয়ে যাই। তালের বড়া আমারও আছে নাকি? ধরো শিলনোড়া তো দু-তিন জেনারেশন চলে যায়। যায় কি না? মা? বলো না!'

—'আমি জানি না। যাঃ।'

—'আঃ! আমাদের শিলনোড়া কবেকার সেটাই বলো না।'

—'আমি কিনিনি, এইটুকু বলতে পারি।'

—'তবে?' বড়মামা হাঁটুতে চাপড় মেরে লাফিয়ে উঠলেন —'শিলনোড়ার ব্যবসা চলে কী করে?'

দিদিভাই উত্তর দিলেন না। গরম গরম তালের বড়া এক বাটি এগিয়ে দিলেন বড়মামার দিকে।

বড়মামা বললেন, 'মওলানা তমিজুদ্দিন আহমেদ। বেশ মুচমুচে হয়নি তো বড়াগুলো!'

—'একটু ঠাণ্ডা হলে হবে।'

—'তবে এখন দিলে কেন?' বাটি রেখে দিয়ে বড়মামা উঠে গেলেন।

—'মার্গিজ, ম্যাকলাউড, উট্রাম।' বড়মামা পরপর বলে গেলেন। কাটা দরজা খোলার শাঁই শব্দটা পাওয়া গেল।

—'সি টু এ ট ন' বড়মামা বেরিয়ে গেলেন।

মামিমা আর হাসি চাপতে পারছেন না। তালের বড়া ভাজার ঝাঁঝরি নামিয়ে রেখে লাল মুখে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে যাচ্ছেন। এর মধ্যে হাসির কী হল বুনবুন বুঝতে পারে না। সত্যিই তো, শিলনোড়ার ব্যবসাদারদের কী হবে? বুনবুনের আর কানুমামুর আর অন্যান্য সব ছেলেদেরই আরও আরও অনেক দুরন্ত হওয়া উচিত ছিল। দিদিভাইয়ের শিলনোড়াটা যদি মাসে একবার করেও ভাঙতে পারা যেত, ব্যবসাদারদের একটু সুরাহা হত। বাজারের ঠাস-দোকানে-বসা শিলনোড়ার দোকানদারদের হতাশ মুখচ্ছবি বুনবুনের চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

কানুমামু বলল—'সিটু য়েটন।' বলে এমন হাসতে লাগল যে দিদিভাই তাকে এক ধমক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিলেন।

ছ্যাঁক ছ্যাঁক ছ্যাঁক মনে মনে ল্যাখ—আমি চোখ বুজিয়ে ছ্যাঁক ছ্যাঁক শুনতে থাকি। এক কুড়ি এক কখন ছাড়িয়ে গেছে। আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। কিন্তু সেটা আমি জানি না। জানিস বুবু, আমি ভাবছি আমি জেগে আছি। দিদিভাই বড়া ভেজে চলেছেন, কড়া কলকল করে চলেছে, মামিমা হেসে চলেছেন, কানুমামু বকুনি খেয়ে ঘাড় গুঁজে বসে রয়েছে। বিকেলের পাতিলেবু রঙের আলো ক্রমে কমলালেবু রঙের হয়ে চলেছে। এটা ঠিক ক'সেকেন্ড তা তো আমি জানি না। এই রকমই চলবে, এই বড়া ভাজা, এই হাসি, এই চলন-ফেরন, আমার দুর্বল শরীরে শক্তি না এলেও ক্ষতি নেই, ন্যাড়া মাথায় চুল নাই গজালো। কীরকম একটা আরাম আমি বলে বোঝাতে পারব না।

ঢুল এসে ঘাড়টা ঝাঁকিয়ে দিতেই চমকে দেখি সত্যিই ঝাঁঝরিতে করে বড়া ভেজে চুবড়িতে রাখছেন দিদিভাই, মামিমা ভাঁড়ারঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন, কমলালেবু আলো...। তাহলে আমি কি ঘুমিয়েছিলুম? না জেগেছিলুম? আপনারাই বলুন। এ রকমও তো হতে পারে যে আমার মস্তিষ্কের কিছু অংশ ঘুমিয়ে পড়েছিল, কিছু জেগেছিল। কিন্তু চোখ? চোখ তো বুজে গিয়েছিল। তাহলে? কিছুক্ষণ আগে যা দেখেছি, আধো ঘুমের মধ্যে তার স্মৃতিই কি ভেতরে ভেতরে কাজ করছিল?

যে মৃত তার দিক থেকে যদি মৃত্যু এমন হয়! তুলসীপাতার তলায় ঠাকুর্দার চোখ আধখোলা ছিল। ঠাকুর্দা কি তাহলে এখনও তাঁর ঘুমের সময়কার দৃশ্যটার মধ্যে বুঁদ হয়ে আছেন? ঠাকুমা আলনায় কাপড় কুঁচিয়ে রাখছেন, উত্তরের জানলা দিয়ে ঠাণ্ডা চাঁদ দেখা যাচ্ছে, তালতলার চটির ওপর একটা মথ এসে বসেছে, ঘোর বেগুনি রঙের মথটা! আমি যেমন চটকা ভেঙে আবার জেগে উঠেছি, এবার ভিন্নতর দৃশ্যের দিকে চলে যাব, ঠাকুর্দার বেলায় সেটা ঘটছে না, ওই একটাই দৃশ্যের মধ্যে থেকে যাবেন তিনি। কিন্তু আমি জেনে গেছি কী ভীষণ আরাম ওইরকম থেকে যাওয়ায়। শুধু দৃশ্যটা তো থাকছে না, মেজাজটাও থাকছে। তাই ঠাকুর্দার মনের ভিতরে ফিরে আসবার কোনও তাড়া নেই। হারানোর দুঃখ নেই। ওরা তো সব আছেই...বুনবুন যে নীলবর্ণ হয়ে জন্মেছিল, যে ঠিকঠাক অষ্টম গর্ভ, ডাক্তার হবে, ঠাকুর্দার সবচেয়ে ভরসা যার ওপরে, পুনপুন, যাকে ঠাকুর্দা 'ফিক' বলে ডাকেন সে ফিকফিক করে হাসে বলে, বুবু যে নাকি যোগমায়া, যদিও তার যোগ সব মেনিনজাইটিসে কেড়ে নিয়ে গেছে খালি মায়াটি ফেলে রেখে, এবং দুগগি যার মনুষ্যত্বে তাঁর বিশ্বাস ছিল, বুদ্ধিসুদ্ধিতে ছিল না, যে দুগগির হোমিওপ্যাথি তিনি আনসায়েন্টিফিক বলে সহ্য করতে পারতেন না, এখন বুবু সেরে ওঠার পর তাঁর তর্কাতর্কি যে দুগগির সঙ্গে প্রায় শেষ হয়ে গেছে বললেই হয়। ছোটগিন্নি, মনো, বউমা, নাতি-নাতনিরা, বেয়ানঠাকরুন সবাই আছে। আছেন যে যার কাজে ঠাকুর্দা তাই খুব নিশ্চিন্তে তাঁর ঘরের নৈশদৃশ্যে স্থির হয়ে আছেন।

বুবু, বুবু, ঠাকুর্দা যখন মারা গেলেন, তুই বুঝতে পেরেছিলি?

কিছু বুঝতে পারিনি, কী বুঝতে পারছি তা বুঝতে পারিনি।

কে যেন ভাঙা ভাঙা ফ্যাঁসফেঁসে গলায় সুর করে বলছিল—

(ও) জ্ঞানহীন হয়েছে টলতে টলতে চলেছে
জ্ঞানহীন হয়েছে টলতে টলতে চলেছে...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠাকুর্দার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে যখন কালীদাদু কঠোপনিষদ পড়ছিলেন, তখন আরও একটা ঘরে গীতাও পড়া হচ্ছিল, আর একটা জায়গার উঠোনে ম্যারাপ বেঁধে কীর্তনও হচ্ছিল। শ্রাদ্ধকর্মও চলছিল ঠাকুর্দার চেম্বারে। কালীদাদুর কঠোপনিষদ শুনছিল খালি চারজন—বুবু-পুনপুন-ঝুনঝুন আর ঠাকুমা। কেন? কেননা ঠাকুর্দার অবর্তমানে কালীদাদুই ঠাকুর্দার একমাত্র বিকল্প। পাঠটা শুধু পাঠ থাকেনি, ঠাকুমা কালীদাদুকে প্রশ্ন করছিলেন, কালীদাদু উত্তর দিচ্ছিলেন। তাদের তিনজনের দিকে তাকিয়ে সহজ কথায় গল্প করে ব্যাখ্যা করছিলেন কালীদাদু।

নচিকেতা বাজশ্রবসের ছেলে।

ভ্যাঃ, নচিকেতা ঘোষ যিনি গান করেন তো? উনি তো সনৎ ডাক্তারবাবুর ছেলে হন! বাবার বন্ধু সনৎ ডাক্তারবাবু!

—বিশ্বজিৎ যজ্ঞ হচ্ছিল।

—যজ্ঞ কী কালীদাদু!

—এই যেমন আজকে এখানে হচ্ছে। দীয়তাং, ভুজ্যতাং, দান-ধ্যান-পুজো।

বুবু বলল; আর গান।

মেঘের কী গো চূড়া আছে?
ও বুড়িমাঈ বুড়িমাঈ, বুড়িমাঈ
মেঘের কী গো চূড়া আছে?

—কীর্তনবাসরের গান তাকে বড়ই স্পর্শ করেছিল, সে উদ্ধৃত করল।

—হ্যাঁ, ঠিক এমনি। বাজশ্রবস দক্ষিণা দিচ্ছেন, দক্ষিণা দিচ্ছেন।

—দক্ষিণা কী ওদের বুঝিয়ে দিন ঠাকুরপো—

—দক্ষিণা মানে উপহার, দান। আজকেও দেখবে অধ্যাপকদের উপহার দেওয়া হবে, পণ্ডিতদের উপহার দেওয়া হবে।

উপহার কী রকমের হার? বুবু ক্ষীণভাবে ভাবল। কিছু বলল না। আড়চোখে পুনপুন-ঝুনঝুনের দিকে তাকিয়ে দেখল ওদের চোখে কোনও প্রশ্ন নেই। ওরা জানে। সুতরাং বুবু তার অজ্ঞতা প্রকাশ করে বোকামি করবে না। পরে অবশ্য অধ্যাপকদের দেওয়া পেতলের ঘড়া উঁকি মেরে দেখে সে ভালভাবেই বুঝতে পেরে যায় উপহার = ঘড়া, ≠ হার। এবং কিছুদিন পরেই সে তার সদ্যলব্ধ জ্ঞান সবাইকে জানাবার উদ্দেশ্যে পিসিমার 'উপহার' থেকে জল খেতে চায়।

পিসিমা সদর্পে বলেন, 'উপহার না আরও কিছু! গ্যাঁটের কড়ি দিয়ে কেনা।' বুবু আবার অথৈ জলে পড়ে যায়।

যাই হোক,

নচিকেতা বলল— 'বাবা, আমাকে কাকে দেবেন?'

বারবার জিজ্ঞেস করতে, বাবা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'যমকে।'

ঠাকুমা বললেন— 'তা ঠাকুরপো এক অর্থে সব পিতাই তো সব পুত্রকে যমের কাছে দিয়েই রেখেছেন, তাই নয় কি? আদি পিতা যিনি, তিনিই তো সৃষ্টি করলেন মৃত্যু। করে তাকে পাঠিয়ে দিলেন প্রাণীর পৃথিবীতে। যে মুহূর্তে জন্ম দিচ্ছেন, পিতামাতা তো মৃত্যুর কাছে সত্যবদ্ধ হয়ে থাকছেন। দেব, দেব তোমাকেই দেব। তবু দেবার সময়ে কত কান্না,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কত অনুনয়!'

কালীদাদু বললেন, —'এই প্রশ্ন এই ব্যাখ্যা এই সবই প্রকৃত নাচিকেত অগ্নি, বউঠান। সত্যিই, মৃত্যু হচ্ছে জীবনেরই ধর্ম, জীবনেরই স্বভাব।'

কিন্তু সে সময়ে পুনপুন একটা অস্বস্তিতে আর বুনবুন একটা আশ্চর্য স্বস্তিতে ভুগছিল। পুনপুন ভাবছিল—বাবা তো তাহলে তাকে যমকে দিয়ে দিতে পারেন! যজ্ঞ হলেই অতএব সে নুকিয়ে পড়বে। বহুদিন পর্যন্ত পুনপুনের এই উৎসবে-যোগ-না-দেওয়ার স্বভাব থেকে যায়।

অপরপক্ষে বুনবুন ভাবে—ভাগ্যিস, সে বাবার কাছে থাকে না। দিদিভাইরা তো আর বুনবুনদের যমের কাছে দেন না। তেমন কোনও শাস্ত্রীয় নজির পাওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং সে অকুতোভয়ে ঘোরাফেরা করতে পারে। তবে আজকের দিনটা বাবার কাছ থেকে দূরে থাকাই নিরাপদ।

তিনজনেই উৎকর্ণ হয়ে শোনে নচিকেতার প্রশ্ন—মানুষ মরে গেলে তার কী হয়।

—দেহের মধ্যে আছে আত্মা। আত্মা মরে না। আত্মার বিশেষ রূপ নেই। আগুন, হাওয়া, এদের মতো। আত্মা দেহ নয়, মন নয়, প্রাণ নয়, বুদ্ধি নয়, আত্মা এগুলোকে ছেয়ে থাকে, কিন্তু এগুলির বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে সে বিনষ্ট হয় না।

—'এ কথা আপনি মানেন ঠাকুরপো।'

—'না মেনে উপায় কী, বউঠান! না মানলে জীবনের কী অর্থ আপনি দেবেন, বলুন! বেশ তো আপনার উপলব্ধি কী বলে?'

—'উপলব্ধি? উপলব্ধি কিছু নেই। তবে কেমন মনে হয় শুধু শুধু একেবারে মিছিমিছিই এমন একটা প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড হল? শেষ পর্যন্ত তো সবই বৃথা? বৃথা বোধ যেতে চায় না ঠাকুরপো। বৃথার বাইরে যেতে পারি না।'

বুনবুন ভাবে—ঠাকুর্দার আত্মা, যা নাকি আগুনের মতো, হাওয়ার মতো তা তাহলে যে কোনও মুহূর্তে যে কোনও রূপ ধরতে পারে। বুনবুনের কাছে রূপ ধরে অনবরতই আসতে থাকবে নাকি?

পুনপুন ভাবে—মৃত্যুও গড়াচ্ছে, ঠাকুর্দাও গড়াচ্ছেন, গড়াতে গড়াতে একসময়ে ঠাকুর্দা আগুন হয়ে জ্বলে উঠলেন, ব্যস ছবিরানি আর তাঁকে ধরতে পারল না।

বুবু ভাবল—তার বুদ্ধি নেই। না থাকলে কী হবে। আত্মা আছে। সে আগুনের মতো, হাওয়ার মতো, সূর্যের মতো। ক্রমে এমন দিন আসবে যখন সে ইচ্ছেমতো রূপ ধরতে পারবে। কেমন রূপ সে ধরবে ভাবতে ভাবতে বুবু কঠোপনিষদের ঘরে ঘুমিয়ে পড়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একাদশ অধ্যায়

পিণ্ডদানম্

অনেক দিন পরে এসেছি মানিকদের বাড়িতে। এক মাস, তিরিশ দিন, চল্লিশ দিন। আমাদের অশৌচ ছিল তো? ময়লা জামাকাপড়, খালি পা, তাই আসিনি। আজ মা বললেন—'যা না পাবন, যা। বিকেলবেলায় ঘরে বসে থাকা ভাল নয়।' মানিক আর আমি পায়ে পায়ে ঢুকলুম ভারী ভেলভেটের পর্দা সরিয়ে। এই হল মানিকদের বিখ্যাত গানঘর। এখানে গান হতে আমি দেখিনি। শুনেছি যখন আমি খুব ছোট তখন পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের গান হয়েছিল, ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের গান হয়েছিল। পণ্ডিতে আবার গান গায় নাকি? সাহেবে আবার গান গায় নাকি? পিসিমা বলেন—'একটা মিনি আর একটা হুলো মাঝরাতে চেঁচালে যেমন হয়, তেমনি। তার চেয়ে একটা ময়নাডালের কীর্তন দিক না।'

বাবা বললেন 'তা যদি বলো দিদিমণি, ময়না ডালেও মিনির ডাক হুলোর ডাক আছে। তখন কী করবে?'

তা সে যা-ই হোক, ঘরটা ফুটবল মাঠের মতো বড়। যেমনি লম্বা তেমনি চওড়া। মেজদিমণির বিয়ের সময়ে এ ঘরে বর, বরযাত্রী সব বসেছিল। এইখান থেকেই রাঙাজেঠু গাল ফুলিয়ে নাচতে নাচতে বেরিয়েছিলেন। বন্ধই থাকে ঘরটা। মাঝে মাঝে খোলা হয়, ঝাড়-পোঁছ করে, হাওয়া খেলিয়ে আবার বন্ধ করে দেওয়া হয়।

আজকে খোলা দেখে ঢুকে পড়েছি। চকচকে কালো মেঝে। ঘরটা আঁধার-আঁধার হলে কী হবে, কোথায় যেন আলো জ্বলছে, আমার পায়ের কাছে মেঝেতে অস্পষ্ট আমার ছবি পড়েছে। মানিক বলল—'এই দ্যাখ, আমারও পড়েছে।' শার্ট, মুখের খানিকটা, একটা কান, যেন এঁকে কে হাত দিয়ে ঘষে ঘষে দিয়েছে। মেঝের ওপর মাঝে মাঝে গোল পদ্ম করা। বিরাট বিরাট তিনটে ঝাড়বাতি ঘরটায়। মানিক সুইচ টিপে জ্বালিয়ে দিল ঝাড়বাতিগুলো, একটা... দুটো... তিনটে অমনি ঘরটা ঝলমল করে উঠেছে। দেয়ালে দেয়ালে কত ছবি। মাঝে মাঝে বড় বড় সোফা রয়েছে, পিঠ উঁচু গদি-আঁটা কত চেয়ার দেয়াল ঘেঁষে দাঁড় করানো রয়েছে। কী কাজ চেয়ারের পিঠে, পায়ায়, হাতলে। সব ঝকঝক করছে।

আমরা ছবি দেখতে এসেছি। বিরাট বিরাট সব রঙিন ছবি। দেখলে আর চোখ ফেরে না। সামনেই অয়েল পেন্টিং, ঈশ্বরী ধ্রুববালা দেবী, জপের মালা নিয়ে গাল তুবড়োনো মুখ কুঁচকোনো এক বুড়োমানুষ, গেরুয়া-গেরুয়া সিল্কের থান পরেছেন, হাতে জপের মালা।

আমি বললুম—'তোর ঠাকুমা নাকি রে?'

ধুত! মানিক বলল— 'এ তো বাবু শিবশঙ্করের মা, দেখছিস না পেছন দিকে ত্রিশূল আঁকা আছে।' অমনি আমার মনে পড়ে গেল সেই বিরাট সব কাণ্ডকারখানা। ধবধবে সাদা মন্দিরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যে ত্রিশূলেশ্বরের তেলচান, দুধচান, কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়েছে— 'জয় ত্রিশূলবাবাকি জয়' বলে কারা চেঁচিয়ে উঠল। কী সব কাণ্ড হচ্ছে সেখানে!

এই ধ্রুববালা দেবীই সেই শিবশঙ্করের মা। যাঁরা দুজনেই বলেছিলেন— শিবোহহম্? তবে তো গল্পটা সত্যি! ছবি রয়েছে যখন।

তারপর দেখি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুর। একটু ঠোঁট ফাঁক, ভেতরে খয়া খয়া দাঁত দেখা যাচ্ছে, চোখগুলো ঢুলুঢুলু, হাতে বুজবুজদিদির মতো নাচের মুদ্রা করেছেন। আমি ফিক করে হেসে ফেলেছি। মানিক বলল—'হাসলি কেন রে?'

আমি— 'এত বড় লোক নাচ করে?'

মানিক— 'নাচ করবে কেন ? ভগবানকে ডাকছে । ওই যে মুখ ফাঁক দেখছিস— বিড়বিড় বিড়বিড় করে ভগবানকে আসতে বলছে।'

আমি—'কোন ভগবান রে ?'

মানিক—'কালী ভগবান ।'

আমরা দু জন ওং নমো করি।

মানিক বলে—'রামকৃষ্ণ ঠাকুর বক উড়ে যাওয়া দেখে মাঠের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন।'

শীতের শুরুতে আমাদের আকাশ দিয়েও তো বক উড়ে যায়, খুব সুন্দর লাগে দেখতে। আমি তো অজ্ঞান হয়ে যাই না ? মানিক তুই যাস ? যা ? একদিন অজ্ঞান হয়ে দেখতে হবে কেমন লাগে।

পরেরটায় দেখি স্বর্গত ডক্টর শিবশঙ্কর রায়চৌধুরী। কালো চাপকান পরা, পকেট থেকে সোনার ঘড়ির চেন উঠে রয়েছে। ঠোঁটের ওপর আশুতোষের মতন গোঁফ, চোখে খুব রাগী রাগী দৃষ্টি, চশমাটা হাতে ধরা, একটা থামে হাত দিয়ে আড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বাপ্ রে ইনি ছুরি হাতে এসে দাঁড়ালে তো আমি ভয়ে চিৎকার করবো । এইটাই পাকুমার বর ? পাকুমার নিশ্চই খুব ভয় করত বলেই কলকাতায় পালিয়ে এসেছিলেন। আমরা দুজনে তর্কাতর্কি করতে লাগলুম এটা সেই চাপকানটা কিনা যেটা তিনি সারারাত ধরে সেলাই করেছিলেন।

মানিক বলল—'সেটাই।'

আমি—'রাজ এস্টেটে কাজ করবার সময়ে তো আরও কত চাপকান তৈরি করিয়েছিলেন। আর এই ছবিটা যখন হয়েছে তখন তো আগের চাপকানটা ছিঁড়ে গেছে।'

মানিক গোঁয়ারের মতো বলল—'না, চাপকান ছেঁড়ে না ছবি তোলবার জন্যে উনি সেই প্রথম চাপকানটাই পরেছিলেন।'

আমি দেখতে লাগলুম একটা চাপকান ভাঁজ করে ধপাস করে হলের ভেতর পড়ল, তারপর আরেকটা, আরেকটা। পৃথিবীর যত লোকে যত চাপকান পরছে, সে সব আর ছিঁড়ছে না। হলটা উপছে পড়ছে চাপকানে। পৃথিবীময় খালি চাপকান। আমার যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। বঙ্কিমচন্দ্রের চাপকান, দ্বারকানাথের চাপকান, রামমোহনের শিবশঙ্করের সবাইকার চাপকান আমার ওপর চেপে বসছে।

একরকম ছুটেই আমি পরের ছবিটার দিকে চলে যাই। স্বামী বিবেকানন্দ। মাথায় গেরুয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাগড়ি, গায়ে গেরুয়া...এটাও কি চাপকান ? কোমরে কষে উড়ুনি না কী বাঁধা, জ্বলজ্বলে চোখ, খুব ভালো লাগে এই ছবিটা আমার। সব সময়ে যেন ঘাড় ফিরিয়ে দেখছেন। কী মস্ত মস্ত চোখ ? অত বড় চোখ মানুষদের হয় ? ও তো ঠাকুরদের থাকে !

এই বারের ছবিটা দেখেই চিনতে পেরেছি। লাল পাড় শাড়ি পরা, চুল সব সামনে এলানো, কপালে সিঁদুর টিপ, হাতে চুড়ি বালা কত রকম, গলা থেকেও ঝুলছে কত রকম। পাকুমা। এখনকার পাকুমা নয়। অনেক ছোট, তবু চিনতে পেরেছি। এই মুখটাই শুকোতে শুকোতে শুকোতে শুকোতে, এই চুলগুলোই সাদা হতে হতে হতে হতে, এই গয়নাগুলোই খসে যেতে যেতে যেতে যেতে এখনকার পাকুমা হয়েছেন। এমন দিন তা হলে ছিল যখন পাকুমা প্যাঁশনে লাগিয়ে বই পড়তেন না ? কালো চুল মেলে লাল পাড়ের ঘোমটা দিয়ে ঘুরে বেড়াতেন ? কী সুন্দর !

মানিক কিন্তু বলল—'দূর। এখনকার পাকুমাই বেশি সুন্দর। পাকুমাদের আবার অত ছোট হলে ভালো লাগে না কী ?'

আমি আর মানিককে বললুম না আমাদের বাড়ির অ্যালবামে বাবার একটা ছোট্টবেলার ছবি আছে। এক্কেবারে ন্যাংটাপুটো। আমার কিন্তু সেই ছবিটা খুব ভালো লাগে। বাবাকে যখন গম্ভীর থাকবার সময়ে ভয় করে তক্ষুনি আমি সেই ছবিটা ভেবে নিই।

এমা, তলায় দেখি নাম লেখা আছে ধরিত্রী দেবী। এ কি রে? ইনি তাহলে নিশ্চয় পাকুমার বোন হবেন। পাকুমার নাম তো সুভগা।

মানিক ঠোঁট উল্টে বলল— 'কি জানি বাবা। আমরা তো এটাই পাকুমার ছবি বলে জানি। সুভগা হয়ত খারাপ নাম ছিল।'

অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকি ধরিত্রী দেবীর ছবি। যেন আমাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছেন। আবার ভালো করে দেখতে গেলেই দেখি আমাদেরও পেছনে কার দিকে, কাদের দিকে তিনি তাকিয়ে। পেছন ফিরে বারবার দেখি কেউ আছে কি না। কই, কেউ তো নেই?

—'পেছন ফিরে কী দেখছিস!' —মানিক জিজ্ঞেস করে।

আমি বলি—'কার দিকে তাকিয়ে পাকুমা হাসছেন বল তো? পেছনে কে আছে?'

মানিক বলে—'ধুত। পেছনে আবার কে থাকবে? পাকুমা তো আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। এর আগেও আমি ছবিটা দেখেছি। সব সময়ে পাকুমা আমার দিকে তাকিয়ে হাসে।'

আমি আর কথা বাড়াই না। পাকুমা আমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি। কিন্তু সে কথা বললে মানিক তো বিশ্বাসই করতে চাইবে না। মিছিমিছি একটা ঝগড়া ঝগড়ি, কান্নাকাটি লাগবে। হাজার হোক পাকুমা তো আগে মানিকের, পরে আমার!

মানিক বললে—'এই দ্যাখ পুনপুন আমার ঠাকুর্দা।'

হ্যাট কোট পরা একজন খুব সুন্দর দেখতে মানুষ, ঠোঁটের ওপর সরু গোঁফ। চোখ দুটো যেন কত দূরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

—'ঠাকুর্দা ইংরিজিতে কবিতা লিখতেন, জানিস তো? কবিতার খাতা আমার জ্যাঠামশাইয়ের কাছে আছে।'

ঠাকুর্দার পরে রবি ঠাকুরের ছবি। এ তো আমি খুব ভালো করেই চিনি। আবার নমো

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করি। রবি ঠাকুরও তো একরকমের ঠাকুরই। যেমন দুগগা ঠাকুর, শিবঠাকুর, রামকৃষ্ণঠাকুর।

তার পরেই মানিকের মেজ ঠাকুর্দা। খুব গাঁট্টাগোঁট্টা মুখে আলবোলা, গায়ে সবুজ কাজ করা চাদর, পাঞ্জাবি। বসে আছেন, মুখে মোটা গোঁফ। খুব গম্ভীর মানুষ।

তার পর মানিক বলল—'দ্যাখ চিনতেই পারবি না।'

আমি আন্দাজে বললুম— 'ছোট্‌ঠাকুর্দা।'

ওমা, ঠিক হয়ে গেল। কিন্তু সত্যিই চেনা যায় না। মোগল বাদশাহদের মতন সাজপোশাক। লাল লাল গাল, কী সুন্দর, কী সুন্দর, যেন রূপকথার রাজকুমার।

তার পরের ছবিটা দেখে তো আমার চক্ষু চড়কগাছ। নীল শাড়ি পরা ভীষণ ফর্সা, বাদামি চুল একজন সিঁদুর পরা মেমসায়েব, বড় বড় নীল চোখ। এঁকেই তো আমি আর পুটপুট-বুজবুজ ছাতের ঘুলঘুলি দিয়ে দেখেছিলুম! হঠাৎ দুম করে উধাও হয়ে গেলেন?

ছবির তলায় লেখা—স্বর্গীয় লীলাময়ী দেবী।

মানিক বলল—'আমার ঠাকুমা। ত্রিলোকেশ্বর রায়চৌধুরীর বউ।'

—'কী বললে? কে ত্রিলোকেশ্বর?'

আমরা চমকে পেছন ফিরে চাইলুম। মানিকের ছোট ঠাকুর্দা। সেই ফ্যাকাসে ফর্সা রঙ। টিঁয়ে পাখির মতো নাক। সাহেবি স্যুট।

—'হী ওয়জ এ ড্যাম্‌ড্‌ ফুল। লীলাময়ীর মালিক হওয়া অত সোজা না। আই, আই শিবশম্ভু রয়চৌড্রি নো দ্যাট।'

ছোট ঠাকুর্দার চোখ দুটো জ্বলছিল। মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। একটু একটু যেন কাঁপছেন। কোথা থেকে হাওয়া আসছে এত? ছোট ঠাকুর্দার কি জ্বর হয়েছে?

—'তোমরা কে? এখানে কী করছো?'

—'আমরা চলে যাচ্ছি'— মানিক ভয়ে ভয়ে বলল।

—'এটা কি আমার কথার উত্তর হল?' বলে তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে তাকালেন উনি।

আমি ঢোঁক গিলে বললুম—'আমি ডাক্তারবাবুর ছেলে। ছবি দেখতে এসেছি।'

—'হুইচ ডাক্তারবাবু? আমিও তো ডাক্তারবাবুর ছেলে।'

আমি প্রায় কেঁদে ফেলে বলি—'শিবশঙ্কর ডাক্তারবাবু নয়, আমি দুগ্‌গাপসাদ ডাক্তারবাবুর ছেলে।'

—'অ, দ্যাট দুগ্‌গাপ্রসাদ! আমার হাঁটুর বাতটার খুব ভালো চিকিচ্ছে করেছে। ছবি দেখতে এয়েচো? ডাক্তারবাবুর ছেলে? বাঃ। এসো, এসো, আমি ছবি দেখাচ্ছি।'

আমার কাঁধ না ধরে কয়েকটা ছবি পার হয়ে উনি এসে দাঁড়ালেন আর একজন মেমসাহেবের ছবির সামনে।

—'চেনো?'

—'ন?' আমি ছোট্ট করে বলি ভয়ে ভয়ে।

সিসটার নিবেদিতাকে চেনো না? মহীয়সী মহিলা। আমাদের এই হতভাগা দেশের জন্যে নিজের সব স-ব, মানমর্যাদা পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত খুনের দায়, সম্পত্তি লিখিয়ে নেবার চার্জ! সে স-ব তিনি দিয়ে গেছেন ভারতবর্ষের বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যে। আহা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমরা, আমরা তাঁকে দেখেছি, তাঁর বক্তৃতা শুনেছি। সেসব দুর্লভ সৌভাগ্যের ব্যাপার। তোমরা এখনকার শিশুরা তো তাঁর নামই জানো না দেখছি। এইসব মহান মানুষ আত্মবিসর্জন দিয়ে গেলেন যার জন্যে, সেই স্বাধীনতা এলো মিডনাইটে চোরের মতো? একটা বাঁটকুল লোকের হাত ধরে, ছ্যা ছ্যা ছ্যা।'

আর একটা ছবির কাছে টেনে নিয়ে গেলেন আমাকে—'এঁকে চিনতে পারছো?'

—'হ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ।'

—'কে বলো তো?'

—'সিসটার.....' আমি ইতস্তত করছি। ঘর ফাটিয়ে হা হা করে হেসে উঠলেন ছোট ঠাকুর্দা— এঁকে তুমি চিনতে পারো না হে ছোকরা। ইনি হলেন দেখো লেখা আছে নীচে; পড়তে পারো? —শ্রীমতী অ্যালিস রবসন।' আমি ভয়ে ভয়ে চেয়ে দেখি সাদা গাউন পরা, ধবধবে ফর্সা এক মেমসাহেব। লীলাময়ীরই মতো, তবে অনে-ক বুড়ো, সিসটার নিবেদিতার চেয়েও বুড়ো, মাথায় ধবধবে চুল, মুখে এতখানিক হাসি। ইনি সাহেবদের পাকুমা নিশ্চয়ই।

ছোট ঠাকুর্দা বলছেন—'ইনিও একজন মহীয়সী। শুধু কারও প্রতিভায় বিশ্বাসী হয়ে, শুধু এক অলৌকিক কৃতজ্ঞতায় নিজের সর্বস্ব কেউ বিদেশি বিধর্মীকে দান করে দিতে পারে? শিবশঙ্করকে একেবারে স্বয়ং শিব বলে চিনেছিলেন তিনি। শিবও যে, যেহোভা-ও সে। কিন্তু মহীয়সী হলেও মানুষ, মাটির মানুষ তো? ভুল, ভুল করে ফেলেছিলেন প্রথমেই। প্রচণ্ড ভুল—' গর্জন করে উঠলেন ছোট্ ঠাকুর্দা—'নেলী, ও নেলী। মাই হার্টস ডিজায়ার, দি ইটারন্যাল উন্ড আপন মাই সোল, আ অ্যাম ব্লীডিং, স্টিল ব্লীডিং, আ উইল ব্লীড টিল টাইমস এন্ড্।'

বৃদ্ধ সাহেব নিজের বুকে হাত চেপে অপূর্ব অভিনয় করতে লাগলেন।

মানিক আমায় ইশারায় বলল—'পালা।' পেছন ফিরে দুজনে ভোঁ দৌড়। —'দ্যাট মা, দ্যাট পাকুমা অফ দিস কার্সড্ ফ্যামিলি, শী'ল ডিসাইড ফর এভরিবডি, ড্যাম হার, ওহ্ ড্যাম হার, ড্যাম হার....' শব্দগুলো আমাদের পেছনে ছুটে আসছে।

—'কী বলছিল রে ছোট ঠাকুর্দা?'

আমি বললুম —'অত কী আমি বুঝতে পারি? কিন্তু পাকুমার ওপর খুব রেগে গেছেন।'

ফিসফিস করে বলি—'ড্যাম তো একটা খারাপ কথা।'

মানিক গম্ভীর হয়ে বলল—'আমার বাবা কী বলে জানিস তো? বলে ছোট্ ঠাকুর্দা পাগল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বাদশ অধ্যায়

পাকুমার তৃতীয় গল্প

এক আলো-আঁধারির শীতের বেলার ভর-সন্ধেয় ওরা পাকুমার তৃতীয় গল্প শুনেছিল। বুবু-পুনপুন-বুনবুন।

এক যে ছিল সওদাগর-কন্যা। তার এমন রূপ যে সে যেখান দিয়ে যায় স-ব আলো হয়ে যায় (পাঁকুদির চেয়েও? টিয়াদির মতো? রাধাদিদিকে দেখেছেন পাকুমা? ওই রকম)। কাঁদলে চোখে মুক্তো ঝরে। হাসলে হীরে ঠিকরে পড়ে (স্যাকরারা কি কন্যার কাছ থেকেই হীরে মুক্তো আনে? একটা হুমদো-মতো লোক সব সময়ে বাটি নিয়ে নিয়ে কন্যার পেছন পেছন ঘুরছে। কখন সে হাসবে, কখন কাঁদবে, হীরেমুক্তো ভরে নিতে হবে, তা-ই)। একবার সওদাগর যাবেন ভিনদেশে বাণিজ্য করতে (বুজবুজও যেতে চায় বাণিজ্যে, কিন্তু সেটা ভিনদেশ নয়, 'নীলের কোলে শ্যামল সে দেশ') মেয়েকে বললেন— কী আনবো মা? তখন মেয়ে বলল— কী আর আনবে বাবা, সবই তো আছে আমার। তুমি বরং একটা বাচ্চা তিমি এনো, পুষবো। সদাগর বললেন— আচ্ছা। (আমাদের বাবাও বেশ বাণিজ্যে গেলে পারেন, আমাদের জিজ্ঞেস করলে আমরাও জিনিস চাইবো— পুনপুন চাইবে জাগুয়ার, যে জানোয়ারটির নাম সে সম্প্রতি শুনেছে। বুনবুন চাইবে ঘোড়া, ঘোড়ায় চড়ে অনেক কিছু করা যায়, আর বুবু চাইবে—কী—কী—কী একটা ঝিনুক তার থেকে পদ্ম উঠেছে, পদ্মের পাপড়ির মধ্যে টুলটুলে মুখ ফুল-তুকতুকে এক রাজকন্যে)।

দিন যায়, দিন যায়। সদাগর তাঁর সপ্তডিঙা ভর্তি করে বাণিজ্য করে ফিরছেন। এমন সময়ে তাঁর মনে পড়ল— তাই তো, তিমি চাই তো! তখন তিনি জাহাজ একটু ঘুরিয়ে মেরুসাগরের দিকে চললেন। মেরুসাগরে তিমিদের আঁতুর- ঘর। সেখানে হাজার হাজার তিমি জন্মায়, একটু বড় হলে মায়েরা তাদের জলে ভেসে বেড়াতে আর শিকার করতে শেখায়। (তিমিদের সঙ্গে আমাদের এত তফাত যে কেন? জলে ভাসা ছেড়ে, আমরা যখন কলের নীচে সব গামছা জড়ো করে চার দিক ঘিরে দিয়ে পুকুর করি আর তাতে সাঁতার কাটি, তখনও কি মা বলেন না, আর নয় পুনপুন-বুনবুন, আর না বুবু, চলে এসো!)। কিন্তু তিমির বাচ্চা ধরতে গিয়ে সদাগরের দুটি পা-ই তিমিমাছে খুবলে খেয়ে গেল। দারুণ অসুস্থ হয়ে তিনি কোনওক্রমে বাড়ি পৌঁছেই মারা গেলেন (বুবু-পুনপুন-বুনবুনের জাগুয়ার-ঘোড়া-ঝিনুকের দরকার নেই)। তখন সদাগরের স্ত্রী শোকে দুঃখে আকুল হয়ে বুক চাপড়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন— আমার সমস্ত ধনরত্ন আমি বিলিয়ে দোব। কিচ্ছুটি আর রাখব না আর তুমি মেয়ে, তোমাকেও আমি সকাল হলেই যে দুয়ারে এসে দাঁড়াবে তাকেই দিয়ে দেব। মেয়েও শোকে দুঃখে কাতর হয়ে ভাবলো সত্যিই বাবার মৃত্যুর জন্যে তো সে-ই দায়ী, তার বিলিয়ে যাওয়াই ভালো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন হবি তো হ এক ভালো মানুষের তিন পুত্তুর সেদিন ভোরবেলা বেড়াতে বেরিয়েছে। বেড়াতে বেড়াতে তারা সদাগরের দরজায় এসে ঘা দিল। বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। দরজা খুলে তিন ভাইকে এক সঙ্গে দেখলেন সদাগরনী। কী করেন, তিনজনের সঙ্গে তো আর মেয়ের বিয়ে দিতে পারেন না। মেয়েকে ডেকে বললেন, এদের মধ্যে একজনকে বেছে নাও (পুনপুন ভাবলো সে আগেই লুকিয়ে পড়বে মেয়ে যাতে তাকে দেখতে না পায়, বুনবুন ভাবলো মে বড্ড হাঙ্গামার, সে দিলেও নেবে না, বুবু উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে....তিন পুত্তুরের বিষয়ে সব কথা শুনে তবে সে ঠিক করবে কাকে নেবে।)।

মেয়ে দেখলো—বড়টি যেন দেবতার মতো, মুখে মধুর হাসি, চোখে যেন কোন সুদূরের স্বপন, কণ্ঠে তার গান। অপূর্ব বাঁশি বাজিয়ে গান করে সে কন্যাকে অভিভূত করে দিল। বলল এমন গান গাইবো যে মনে হবে নন্দনকাননে বসে পারিজাতের গন্ধবহ বাতাসে কান পেতে স্বর্গের মন্দাকিনীর কলতান শুনছ। বড়টির চোখে চোখ আটকে আছে এমন সময়ে সদাগর কন্যার কানের পাশ দিয়ে শনশন করতে করতে তীর ছুটে গেল; কন্যা দেখলো— মেজপুত্তুর বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, চোখ যেন বাঘের সাহসে জ্বলছে, পেশীতে পেশীতে ঢেউ খেলিয়ে যাচ্ছে, হাতে ধনুর্বাণ, কোমরে তরোয়াল। মেজকুমার বলল—যদি অনুমতি করো তো একটার পর একটা বাণ বিঁধিয়ে লম্বা একটানা পথ করে দিতে পারি তোমার জন্যে। যদি কখনও বিপদে পড় তো তোমার বিপদের বুকে সঙ্গে সঙ্গে বিঁধে যাবে আমার তরোয়ালের ফলা। আমি পাশে থাকতে তিনভুবনে কোনও যক্ষ রক্ষ কাউকে তোমার ভয় নেই। কন্যা মুগ্ধ হয়ে দেখলে— কী বীরপুরুষ! কী বীরপুরুষ! তীর-ধনুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে যেন বা রাম। দেখছে তো দেখছেই এমন সময়ে তার আঁচলে টান পড়লো, কন্যা ফিরে দেখে ছোটকুমার। কুমার তো নয় রাজকুমার। কন্যার চোখে আর পলক পড়ে না, ছোটকুমার বলল আমি হাজার রকম খেলা জানি। আমরা যাব বনে, পাহাড়ে, আমরা ঝাঁপ দেব সমুদ্রে, সারা পৃথিবী জুড়ে আমরা আমাদের খেলাঘর পাতব। কন্যা অবাক হয়ে দেখল কুমারের চোখ দুটি বালকের মতো, সে শিশুর মতো হাসে, তার হাতে এক চমৎকার বল, সেটা সে বিদ্যুদ্বেগে আকাশে ছুঁড়ে দেয়, আর বিদ্যুদ্বেগে তাকে ধরে ফেলে। (বুবুর তিন জনকেই পছন্দ, এখন কন্যে কী করে দেখা যাক!)

এখন সেই কন্যের ছিল খুব বুদ্ধি। সে ভাবলো বিপদে তো আর সবসময়ে পড়তে হচ্ছে না, আর পড়লে তো মেজকুমার আছেই, আর ছোটর মতো খেলুড়িকেও খেলার সময়েই দরকার, তো তখন দেখা যাবে'খন। কিন্তু স্বর্গীয় গান শুনিয়ে সব সময়ে তাকে সে নন্দনকাননের আনন্দে রাখবে সেই বড় কুমারকে বেছে নেওয়াই ঠিক হবে (যুক্তিটা বুবুর মনে ধরেছে, পুনপুন ভাবছে ছোট কুমারই সবচে' ভালো, বুনবুন ভাবছে মেজকুমার)।

সে যে-ই বড়কুমারের হাত ধরেছে অমনি অন্ধকার হয়ে গেল দুই কুমারের মুখ। দেখে কন্যার বড় কষ্ট হল। বলল— 'তোমরা ভাবছ কেন? আমি তো রইলামই। তোমাদের তিনজনকেই তো আমি ভালোবাসি?'

তখন তিন কুমার সাদরে সদাগর কন্যাকে নিয়ে নিজেদের বাড়িতে তুলল। আর সদাগরনী সব টাকাকড়ি বিলিয়ে দিয়ে হলেন বনগামী। এদিকে সদাগর-কন্যা তার সংসার যত সহজ ভেবেছিল ততটা হল না। সে যখন বড়কুমারের সঙ্গে গান গেয়ে, গান শুনে সময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাটায় অন্য দুজন রাগে ফোঁসে। সে যখন মেজকুমারের ঢাল-তলোয়ার আর তীর-ধনুকের কসরৎ তারিফ করতে ব্যস্ত থাকে, তখন বড়কুমারের মুখ মলিন হয়ে যায়, ছোটকুমার ধুলোয় গড়াগড়ি খায়। আর ছোটকুমারের সঙ্গে যখন খেলে, তখন আর দুই কুমার ঘোড়ায় চড়ে টগবগ টগবগ করতে করতে ঝড়ের মতো দুজনে দুদিকে চলে যায়।

অবশেষে একদিন বড় বলল— 'কন্যা, তোমায় সময় দিচ্ছি, তুমি মনস্থির করো, তোমায় একজনকে বেছে নিতে হবে।' বলে সে অনেক দূরের দেশে চলে গেল। মেজকুমারও বলল— 'তোমায় সময় দিচ্ছি, তুমি একজনকে বেছে নাও।' বলে সে যুদ্ধ-বিগ্রহ-বিপ্লবে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আজ কারাগারে যায়, কাল অজ্ঞাতবাসে যায়, পরশু আবার সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে নেবে পড়ে। সৈন্যসামন্ত রথী- মহারথীতে বাড়ি ভরে যায়, কন্যা তাদের সেবাযত্ন করে, কিন্তু মেজকুমারের দেখা আর পায় না।

কেউ নেই আর বাড়িতে। তখন ছোটকুমার বলল— দেখছ তো কন্যে, তোমার স্বর্গের দেবতাও তোমায় ফেলে চলে গেল আর তোমার বীরপুরুষও কোথায় উধাও হয়ে গেল। তুমি আমাকেই বরণ করো।

কন্যা কী করে, সে দিনরাত প্রার্থনা করে বড়-মেজ ফিরে আসুক, আর ছোটর সঙ্গে খেলা করে অরণ্যে, পাহাড়ে, সমুদ্রে। এইরকম ভাবে অনেক দিন চলে গেল, বড় কুমার ফিরে এসে দেখলো পুরী খাঁ খাঁ, দাস-দাসীদের জিজ্ঞেস করল কেউ কিছু বলতে পারল না। তখন মনের দুঃখে বড়কুমার মাথায় পাথরের বাড়ি মেরে মরে গেল। কন্যা ঘরে দুয়ার দিল। ছোটকুমারের হাজার ডাকেও দুয়ার খুলল না। কিন্তু একদিন দরজায় দুমদাম ঘা শুনে দরজা খুলে দেখে মেজকুমার। সে বলল— 'কন্যা, অত্যাচারী রাজার সেনাদলকে মেরে এসেছি; আমার আর রক্ষা নেই, বিদায় দাও', বলে সে হাতের তলোয়ারটা নিজের বুকে বিঁধিয়ে দিল।

তখন সদাগরের সেই মেয়ে নিজের ওপর রাগে, ছোটকুমারের ওপর রাগে দুঃখে প্রাণ বিসর্জন দিল।

গল্প শেষ। পাকুমার মুখ গম্ভীর। চোখ চকচক। আমরা রুদ্ধ নিশ্বাসে শুনছিলুম। মানিক বলল— পাকুমা সদাগর কন্যার নাম তো বললে না?

পাকুমা উত্তর দিলেন না।

আমি বললুম আমি বলব? সদাগরের মেয়ের নাম লীলাময়ী।

ভীষণ চমকে উঠলেন পাকুমা। যেন তাঁকে কেউ চাবুক মেরেছে। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন— এ নাম তোমার মনে হল কেন, বাবা?

—কেন তা তো জানি না পাকুমা।

মানিক বলল—ও কিছু জানে না পাকুমা। লীলাময়ী তো আমার ঠাকুমার নাম। কন্যাদের ওরকম নাম হয় না কী?

ঠিক বলেছ। কী রকম নাম হয়?

বুনবুন বলল—কাঞ্চনমালা কাঁকনমালা।

মানিক বলল—মণিমালা, শঙ্খমালা।

—ঠিক। পাকুমা উঠে পড়েছেন। এবার চুল বাঁধবেন, বরফ রঙের চুল, এবার গা ধোবেন, হিম-ঠাণ্ডা জলে, তারপর দুধগরদের কাপড় পরবেন, তারপর তুষার ধবল শাঁখে ফুঁ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ত্রয়োদশ অধ্যায়

পিতামহ

ছোট্ ঠাকুর্দা আমাকে ডেকেছেন। মানিক খবর দিল।

আমি চমকে গেছি। ভয়ে ভয়ে বললুম—'কেন রে?'

—'তা তো জানি না। তোকে একেবারে তিনতলার ঘরে নিয়ে যেতে বলেছেন।'

—'তুইও থাকবি তো?' আমার গলা কেঁপে যাচ্ছে।

—'হ্যাঁ। আমাকেও তো যেতে বলেছেন।'

মানিকের পেছন পেছন ভেতর বাড়ির কার্পেট পাতা সিঁড়ি দিয়ে উঠি। আমি যেতে চাইনি। এই তিনতলা ভীষণ ভয়ের। কিন্তু আমি যদি না যাই, ছোট্ ঠাকুর্দা আমাকে সারা পৃথিবী চুঁড়েও খুঁজে বার করতে পারেন, সে আমি জানি। তুমি ধরো ভূতের ভয়ে পালাচ্ছ। অনেক দূরে, অনেক অনে-ক দূরে একেবারে মায়ের কোলের ভেতর বসে আছ। চার পাশে তোমার বাবা, তোমার পিসিমা সব আপনজনেরা। নিশ্চিন্ত হয়ে হাসছ তুমি। হঠাৎ ওপর থেকে একটা মোটা, লোমশ, কড়া মতন হাত নেমে এসে তোমায় সবার মাঝখান থেকে তুলে নিয়ে গেল। এমন কি আর হয় না? তাই ছোট্ ঠাকুর্দাকে অমান্য করবার সাহস নেই আমার।

তখন বিকেলবেলা। সিঁড়ির অনেকটা পশ্চিমের জুড়িয়ে-যাওয়া রোদে ছেয়ে রয়েছে।

পাকুমা রান্নাবাড়ি পার হয়ে উঠোনে এসে বললেন—'ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস মানিক?'

—'ছোট্ ঠাকুর্দা ডেকেছেন পুনপুনকে, তাই নিয়ে যাচ্ছি।'

—'ছোট্ ঠাকু .... পুনপুনকে?' পাকুমার গলা দিয়ে বিস্ময় ঝরে পড়ছে। আমি দু-তিনটে সিঁড়ি এক লাফে পার হয়ে, ছুটে উঠোনে গিয়ে পাকুমাকে জড়িয়ে ধরেছি।

—'পাকুমা, আমি ছোট্ ঠাকুর্দার কাছে যাব না। আমায় ভীষণ মারবেন, পাকুমা আমায় যেতে দেবেন না।'

পাকুমা আরও অবাক হয়ে আমার মুখটা দু হাতে তুলে নিয়ে বললেন—'কেন? মারবে কেন?'

—'আমরা গানঘরে ছবি দেখছিলুম, তাই। ভীষণ রাগ করেছেন।'

—'ছবি দেখছিলে এতে রাগের তো কিছু নেই! ছবি দেখাটা দোষের হবে কেন?'

—'আপনাদের গানঘরে তো ছোটদের ঢোকা বারণ পাকুমা, না?'

—'কেন? এ গানঘর তো আর নাগেদের আমলের নয়' ... পাকুমা আপন মনে বললেন। তারপরে বললেন—'কত সুন্দর সুন্দর ছবি টাঙানো রয়েছে। তেজেনবাবুর আঁকা, আলিসাহেব, জে. টি. মর্গ্যান ... সেসব তো দেখবার জিনিসই। না মণি ছবি দেখতে গিয়ে তোমরা কোনও দোষ করনি। আর, যে কোনও কারণেই হোক, বিরক্ত হলে ছোট ছেলেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডেকে মারবে, এমন ছেলে শম্ভু কেন, আর কেউই এ বাড়িতে নেই, তুমি নিশ্চিন্তে যাও। ছোট্ ঠাকুর্দার নিশ্চয় তোমাকে খুব ভাল লেগেছে। যাও, ভয় নেই। তা ছাড়া, আমি তো নীচে রইলুমই।'

সত্যিই তো, ছিটকিনি খুলে নতুন কাকুর ঘর থেকে কে আমায় উদ্ধার করেছিলেন? পাকুমাই তো।

মানিক বলল—'দেখলি তো! চল এখন! কত দেরি হয়ে গেল বল তো!'

লম্বা-চওড়া দালান। তার দুদিকে ঘর। ডানদিকে দ্বিতীয় ঘরটা ছোট্ ঠাকুর্দার। আমরা দরজায় টোকা দিই।

—'এসো, ভেতরে ঢুকে এসো'— ছোট্ ঠাকুর্দার সেই গলা। ভেতরে ঢুকতে পা কাঁপছে।

দেখি একটা গোল মার্বলের টেবিল। তার ওপরে চায়ের বাসন, এত পাতলা কাপ যে ভেতরে চা দেখা যাচ্ছে, ট্রের ওপর চায়ের পট, চিনি দুধ। একটা বেতের চেয়ারে নরম গদির মধ্যে ডুবে বসে আছেন ছোট্ ঠাকুর্দা, শাদা শার্ট-প্যান্ট পরা। আরেকজন ফরসা মতো কুঁচিয়ে থান পরা মানুষ তাঁকে চা ঢেলে দিচ্ছেন।

—'এসো এসো, এসো ভাই, এইখানে বসো।'

হেসে তিনি বললেন—'মানিকজোড় একেবারে।'

আমরা জড়সড় হয়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছি তো!

ছোট্ ঠাকুর্দা বললেন—মেজ বউদি এদের চা দাও।

আমি চা খাই না। মানিককেও কখনও খেতে দেখিনি। কিন্তু না বলতে সাহস হল না। মেজ বউদি বললেন—'কেক খাও, আমি নিজে করেছি।'

কিসমিস-বাদাম দেওয়া, ডিমের গন্ধে ভুরভুর, চৌকো কেক, তারপর সুন্দর কাপে সুন্দর গন্ধ অলা চা খেলুম। চা যে আবার এমন ভাল একটা খাবার জিনিস তা কিন্তু আমি জানতুমই না।

ছোট্ ঠাকুর্দা বললেন—'এই ছেলেটির কথাই তোমায় বলছিলুম। মেজ বউদি। দুগ্গা গো, দুগ্গা ডাক্তারের ছেলে। চমৎকার, না?'

মেজ বউদি মুখ টিপে হেসে বললেন—'চমৎকার! বলে চমৎকার! অতি চমৎকার।'

চমচমের মতো ভাল হলে তাকে চমৎকার বলে এতে আমার কোনও সন্দেহই রইল না। কেন? তা তো জানি না!

ছোট্ ঠাকুর্দা চা শেষ করে পাইপের মধ্যে তামাক ভরতে লাগলেন, তারপর পাইপ ধরালেন। পাইপের কড়া গন্ধে ঘরটা ভরে গেল।

—'এই যে আমার মেজ বউদিকে দেখলে, চা ঢেলে দিচ্ছেন, কেক তৈরি করে খাওয়াচ্ছেন, ইনি কে জান?'

—মেজ বউদি উঠে দাঁড়ালেন, বললেন—'আহা, এসব আবার কেন?'

—'বা আজকালকার ছেলেরা ইতিহাস জানবে না? এখনও কিছু ইতিহাস চলে ফিরে বেড়াচ্ছে মেজ বউদি, এরপর তো সবই একেবারেই ইতিহাস হয়ে যাবে!'

আমরা হাবলার মতো চেয়ে আছি।

মেজ বউদি বললেন—'আমি যাই ভাই। মানিকজোড় না জোড়মানিক! তোমাদের সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার দেখা হবে পরে। কেমন?'

ছোট্ ঠাকুর্দা বললেন—'সেই যে তোমাদের সিস্টার নিবেদিতার ছবি দেখালুম, সেই নিবেদিতার কাছে ইনি পড়েছেন ছোটবেলায়, ঘরে ঘরে ঘুরে ঘুরে মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়েছেন। সিস্টার নিবেদিতার মহৎ কাজ তো একটা নয়। তিনি যেমন ভারতীয়, বিশেষত বাঙালিদের মধ্যে বীরত্ব জাগাতে চেয়েছেন, দে-চম্পট কাপুরুষের জাত তো আমরা! তেমনি আবার মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে, তাদের মধ্যে চেতনা জাগিয়ে দেশটাকে জাগিয়ে দিতেও চেয়েছিলেন। চেতনা জাগানো মানে কী বল তো?'

আমি চুপ। মানিক চুপ। 'চেতনা' কথাটা বাড়িতেও মাঝে মধ্যে শুনতে পাই। যেন কার্নিশে-বসে-থাকা একটা গোলা পায়রা। পাখার ফটাফট শব্দ করে নেমে পড়ল 'চেতনা', ওই উড়ে যাচ্ছে 'চেতনা' আবার গিয়ে বসবে কার্নিশের কাছে ঘুলঘুলিতে। 'চেতনা'কে লুফে নিলেন বাবা, উড়িয়ে দিলেন, সেটা গিয়ে বসল পমপমের কাঁধে। কাঁধ থেকে কোলে নেমে পড়ছে 'চেতনা', নিচু হয়ে 'চেতনা'কে তুলে নিল ই-দাদা, এবার কি সুযযির দিকে পাঠিয়ে দেবে?

—'চেতনা মানে নিজের ভেতর-বাহির সবটা সম্পর্কে জ্ঞান, সতর্কতা। যেমন ধরো রাস্তায় আবর্জনা ফেলতে নেই, থুতু ফেলতে নেই যেখানে সেখানে। আমাদের মেয়েরা দেখবে এক বালতি কুমড়োর খোসা, শাকের ডাঁটা, মাছের আঁশ, ছাই সব নিয়ে এসে ধড়াস করে পাশের বাড়ির দরজার গোড়ায় ফেলে দেবে। চেতনার অভাব। আবার দেখবে রাস্তায় যেতে যেতে কেউ প্যাচ করে পানের পিক ফেলল। চেতনা নেই। তো নিবেদিতা এই সব শেখাতেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বাইরে-ভেতরে। আমার মেজ বউদি ছিলেন তাঁর প্রকৃত শিষ্যা। বুঝলে?'

আমরা বুঝলুম।

—'আমার মেজদা, এই মানিকের মেজ ঠাকুর্দা ছিলেন গুপ্ত বিপ্লবী। গুপ্ত মানে বোঝো?'

আমরা মাথা নাড়ি। 'গুপ্ত' মানে 'চুপি চুপি'। কেন জানব না?

—'বাইরে ছিলেন দুঁদে পুলিশ অফিসার। কিন্তু ভেতরে ভেতরে বিপ্লবী। মেজ বউদির লেখা ডায়েরি যদি প্রকাশ করা যায় না, বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের এক অদ্যাবধি অজানা অধ্যায় উন্মোচিত হবে। আমাদের বাগানে একটা ঘর আছে দেখেছ তো? ওইখানে কত যে বিপ্লবী লুকিয়ে থেকেছেন তার ঠিক নেই।'

—'ওইটুকু ঘরে?' মানিক বলল।

—'ঠিক কোথায় কেমন করে সে একদিন তোমাদের দেখাব এখন,' ঠোঁটে পাইপ নিয়ে ছোট্ ঠাকুর্দা উঠে দাঁড়ালেন।

—'যে জন্যে তোমাদের ডেকেছি। ছবি দেখতে ভালবাস, দেখ।'

টেবিলের ড্রয়ার খুলে উনি একটা বড় বাক্সর মতো অ্যালবাম বার করলেন। অ্যালবামের পাতা খুলে ছবি দেখাতে লাগলেন আমাদের মাঝখানে বসে।

—'এই দেখো, কে বলো তে?'

আমি বললুম— 'গুপ্ত বিপ্লবী।'

'হা হা হা হা'—অট্টহাস্য হাসতে লাগলেন ছোট্ ঠাকুর্দা।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'গুপ্ত বিপ্লবীই বটে। শিশির ভাদুড়ির নাম শুনেছ? এটা ওই শিশির, আমাদের বাড়ির পুজোয় নাটক হচ্ছে, শিশির সেজেছে কৃষ্ণ। এই দেখো পাশে এটা আমি, শিবশম্ভু রায়চৌধুরী কর্ণ করছি। কর্ণর নাম শুনেছ তো? না, তাও শোননি?'

আমি উৎসাহে এগিয়ে বসে বলি—'হ্যাঁ, চাকা বসে গিয়েছিল তো। কবচকুণ্ডল গা কেটে দিয়ে দিলেন যিনি।'

—'ঠিক। আহাহা কী চরিত্র! কী মানুষ। মহিমা কী। অমন যে কৃষ্ণ, সেই কৃষ্ণও তাঁর কাছে পরাভূত। দৈহিক শক্তির কাছে নয়, চরিত্রশক্তির কাছে। আচ্ছা বলো তো 'মহাভারতে'র গল্পে কাকে তোমাদের সবচেয়ে ভাল লাগে?'

মানিক তাড়াতাড়ি বলেছে—'কর্ণ।'

আমিও বলছি—'কর্ণ।' বড়রা এরকম প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেই একটা ' কেন' জিজ্ঞেস করেন। কর্ণের বেলায় বলতে পারব চরিত্রশক্তির জন্য। তাই কর্ণ বললুম। আসলে কর্ণ নয়। আমার প্রিয় অর্জুন।

—'আহাহা হা! এই দেখো গিরিশচন্দ্রের জনা, আমি প্রবীর, এই ডি. এল. রায়ের "চন্দ্রগুপ্তয়" আমি চন্দ্রগুপ্ত।'

পরপর পাতা উল্টে যান ছোট্ ঠাকুর্দা। দেখতে থাকি।

—'এই দেখো শেক্সপীয়রের "অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা", আমি অ্যান্টনি আর এই দেখো আমার বড় বউঠাকরুন ক্লিওপেট্রা সেজেছেন।'

আমরা অবাক হয়ে দেখি—অ্যান্টনি একেবারে ছবির বইয়ের রোম্যান সাহেব, আলগা আলখাল্লার মতো পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছেন। টুকটুক করছে লাল চেহারা। আর ক্লিওপেট্রার শাদা ফুরফুরে পোশাক, মাথায় ক্রাউন জ্বলজ্বল করছে, কানের ওপর ফাঁপানো চুল, এক হাত সটান সামনে বাড়িয়ে কী যেন আদেশ করছেন ক্লিওপেট্রা। ও রকম সুন্দর কোনও মেয়ে আমি কখনও দেখিনি।

—'ছোট্ ঠাকুর্দা, আপনি খুব সুন্দর ছিলেন, না?' মানিকের প্রশ্নে আমার চমক ভাঙে।

—'সুন্দর?' ছোট্ ঠাকুর্দা কেমন অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলেন—'শুধু সুন্দর, লিট্‌ল বয়? আমি পাবলিক স্টেজে নামলে আজ শুধু শিশির ভাদুড়ি শিশির ভাদুড়ি, অহীন্দ্র চৌধুরী অহীন্দ্র চৌধুরী করত না লোকে' বলেই তিনি গদগদ গলায় আবৃত্তি করতে লাগলেন:

'জন্ম-জন্ম—একমাত্র রন্ধ্রপথ ছিল
ওইখানে। তাই আজ ওরে ও মরণ।
ভগ্ন-রথে পৃষ্ঠ দিয়া, সমস্ত ভুলিয়া
বসে আছি। ওরে ও মরণ—বিস্মরণে
জন্ম তোর। তুই এলি—জন্মের লাঞ্ছনা
স্মৃতি মুছাতে নারিলি! চারিদিকে শূন্য,—
মধ্যে আমি। আমার অন্তরে প্রবেশিয়া
ব্যঙ্গ করে বিরাট শূন্যতা

এ রকম কখনও শুনেছো?' শুধু গর্ব নয়, কেমন দুঃখের সঙ্গেও যেন বললেন ছোট্ ঠাকুর্দা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এ রকম গলা, মাঝে মাঝে কান্নায় থর থর করছে, মাঝে মাঝে বীরত্ব ফুটে উঠছে, এরকমটা আমরা কখনও শুনিনি। কখনও না। গলার আওয়াজটাও যেন কেমন অন্য রকম। ছোট্ ঠাকুর্দার কথা বলার গলা আর আবৃত্তির গলা আলাদা? যখন আবৃত্তি করছিলেন, চেহারাটাও যেন কেমন বদলে গিয়েছিল। একটা মানুষের মধ্যে আসলে দুটো মানুষ আছে না কি? ততক্ষণে ছোট্ ঠাকুর্দা ইংরিজিতে আবৃত্তি করছেন— 'এজ ক্যানট উইদার হার, নর কাস্টম স্টেল হার ইনফিনিট ভ্যারাইটি।' এ আবার আরেক রকম আবৃত্তি, যেন আপন মনে বলছেন।

হঠাৎ ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ছোট্ ঠাকুর্দা—'ওফ্ফ দ্যাট ধরিত্রী দেবী: শি ডিডনট অ্যালাও মি টু জয়েন দা পাবলিক স্টেজ। হোয়েনেভার আই ওয়ান্টেড টু ডু সামথিং, শি স্টুড ইন মাই ওয়ে। শি স্টুড দেয়ার লাইক আ মিলিয়ন-ইয়ার-ওল্ড পিরামিড ... অ্যান্ড আই ওয়জ লস্ট! লস্ট! লস্ট! মাই অক্যুপেশন ওয়জ গন, গন, গন। ... শোনো ... লিস্‌ন বয়েজ, তোমাদের মধ্যে যদি কোনও সাধ থাকে, যা অত্যন্ত শক্তিশালী, যদি কোনও প্রতিজ্ঞা থাকে, তা সে যা-ই হোক না কেন, এনি ড্যাম থিং ইন দিস ওয়র্ল্ড, তা হলে কারুর পরোয়া করবে না। কারুর কথা শুনবে না, ফলো ইওর ওন ট্যালেন্ট টু দা গ্রেভ...।'

'অভিনেতা, অভিনেতা হতে চেয়েছিলাম ... সার গ্যারিক। গিরিশ ঘোষ মদ খেত, মেয়েমানুষে মজত... সো হোয়াট? শিশির অ্যাক্টর সো ও মদ ... সো হোয়াট?' বজ্রগর্জনে চেঁচিয়ে উঠলেন ছোট ঠাকুর্দা। তারপর হঠাৎ সুর নরম করে বললেন— 'আমি কখনও মদ ছুঁইনি, স্বদেশির যুগের ছেলে আমরা ... আমি কখনও মেয়েমানুষ স্পর্শ করিনি। আমার চোখের সামনে চিরকাল ছিল সে, একমাত্র সে। আর কেউ নয়, কেউ তার কাছে কিসসু নয়। আমায় যদি দ্যাট বাংলিং ইন্টারফিয়ারিং ফুল অফ এ লেডি অভিনয়টা করতে দিত! আমি তার জন্য আমার যা কিছু ব্যথা বেদনা বিরহ প্রেম ভক্তি সব উজাড় করে দিতে পারতুম, একটা আউটলেট পেতুম, আমার বুকের মধ্যে জমে থাকা তুষার, জমাট লাভা ... সেই সব স-ব আমি প্রকাশ করে দিতে পারতুম। অন্যভাবে। কে আমার অভিনয় অমন প্রাণস্পর্শী করেছিল! নাগেদের বাড়ির দুর্গোৎসবে আমি রাম করিনি? শিশিরের চেয়েও ভাল করিনি? কেন করেছিলুম, কেউ জানে না, আমি জানি, আমি জানি। ...এত রূপ এমন ক্ষমতা সমস্ত সমস্ত নষ্ট করে দিলে। আর এখন? এখন আমি এক বৃদ্ধ, নখদন্তহীন বৃদ্ধ শার্দুল। করার কোনও কাজ নেই, ভাবার কোনও বিষয় নেই, গোর একটা, অজানা, অচেনা কবর...অপরাধ করলুম, করে ফেললুম,— সে চলে গেল, আমার ওপর অভিমান করে, তিন তিনটে মানুষ চলে গেল...।'

অ্যালবামটা টেনে নিলেন ছোট্ ঠাকুর্দা, অন্যমনস্ক, পাতা উল্টে যাচ্ছেন। ডেসডিমোনার ছবি একটা। লীলাময়ী ডেসডিমোনা বলে একটা মেয়ে সেজেছেন। আলোছায়ায় মাখা ছবিটা, ছায়ার মধ্যে থেকে বড় বড় চোখ চেয়ে রয়েছে কার দিকে। মুখে হাসি নেই। বিষণ্ণ। ভীষণ করুণ। ছবিটার দিকে অপলকে চেয়ে থাকতে থাকতে ছোট্ ঠাকুর্দা পকেট থেকে শাদা ধবধবে রুমাল বার করলেন।

কাপড়ের খসখস শব্দ না? পাকুমা পুজোর কাপড় পড়ে এসে দাঁড়িয়েছেন দরজার কাছে। —'শম্ভু!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোট্ ঠাকুর্দা জবাব দিচ্ছেন না। মুখ নিচু করে রুমাল দিয়ে মুখ চোখ মুছছেন।

—'দু যুগ তিন যুগ পার হতে চলল, শম্ভু এখনও তোমার কষ্ট গেল না?"

—'দু যুগ? তিন যুগ?' ছোট্ ঠাকুর্দা মুখ তুলে তাকালেন, 'লক্ষ যুগ পার হয়ে গেলেও যায় না মা, বুকের মধ্যে লাভা আটকে রেখে গুমরে মরনি তো, তুমি বুঝবে না। কোনওদিন বোঝনি, আজও বুঝবে না। একটা বাঁধা সড়ক চিনে এসেছ চিরকাল। পয়সা ছিল, বুদ্ধির জোর ছিল, সেই পথে নিজে চলেছ, সব্বাইকে চালিয়ে এসেছ, না না, তুমি বুঝবে না। এ তোমার বোঝার জিনিস নয়।

ছোট্ ঠাকুর্দা না হয় পার্ট বলছেন। কিন্তু পাকুমাও যে কেন ধরতাই দিয়ে যাচ্ছেন সেটাই বুঝতে পারছি না।

—'বাঁধা সড়কে চলে এসেছি আমি? কী বলছ তুমি?'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ ওটাও বাঁধা সড়কই মা। তোমার ছেলেরা, নাতিরা ডাক্তার হবে, জজ হবে, ব্যারিস্টার হবে, আবার দেশ উদ্ধারও করবে, তুমি ধর্মের ঠাট-বাট মানবেও, আবার মানবেও না। বিধর্মীর সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিয়েছ বলেই তুমি কি নিজেকে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ঠাউরেছ না কি? অত সোজা নয় মা, অত সোজা নয়। তোমার সড়কও বাঁধা সড়কই। একটা কাজও ওই বাঁধাবাঁধির বাইরে করতে পারনি, করতে চাওনি। আমি যে আজ একটা ধ্বংসস্তূপ, ঘরেরও নই, পারেরও নই, আমি যে একটা প্যারাসাইট, একটা পাপী, তা তোমার চেয়ে বেশি আর কে জানে মা? কে আমাকে এমন করেছে?'

—'তোমার অহঙ্কার, তোমার তামসিকতা শম্ভু। নয়তো এত কাল গড়িয়ে গেল, তুমি কেন নিজেকে গড়ে নিতে পারলে না? তোমাকে হার্ভার্ডের মতো জায়গায় পাঠালুম, তুমি দুটো পাশের পরেই স্নায়ুবিকারের রুগি হয়ে ফিরে এলে। সে কি আমার দোষ? সুযোগ কি তোমাকে দেওয়া হয়নি?'

—'আ অ্যাম দা লাস্ট পার্সন টু ব্লেম ইট অন এনিবডি। বাট মাদার, তুমি জান না, বুকের মধ্যে আগুন পুষে রেখে যেন কিছুই হয়নি, এমনিভাবে সাংসারিক কাজকর্ম করা যায় না। আর অহঙ্কার! অহঙ্কারই তো আমাদের গড়েছে মা। নইলে তুমি কেন তুমি আর আমি কেন আমি? কোনও কোনও তামসিকতা সর্বস্বত্যাগের তামসিকতা মা জননী। একদিন বুঝবে, যে সন্তান তোমাদের সবার অপরাধের বোঝা নিয়ে জীয়ন্ত শবদেহের মতো শুধু কালক্ষেপ করে গেল, সে ইচ্ছে করলে সব ভেঙে চুরে দিতে পারত, কেড়েকুড়ে নিতে পারত। ভাঙেনি, নেয়নি। সব স-ব ত্যাগ করেছে, তমোমগ্ন হয়ে থেকেছে, অন্ধকারে ঢাকা, ভেতরে আগুন আছে বলে। আর তুমি? তুমি মনে করছ, চার পুরুষ ধরে চৌধুরীবাড়ির হালটি ধরে নিষ্কাম কর্ম করে যাচ্ছো মা ফলেষু হয়ে। একদিন, একদিন বুঝবে এ তোমার কোন গুণের গুণপনা, মা গো, একদিন বুঝবে?'

আমি অনেকক্ষণ ধরেই বুঝতে পারছিলুম এখানে আমাদের আর থাকা ঠিক নয়। ছোট্ ঠাকুর্দা আর পাকুমা পার্ট বলছেন না, তর্কাতর্কি করছেন, আমাদের বাড়ি বাবাতে আর ঠাকুর্দাতে যেমন হত, পমপম আর ই-দাদার মধ্যে যেমন হয়, কিংবা ই-দাদা আর পালক। তর্ক করতে করতে ওঁরা আমাদের কথা ভুলেই গেছেন। কিন্তু আমার অন্তত পা যেন আটকে গিয়েছিল। ছোট্ ঠাকুর্দার সেই পার্ট বলার মতো কথা বলা, পাকুমা যেন পাকুমা নয়, সবই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাকে অভিভূত করে দিচ্ছিল।

হঠাৎ পাকুমা বেরিয়ে গেলেন। ছোট্ ঠাকুর্দা আমাদের দিকে ফিরে হঠাৎই যেন আবিষ্কার করলেন আমাদের।

—'কে? আরে মণি-মাণিক্য না জোড় মানিক না? খুব ভয় পেয়েছ তো? চল তোমাদের দেখাই কোথায় বিপ্লবীরা লুকিয়ে থাকত।'

আমাদের দু জনের কাঁধে হাত দিয়ে ছোট্ ঠাকুর্দা নীচে চললেন। বাগানের ছোট্ট ঘরটাতে যেখানে দায়ুদ গোবর্ধনকে মেরেছিল সেইখানে এসে উনি আমাদের এক দলা কাঁটাগাছ দেখালেন।

—'ওই দেখো, ওই যে ক্যাকটাসের ট্রেটা রয়েছে ওটা সরালেই একটা দরজা পাবে, ওই দরজা দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে যেতে হয়। এবার চলো এর উল্টো দিকে।'

দুটো উঠোন পার হয়ে আমরা বারবাড়িতে এলুম। ছোট্ ঠাকুর্দা গান ঘরের দরজা খুললেন। আজ ঘরটায় দরজা-জানলা সব বন্ধ রয়েছে—ভ্যাপসা গন্ধ। সব আলোগুলো জ্বালিয়ে দিলেন ছোট্ ঠাকুর্দা, ঘর ঝলমল করে উঠল। ছবিগুলো জ্বলজ্বল করছে, যেন হাসছে। ঘরের একদম শেষে একটা দেয়াল-আলমারি। দেয়াল জোড়া একেবারে। ডান দিকের ভাঁজ করা পাল্লা খুলে উনি পেছনের দেয়ালে একটা কড়া ধরে হ্যাঁচকা টান মারলেন, আলমারির পাল্লার মতো খুলে গেল দেয়াল। সেই ফাঁক দিয়ে আমরা তিনজন একটা অন্ধকার জায়গায় ঢুকলুম। ছোট্ ঠাকুর্দা বোধহয় কোনও সুইচ টিপলেন। আলো জ্বলে উঠল। এটা একটা ঘর, ভ্যাপসা, নোংরা, অনেক দিনের ঝুল জমে আছে কড়িকাঠে। কয়েকটা কাপড়-ঢাকা সোফা কৌচ, টেবিল তক্তপোশ রয়েছে ঘরটাতে। এখানে জানলা নেই, আছে খালি বড় বড় কাচ ঢাকা ঘুলঘুলি।

ছোট ঠাকুর্দা বললেন—'বয়েজ, এই ঘর একটা ঐতিহাসিক ঘর। কী আর পড়বে তোমরা ইতিহাসে? কতটুকু? এই ঘরে এক সময়ে আমার বউঠাকরুনরা কত বিপ্লবীকে লুকিয়ে রেখেছেন। আমার মা তাঁদের সেবা করেছেন, এইখানে কত প্ল্যান আঁকা হয়েছে, কত ম্যাপ আঁকা হয়েছে স্বাধীন ভারতবর্ষের।'

মানিক বলল—'একটা ম্যাপও কি আর নেই?'

—'না', মানিকের মাথায় হাত রেখে হাসলেন ছোট্ ঠাকুর্দা—'একটা ম্যাপও নেই।'

গুপ্ত কুঠুরির দরজা বন্ধ করে দিয়ে উনি বললেন—'এই ঘর এ বাড়ির সবচেয়ে পবিত্র ঘর, এই ঘরে পা রেখেছেন অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ, সিস্টার নিবেদিতা, এখানে এসেছেন অমরেন্দ্র চাটুজ্যে, ভূপেন দত্ত, আর সবচেয়ে বেশি এসেছেন যাঁরা তাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামের অখ্যাত গুপ্ত সৈনিক সব। তাঁদের নাম করতে গেলে আজকের রাত ফুরিয়ে যাবে। তাঁদের গল্প তোমাদের আর এক দিন শোনাব।'

তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন—'আর এই গানঘর? এ-ও কিছু কম পবিত্র নয়। এখানে গান করে গেছেন পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ, ফৈয়জ খাঁ সাহেব, বদল খাঁ সাহেবের সারেঙ্গি শুনেছি এইখানে। কত ভাল ভাল নাটকের রিহার্স্যাল দেখেছি, করেছি। আমার কাছে এই ঘরও পবিত্র। আ হোলি রুম। মাই চার্চ।'

এর কয়েকদিন পর একটা রবিবার সকালে সেই অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চতুর্দশ অধ্যায়

প্রপিতামহী

রবিবার সকালে আমরা দ্বারিকের হিঙের কচুরি খাই তো! হালুয়া দিয়ে। খোসাসুদ্ধু আলুর তরকারি দিয়ে। ছোট্ট ছোট্ট কচুরি। আমার ভাগে দুটো আছে। যদি খেতে পারি মা আরেকটা দেবেন বলেছেন। আমি তাড়াতাড়ি দু নম্বরটা মুখে পুরছি, দেখি মানিক। ছুটতে ছুটতে এসেছে। হাঁপাচ্ছে। আজকে ওর সঙ্গে গোবর্ধনও নেই। একলা এসেছে মানিক।

—'পুনপুন, পুনপুন, শিগগিরই আয়। আমাদের বাড়ি পুজো হচ্ছে। পাকুমা ঠাকুর হয়ে যাচ্ছে।'

মা বললেন—'কী হয়েছে? পাকুমার কিছু হয়েছে? অসুখ?'

—'অসুখ নয়, পুজো। দেখবি আয়? আয় না?'—মানিক আমার হাত ধরে টানাটানি করছে। হাতটা ছিঁড়ে ফেলবে নাকি?

মা বললেন—'যাও, আগে দুধটা খাও, খেয়ে নিয়ে যাবে।' তারপর পিসিমার দিকে তাকিয়ে বললেন—'কী বলুন তো দিদিমণি?'

পিসিমা বললেন—'সত্যনারায়ণ হচ্ছে বোধহয়, পুন্নিমে তো!'

আমি ততক্ষণে মানিকের হাত ধরে হাওয়া।

মানিকদের গানঘর খোলা হয়েছে। ভালো করে ঝাড়পোঁছ করা হয়েছে। ঝকঝক করছে ঘরখানা। মাঝখানের পদ্মটার কাছ ঘেঁষে মেঝেতে বিছানা। পাকুমা সেখানে গরদের কাপড় পরে বসে আছেন। কপালে চন্দনের ফোঁটা, হাতে জপের মালা। সবাই বলছে পাকুমা প্রায়োপবেশন করছেন।

পদ্মর ওপর বালি। তার ওপর চৌকো পাত্তর। সেখানে কাঠের আগুন জ্বলছে, একজন টিকি-মাথায় পুরোহিত আগুনে ঘি ঢালছেন। আর অংবং করছেন, অংবং করছেন আর ঘি ঢালছেন। ধুনো-গুগগুলে ঘরের ওই জায়গাটা সরস্বতীপুজোর মতো আবছা। খুব পুজো-পুজো গন্ধ বেরোচ্ছে। ঘরের মধ্যে মানিকদের বাড়ির সবাই। সব্বাই। শুদ্ধ কাপড় পরে জড়ো হয়েছে সব। সবাইকার মুখ থমথম। কেউ কেউ কাঁদছেন। হাউ-হাউ করে নয়। চোখ দিয়ে জল পড়ছে শুধু। মানিকদের বাবা, কাকা, জেঠারা; কর্তামা, মা, কাকি-জেঠিরা, পিসি-পিসেমশাইরা স-ব বোধহয় এসেছেন। এঁদের সবাইকে আমি চিনি না। মেজদিমণির বিয়েতে কাউকে কাউকে দেখেছি বলে মনে করতে পারছি যেন।

পুজো শেষ করে ঠাকুরমশাই শান্তির জল দিয়ে উঠে গেলেন। তারপর মানিকের বাবা পাকুমার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন—'পাকুমা তুমি এ কী করছ? কেন করছ। এ সব মতলব ছেড়ে দাও, আমি বলছি। তুমিই বলো আমি তোমার ছেলেরও

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়া। পাকুমা, মা জানিনি কোনওদিন, তোমার কাছেই মানুষ হয়েছি, আমার কথাও কি তুমি শুনবে না?'

পাকুমা বললেন—'ভুতু, একটা সৎ-সংকল্প করেছি, তা থেকে আমায় টলাবার চেষ্টা কেন করছ বাছা। অমন করে না।'

—'সৎ-সংকল্প? তুমি তো আত্মহত্যা করছ? আত্মহত্যা তো পাপ?'

—'পাপ-পুণ্য বলে এ সংসারে সেভাবে কিছু নেই ভুতু। যখন যেটা একান্তভাবে প্রয়োজন, তখন সেটাই করতে হয়।'

—'তার মানে এইটা, তোমার মৃত্যুটা প্রয়োজন হল?'

—'হল ভুতু। আমার তো অনেক দিন আগেই চলে যাওয়ার কথা। চিন্তা করে দ্যাখো তোমার ঠাকুর্দা কবে কোনকালে চলে গেছেন। তোমার বাবা, মেজকাকা, মা সব্বাই কত কাল হল গত হয়েছেন। তোমাদের বাবা-কাকাদের সন্তানদের মধ্যেই কি সব কটি বেঁচে আছে?'

—'সেই কথা ভেবে হঠাৎ আজকে তুমি আত্মহত্যা করবে? মা-বাবার অবর্তমানে তুমিই আমাদের দু হাতে আগলে রেখেছ, এখনও রেখেছ, তুমি যা বলো তাই আমরা মেনে চলি।'

—'না, চলো না ভুতু। তবে সেসব কথা থাক। একদিন না একদিন তো যেতেই হয়। এখন তোমরা ভব্যিযুক্ত সাবালক হয়েছ, তোমাদের নিজেদের ভরা সংসার। সবই তো সামলাচ্ছ। বুঝিয়েও দিয়েছি সব। আমার কোনও দায় নেই ভাই।'

—'স্বাভাবিকভাবে চলে গেলে তো কিছু বলার থাকত না পাকুমা। এভাবে যাচ্ছ মানে কোনও কারণ আছে। নিশ্চয় কোনও কারণ আছে। আমাদের বলো কী অপরাধে আমাদের আজ এইভাবে...কী কথা শুনি না।'

পাকুমা বললেন—'কারণ একটা আছে। তবে সেটা তোমাদের অপরাধ নয়। আমারই অপরাধ। নিতান্তই যদি শুনবে তো শোনো। আমার বহুমূল্য মণিটি হারিয়ে গেছে।'

আমার কান খাড়া। মানিক আমার দিকে বড় বড় চোখে চেয়ে আছে।

—'মণি? কী মণি? কোনওদিন তো শুনিনি?' মানিকের বাবা আকাশ থেকে পড়েছেন।

—'শোননি আমি বলিনি বলে। বলার কথা নয়। অনেকদিন আগে, তোমাদের ঠাকুর্দার সঙ্গে বিয়েরও আগে আমি এক মন্ত্রপূত মণি পাই। পরশমানিক বলেই তাকে জানতুম। ছোট্ট কালো পাথরের টুকরো একটা। সেই মানিক আমি হারিয়ে ফেলেছি।'

—'কী করে হারালে? এ তো আশ্চর্য কথা!'

—'মানিকটা থাকত আমার আলমারিতে। আলমারি খুললেই চারদিকে একটা আভা দেখতে পেতুম। কদিন আগে আলমারি খুলে দেখি ভেতরটা কেমন ম্যাড়ম্যাড় করছে। তখন বাক্স খুলে দেখি মণিটা নেই। তখনই বুঝেছি আমায় এবার চলে যেতে হবে।'

মানিকের বড় জ্যাঠামশাই বললেন—'কী বলছ পাকুমা? কোনওদিন তো বলোনি! অত দামি একটা পাথর হারিয়ে যাবে, খোঁজাখুঁজি না করে তুমি প্রায়োপবেশনে বসে পড়লে? আশ্চর্য! কেউ নিশ্চয় চুরি করেছে তোমার আলমারি থেকে। এত বড় কথাটা তুমি চেপে যাচ্ছিলে?'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকুমা হাত তুলে বড় জ্যাঠাকে থামালেন—'কাতু, সে পাথর দেখতে খুবই সাধারণ। একটা কালো পাথরের টুকরোকে খুব ঘষে ঘষে মসৃণ করে ফেললে যেমন হয় তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। তার যে কোনও অসাধারণত্ব আছে দেখলে বোঝা যায় না ভাই। হীরে-জহরত তো নয় যে কেউ চুরি করবে। আমিই কোথাও হারিয়ে ফেলেছি।'

—'বেশ তো হারিয়ে থাকে, খুঁজে বার করবো।'

—'মন্ত্রপূত সে পাথর নিজের ইচ্ছেয় আসে, ইচ্ছেয় যায় বাছা, পারবি না।'

—'পারি কিনা দেখো।'

—'বেশ দেখো। তবে খামোখা লোকজনদের উত্ত্যক্ত করো না, আর শোনো খুব শুদ্ধ কাপড়ে, শুদ্ধ চিত্তে ছাড়া ও পাথর খুঁজে কোনও লাভ নেই, পাবে না। পেলেও আর তার গুণ থাকবে না। আমি বলছি কাতু, হারিয়ে গেছে এটা মেনে নেওয়াই ভালো।'

—'মোটেই না। হারিয়ে গেছে, আবার খুঁজে পাওয়া যাবে। ঠিক আছে, তুমি যে ভাবে বলছ সে ভাবেই খুঁজব। কিন্তু তোমাকে কথা দিতে হবে খুঁজে বার করতে পারলে তোমাকে উঠতে হবে। এসব প্রায়োপবেশন-টেশন চলবে না। কথা দাও।'

পাকুমার মুখে কী সুন্দর হাসি! বললেন—'ঠিক আছে, কথা দিলুম।'

বড় জ্যাঠামশাই সবাইকার দিকে তাকালেন—'সবাই শুনলে তো? পাঁচ দিন সময় নিই আমরা। এর মধ্যে মেয়েরা সব সকালবেলায় চান করে গরদের কাপড় পরে নেবে। গীতাপাঠ চলবে। এ ক'দিন বাড়িতে মাছ মাংস পেঁয়াজ রসুন ঢুকবে না। আমরাও সব পুজোর কাপড় পরে থাকব, একাহারী হব, যে যার সাধ্যমতো বুঝলে।'

সবাই চলে গেলেন আস্তে আস্তে। খালি আমি আর মানিক পাকুমার মাথার কাছে। ঘর চুপচাপ হয়ে গেলে পাকুমা বললেন—'কিরে কে রে? মানিক?'

ভিতু ভিতু গলায় মানিক বলল—'আমি আর পুনপুন। আমি যাব না পাকুমা, আমি এখানেই থাকব।'

আমি বললুম—'পাকুমা, আপনার পরশমানিক হারিয়ে গেছে? সত্যি?'

—'সত্যি নয় তো কী?'

আমি বললুম—'আমি খুঁজে দেব পাকুমা?'

—'পারবি?' হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে পাকুমা বললেন, 'তোরা দুটোতে এদিকে একবার আয় দিকিনি।'

আমরা সামনে গিয়ে পাকুমার মুখের সামনে বিছানার ওপর হাঁটু গেড়ে বসলুম। পাকুমা বিছানায় বসতে আমাদের বারণ করলেন না তো? পিসিমা কিন্তু আমাদের বিছানা ছুঁতে দেন না। বুবুকে যদি বা দেন। আমাকে একবারে নয়। বলবেন—'এই পুনু খবর্দার আমার জিনিস ছুঁবি না!'

ঠাকুমা বলবেন—'আহা একটা একফোঁটা বই তো নয়, মনো!'

পিসিমা বলবেন—'কলাইয়ের বীজ একফোঁটা হলেও কলাই সেজমা, ব্যাটাছেলের ঝাড়ে ব্যাটাছেলেই জন্মায়। তোমার কথা আলাদা তুমি পাকা মাথায় সিঁদুর পরেছ। কিন্তু আমি একটা জন্মশুদ্ধ মানুষ...'

পিসিমা আমাকে ব্যাটাছেলে বলেন। এ মা! ব্যাটাছেলে তো একটা খারাপ কথা। আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কখনও পিসিমার জিনিস ছোঁব না। ছোঁবই না।

পাকুমা আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। পাকুমার মুখটা কি হাসি-হাসি? না কাঁদো-কাঁদো আমি একদম বুঝতে পারছি না।

পাকুমা বললেন—'আগে ভাবতুম, রায়চৌধুরী বংশের কেউ ছাড়া ও জিনিস পায়ও না, কী ভুল? পরশমানিক কি কোনও বংশের একচেটে হতে পারে? তুমি, হ্যাঁ মণি তুমিও পেতে পার বইকি? তবে খুব ভালো, খুব সাহসী, খুব দয়ালু হতে হবে বাবা, যতটা বুদ্ধি চাই ততটাই হৃদয় চাই।'

আমি তাড়াতাড়ি বলি—'পাকুমা, বাবা বলেছেন আমি খুব সাহসী। স্বাধীনতার দিন আমি হারিয়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু একটুও কাঁদিনি। রাস্তার দাদাদের কাছে ঠিকানা বলে বাড়ি আসতে পেরেছিলুম। আর পাকুমা, আমার খুব দয়াও আছে। আমি ভিখারিদের পয়সা দিই, চাল দিই। নিতাই আমার লাট্টু চাইলে আমি দিয়ে দিয়েছিলুম। এতে হবে না পাকুমা? পারব না?'

মানিক অমনি বলল—'আমিও তো খুব ভালো পাকুমা। আমি তো পরীক্ষায় টুকলি করি না। ফড়িং-এর ডানা ছিঁড়ি না প্রজাপতি দেশলাইয়ের বাক্সে পুরে রাখি না বাচ্ছার মতো। আমি পারব না?'

পাকুমা আমাদের দুজনকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। পাকুমার বুকে রোজ সুন্দর গন্ধ পাই। আজকের গন্ধটা আরও সুন্দর। সরস্বতী পুজোর মতো। পাকুমা তাহলে সত্যি-সত্যি ঠাকুর হয়ে যাচ্ছেন। এখনই আর্ধেকটা হয়ে গেছেন, আর আর্ধেকটা হলেই মাথার চারপাশ দিয়ে জ্যোতি বেরোবে।

পাকুমা বললেন—'কেন পারবি না বাবা? নিশ্চয় পারবি। চেষ্টা কর। তবে বড়রা যেখানে খুঁজছে সেখানে খুঁজতে যাসনি। মন্ত্রপূত পাথর তো। তেমন করে খুঁজতে পারলে হয়তো দেখবি তোদের পেনসিলের বাক্সে লুকিয়ে বসে আছে। কিংবা হয়তো দেখবি তোদের প্যান্টের পকেট থেকে বেরোচ্ছে।'

—'তা হলে তুমি আর পারোপবেশন করবে না তো? মানিক বলল।'

আমি পাকুমার দিকে তাকিয়ে আছি। মানিক বুঝতে চাইছে না, কিন্তু আমি বুঝে গেছি পাকুমা কিছুতেই আর এই বিছানা ছেড়ে উঠবেন না, সে আমরা পাথর খুঁজে পাই আর না পাই। চোখ দুটো উনি আস্তে আস্তে বুজে ফেলছেন, বলছেন—'তোরা দুটোতে আমার কাছে কাছে থাকতে পারবি? ওই কোণে যে কৌচগুলো রয়েছে তাতে শুয়ে থাকবি রাত্তিরবেলায়, পারবি না মানিক? পারবি না মণি?'

—'যদি জেঠুরা আসতে না দেয়!'

—'আমি বলে দেব সবাইকে। তবে মণি তোকে বাবা-মার কাছ থেকে অনুমতি আনতে হবে বাবা।'

মানিক পাকুমার কাছে থাকবে, এ আর বেশি কথা কি? কিন্তু আমি তো পাকুমার আসল নাতকুড় নয়! কর্তামা গোবর্ধনের সঙ্গে মানিককে পাঠালেন আমাদের বাড়ি। আমি বসে আছি পাকুমার কাছে। আজ পাকুমা গল্প বলছেন না, তবুও আমার ভালো লাগছে বসে থাকতে। আমি ছবি দেখছি, ঘর দেখছি, আমি সেই গুপ্ত ঘরের দরজা-ঢাকা আলমারিটার দিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকাচ্ছি...।

ওমা, দেখি বাবাও এসেছেন, মা-ও এসেছেন। ওঁরা পাকুমাকে প্রণাম করছেন।

পাকুমা বললেন—'ডাক্তারবাবু, আপনিই এ ক'দিন আমার চিকিৎসা করবেন। আর কারও ওষুধ আমি ছোঁবো না, কাতু-ভূতু তোমরা শুনে রাখো। আর আপনার এই ছেলেটি যদি আমার কাছে কাছে থাকে, যতক্ষণ জ্ঞান থাকবে ততক্ষণ...।'

বাবা বললেন—'আপনি এ সব কী বলছেন? প্রায়োপবেশন আবার আজকালকার দিনে কেউ করে নাকি? আপনি তো এ রকম...'

—'কী? কুসংস্কারের কথা বলছেন তো? কথাটা কী জানেন ডাক্তারবাবু মাঝে মাঝে আত্মশুদ্ধির দরকার হয়ে পড়ে।'

—'কার আত্মা মা? আপনি যদি না-ই থাকলেন তো শুদ্ধি কার? সে নিয়ে আপনার হবেই বা কী?'

—'কার আত্মা, কার শুদ্ধি, আপনি নিজেকেই জিজ্ঞেস করুন ডাক্তারবাবু। ধরুন যতীন দাস যে জেলে প্রায়োপবেশন করলে সে কার শুদ্ধির জন্যে? সুভাষ যে গৃহত্যাগ করে চলে গেলেন অশেষ কষ্ট সয়ে আজ নিরুদ্দেশ সে কার জন্যে?'

—'কিন্তু মা, সে তো...'

—'আমি একটা উদাহরণ দিলুম, ডাক্তারবাবু, তুলনা করছি না।'

আমার মার চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

পাকুমা বললেন—'নাত-বউ চোখ মোছো মা চোখের জল ফেলবার সময় এটা নয়। আমি খুব সুখী, খু-উ-ব। না ডাক্তারবাবু, আমি যা ঠিক করি, তা করি। এটুকু আমার এখনও আছে। সময়মতো এসে আমার নাড়িটাড়িগুলো দেখে যাবেন। নাকে নল দিয়ে কি ছুঁচ ফুটিয়ে কিছু খাওয়াবার বা জিইয়ে রাখবার চেষ্টা যেন কেউ না করে। ছেলেটিকে আমার কাছে থাকতে দেবেন তো?'

—'আপনি চাইছেন আর এটুকু আমি দেব না! আপনার কাছে যে আমি কতভাবে ঋণী!'

—'ঋণ? কিসের ঋণ আবার? মানুষ হয়ে জন্মালে পরস্পরকে দেখাশোনার দায় আপনি বর্তায়। ঋণের কথা উচ্চারণ করলে আপনি ছেলেকে বাড়ি নিয়ে যান।'

বাবা মাথা নিচু করে রইলেন। মা বললেন—'পাকুমা, ও তো আপনার মানিকেরই মতো! আপনার কাছে রাখবেন এ তো ওর সৌভাগ্য।'

পাকুমা বললেন—'রাতের খাওয়া-দাওয়া ও এখানেই করবে। সকালটা বাড়িতে থাক। স্কুলে যাক। সন্ধেবেলায় পড়ার বই-টই নিয়ে আমার কাছে চলে আসবে। কেমন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঞ্চদশ অধ্যায়

মহাপ্রস্থান

প্রথম রাত্তির—দুটো পাশাপাশি কৌচে ছোট ছোট চৌকো বালিশ নিয়ে আমরা শুয়েছি। এগুলো সাহেবি বালিশ। লাল মখমলের। একে বলে কুশন। সন্ধেবেলায় আমরা রুপোর থালা করে প্রসাদ খেয়েছি, পাকুমার থেকে একটু দূরে বসে। তারপরে অঙ্ক কষতে হয়েছে। আমি ভাগ শিখে গেছি তো! মানিক শেখেনি, পাকুমা বললেন ওকে শিখিয়ে দিতে। তারপরে গ্রামোফোনে গান বাজতে লাগল—মীরাকে প্রভুর গান। শুনতে শুনতে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। কখন জানি না, আমার ঘুম ভেঙে গেছে। এত বড় মাঠের মতো ঘরে কখনও থাকিনি তো! ঠিক যেন মনে হচ্ছে, ঘরের মধ্যে কে আকাশ পুরে দিয়েছে। চারদিকে আকাশ মাঝখানে আমি ভাসছি।

ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে পাকুমার মাথার কাছে। সারা দিন ধুপ-ধুনো জ্বলছে, টাটকা ফুল পেতলের ফুলদানিতে, পাথরের থালায়। খুব গন্ধ।

—'মা, ঘুমোলে?'

চমকে উঠেছি। ছোট্ ঠাকুর্দার গলা না! এ ঘরে খুব আস্তে কথা বললেও গমগম করে। ছোট ঠাকুর্দা ফিসফিস করে বলছেন। কিন্তু আমি শুনতে পাচ্ছি।

—'না, বাবা, কিছু বলবি?'

—'তুমি শেষ পর্যন্ত আমার ওপর অভিমান করে চলে যাচ্ছ মা?'

—'কে বললে এ কথা!'

—'কে আবার বলবে? পেটের ছেলেকে ঠকাতে পারো মা? আমি সে-দিনের সব কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি। আমার ভাগ্যে যা হবার হয়েছে। সত্যি তো আমি জোর করিনি কখনও, রোখ ছিল না। বাবা বললেন, অ্যাকটো করতে নামলে ত্যাজ্য পুত্র করবেন। রাজভোগটি আর অক্লেশে জুটবে না, স্ট্রাগল করতে হবে বুঝে ফিরে এলুম। এ তো তোমার দোষ নয় মা! নেলীকে না পেয়ে যে পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলুম, সে-ও তো আমারই ব্যক্তিগত ব্যাপার। কোনও কিছুতেই কোনওদিন বিচক্ষণতা দেখাতে পারিনি মাগো। তুমি তো আমাকে বারবার সুযোগ দিয়েছ। আমি পারিনি। আমিই পারিনি। নেলী যখন দাদাকে ছাড়তে রাজি হল না, আমি তো এ বাড়ি ছেড়ে যেতে পারতুম। যাওয়াই তো উচিত ছিল। যাইনি সহজ জীবনের লোভে, লড়াইয়ের ভয়ে। জীবনসংগ্রামে অক্ষম, কাপুরুষ সন্তান তোমার প্যারাসাইট, উচ্ছিষ্ট। কাপুরুষের স্বভাবই এমনি, নিজের দায় অন্যর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়, মা, আমায় মাফ করো।'

—'শম্ভু, আমি তো চিরটা কাল তোকে প্রাণভরে আশীর্বাদই করেছি বাবা। তুই তো

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানিস, তোর বাবার গোঁড়ামি আমার ছিল না। তাঁর টাকাপয়সার মুখাপেক্ষীও আমি ছিলুম না। তুই যদি অ্যাকটিং করতিস তেমন জোর করে, খুশি না হলেও সাহায্য আমি করতুম। তোর মধ্যে যে ক্ষমতা রয়েছে তা যে অতি অসাধারণ তা কি আর আমি বুঝতুম না? তবে সত্যি কথাই, তোর ওই ক্ষমতাকে আমি তিলুর লেখাপড়া কি কালীর শক্তি-সাহস-দেশপ্রেমের চেয়ে বড় করে দেখিনি। আজ এত কাল পরে বুঝতে পারি তুই ওদের কারও চেয়ে কিছু কম ছিলি না।'

—'আহ্, বলো মা বলো, আরেকবার বলো। চিরকাল শুনে এসেছি আমি এ বাড়ির প্রডিগ্যাল, আমি ব্ল্যাক শিপ, তুমি আরেকবার বলো মা বুকটা জুড়োক।'

পাকুমা খুব তুলতুলে আদর ভরা গলায় বললেন—'তুই সত্যিই ওদের কারও থেকে কিছুমাত্র কম ছিলি না শম্ভু। হয়তো বেশিই ছিলি। তিলু কী করলো শেষ পর্যন্ত! তার কী ভাষা, কী বক্তৃতা, মঞ্চে একবার উঠলে লোকে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেত, অত বড় ব্যারিস্টার হল, মাঝখানে এসে লীলার সঙ্গে কী কথাবার্তা হল আজও জানি নে। সেই যে গেল আর ফিরলোই না! আমার ছেলে ত্রিলোকেশ্বর...সে বিদেশে বিভুঁয়ে ঈশ্বর জানেন কী পরিবেশে কীভাবে হতভাগার মতো অকালে চলে গেল! এ কি পুরুষমানুষের কাজ!'

—'মাগো, দাদা নেলীকে শুধু একটাই প্রশ্ন করেছিল—ছোটর সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক লীলা? নেলী অভিমানে জবাব দেয়নি। চুপ করে ছিল। দাদা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঘোড়ায় চড়ে ময়দানের দিকে বেরিয়ে গেল। সাত দিনও গেল না আবার বিলেত চলে গেল। দাদার দোষ ছিল না মা। পুরুষমানুষ কি শুধু বীর্যে হয় না, প্রেমেও হয় মাগো, ঈর্ষায়ও হয়।'

একটা নিশ্বাসের শব্দ শুধু শুনতে পেলুম। নিশ্বাসটা ওপরে উঠে পাক খাচ্ছে যেন।

ছোট ঠাকুর্দা আবার বললেন— 'একেকটা মানুষ প্রকৃতিতে এত রিচ হয় মা যে অন্য মানুষ তার পরিমাপ করতে পারে না। ওই রকম একটা মেয়েকে তোমাতে অ্যালিসেতে মিলে আমাদের তিন জনের মাঝখানে বসিয়ে দিলে। সে কথা কইত একজনের সঙ্গে, কাজকর্ম করত আরেক জনের সঙ্গে, আমার সঙ্গে তার যত হাসি গল্প, থিয়েটার, গান কৌতুক। সে যদি তিনজনকেই তিন রকম করে ভালোবাসে, কী করা যাবে? তুমি তার দিক থেকে ভাবো। আমি অর্বাচীন সে কথা না বুঝে যদি অপরাধ করে ফেলে থাকি মা তবে আমাকেই কি দোষ দিতে পার? সে চলে গেল। আমার অপরাধে সে চলে গেল। আমারই অপরাধে দাদাও...' ছোট ঠাকুর্দার গলা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। পাকুমা কথা বলছেন না। একটা হাত দেখছি উঁচু, ছোট ঠাকুর্দার মাথার ওপর। আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়েছি কখন।

তৃতীয় রাত্রি

চাপা রাগত গলা—'মা, ও শয্যে থেকে তুমি ওঠো। তুমি নয়, আত্মঘাতী আমারই হওয়া উচিত।'

—'কেন উমা?' —পাকুমার গলা।

—'কেন তুমি জানো না? তোমার নাতিরা চতুর্দিকে মণি খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমার কাছে আলমারির চাবি চাইছে। আমার আলমারি, নতুনের আলমারি, রাঙার আলমারি স-ব খুঁজে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখবে।'

—'তাতে কী? দিয়ে দাও না চাবি!'

—'দিয়ে দোব? বাঃ! রাঙা জ্যাকপট জিতে এতগুলো টাকা পেয়েছে সে সব তো আলমারিতে। দেখলে কাতু ভুতু সতু সব কী মনে করবে তুমি জানো না?'

—'ওরা যাই মনে করুক তুমি সত্যি কথা বলো না, কেউ তোমার ক্ষতি করতে পারবে না!'

—'খুব সোজা, না? আশ্রিতকে কে কবে বিশ্বাস করেছে?'

—'আশ্রিত হয়ে আছ কেন উমা, আমি তো রাঙা আর নতুনকে জমি দিয়ে বসত করাবার কথা কবে থেকে বলছি।'

—'চিরকাল শহরে মানুষ এখন এতখানি বয়সে আর গ্রামগঞ্জে গিয়ে থাকতে পারে? বললেই হল? নতুনকে তো একরকম নির্বাসন দিয়েছ।'

—'এখনও সে রায়চৌধুরীদের বিষয়ই দেখাশোনা করছে, এ-ও কিন্তু স্বাধীন হওয়া হল না।'

—'কী চাও তুমি মা? দুটো বুড়ো ছেলে নিয়ে আমি গঙ্গায় ডুবে মরি। একটা মাতাল জমিদারের অকালকুষ্মাণ্ডর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল সে কি আমার দোষ?'

—'তুই বিধবা হয়ে আসবার পর তোকে আমি ভিক্টোরিয়া স্কুলে ভর্তি করে দিইনি উমা! গেলে না কেন? ছেলেরা মামাবাড়ির আদরে গোল্লায় যাচ্ছিল, বোর্ডিং-এ পাঠাবার বন্দোবস্ত করলুম কেঁদে কেটে অনর্থ করলে। তখন আমার কথা শুনলে তুমি আজ নিজের পায়ে দাঁড়ানো ভব্যিযুক্ত মানুষ, তোমার ছেলেরা আর কিছু না পারুক নিজেরটা নিজে চালিয়ে নেবার শিক্ষাটুকু পেত।'

—'শোকাতাপা মানুষকে হঠাৎ লেখাপড়া শেখার কথা বললে সে রাজি হয়? ছেলেদের কোলছাড়া করতে চাইলে রাজি হয়?'

—'কিসের শোক উমা? দিগিন মারা যেতে তার জমিদারি যখন নিলামে উঠল, আমি তো তোমার বিষয়ের শোক যত দেখেছি, মানুষটার জন্যে তত দেখিনি।'

—'একটা দুশ্চরিত্তির শয়তান ছিল, সদরে আর একটা সংসার করেছিল, তার জন্যে কি আমায় অন্নজল ত্যাগ করতে হবে নাকি?'

—'না, তা হবে না। তাই তো বলেছিলুম পড়াশোনা করো। বাড়িতে গভর্নেস পর্যন্ত রাখলুম, তুমি তো কিছুই শিখতে চাইলে না উমা। দিগিনকে জামাই করে তোমার ঠাকুমা ভুল করেছিলেন। কিন্তু সে ভুল শোধরাবার জন্যে চেষ্টা তো আমি কম করিনি।

—'বেশ। তো সে কথা শুনিনি বলেই কি আজ জলে ভাসিয়ে দিতে চাইছ?...'

—'না। কখনোই না। এইটুকু বলছি—যা হয়ে গেছে, গেছে। ছেলেদের এবার বুঝতে দাও, তাদের যা সাধ্য সেইমতো স্বাধীনভাবে থাকাই তাদের পক্ষে সম্মানের। তোমার মাসোহারা তুমি বরাবর পাবে। কিন্তু ছেলেদের বলো, যেন দেশে গিয়ে তাদের নামে যে জমি লিখে দিয়েছি, তার দেখাশোনা করে। মামাবাড়ির আশ্রয়ে আর না থাকে। যদি জ্যাকপটের টাকা পেয়ে থাকে তো খুব ভালো। সেগুলো আর ঘোড়া আর মদের পেছনে না উড়িয়ে, স্বাভাবিক মানুষের মতো বাঁচুক।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'এ বয়সে আর কি কেউ ফিরতে পারে মা? তুমি অসম্ভব আবদার করলে কী হবে!'

—'আমি চলে গেলে সব হবে। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

—'তোমার অনাথ বিধবা মেয়েকে তার অমানুষ ছেলেদের হাতে হাড়ির হাল হতে রেখে যাচ্ছ মা? তুমি কী নিষ্ঠুর! আমি ভাবতেও পারিনি, একমাত্র মেয়ের ওপর তুমি এত নিষ্ঠুর হতে পারবে।'

—'উমা, আমার বয়সটা ভাব। আর কতদিন আমি বেঁচে থাকব আশা করিস? তুই? তুই-ই বা আর কতদিন বাঁচবি? ছেলেদের, বউয়ের অকালমৃত্যু সহ্য করেছি। নাতি-পুতিগুলোও পট পট করে চলে যাচ্ছে। আমি আর কত দেখব? ... তুই আয়, আমার পাশে একটু শো মা, আমি তোর গায়ে হাত বুলিয়ে দিই।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। চাপা-চাপা কান্না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। বুবু স্বপ্ন দেখে এমনি করে কাঁদে। কর্তামা কি আজ রাত্তিরবেলায় বুবু হয়ে যাচ্ছেন?

ফোঁপাতে ফোঁপাতেই কর্তামা একসময়ে বললেন— 'তা হলে মণির কথা সব মিছে? আর ভালো লাগছে না বলে চলে যেতে চাইছ?'

—'উঁহুঃ! মণির কথা একদম নির্জলা সত্যি। তবে ভালো না লাগাটাও মিথ্যে নয়।'

—'সংসার যদি ভালো না লাগে তো কাশী, বৃন্দাবন, হরিদ্বার যেখানে ইচ্ছে গিয়ে থাকো না মা, আমিও তোমার সঙ্গে থাকব, অ্যালিস যেমন মুক্ত স্বাধীন ঘুরে বেড়ায়!'

—'কথাটা যে ভাবিনি তা নয়। কিন্তু কাশী বৃন্দাবনেও যে ভালো লাগবে তেমন তো কোনও কথা নেই। ভালো না লাগারই কথা। মুখামি আর শক্তির অপচয় আমি সইতে পারি না সে তো তুই জানিস। তুই যদি অ্যালিসের সঙ্গে থাকতে চাস তো সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

—'আমার ছেলেগুলোর কী হবে?'

—'থেকেই কি ওদের কিছু করতে পারছিস? ওরা তোর কথা শোনে? মানে?'

নিশ্বাস ফেলে কর্তামা বললেন— 'আমাকে কেউই মানে না মা। এসব আমার নিজেরই টান। যদি ওদের নিজেদের সংসারে থাকত তা হলে হয়তো এত উতলা হতুম না।'

আধো অন্ধকারে যতক্ষণ জেগে রইলুম, দুটি মাথা কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি দেখতে পেলুম, কর্তামা বোধহয় সারা রাতটাই মায়ের কাছে কাটালেন।

পঞ্চম রাত

এসেছিলেন মানিকের এক কাকা। এঁর মুখ চিনতুম, কিন্তু বেশি দেখিনি বাড়িতে।

উনি আস্তে করে ডাকলেন—'পাকুমা!'

—'কে? কে রে?'

—'আমি জিতু, পাকুমা।'

—'কিছু বলবি?'

—'তোমার মণি খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে, বড় মারাত্মক জিনিস বেরিয়েছে মা জিনার আলমারি থেকে। তাড়া-তাড়া চিঠি মা। লভ লেটার। এখন আমি কী করি? বলো, কী করি?'

—'জিনিয়া জানে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'সরাবার সময়েই তো ধরা পড়ে, বড়দা হুকুম দিয়েছিল কেউ আলমারি ছোঁবে না, চাবি সব বড়দার জিম্মায়। জিনা চাবি সরিয়ে আলমারি থেকে চিঠির তাড়া সরাচ্ছিল শাড়ির মধ্যে লুকিয়ে, মেজদা-বড়দা সব দেখেছে, একেবারে নাতে-হাতে...কী লজ্জা! কী অপমান! পাকুমা, উঃ কী অপমান।'

—'নাম সই আছে তলায়?'

—'নাঃ। কিন্তু হাতের লেখা দেখে মেজদা-বড়দা চিনতে পেরেছে মনে হয়। নতুনদা দেশ থেকে নিয়মিত হিসেব-পত্র পাঠায় ... কী অশ্লীল, চিন্তা করা যায় না এত নোংরা, পাকুমা আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। কী করবো আমি? কী করবো? উফ্‌ফ্‌!'

—'কি করবি জিতু তুই-ই বল।'

—'তুমি আমার ওপর ছেড়ে দিচ্ছো? আমি তো তোমারই পরামর্শ নিতে এসেছি।'

—'তোর বউ, তোর যন্ত্রণা জিতু, তুই যা ঠিক করবি, তাই হবে।'

—'যদি মেরে ফেলি? যদি এখুনি এক গুলিতে-ওকে ঝাঁঝরা করে আরেক গুলিতে নিজে ঝাঁঝরা হয়ে যাই!'

—'তাই যদি তোর ঠিক মনে হয় তাই করিস, আমি বাধা দোব না।'

—'পাকুমা, এর পর আর এখানে থাকা যায় না। আমি জাহাজের চাকরি ছেড়ে দোব। অন্য কোথাও থাকবো। জিনুকে আমি ছাড়তে পারবো না, ও বিষ আমায় চিরকাল বয়ে বেড়াতে হবে।'

—'ছাড়বি কেন? তবে ওকে পাহারা দেবার জন্য যদি চাকরি ছাড়িস খু-ব ভুল করবি জিতু।'

—'না, না। কিছু একটা ব্যবসা ধরবো।'

—'অনাথ-আশ্রম-টাশ্রম থেকে দেখে শুনে একটা পোষ্য নে না।'

—'বলছো? তাতে হবে?'

—'হতে পারে।'

—'তো তুমি জিনুর সঙ্গে একটু কথা বলো—বলবে পাকুমা? ওকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি।'

—'নিয়ে আয়। কিন্তু ওর সঙ্গে কথার সময়ে তুই থাকতে পাবি না।'

—'কেন? ... ও ... আচ্ছা।'

কিছুক্ষণ পর কাপড়ের খসখস শব্দ। চুড়ি বালার ঠুনঠুন। জিনা কাকিমা এসেছেন। চুপ করে মাথা নিচু করে বসে আছেন।

—'জিনিয়া, কিছু বলবি?'

—'আমি কাল সকালেই মার কাছে চলে যাবো পাকুমা।'

—'বেশ তো, যাস।'

—'এখানে আর কোনওদিন ফিরব না।'

—'না-ই ফিরলি। কিন্তু জিতু যে অন্যত্র বাসা নেবার কথা কি বলছিল ...'

—'যাবো না। ও সারা জীবন আমার ওপর অত্যাচার করবে, খোঁটা দেবে সইতে পারবো না। আমার তো কোনও পিছটান নেই!'

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'না, খোঁটা দেবে না। তুই ওকে সাঙ্ঘাতিক কষ্ট দিয়েছিস। কিন্তু ও এখনই তোকে মাফ করে দিয়েছে। এত ভালোবাসে তোকে। তোর বাপের বাড়ির নানা বদনাম সত্ত্বেও বড্ড ভালোবাসতো বলে বিয়েটা জোর করে করেছিল, তুইও করেছিলি। এটা একটা দায়িত্ব। ঝেড়ে ফেলতে পারিস না। জিতুর ভালো-মন্দর দায় তোর।'

—'আমি বাড়ির চার দেয়ালের মধ্যে বন্ধ থাকতে ভালোবাসি না পাকুমা। আমার স্বামী সারা বছর জলে, জলে। অনেক দিন এ জীবন সহ্য করেছি। আর পারছি না।'

—'আমি তো ওকে একটা দত্তক নিতে বলছিলুম।'

—'দত্তক? কেন? আমার নিজের হবে না?'

—'সে তোরা জানিস। বারো বছর হয়ে গেল'

—'ও কিছু না। ও আমার হাতে ...'

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে পাকুমা বললেন— 'যা ভালো বুঝিস কর জিনা। তবে দুজনে মিলে আলোচনা করে, সব দিক ভালো করে বুঝে শুনে, ঝোঁকের মাথায় নয়। তোর মায়ের কাছে গেলে স্বাধীনতা হয়তো পাবি, শান্তি পাবি না। স্বস্তিও পাবি না। একমাত্র কোনও বড় কাজের জন্যেই স্বামী-সন্তান পরিবার এ সবের মায়া ত্যাগ করা চলে। অনেক বড় কাজ।'

কাকিমা হঠাৎ কর্কশ গলায় বললেন— 'আপনি তো সব জানতেন, তাহলে নতুনদাকে সামলাননি কেন?'

—'কে বললে আমি সব জানতুম!'

—'নইলে নতুনদাকে দেশে সরিয়ে দিলেন কেন?'

—'তোমার নতুনদার অনেক রকম বিকৃতি ছিল জিনিয়া। আয়েসের জীবন, কাজ-কর্ম নেই, স্বভাব ক্রমশই খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। তুমি ভাবছো তুমিই ওর একমাত্র। তা কিন্তু নয়।'

—'নয়?'— জিনা কাকিমা কী রকম অদ্ভুত গলায় বলে উঠলেন।

—'না, নয়। ওর অনেক রকম হয়েছিল। একেবারে পশুর মতো হয়ে যাচ্ছিল। তাই, যাতে কাজের মধ্যে থাকে সেইজন্যে পাঠিয়েছি।'

জিনা কাকিমা কোনও কথা না বলে হঠাৎ দুম করে উঠে চলে গেলেন।

পাকুমার পাশে কালো পাথরের একটা ছোটখাটো ঢিপি তৈরি হয়ে গেছে। বাড়ির যে যেখানে আছে, যেখান থেকে পেরেছে খুঁজে পেতে এনেছে। পাকুমা সবগুলোই বাতিল করে দিয়েছেন।

পঁচিশ দিনের দিন আমাদের ভীষণ ভয় করতে লাগলো। এতদিন ভাবছিলুম বেশ একটা মজা হচ্ছে। এখন বুঝতে পারছি এ মজা নয়। পাকুমা বিছানার সঙ্গে মিশে গেছেন। কথা বলেন না। মাঝে মাঝে খালি দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাই। সারা দিন ধরে, সারা রাত ধরে ... কাকা জেঠা কাকিমা জেঠিমা, দাদা বউদিরা, মেজবউদি, কর্তামা ছোট্ ঠাকুর্দা আনাগোনা করেন, পিসতুতো ভাইবোনেরা, পিসিমারা আসেন, কান্নাকাটি করেন। বাবা পাকুমার নাড়ি দেখতে আসেন, মুখ নিচু করে বসে থাকেন।

ছোট্ ঠাকুর্দা বলেন—'কী ডাক্তার, কেমন দেখলে?'

বাবা বলেন—'যেমন দেখার কথা ...'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবা আমার দিকে একবার আনমনা চোখে তাকান, কী যেন বলবো-বলবো করেন, তারপর চলে যান।

মানিক বলল—'পুনপুন, পাকুমা কি তাহলে সত্যি-সত্যি মরে যাবে না কি?'

আমি বললুম—'আমরা পাকুমাকে মরে যেতে দোব না, মানিক চ' আমরা গিয়ে বলি...'

সেই সন্ধেবেলায় বাবা পাকুমার নাড়ি দেখে গেছেন। সারা সকাল বড় বড় বই থেকে পাঠ হয়েছে। ছোট্ ঠাকুর্দা বাইবেল পড়েছেন আমরা বসে বসে শুনেছি, তারপরে 'লাইফ ডিভাইন' পড়েছেন, ঠাকুরমশাই এসে গীতা পড়ে গেছেন, 'কথামৃত' পড়েছেন কর্তা মা, জিনা কাকিমা গান করেছেন, মেজবউদিদি, মেজদিমণি গান করেছেন, ধূপধুনো জ্বলেছে। সন্ধের শাঁখ বাজার পর থেকে পাকুমা নেতিয়ে পড়েছেন। এখন রাত হচ্ছে, আমাদের লুচি-আলুরদম-পায়েস খেতে ভালো লাগেনি, ছবিরানীর মা বসে বসে জোর করে খাইয়েছেন, বাগানের ঘরের কোটর থেকে কুটুরে প্যাঁচা কাঁ কাঁ করে ডেকেছে, গান ঘরে এসে দেখি বাচ্ছা ওর কালো টলগুলিটা পাকুমার মাথার কাছে আস্তে রাখছে। আমাদের দেখে বললে— 'এইটাই যদি পরশমানিক হয়, রাঙাদা?'

মানিক বলল— 'দুর, ওটা তো মার্বল, ওটা কেন পরশমানিক হতে যাবে!'

—'কিন্তু যদি হয়, যদি হয়ে যায়!'

মানিক বলল— 'কী রে পুনপুন, হতে পারে?'

আমি বললুম—'নাঃ এ গুলি তো কারখানায় তৈরি হয়। আর পরশমানিক সাপের পেটে ভগবান তৈরি করে দিয়েছেন।' তখন বাচ্ছা পকেট থেকে আর একটা কালো গর্ত-গর্ত মতন পাথর বার করে বলল— দ্যাখ তো পুনপুন দাদা, এটা হতে পারে। আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পাথরটা দেখি, বলি— 'এটা কোথায় পেলি?'

—'আমার মা এটা দিয়ে পা ঘষে!'

মানিক বলল— 'দূর ওটা তো ঝামাপাথর।'

তখন বাচ্ছা খুব রেগে যায়, কে রাঙাদাকে বলে গেছে যে ঝামা পাথর পরশমানিক হতে পারে না।

তখন আমি বললুম —'যদি হয়ও, পায়ে ঘষার জন্যে ওই পাথরের গুণ নষ্ট হয়ে গেছে।'

বাচ্ছা তখন কালো মুখে চলে গেল। মানিক বলল —'পুনপুন তোর পকেটটা দেখ তো। আমিও আমার পেনসিল বক্সটা খুঁজছি। পাকুমা বলেছিল না!'

মানিক ওর পেনসিল বক্স, আমি আমার পকেট উল্টে পাল্টে খুঁজি, আমার পকেট থেকে একটা কালো রঙের প্যান্টের বোতাম বেরোয়, মানিকের পেনসিল বক্স থেকে একটা পুরনো, শক্ত, কালো হয়ে যাওয়া রবার।

মানিক ফ্যাকাসে মুখে বলে— 'পরশমানিকটা হয় রবার হয়ে গেছে, নয় বোতাম হয়ে গেছে।'

আমি বলি —'তুই শিওর?'

মানিক বলে— 'শিওর না? আগেও তো পেনসিল বক্স দেখেছি এই রবারটা কোনওদিন ছিল না। তোর পকেটের বোতামটা দেখেছিস আগে?'

আমি বলি— 'আমার দুটো কালো প্যান্ট আছে, কিন্তু সে গুলোতে তো সব বোতামই

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে! বোতাম ছিঁড়ে গেলেই বুজবুজদিদি সেলাই করে দেয়।'

মানিক বলে— ' তাহলে?'

আমি বলি— 'পরশমানিক তো একটা। রবার, বোতাম মিলিয়ে তো দুটো। হয় বোতাম, নয় রবার, বুঝলি' আবার মানিক ভেবে-চিন্তে বলে, এ-ও হতে পারে, পরশমানিকটা দু ভাগ হয়ে আমাদের দুজনের কাছে এসেছিল।'

আমি —'এসেছিল যদি পাল্টে গেল কেন?'

মানিক—'আমরা নিশ্চয়ই কিছু দোষ করেছি। তুই ছোটবাইরে করে হাত ধুয়েছিলি?'

আমি— 'হ্যাঁ-অ্যা। আমি তো আর বাচ্ছার মতো না। তুই খেয়ে ভালো করে পুলকুচি করেছিলি? পায়েস খেয়ে তুই তো কক্ষনও মুখ ধুতে চাস না!'

মানিক— 'ভেবে দেখতে হবে, মনে হচ্ছে ধুয়েছি। কিন্তু না ধুলেই বা কী? পাকুমা বলেছিল মনে মনে শুদ্ধ হতে হবে, ভুলে গেলি। মন দিয়ে তো আর আমরা ছোটবাইরে করি না, মন দিয়ে খাইও না যে মনের মধ্যে জল নিয়ে কুলকুচি করতে হবে। এই পুনপুন তুই পুলকুচি বলিস কেন রে? কথাটা হল কুলকুচি।'

আমি— 'ভ্যাট। কথাটা পুলকুচি,'

মানিক 'কক্ষনও না, কথাটা কুলকুচি।'

তখন ঠিক হল পাকুমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

পাকুমা চোখ বুজিয়ে নেতিয়ে রয়েছেন। আমরা ছুটে গিয়ে পাকুমার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে ডাকলুম। 'পাকুমা, পাকুমা।' ফট করে পাকুমার চোখের পাপড়ি খুলে গেল। আর সেই ঘোলাটে কাচের মতো চোখের দিকে তাকিয়ে আমরা আমাদের মতভেদের কথা ভুলে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লুম— 'পাকুমা, তুমি মরে যাবে না, কিছুতেই মরতে পারবে না, আমরা তোমাকে যেতে দেব না, পাকুমা তুমি মরে গেলে আমরাও আর বাঁচব না, সত্যি বলছি আমরাও তা হলে পায়োপবেশন করবো।'

পাকুমা যেন অনেক দূরে চলে গিয়েছিলেন, ফিরে এলেন। অনেক কষ্টে বললেন— 'আমি মরে গেলেই কি আর মরে যাবো, বোকা ছেলে। ঠিকই বেঁচে থাকবো কোথাও না কোথাও....'

কে যেন পাকুমার মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। চোখ তুলতে অবাক হয়ে দেখি, অ্যালিস, সেই অ্যালিস রবসন ছবি থেকে বেরিয়ে এসে নেমে দাঁড়িয়েছেন। শাদা ধবধবে গাউন-গাউন পোশাক পরা, হাতে লম্বা মালার পুঁতি ধরে আছেন, মাথায় তুলো তুলো চুল ঠিক আলোর মতো ফর্সা।

অ্যালিস বললেন —'ধরিত্রী, আই হ্যাভ কাম টু গিভ ইউ মাই ফেয়ারওয়েল কিস', নিচু হয়ে তিনি পাকুমার শুকনো গালে চুমু খেলেন, তারপরে উঠে দাঁড়িয়ে দু হাত জোড় করে বললেন —'মে ইয়োর সোল ডিপার্ট ইন পিস।' আমার মাথায় পাকুমার হাত, বললেন, 'জল দাও তো মানিক।' আমি কোষাকুষির জল নিয়ে পাকুমার হাঁ-এ ঢেলে দিলুম। অ্যালিস বললেন, 'ই ডিপার্টেড সোলস, দ্যাট ওয়্যার ডিয়ার টু হার ইন হার এক্সপেরিমেন্ট উইথ লাইফ কাম অ্যান্ড টেক হার টু দি অ্যাবোড অফ শি ভা, শি ভা, শিভা।' আস্তে আস্তে সমস্ত ঘরটা মানুষজনে ভরে গেল। কত কত মানুষ, তাদের যেন চিনি আবার চিনি না, পাকুমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শয্যা ঘিরে সব দাঁড়িয়েছেন। একবার যেন বাইরে বিদ্যুৎ চমকালো। এক ঝলকে আমি লীলাময়ী ও ত্রিলোকেশ্বর রায়চৌধুরীর মুখ দেখতে পেলুম। তারপর কালীকিঙ্কর, শিবশঙ্কর, ধ্রুববালাদেবী, সিসটার নিবেদিতা, বিদ্যাসাগর, রামমোহন রায়, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ সব, সব, সবাই।

ভোরবেলায় যখন ঘুম ভাঙলো, দেখলুম ঘর ভর্তি লোকজন। মা আমাকে কোলে তুলে নিয়েছেন। বাবা পাকুমার ডান হাতখানা আস্তে আস্তে নামিয়ে রাখলেন। পায়ের ওপর উপুড় হয়ে প্রণাম করলেন। অত ভিড়, সবাই মাথা নিচু করে আছে কেউ কথা বলছে না।

হঠাৎ ছুটতে ছুটতে ভিড় ঠেলে নতুনকাকু ঢুকলেন, পাকুমার পায়ের ওপর একটা গোঙানির মতো শব্দ করে আছড়ে পড়লেন। আমার আর নতুনকাকুকে ভয় করছে না। মা, বাবা আমাকে, মানিককে বাচ্ছাকে নিয়ে চলেছেন আমাদের বাড়ি। ছবিরানি থাকলে ছবিরানিও গড়াতে গড়াতে যেত।

বেলা প্রায় এগারোটার সময়ে বিশাল এক মানুষের মিছিলের মাঝখানে পাকুমা নাতিদের মাথায় চড়ে চলে গেলেন। যাবার অনেকক্ষণ পর পর্যন্তও রাস্তায় খই আর ফুটো পয়সা ছড়িয়ে রইল, চন্দনের গন্ধ বেরোতে লাগল ভুরভুর করে। সব চলে গেলে এক জন লম্বা মেমসাহেব, মাথায় তুলোর কুন্ডুলী, পিঠে একটা বোঝা, উল্টো দিকের রাস্তা ধরে একা একা চলে গেলেন।

মানিক বলল —'দ্যাখ পুনপুন, দ্যাখ —অ্যা[illegible]'

॥ দ্বিতীয় স্কন্ধ সমাপ্ত ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় স্কন্ধ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রারম্ভিক

দুর্গাপ্রসাদ আজিকালি সকালের দিকে চেম্বারে বসেন না। কী এক প্রয়োজনে বাহির হইয়া যান। দুপুর গড়াইয়া যায় ফিরিতে। খাইয়া সামান্য একটু বিশ্রাম করিয়াই রোগী দেখিতে শুরু করেন। ইহাতে বেশ কিছুটা আর্থিক ক্ষতি হয়; কিন্তু দুর্গাপ্রসাদ গ্রাহ্য করেন বলিয়া মনে হয় না। সকালে কোথায় যান কাহাকেও বলিয়া যান না। পত্নী জানেন কি না বলিতে পারি না।

বর্মার দাদার উপস্থিতি কি তাঁহাকে কিছুটা নিশ্চিন্ত করিয়াছে? হইতে পারে। মণিমোহন বর্মায় স্ত্রী হারাইয়া আসিয়াছেন, এই গৃহে কাকিমা, দিদি, ভ্রাতা, ভ্রাতৃবধূ ও ইহাদের সন্তানগুলির সান্নিধ্যে, আদরে, যত্নে তিনি যেন নূতন জীবন ফিরিয়া পাইয়াছেন। কর্তার মৃত্যুর পর হইতেই তিনি সমানে ভ্রাতাকে আশ্বস্ত করিতেছেন। ইঁহারা ব্যতীত তাঁহার আর আছেটা কে? দুর্গাপ্রসাদ তাঁহার উপর নির্ভর করিতে পারেন। সাংসারিক যে-সকল বিষয়ে দুর্গাপ্রসাদ পূর্বে পিতার সহিত পরামর্শ করিতেন, এখন সে স্থলে তিনি দাদার পরামর্শ লইতেছেন। নিজ সন্তানগুলির উপর দুর্গাপ্রসাদের অগাধ আস্থা। উহারা ঠিকই নিজ নিজ পথ খুঁজিয়া বাহির করিবে। দাদা বলিতেছেন ইন্দ্র ব্যারিস্টারি পড়িতে বিলেত যাক। তিনি ব্যয়ভার বহন করিবেন। একটি ছেলে অন্তত ডাক্তারি পড়ুক। ঋদ্ধি-ভক্তির বিবাহের ব্যাপারে তিনি উদ্যোগী। মেয়েদের এখনই বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই, দুর্গাপ্রসাদও ইহাদের বিবাহের কথা ভাবেন নাই। ছেলেমেয়েগুলি কেহ পড়িতেছে, কেহ রিসার্চ করিতেছে, সন্ধ্যা হইলেই ঘর ভরিয়া উঠে তাহাদের কলরবে, এইরূপই যেন অনন্তকাল চলিবে। কিন্তু মণিমোহন তাঁহার মাথায় ঢুকাইয়াছেন এই রূপ চলে না, ছেলেমেয়েদের বিবাহের কথা ভাবিতে হয়। তিনি থাকিয়া থাকিয়াই সম্বন্ধ আনিতেছেন।

দুর্গাপ্রসাদের বয়সে পিতৃশোকে মুহ্যমান হওয়া মানায় না। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর দুর্গাপ্রসাদের সকল লম্ফঝম্প বন্ধ হইয়া গিয়াছে। জোরে কথা বলিতে শুনা যায় না তাঁহাকে। মুখের চেহারায় যেন বাজে-পোড়া ভাব।

কালো চামড়ার ডাক্তারি ব্যাগটি লইয়া দুর্গাপ্রসাদ সকাল নয়টা নাগাদ রওনা হইলেন। তাঁহাদের রাস্তা যেখানে শ্যামপুকুর স্ট্রিটে মিশিয়াছে, সামনে একটি শিবমন্দির, এবং তাহার পরেই শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থানপূত সেই বিখ্যাত বাড়িটি, সেইস্থলে পাঁচ-ছয়জনের একটি দলের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল। দুইটি শিশু, একটি বালক, দুইটি মহিলা ও একটি বয়স্ক পুরুষ। ইঁহাদের রুক্ষ চুল, বসন মলিন, হাতে বড় বড় জুটের ব্যাগ। পুরুষটি একটি টিনের তোরঙ্গ বহিতেছেন। ইহারা চিরকুটে লেখা একটি ঠিকানা দেখাইয়া ঠিকানাটির হদিশ চাহিলেন। সামান্য ভুল থাকিলেও ঠিকানাটি রায়চৌধুরী বাড়ির মনে হইল। দুর্গাপ্রসাদের আজ সামান্য দেরি হইয়া গেল। তিনি ইঁহাদের রায়চৌধুরী বাড়ির দেউড়ি অবধি পৌঁছাইয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিলেন। কথায় কথায় প্রকাশ পাইল ইঁহারা কয়েকমাস পূর্বে বরিশাল ছাড়িয়া আসিয়াছেন, বনগাঁয় রিফিউজি ক্যাম্পে আশ্রয় পাইয়াছিলেন, এক্ষণে কুটুম্বদের সন্ধান মিলিয়াছে।

এইরূপে দুর্গাপ্রসাদের হাত ধরিয়া দাঙ্গাবিধ্বস্ত বরিশাল ক্ষয়িষ্ণু কলিকাতার অন্দরমহলে, উত্তরমহলে ঢুকিয়া পড়িল।

খ্রিস্টীয় পঞ্চাশ সনের ফেব্রুয়ারি হইতে পূর্ববঙ্গের বাগের হাট, খুলনা, বরিশাল পাবনা রাজসাহী ইত্যাদি অঞ্চলে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে তাহার ফলে অবশিষ্ট হিন্দু জনতা, যাঁহাদের অধিকাংশই ছিলেন কৃষিনির্ভর, যাঁহারা এতকাল পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরী, কীর্তনখোলা- মধুমতী বিধৌত এই বিশাল উর্বর-ভূমির বৃক্ষলতা পুষ্পশোভিত জনয়িত্রী প্রকৃতির মায়া কাটাইতে পারেন নাই, মাটি কামড়াইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই তাঁহারাও দলে দলে দেশ ছাড়িলেন। ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় ফরিদপুর ও বরিশালে যে-পনেরটি যাত্রী স্টিমার পাঠাইয়াছিলেন, ঢাকায় যে-ষোলোটি যাত্রী বিমান পাঠাইয়াছিলেন, সেগুলিতে তিলধারণের স্থান ছিল না। একান্ন সনের মধ্যে এই উৎখাত উদভ্রান্ত জনগণের সংখ্যা দাঁড়াইল সাড়ে তিন লক্ষ। বনগাঁ, দর্শনা, ধুবুলিয়া, ফুলিয়া, রানাঘাট হাবড়া ইত্যাদি স্থলে সরকারি রিফিউজি ক্যাম্পে ইঁহাদের মধ্যে বহুজনের আশ্রয় মিলিল। অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবানরা আত্মীয়-কুটুম্বের সাহায্যে কোনও না কোনও স্থান খুঁজিয়া লইলেন, অপেক্ষাকৃত জেদী যাঁহারা, তাঁহারা পশ্চিমবাংলার, বিশেষ কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের যেখানে এতটুকু ফাঁকা জমি অথবা বাসগৃহ পাইলেন, দখল করিয়া লইলেন। পশ্চিমবঙ্গে ধূলিমলিন, দুঃস্থ, ক্ষুধার্ত জনতার এক স্রোত বহিতে লাগিল।

আসল কথা, দুর্গাপ্রসাদ প্রতিদিন শিয়ালদহ স্টেশনে যাইতেন। সেখানে প্ল্যাটফর্মে প্ল্যাটফর্মে অবর্ণনীয় দুর্দশায় পড়িয়া আছে একটি মানবগোষ্ঠী, এই সেদিনও যাঁহাদের ঘর ছিল, ভূমি ছিল, দেশ ছিল, প্রতিবেশী ছিল। এখন কিছু নাই। পাশ দিয়া নির্বিকার মানবস্রোত বহিয়া চলিয়াছে, নাকে কাপড় দিয়া স্থানত্যাগ করিতেছে কলিকাতার মানুষ। কিছু সেবাপ্রতিষ্ঠান, কিছু সরকারি জোঁক এবং অসংখ্য সুযোগলিপ্সু জুয়াচোর এই শ্মশানভূমিতে নামিয়াছে। কেহ চাহিতেছে বর্ডার স্লিপ নামে সরকার প্রদত্ত পরিচয়পত্রটি, কেহ চাহিতেছে লুকানো স্বর্ণালঙ্কার, কেহ শিশুর খোঁজে আসিয়াছে নানাপ্রকার ব্যবসায়ের কাজে লাগিবে, কেহ আসিয়াছে নারীমাংসের সন্ধানে।

দুর্গাপ্রসাদ দেশের জন্য কিছু করিতে পারেন নাই। তাঁহার নেতা নিরুদ্দিষ্ট। দল নাই। সামর্থ্য নাই।কিন্তু এখনও সংকল্প আছে। বিবেক আছে। নিজ সংসারের গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিবার মানুষই তিনি নহেন। পিতার বিষয়বুদ্ধি এবং সাংসারিক কর্তব্যবোধের পরিমণ্ডলে থাকিয়া কিছুকাল তিনি যেন আত্মবিস্মৃত ছিলেন। প্রত্যহ বাজার করিয়াছেন, বাড়ির রোয়াক ও নর্দমা নিজ হাতে পরিষ্কার করা তাঁহার একটি বাতিক। তাহাও তিনি নিয়মমাফিক করিয়া গিয়াছেন। স্বহস্তে কাচা নীলাভ হাফ পাঞ্জাবি পরিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছেন। অর্থের বিনিময়ে চিকিৎসা করিয়াছেন। পিতা তাঁহাকে পাকে প্রকারে বুঝাইয়া ছিলেন চিকিৎসাকর্ম একটি মানবসেবা বিশেষ। পিতার প্রয়াণের পর দুর্গাপ্রসাদ একদা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে সার যদুনাথের বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলেন। ইহার পরই দেশ আবার তাহার মধ্যে চাগাড় দিল। সার যদুনাথ বলিলেন:

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"পূর্ব বাংলা হইতে উৎখাত হইয়া যাঁহারা আসিতেছেন, তৃতীয় শ্রেণীর কামরা হইতে ওয়াগান হইতে তাঁহারা যখন শিয়ালদহ স্টেশন ইয়ার্ডে খালাস হইতেছেন তখন তাঁহাদের যতই বিধ্বস্ত বিভ্রান্ত দেখাক, হে পশ্চিমবঙ্গবাসী জানিবেন তাঁহারা পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কী বুদ্ধিতে কী বিত্তে, কী সংগঠন শক্তিতে, কী দুর্দমনীয় সাহসে। ঢাকা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ইঁহাদের আজ হারাইতেছে, পরবর্তী প্রজন্মে ঈশ্বর ইহার বিচার করিবেন। কিন্তু আপনারা ইহাদের প্রত্যাখ্যান করিবেন না।

"আমি আপনাদের সতর্ক করিতেছি আপনাদের দুয়ারে আশ্রয়প্রার্থী এই গুণীজাতিকে ফিরাইবেন না। এই মানবসম্পদ একদিন আপনাদের প্রকৃত মহৎ করিবে।"

মহামান্য পণ্ডিতজন এ বিষয়ে কী বলেন তাহাই শুনিতে দুর্গা গিয়াছিলেন। দেশভাগের জ্বালায় ও পূর্ববঙ্গবাসীদের সহিত কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্ব্যবহারের দরুন ক্রোধে তিনি জ্বলিতেছিলেন। সার যদুনাথ ও রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁহার মত তো সমর্থন করিলেন-ই অদূর ভবিষ্যৎ এই জনগোষ্ঠীর মূল্য সর্ম্পকেও নতুন কথা যোগ করিলেন। প্রথম হইতেই তিনি শিয়ালদহে যাইতেছিলেন। এখন নিয়মিত, তাঁহার ডাক্তারি ব্যাগটি লইয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে আবাল্য যে-বৃহৎ আমি ক্ষুধিত হইয়াছিল, এক্ষণে এইভাবে তাহা সামান্য হইলেও তৃপ্তি পাইল। হৃদয় জুড়িয়া সত্তা ভরিয়া এক হাহাকারবোধ সর্বদা মাথা কুটিতেছে। সরল, সাহসী, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ অবিরত তাঁহার স্বপ্নের রূপরেখা আঁকিয়া যাইতেছে। ভাবিতেছে বিদেশি শক্তি উত্ত্যক্ত হইয়া নিঃশর্ত স্বরাজ দিতে বাধ্য হইবে। ভাবিতেছে স্বাধীন দেশের স্বাধীন সরকার গঠিত হইবে, তাহার মূল লক্ষ হইবে ক্ষুধার অন্ন, শুভবুদ্ধির জন্য শিক্ষা, সামগ্রিক উৎকর্ষের জন্য স্বাস্থ্য। ভাবিতেছে কঠোর উদাহরণমূলক শাস্তি দিয়া যাবতীয় সুযোগসন্ধানী, জুয়াচোর, সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন বিপথগামীগুলিকে বুঝাইতে হইবে এরূপে চলিবে না, চলিবে না। কিন্তু রাজনীতির কুটিল হাত, স্বার্থান্বেষীর ক্লিন্ন অঙ্গুলি সকল ব্লু-প্রিন্টই মুছিয়া দেয়। এই বাস্তবকে চোখের সম্মুখে দেখিয়াও বিশ্বাস করিতে পারেন না দুর্গাপ্রসাদ, মানিয়া লইতে পারেন না। মনে হয় এ বুঝি এক কালস্বপ্ন। সহসা জাগিয়া দেখিবেন দেশময় শঙ্খ বাজিতেছে। সুভাষ আসিয়া গিয়াছেন। তাঁহার হস্তে বরাভয়, চক্ষে স্নেহ, ওষ্ঠে সংকল্প, সর্বাঙ্গ দিয়া শক্তি তেজ সাহস বিচ্ছুরিত হইতেছে। সমগ্র দেশ মাথা পাতিয়া তাঁহার নেতৃত্ব মানিয়া লইয়াছে। তিনি প্রধানমন্ত্রী। নেহরু, প্যাটেল, জিন্নাহ্ আবুল কালাম, শ্যামাপ্রসাদ প্রমুখ ক্যাবিনেট গড়িয়াছেন। শহীদ সোরাবর্দি প্রমুখের ফাঁসি হইয়াছে। এবং পন্ডিচেরি হইতে বার্তা আসিয়াছে অরবিন্দ ঘোষ ভারতের রাষ্ট্রপতি হইতে শেষ পর্যন্ত সম্মত হইয়াছেন।

বাস্তববোধ নাই? হইবে হয়তো। কিন্তু আপামর সাধারণ পাঠক বুকে হাত দিয়া বলুন তো মন বলিতেছে কিনা, 'এমন কেন সত্য হয়না আহা!' বলুন তো সাধারণ নির্দোষ নাগরিকদের শোচনীয় মৃত্যুর পরিবর্তে যদি ল্যাম্পপোস্ট হইতে কালোবাজারিদের, ঔষধ ও খাদ্যে ভেজাল প্রদানকারীদের মৃতদেহ ঝুলিতে দেখিতে পাইতেন তৃপ্ত হইতেন কি না! যদি স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই শহর হইতে গ্রামে, গ্রাম হইতে গ্রামে , রাজ্য হইতে রাজ্যান্তরের পথগুলি প্রস্তুত হইত, যদি নির্ভেজাল দুগ্ধ ও অন্ন পরিমিত হইলেও সুলভে পাইতেন, যদি বৈদ্যুতীকরণের কাজগুলি হইতে শুরু করিত, শিশুগুলিকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে পারিতেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহারা প্রথম হইতেই মাতৃভাষা ইংরাজি ভাষা ও রাষ্ট্রভাষা শিখিত, আপন দেশের ইতিহাস ভূগোল ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিত, ইংরাজি পড়াইবার জন্য সাধারণ ভদ্রতা ও শৃঙ্খলা শিখাইবার জন্য যদি তাহাদের আকাশচুম্বী বেতনের বিদ্যালয়ে পাঠাইতে না হইত, খ্রিস্টান মুসলমান হিন্দু শিখ নির্বিশেষে যদি সকলেই একই আইনের অনুবর্তী হইত, রাজনৈতিক দলে ও ব্যবসায়ীতে যদি গোপন কোলাকুলি না থাকিত, যদি ছেলেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনীতি আর রাজনীতিতে জুয়াচুরি না শিখিত, কর্মস্থলে আড্ডার ও গৃহ হইতে কাজের নাম করিয়া পলাতক না হইত, তাহা হইলে আপনি পাঠক সুখী হইতেন না? তখনও কি আপনারা দলে দলে দেশ ছাড়িয়া পলাইতেন? কথায় কথায় উৎকোচ লইতেন? ট্রাম বাস পোড়াইতেন? স্বাধীনতার নামে যথেচ্ছ তাণ্ডব করিতেন? করিতে পারিতেন? না। আমি বলিতেছি আপনারা তখন সামান্য কৃচ্ছ্রসাধন মাইন্ড করিতেন না। জন্মনিয়ন্ত্রণের তত্ত্বটি স্থিরমস্তিষ্ক হইয়া বুঝিতেন, আপনার অতিরিক্ত কপর্দকটি সাধারণের কল্যাণে ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।

জনসাধারণ কৃচ্ছ্র করিবে আর নেতৃগণ পুষ্পকে চড়িয়া স্বর্ণলংকায় বিহার করিতে যাইবেন, গণতন্ত্রে এরূপ হয় না। নিঃস্ব ভূমিশ্রমিকদের যে কোনও সময়ে হত্যা করিয়া ছারখার করিয়া দিবে আর নেতৃগণ কমান্ডো লইয়া টয়লেটে যাইবেন ইহাও গণতন্ত্রে হয় না। রাজতন্ত্র চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু অভ্যাসটি মজ্জাগত হইয়া রহিয়াছে। গদিতে বসিবার আগে পর্যন্ত আমি তোমাদের আজ্ঞাবহ, দাসানুদাস। বসিবার যা অপেক্ষা। বসিলেই আর মনে থাকে না আমাকে তুমিই তোমার কষ্টার্জিত উপার্জন দিয়া পুষিয়াছ। বেতন দিয়াছ, পার্কস দিয়াছ। তখন আমিই বা কে আর রাজাধিরাজই বা কে? তখন আস্ফালন করিব, বাহ্বাস্ফোট করিব, তলে তলে লুটিয়া পুটিয়া খাইব আর বেগতিক দেখিলেই কুঁইকুঁই করিব।

কে আপনি ফ্যাকফ্যাক করিয়া হাসিতেছেন? সিনিক, নয়? সিনিক মহোদয়ের কোনও শুভতেই বিশ্বাস নাই। উনি অশুভ অমঙ্গল কুশ্রীতা, কদর্যতা কৃতঘ্নতা, হিংসা লোভ এইগুলিকেই জীবনের বেসিক প্রিন্সিপল্ বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। এইগুলিই না কি বাস্তব। এই বাস্তবে তিনি কোনও সক্রিয় ভূমিকা লয়েন না। তফাৎ হইয়া থাকেন এবং বক্র হাসি হাসেন। ভাবখানা—হে শিশুগণ, অপরিণত বুদ্ধি বাল্যখিল্যগণ কর কী করিবে, কিছুই হইবে না। কিস্যুই করিতে পারিবে না।

বলি সিনিক মহোদয়—কিস্যুই না হইলেই কি আপনি সুখী? মন্দকে মন্দ বলিয়া চিনিতে তো পারেন। তাহা হইলে আঁতেলগিরিকে দুদণ্ডের ছুটি দিয়া অন্তপক্ষে 'ইহা মন্দ, ইহা মন্দ' বলিয়া দুইটা গাল পাড়িয়াও আমাদের সুসার করুন না।

মনুষ্যজাতিকে চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। নিখাদ ভাল, নিখাদ মন্দ, ভাল মন্দে মিশ্রিত আর সিনিক। নিখাদ ভাল। নিখাদ মন্দ লইয়া কোনও গোল নাই। বাকি দুইটি শ্রেণীতেই যত গণ্ডগোল। মিশ্রিত গুলিকে ভাল পথেও চালাইতে পার, মন্দ পথেও চালাইতে পার। আর সিনিক? উচ্চাঙ্গের তিক্ত হাসি লইয়া সিনিক ওই যাইতেছে, সহজ মনুষ্য উহার ছায়া মাড়াইও না। মন্দকে মন্দ জানিয়াও সে মানিয়া লয়। অপরিবর্তনীয় বলিয়া মনে করে, এবং এই জ্ঞানের বলে আপনাকে অপরসাধারণ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে, তাহাকে দূর হইতে সেলাম বাজাইতে হয় বাজাও, কিন্তু সান্নিধ্যের ঝুঁকি লইও না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের দুর্গা ডাক্তারটি মন্দ শ্রেণীতে পড়েন না। মিশ্র শ্রেণীতে পড়েন না, সিনিক তো নহেনই। কিন্তু তাঁহাকে কি নিখাদ ভালর দলেই ফেলা যায়? সংস্থান করিতে পারেন না। অথচ একটি বৃহৎ পরিবারের সৃষ্টি করিয়াছেন, আচরণে সমতা নাই, পিতা না থাকায় বৃহৎ সংসারটির দায় তাঁহারই স্কন্ধে অথচ সকালের প্র্যাকটিস ত্যাগ করিয়া আর্থিক ক্ষতিসাধন করিতে পরাঙ্মুখ হইতেছেন না। সংসারের প্রতি কর্তব্যের অবহেলা হইল না? পিতা জীবিত থাকিতে তাঁহার সহিত প্রতিনিয়ত খটামটি লাগিত। ব্রজেশ্বরের ন্যায় আনুগত্য তো তিনি পিতাকে কখনই দেখাইতে পারেন নাই। এখন আবার পিতার মৃত্যুতে মলিন, গম্ভীর হইয়াছেন। মানুষটিকে কি ভাল বলা যায়?

পাঠক, নৈতিক ভালোমন্দের প্রশ্নের বাহিরেও মনুষ্যচরিত্রে বহু জটিল গোলকধাঁধা, বহু ছায়াময় অববাহিকালোক থাকিয়া যায়, সেখানে রিপু বা প্রবৃত্তিরা লীলা করে, প্রশিক্ষণ ও সংস্কার কাজ করে, সঙ্গ ও পরিবেশের প্রভাব কাজ করে। ভাল তাহাকেই বলি যাহাকে নষ্ট করা যায় না। দুর্গা ডাক্তার ইনকরাপ্টিবল। কিন্তু তাই বলিয়া কি তাঁহার স্বভাবে জটিলতা নাই? দ্বন্দ্ব নাই! কখনও দেশ কখনও পরিবারের প্রতি কর্তব্যবোধ উথলাইয়া উঠিবার প্রবণতা নাই? কাম এবং ক্রোধ তিনি সর্বসময়ে সংযত করিতে পারেন নাই। কিন্তু লক্ষ টাকা দিলেও তিনি হাতে রাখিয়া কাহারও চিকিৎসা করিতে পারিবেন না। মারিয়া ফেলিলেও কাহারও সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন না। প্রাণ থাকিতে কাহারও ক্ষতি হইতে দিবেন না।

এইগুলি ভালত্বের মৌলিক লক্ষণ। ইহার উপরে শিক্ষা, সুযোগ, সঙ্গ পরিবেশ দিয়া ভালত্বের সৌধ গড় না কেন। ভাল যখন সুসমঞ্জস, উপায় কুশল, কর্মপটু, প্রাজ্ঞ হইয়া উঠিবে তখন তাহা হইবে ইহলোকে মনুষ্যত্বের পরমোৎকর্ষ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম অধ্যায়

বাসুদেব

দাদাভাই বলেন—আমাদের কানুবাবু হল গজ, সোজা যাবে না, কোনাকুনি যাবে, আর বুনটু হল গিয়ে ঘোড়া, আড়াই লাফে চলে।

চার নম্বরে ট্র্যাফিক জ্যাম। সিঁড়ির মাথা থেকে মাঝ সিঁড়ির চাতালে হবে তোমার প্রথম লাফ। তা এইটুকু পথের মধ্যে যদি—'দূর নংকোপোড়া ফেলে দিবি নাকি' বলতে বলতে পিসিমা, 'বীর হনুমানের ন্যাজ কই' বলতে বলতে বর্মার জ্যাঠাবাবু, 'বুনবুন, সক্কাল সক্কাল উঠে পড়তে বসতে হয়' বলতে বলতে পমপম দিদি ঢুকে পড়ে তা হলে টগবগ টগবগ করে আর তোমার লাভ কী? বারো নম্বরে সে যশোদার ননীচোরা গোপাল। তাকে কেউ বকুক তো? আর পড়তে বসা? দাদাভাই বলবেন, বুনবুন শুনবে না। কারণ দাদাভাই তারপর নিজেরই পড়াশোনার মধ্যে ডুবে গেছেন। দিদিভাইও বলবেন, বুনবুন শুনবে না, কেননা ততক্ষণে দিদিভাই নিজের কাজে গেছেন। বুকুন তো বই খাতা খুলে বসেছে! তারপর সে কী বলছে আর কী করছে কে দেখতে যাচ্ছে? তার আর কানুমামুর সব রকমের প্রতিযোগিতাই সিঁড়ির ওপর হয়। কানুমামু অবশ্য বড় হয়ে গেছে। মাস্টামশাইয়ের কাছে পড়ে। প্রতিযোগিতায় সে আজকাল সব সময়ে অংশগ্রহণও করে না। কিন্তু জাজ তো হয়। বুনবুন তোমার প্রতিযোগিতা তা হলে কার সঙ্গে? নিজেরই সঙ্গে। আজকে বুনবুনকে চার সিঁড়ি টপকাতে হবে, দালানের বড় ঘড়িতে তার সময় দেখবে কানুমামু।

চাতাল অবধি এক লাফে পৌঁছে বুনবুন সিঁড়ির জানলা দিয়ে সিধে বাবার মাথাটা দেখতে পেল। বাবা নীচে এসেছিলেন? এখন বেরিয়ে যাচ্ছেন? কোথায় যাচ্ছেন বাবা? বাকি দেড় লাফে সে সদরে পৌঁছে যায়।

—বাবা আমায় নিয়ে চলো।

—কোথায় যাবে?

—চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম। ট্রামে চড়ব, বাবা। যাব।

—স্কুল নেই!

—পরীক্ষা হয়ে গেছে তো!

—আমি চিড়িয়াখানা যাচ্ছি না বরুণ। যেতে পারব না।

—যেখানে যাচ্ছ, সেখানেই যাব—

বুনবুন বাবার পকেট ধরে ঝুলতে থাকে।

সে তো ইদানীং আর বাবাকে ভয় পাচ্ছে না কিনা। ঠাকুর্দাদার মৃত্যুতে সে বুঝতে পেরেছে, বাবাও শুধু বাবা নয়, তারই মতো একটা ছেলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই যে বাবার মুখচোখ কেমন হয়ে গিয়েছিল। বাবা ভয় পেয়েছিলেন। বুনবুন বুঝতে পারে ঠাকুর্দার মৃত্যু নিয়ে তার মনে যেমন বাবার মনেও তেমন অনেক প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।

—দিদিভাইকে জিজ্ঞেস করে এসো।

—তুমি চলে যাবে না তো?

সব দাদা-দিদিরা বাবা-মাকে আপনি বলে, শুধু পুনপুন-বুনবুন-বুবুকে কিছুতেই আপনি শেখানো যায়নি। বাবা-মা পিসিমা ঠাকুমা সব গুরুজনদেরই ওরা অবলীলায় তুমি বলে। দাদা-দিদিদের কাউকে কাউকে নাম ধরে ডাকে, তুই বলে। বড়রা সব হার মেনে গেছে ওদের কাছে।

—তোমার সঙ্গে যাবে। দিদিভাই বললেন—তবে জায়গাটা তো ছোটদের যাবার মতো নয়। না-ই গেল। কিংবা আজ তুমিই না হয় অন্য কোথাও...

—তা হয় না মা, এক মহিলার খুব জ্বর দেখে এসেছি। টাইফয়েড হতে পারে। বুনবুনের কাঁধের ওপর দিদিভাইয়ের হাত শক্ত হল।

—যায় না বুনবুন।

—আসতে চায় আসুক মা, ভয় নেই। হোমিওপ্যাথিতে টাইফয়েড একবার সারলে আর হয় না।

—তুমি তা হলে ফিরে এখানেই খেও। আজ আমি লোক দিয়ে ও বাড়ি খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, আর কানুকেও নিয়ে যাও। ওকে সামলাবে এখন।

বুনবুন ট্রামে চড়েছে। কানু ট্রামে চড়ে থাকে, কিন্তু বুনবুন তো ঘনঘন চড়ে না।

—বাবা, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

—শেয়ালদা।

—ইস্টিশন?—কানু বলল।

—হ্যাঁ।

—আমরা ট্রেনে চড়ব?

—না, ট্রেনে কিন্তু চড়ব না। দেখোই না কী করি।

এ কী! একে স্টেশন বলে? এত ভিড়! বাক্স-পেঁটরা পুঁটলি-পেঁটলা নিয়ে অসংখ্য মানুষ বসে আছে, শুয়ে আছে।

—বাবা, এরা কোথায় যাবে?

—যাবে না। এসেছে।

—বাড়ি যাবে না?

—বাড়ি নেই বাবা।

—কেন?

কানু বলল—জানিস না, দেশ ভাগ হয়ে গেছে এরা রিফিউজি।

বাবা বললেন—ওরা এখানে আশ্রয় নিতে এসেছে। নিজের মনেই বাবা গজগজ করতে লাগলেন নেহরু নিজের গদি দেখল, গান্ধী নিজের ধর্ম দেখল। পাঞ্জাব ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে। এক্সচেঞ্জ অফ পপুলেশন অ্যান্ড প্রপার্টি হচ্ছে দিব্যি। আর বাংলার বেলায় বলে দিল ওদের ঠেকাও। ওদের জায়গা হবে না...

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই সময়ে আধময়লা জামা পরা একটি মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাবার কাছে এসে বলল—'ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু এট্টু দ্যাহেন আমার মা গ' কী হইল, কেমন করতাসে।'

প্ল্যাটফর্মের একধারে কাঁথা জড়িয়ে এক মহিলা ঠকঠক করে কাঁপছেন, পাশে কালো তোরঙ্গ। তার ওপর পুঁটলি বসানো। চোখ বুজিয়ে বুজিয়েই উনি দুলছেন আর চ্যাঁচাচ্ছেন—'কাইট্যা ফ্যালাইসে, সব কাইট্যা ফ্যালাইসে। অরে অ গপাল, যাস কই? আমার মানুষডারে ফেইল্যা যাস না। মিনু, মিনু, আমার মাইয়াডা কই?'

মেয়েটি মায়ের গলা জড়িয়ে ধরল—'এই তো আমি, মা অ মা, মা গ।'

বাবা ব্যাগ থেকে ওষুধ বার করলেন, মহিলাকে খাইয়ে দিলেন। চটপট পুরিয়া বাঁধলেন। মেয়েটির হাতে দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। দুজনে মিলে ওঁকে কাঁথা পেতে শুইয়ে দিলেন। তারপর স্টেশনের কল থেকে একটা গামছা ভিজিয়ে মহিলার মাথা জবজবে করে ভিজিয়ে দিতে লাগলেন।

ঘুরে ঘুরে রোগী দেখতে লাগলেন বাবা।

—আজ কেমন আছেন?

—প্যাটটা এখন ব্যাটার, কিন্তু ব্যাথাটা যায় কই?

—যাবে, পুরিয়াগুলো রাখুন। জলটা কিন্তু ফুটিয়ে খাবেন।

বুনবুন ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল—মামুফুল এদের রান্নাঘর কই?

—নেই।

—তা হলে কোথায় জল ফোটাবে?

—ওই তো ইঁটের মধ্যে কাঠকুটো জ্বেলে।

—ভিখারিদের মতন?

—ভিখারিই তো!

—কী বললে খোকা। ভিখারি?—ওধার থেকে একজন খেকিয়ে উঠলেন।

—ভিখারি কইর‍্যা রাখছে, ভিখারি নই, বুঝলা? জমি-জায়গা ছিল, তোমাদের মতন পোলা ছিল তিনটা, হালার বদ্যিরে পায়ে ধরলাম, কাউরে পালাম না। সব শ্যাষ হইয়া গেল। আর তুমরা এখন ছুট ছুট ছেলে বাপের বয়সী ভদ্রলোকেরে ভিখারি কইছ?

বাবা হাত জোড় করে বললেন—আপনি উত্তেজিত হবেন না। ছোট ছেলে, অত কি বোঝে? মাফ করে দিন।

—কারে মাফ করব কন? হালার সরকাররে, না দ্যাশের পিশাচগুলারে, না ভগবানেরে? থুঃ, থুঃ স্বাধীনতার গায়ে থুঃ।

এই যে ডাক্তারবাবু এসে গেছেন?—ঝোলা গোঁফঅলা একজন ভদ্রলোক পেছন থেকে বললেন—উঃ এমন গেরোতেও মানুষ পড়ে!

কলেরার টিকে এরা কিছুতেই নেবে না। আসতে দেখলেই পালাবে। আর কী নোংরা। এত চিকিচ্ছে করে বেড়াচ্ছেন ডাক্তারবাবু এদের একটু হাইজিন শেখাতে পারেন না? যেখানে হাগছে সেখানেই খাচ্ছে।

রাগী লোকটি এবার মারমুখী হয়ে তেড়ে এলেন।

—কয়ডা দালান দিসেন? ইয়েস, খাওয়া হাগা আমাগ এক হইয়া গেছে। কার পাপে।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কন তো দেখি কার পাপে? সাত পুরুষ্যা ঘর, বাগান, জমি-জিরাত, পুকুর, দালান ছাইড়া পুঁটলি কাঁধে ফকিরয়ার মতন বাইরাইছি। আপনাগর লাথি ঝ্যাটা গালমুন্দ খাইত্যে?...

—ক্ষ্যামা দিন দাদা, আপনাদের ভালর জন্যই বলি—ঝোলা-গোঁফ হাত নেড়ে বললেন।

আশপাশের লোকেরা রাগি লোকটিকে বকাঝকা করতে লাগল।

—সরকারের লোক ক্ষ্যাপাইতাসেন?

—ডোল না জুটলি যাবা কোথা? অ খুড়া?

কেউ ক্লান্ত গলায় বললে—আরে যাইতে দিন না। যাইতে দিন।

ঝোলা-গোঁফ তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে বাবার সঙ্গে চলতে চলতে নিচু গলায় বলতে থাকলেন—শুনলেন তো? সবাই জমিদার। সব্বারই জমি-জিরেত দালান-কোঠা ছিল। এদিকে মুখের ভাষা শুনুন—ভিখিরিরও অধম।

বাবা বললেন—জলেরই তো দেশ। চাষবাসই প্রধান জীবিকা। অল্পবিস্তর জমি অনেকেরই ছিল। সেই হিসেবে জমির মালিক, জমিদার এই আর কী। আর সত্যি কথাই। এমন দুরবস্থায় কে-ই বা পরিচ্ছন্নতা রাখতে পারে বলুন। মাথাগুলো যে ঠিক আছে এখনও এই ঢের। এর চেয়ে অনেক কম দুর্বিপাকেও মানুষ পাগল হয়ে যায়।

ঝোলা গোঁফ বললেন—তঞ্চক নেই নাকি? ভান, ভড়ং, ভেক। ধরুন এখানকার মতো ওখানেও তো ভিখিরি, ভ্যাগাবন্ড, বেজন্মা কিছু কম ছিল না।

চারপাশে একঝলক তাকিয়ে ঝোলা-গোঁফ একটু নিচু গলায় আবার বললেন, এই সুযোগে তারাও সব এপারে এসে এটা সেটা ক্লেইম করতে লেগেছে। দেশটাই না জবরদখল করে নেয়। দেশটাই না রিফিউজি করে দেয়।

—সন্দেহ আছে নাকি আপনার তাতে?—বাবা কুনকুন কানুকে সাপটে ধরে বললেন, আপনি কি ভেবেছিলেন দেশটা জবরদখল হয়ে যাবে না? উদ্বাস্তু কলোনি হয়ে যাবে না?

—বলেন কি মশাই, আপনি যেন সব জেনে বলছেন মনে হচ্ছে।

—আন্দাজ। অনুমান বলেও তো একটা জিনিস আছে। এই অদ্ভুত বেআক্কিলে স্বাধীনতার ফলে দেশখানা যে অতিরিক্ত মানুষের ভারে টলমল করছে এ তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছেন। ডুবতে ডুবতেও হয়তো কোনওক্রমে ভেসে থাকব। এ আপনি গিলতে পারবেন না, ওগরাতেও পারবেন না।

—তা হলে উপায়?

—উপায় নেই। সমস্ত ছারখার ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। সমাজসংস্কৃতি বলে আর কিছু থাকবে না। এতদিনের লালিত ভ্যালুজ সব পাল্টে যাবে। একটা মাতাল, করাপ্ট, ভায়োলেন্ট সোসাইটি তৈরি হবে। নিজবাস থেকে বিতাড়িত হয়েছি, গোরু ছাগলের চেয়েও খারাপ অবস্থায় সহায়সম্বলহীন ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল আমাকে জলে। এবার বলুন আমি সামনে যা পাই আঁকড়ে ধরব কি না। জলে ডোবা মানুষ কী করে জানেন? কেউ বাঁচাতে এলে তাকেই এমনভাবে জাপটে ধরে যে দুজনেই ডুবে মরে।

—উঃ, আপনি বলতেও পারেন, ডাক্তারবাবু।

—কারও দুরবস্থা বুঝতে হলে তার জায়গায় নিজেকে দাঁড় করাতে তো হবে।

—আমরা চাকরি করি মশাই, এই আমাদের চাকরি। অতশত বুঝি না। জানেন আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শালার একখানা দোতালা বাগানবাড়ি ছিল দমদমায়। থাকত শুধু একটা চাকর। দেখাশোনা করত। জবরদখল করে নিয়েছে। বাগানটাতে টিন দিয়ে খড় দিয়ে ছাউনি খাড়া করেছে। ঘরে ঘরে এক একখানা ফ্যামিলি। পরের সম্পত্তি, দখল করে নিতে এতটুকু বাধল না। কী এরা?

—শুনুন, বাবা বললেন, ঠিক এইরকম সম্পত্তি এদেরও ছিল, বাড়িঘর জোত জমা, বাগান পুকুর। সবাইকার একরকম নয়, কিন্তু ছিল। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের শহুরে মানুষের মধ্যে ভদ্রাসনের আকাঙ্ক্ষাটা কম, আমরা ভাড়াবাড়িতে আমরণ থাকতে পারি। এদের কিছু না হোক একটা মাটির ঘরও ছিল। সঙ্গে একটু জমি, খানিকটা খাল, কি পুকুর, তেমন তেমন জলা জায়গায় একটা নৌকো। ওয়ান ফাইন মরনিং এরা শুনল এদের দেশ পাকিস্তানে পড়েছে। আর সেই থেকেই শুরু হল মারদাঙ্গা, ঘর জ্বালানো, জবরদখল। যার সব ছিল তার কিছু নেই। নিঃস্ব হয়ে গেছে। খোলা আকাশের তলায় মেয়েদের নিয়ে, বাচ্চা নিয়ে কতদিন থাকবে গৃহস্থ মানুষ? আব্রুর জন্যে জবরদখল করবে। দু মুঠো অন্নের জন্যে চুরি, জোচ্চুরি, বেশ্যাবৃত্তি সবই করবে দাদা।

—ওঃ ডাক্তারবাবু আপনি এমন করে বলেন না! ঝোলা-গোঁফ যেন পালিয়ে বাঁচলেন।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে বুনবুন বলল—জবরদখল কী বাবা?

—জবর মানে জোর। জোর করে কোনও কিছু নিয়ে নেওয়াকে জবরদখল বলে।

—তার মানে চুরি?

—চুরি তো মানুষ চুপিচুপি করে। আর জবরদখল সোরগোল করেও করতে পারে।

কানু বলল জামাইবাবু, উদ্বাস্তুরা কি চিরকালই এই শেয়ালদা স্টেশনে থাকবে?

—তা কি আর থাকবে? যার আশ্রয় জুটবে চলে যাবে আস্তে আস্তে। তারপর আবার স্টেশন ভর্তি হয়ে যাবে। আবার চলে যাবে, আবার ভর্তি হয়ে যাবে। পা চালিয়ে চলো এবার।

খেতে বসে বাবা দাদাভাইকে বলছিলেন—সামান্য একটা সম্পত্তির পার্টিশান হলেও একটা বিলিব্যবস্থা করে মানুষ। ধরুন কোথাও একটা সিঁড়ি তুলল, কোথাও একটা দরজা ফোটাল, রান্নাঘর ছিল না এক পার্টির রান্নাঘর উঠল। তবে পাঁচিল উঠবে। আর এ দেখুন একটা সাব কন্টিনেন্ট। লক্ষ লক্ষ মানুষের ঘরসংসার, জমিজায়গা, কাজকারবার, অভ্যেস, বংশধারা, কত পুরুষের বসবাস, একবার ভাবলে না, দায়িত্ব নিলে না, ট্যারাব্যাকা একটা লাইন টেনে দিয়ে বললে দেশ ভাগ হয়ে গেল?

দাদাভাই বিশ্বাসের মানুষ, তর্ক-বিতর্কের মানুষই নন। বললেন ভগবানের এ কী লীলা, তিনিই জানেন, দুগ্‌গা, তুমি আমি কি এর তল পাব? দিদিভাই হেসে বললেন—করল মানুষ আর তুমি এর মধ্যে ভগবানের লীলা দেখছ? ওকি দুগ্‌গা, ডালের ওপর অম্বল মাখছ কেন? ওঁর ওপর রাগঝাল করে কোনও লাভ নেই। ওই এক রকমের মানুষ।

বাবা অপ্রস্তুত হয়ে বললেন—না না রাগ করব কেন? তলিয়ে দেখতে গেলে শেষ পর্যন্ত সবই তো ঈশ্বরের বিধান। কিন্তু ঈশ্বরের বিধান বলে আমরা নিজের সন্তানের অসুখের সময়ে কি হাত পা ছেড়ে বসে থাকি? আমার বাড়ির রান্নাঘর কোথায় হবে, কলঘর কোথায় হবে সে ব্যাপারে তো আমিই মাথা ঘামাই, ঈশ্বরকে তো ডাকি না। দেখুন মা, স্বাভাবিকভাবেই একটা পপুলেশন অ্যান্ড প্রপার্টি এক্সচেঞ্জ হতে শুরু করেছিল। লার্জ স্কেলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেটা হয়ে গেলে তো এত সমস্যা হত না। আপনাদের নেভু তো দিল্লি প্যাক্ট করে সেটা বন্ধ করে দিলে। বন্ধ মানে কি? ওয়ান ওয়ে। এদিক থেকে মুসলিম পপুলেশন যা ওদিকে গিয়েছিল ফেরত এল। সম্পত্তি ফিরে পেল, হিন্দুরা ফিরে যেতে সাহসই করলে না। বাগেরহাটের দাঙ্গার পর ওখানে যা শুরু হল, তাতে কি তাদের দোষ দেওয়া যায়?

দাদাভাই বললেন—পাসপোর্ট চালু করতে গিয়েই বোধ হয় আরও সর্বনাশ হল।

এই সময়ে কানু বলল—মা দেখো বুনবুন ভাতগুলো থালার তলায় ফেলে দিচ্ছে, বুনবুন অমনি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল।

দিদিভাই বললেন—কী হল বুনবুন, কাঁটা গিলেছ?

বুনবুন কোনওমতে ঘাড় নেড়ে বলল—খাব না।

—কেন? দেখি—দিদিভাই তার গায়ে হাত দিয়ে দেখতে লাগলেন জ্বর এসেছে কি না।

বুনবুন বলল—ওই মে'টার মায়ের জ্বর আর সারবে না। ওদের সবাইকে কেটে ফেলেছে...

দিদিভাই বললেন—তখনই বলেছিলুম দুগ্‌গা, ছোট ছেলে ওসব জায়গায় নিয়ে যেতে আছে। দেখো তো!

বুনবুন ঠোঁট ফুলিয়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল—ওই মে'টার মা রাঁধতে পারবে না। ও কী খাবে-এ-এ

বাবা বললেন—ও এই কথা। ওদের তো একটু পরেই খিচুড়ি দেবে, জানিস না বুঝি? দেখেছিস কানু, তুই জানিস আর ও জানে না। বোকা ছেলে।

—মিনু খাবে?—

—নিশ্চয়ই। খাবে না তো কী?

—মিনুর মা?

—জ্বর সেরে গেলেই খাবে।

—মিনুর মায়ের জ্বর সারবে না-আ-আ...

বুনবুন কাঁদতেই লাগল, কাঁদতেই লাগল। একটু পরেই বমি করে ফেলল। দুপুরে দেখা গেল তার ঘোর জ্বর এসেছে।

বাবা নীচের ঠোঁটটা কামড়ে পায়চারি করছিলেন, আপনি মনেই বললেন— এত দুর্বলচিত্ত হলে যুঝবে কী করে এরা?

দিদিভাই অসন্তুষ্ট স্বরে বললেন—সব কিছুরই একটা বয়স আছে দুগ্‌গা!

বাবা বললেন—লাইফ ইজ গেটিং ভেরি টাফ, মা বুঝলেন? ওর টিকে নেওয়া হয়ে গেছে। এ জ্বর টিকে ওঠার জ্বর। এরপর দেখবেন ইমিউনিটি এসে যাবে। দেখুন—এই ব্রাহ্মধর্ম, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবি ঠাকুর ওদিকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, জগদীশ বোস এইসব দিয়ে আমরা একটা কালচার, মানবিকতার এক ধরনের মাপকাঠি তৈরি করেছিলুম। দীর্ঘদিন তারই ছায়ায় লালিত হয়েছি। আজ আমাদের নেতারা যে অপরাধ করলেন তাতে করে তাঁদের শেষ পর্যন্ত কী হবে জানি না। কিন্তু আমরা শেষ হয়ে গেলুম।

—আগুন নিয়ে খেলা হচ্ছে বাবা, বুঝলেন? আগুন নিয়ে খেলা। এই আগুনে ঝলসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুড়ে যে নতুন সমাজ বেরোবে তার চেহারা আন্দাজ করতেও ভয় হয়। হিংসে, বিদ্বেষ, হতাশা, আক্রোশ দিয়ে তৈরি হবে দেশের হাওয়া। সেখানে আপনার আমার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হবে। কিন্তু এই কানুর, এই বরুণের কষ্ট হলে তো চলবে না। কিন্তু আমরা শেষ হয়ে গেলুম।

বাবা ঠিকই বলেছিলেন। জ্বরটা আমার টিকের জ্বর। তারপর থেকে কত দুর্ঘটনা, দুর্বিপাক, দুর্ভোগই তো দেখলুম, কই আর কখনও তো ভয় পাইনি। কখনও না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় অধ্যায়
দেবকীনন্দন

ঠাকুর্দাদা মারা যাবার পর থেকে বারো নম্বরে বাবার যাতায়াত বেড়ে গিয়েছিল। আগে আগে ঠাকুর্দাদাই ছিলেন দুই বাড়ির মধ্যে সেতু। চার নম্বরে তাঁর যত কাজ, আর বারো নম্বরে তাঁর যত আড্ডা। ঠাকুর্দাদা হঠাৎ সেই সেতুটা তুলে নিয়ে 'সে- তু চা-ই একটা সে- তু' বলে কোথায় চলে গেলেন, আমার যেটুকু সেই সেতুতে উঠে পড়তে পেরেছিল, সেই অংশটুকুও কেমন ঠিকানাহীন হয়ে ঘুরতে লাগল। ও বাড়ি গিয়ে আমি আগেই যাঁর খোঁজ করতুম তিনি হলেন ঠাকুর্দাদা। বারো নম্বরের এক টুকরো। বারো নম্বরের হাওয়ার একটা স্রোত। নিজেদের মধ্যে চলিত ঠাট্টার সুতো ধরে ঠাকুর্দাকে সম্ভাষণ করে তবে আমি চার নম্বরের মণ্ডলে প্রবেশ করতুম।

চার নম্বরের একটা মস্ত টান অবশ্য ছিল, মায়ের টান, সেটা কিন্তু চোরা চুপিচুপি টান, প্রেমিকার প্রতি কিশোর প্রেমিকের যেমন থাকে। প্রকাশ করতে কেমন লজ্জা হত। বুবু পুনপুন যেমন অবলীলায় মায়ের পাশে শোওয়ার জন্য লড়ালড়ি করত, আমি কোনওদিনই সেটা করতে পারতুম না। মাকে পাশে না-ই পাওয়া যাক, মা খালি ঘুরে ঘুরে কাজ করুন, কিন্তু মায়ের দিক থেকে একটা বাতাস বইবে, বুনবুন যেখানেই যাক, ছাতে বা চিলেকোঠার ঘরে বা উঠোনে বা দালানে বা কোনও ঘরে সেই মা-মা- বাতাস তাকে ছোঁবেই। বুনবুন কখনও বুক চিতিয়ে, কখনও ডিগবাজি খেতে খেতে সেই বাতাস গায়ে মেখে নেবে। মাঝে মাঝে বুনবুন দেখতে পাবে সবুজ পাড় মিলের শাড়িতে ঘেরা মায়ের পাশমুখ, আধখানা ধ্যাবড়া সিঁদুর টিপ, কখনও দেখবে একখানা ক্ষয়া ক্ষয়া চুড়ি নোয়াশোভিত সাদা হাত, চাবির গুচ্ছ ফেলার ঝনাৎ শব্দ, বুনবুন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠবে।

আর রাত্তিরবেলা মায়ের পাশে ঘুম? হয়তো তুমি যখন শুলে তখন মা আসেননি। মাঝরাত্তিরে পাশ ফিরতে গিয়ে তুমি সেই নিবিড় মা-মা- গন্ধটা পেলে, পানের গন্ধ, ধোপাবাড়ির শাড়ির গন্ধ। ধোপাবাড়ির কাপড় না ধুয়ে বউয়েরা তো রান্নাঘরের কাজ করতেই পারবেন না। তাই মা এই উপায়টা বার করেছেন। রাত্রে পরে শোবেন, সকালে জলকাচা হয়ে গেল। পাটভাঙা কাপড় পরাও হল, আবার রান্নাঘরে ঢোকার জন্যে কাপড় শুদ্ধু করে নেওয়াও হল। ফলে শনি রবিবার রাতে মায়ের কাছে শুতে দুদিনের দুটো পাটভাঙা শাড়ির গন্ধ, পানের গন্ধ, মাতৃদেহের সুরভির সঙ্গে মিশে তোমার ইন্দ্রিয়ে রোমাঞ্চক স্পর্শ বুলিয়ে দেবে। তুমি নাক দিয়ে তাকে ছোঁবে। ত্বক দিয়ে, প্রতি রোমকূপ দিয়ে তার ঘ্রাণ নেবে।

—বরুণ, বরুণ ওঠো, একবার কলতলায় যাও মা আমাকে ঠেলে তুলে দেবেন। বুবু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুনপুনকেও। কলতলার দিকে যেতে যেতে আমি জোরে শ্বাস টানব। কতকগুলো জিনিস আমি বুবু পুনপুনের থেকে কিছুতেই লুকোতে পারি না। আমরা তিনজনে তো আসলে এক। তাই।

পুনপুন বলবে—নাক টানছিস কেন?

আমি আস্তে বলব— মায়ের গন্ধ, কাউকে বলবি না কিন্তু।

পুনপুন সরু গলায় বলবে— তুইও? আমি তো গন্ধটা সবসময়ে পাই। বুবু তার ঘুম ভাঙা খসকা গলায় বলবে— আমি পাচ্ছি না, সে কাঁদো কাঁদো হয়ে যাবে। তক্ষুনি তক্ষুনি মায়ের গন্ধ খুঁজতে সে মায়ের কাছে চলে যেতে চাইবে, তার যেন বাথরুম করবারও আর তর সইছে না।

কিন্তু এ সব তো একটু আগেরই কথা। এখন তো আমি বড় হয়ে গেছি। বড় হয়ে গেলে মে'দের পাশে শুতে হয় নাকি? পুনপুন বলে 'দিদিভাইয়ের কাছে শুস যে?' 'দিদিভাই আবার মে' নাকি!' এই জবাব ঠোঁটের আগা থেকে ভেতরে পাঠিয়ে দিই আমি শেষ মুহূর্তে বুঝে ফেলে যে দিদিভাইও মে'-ই। কিন্তু দিদিভাই যেমন মে' নয় আমার কাছে, মা-ও তেমন পুনপুনের কাছে মে' নয়। তবে দিদিভাইয়ের কাছেও তো আমি শুই না আজকাল। দিদিভাইয়ের পাশের ঘরে, শাদা কালো চৌকো পাথরের ঘরে তক্তপোশ আছে আমার আর মামুফুলের। আমাদের পড়ার টেবিল, বইয়ের তাক, আমাদের ক্রিকেট ব্যাট, ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট স-ব।

চার নম্বরের তৃতীয় আকর্ষণ আমার অবশ্যই বুবু পুনপুন। ওদের সঙ্গে বিশেষ করে পুনপুনের সঙ্গে আমার একটা বোঝাপড়া তো আছেই। বুবু এ পর্যন্ত আমার সঙ্গে দুবার আড়ি করেছে। একবার যখন কলঘরে গামছা দিয়ে পুকুর তৈরি করে সাঁতার কাটছিলুম, তখন আমি আর পুনপুন দেখে ফেলি বুবুর পেছনে কোনও শুঁড় নেই, তখন দুয়ো দিয়ে তাকে আমরা পুকুর থেকে বার করে দিই। ছিচকাঁদুনি বুবু যথারীতি কেঁদেকেটে হাঙ্গামা বাধায় এবং আমরা দু ভাই মায়ের কাছে থেকে ঠাস ঠাস গালে চড় খাই। সেবার বুবু অনেক দিন আড়ি করেছিল। আর একবার অসুখের পর অনেক দিন কোনও কারণ ছাড়াই আড়িটা করে। সেবার আমি দিদিভাইয়ের পরামর্শ নিই। দিদিভাইয়ের কথাতেই আমি আড়ির পরোয়া না করে বুবুকে হাসিয়ে দেবার চেষ্টা করতে থাকি। তাতে কাজ দিয়েছিল।

সারা শীতের ছুটি খেলা থাকে চার নম্বরের উঠোনে। সকালের দিকে আজকাল চার নম্বরও ফাঁকা ফাঁকা। ই-দাদা, সু-দাদা, পালক কেউ নেই। পম টম ওপরে কোথায় কে জানে! বুজবুজও নেই। আমি পুনপুনকে জিজ্ঞেস করি— বড়রা কোথায় যায় রে? পুনপুন বলে ড্রপ দিতে দিতে ঠোঁট উল্টোয়। বড়দের কাজ-কারবার অদ্ভুত। এই হয়তো সেধে সেধে হয়রান হয়ে গেছি, তবু কেউ খেলতে এলো না। আবার দেখো কোনওদিন ফট করে মালকোঁচা মেরে নেমে পড়বে। আর খেলতে একবার নামল তো হয়ে গেল। ক্যারমে বসল তো প্রথম স্ট্রাইক পেলেই শটাশট, শটাশট, বাস বোর্ড ফাঁকা। আর ক্রিকেটে যদি ব্যাট ধরে তো ডাবল সেঞ্চুরি করে নিজেরাই হয়রান হয়ে ছেড়ে দেবে। একমাত্র মামুফুল যদি বল ধরে তাহলে ওদের আউট করা যায়। আর বুবু যদি গুগলি দিতে রাজি হয়, তবে। বুবু আমাদের গুপ্তে। ওর গুগলি কেমন বলুন তো? বাঁ দিকে কোনাকুনি ছুটে গিয়ে ও ডান দিকে বলটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছুঁড়ে দেবে। ব্যাস আউট। মামুফুল বলবে আনতাবড়ি দা গ্রেট। জ্যাঠাবাবু হাততালি দেবেন ঠোঁটে চুরুট কামড়ে। আর হাততালির বাড়াবাড়িতে বুবু লজ্জা পেয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে ভেতরে চলে যাবে।

আমরা ব্যাডমিন্টন খেলছি। কর্কটা পাঁচিল টপকে রাস্তায় পড়ে গেছে। তুলতে গিয়ে দেখি সিংগিবাড়ির দোতলার জানলা দিয়ে মানিক চেয়ে আছে। আমি বলি— 'পুনপুন ওই দ্যাখ মানিক।' আমরা দুজনে ওকে ডাকি। মানিক ইশারা করে ভেতর দিকে দেখায়। ওকে আসতে দেবে না। আমি টানি পুনপুনকে— চল মানিকদের উঠোনে যাই, নেট দরকার নেই। শুধু র‍্যাকেট নিয়েই খেলব। পুনপুন কিন্তু উৎসাহ দেখায় না। তবু ওকে টানতে টানতে নিয়ে যাই। আমরা আসছি দেখে মানিকের মুখ অদৃশ্য হয়ে গেছে। ও ছুটতে ছুটতে নীচে নামছে।

দেউড়িতে একজন রোগামতো বুড়োমতো লোক তেল মাখছেন। বললেন— কার পোলা, কোথায় যাবা? অ, ডাক্তারবাবুর না? বা বা তুমার একখান জুড়ি আছে কও নাই তো পুনু!

উনিও তেলের কৌটো নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন, মানিকের জ্যাঠামশাইও ভেতর থেকে বেরোচ্ছেন দেখা গেল। ওঁর পেছনে মানিক, মানিকের বাবাও। এতজন বড়কে দেখে পুনপুন ঘাবড়ে যায়। আমি ওকে টেনে নিয়ে মানিকের সঙ্গে ভেতরে ঢুকি। ও হরি, এখানে কোথায় খেলব?

সেই সময়ে জ্যাঠামশাইয়ের তীক্ষ্ণ গলা কানে এসে লাগল— আপনি যে দেখি দলকে দল এনে বসাচ্ছেন ঘোষালকাকা।

তেলমাখা মানুষটি মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন— করি কি কও কাতু। এরা তো কেউ আমার পর না।

—আমাদের একটা অনুমতি নেওয়ারও দরকার মনে করলেন না?

—অনুমতি? নিষিদ্ধ এলাকা নাকি? পারমিট লাগব? আমারে যে দুইটা ঘর দিয়াছ তাতেই তো উয়াদের জায়গা দিয়াছি। এত রয়্যাছে তোমাদের!

—বাঃ, চমৎকার। এত রয়েছে? তাই আপনি গ্রাম সুবাদে যে যেখানে আছে এনে বসাচ্ছেন!

—তুলবা নাকি? মারবা? তেলমাখা- চেঁচিয়ে উঠলেন— তোমার অন্ন তো খাই নাই! জুটসে তো শুদু মাথার উপর একটু ছাদ। এটুকও কাড়বা?

—আপনি তো দেখি হয়কেও নয় করতে পারেন। তুলবার কথা কখন বললুম? বিনা অনুমতিতে রাশি রাশি লোক এনে ঢোকানোটা বন্ধ করতে বলেছি। কী নোংরা করে রেখেছেন সব! উঠোনময় কাপড় শুকোচ্ছে। এখানে বাচ্চারা ইয়ে করে রেখেছে। ছি! ছি!

ভেতর থেকে এক মহিলা অগ্নিমূর্তি হয়ে বেরিয়ে এসে বললেন— এখনই কী দ্যাখতাসো? নোংরা কারে কয় দেখাইয়া দিমু। গুরুজনের উপর চোপা? দুইটা ঘর হাওলাত দিয়া মাথা কিনবা নাকি?

জ্যাঠামশাই শিহরিত হয়ে বললেন— ঘোষালকাকা ওঁকে ভেতরে যেতে বলুন। আপনার সঙ্গে কথা বলছি... মাঝখান থেকে স্ত্রীলোক...

—স্ত্রী লোক! মাইয়া বইলা আর মানুষ না, না? বুড়া মানুষটার লগে তখন থিকা ক্যাচর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাচর ক্যাচর ক্যাচর...

জ্যাঠামশাই রাগে লাল হয়ে ভেতরে উঠোনের দিকে গেলেন। মানিকের বাবা বললেন— তখনই আপনাকে বারণ করেছিলুম দাদা। আপনি তখন শুনলেন না। কে পিসিমার মামাশ্বশুরের ছেলে, পিসিমা বললেন আর অমনি আপনি...

পুনপুন আমার হাত ধরে এক টান দিল— বাড়ি চল।

মানিক আর এক হাত ধরে বলল— চল না বাগানে যাব।

ভেতর-উঠোনে ঢুকতেই রান্নাবাড়ির দাওয়া থেকে কর্তামা বললেন— আমার ঘাট হয়েছে বাবা। আমি তোমাদের কাছে মাফ চাইছি। তোমাদের পিসেমশাই যখন বেঁচেছিলেন তখন এর বাড়ি, আমার খুড়তুত মামাশ্বশুরবাড়ি কত খেয়েছি, মেখেছি। তাদের যে এরকম হা-ভাতে হা-ঘরে অবস্থা হবে তা কি স্বপ্নেও ভেবেছি? এই মদন তখন আমার পায়ে পায়ে ঘুরত, বউরানি বউরানি করে কত কাঁচা আম, কামরাঙা, চালতা এনে দিয়েছে...

রাঙাজেঠু মাথা নেড়ে বললেন— আসলে কাতু হয়েছে কী জানো, অত বিষয়-সম্পত্তি তো, অনেককাল মনস্থির করতেই পারেননি। নিজের দেশ, বাড়িঘর, বাগান জমি-জায়গা নেহাত কারে না পড়লে কে-ই বা বেচতে চায়। তারপর তো ক্রমশই বিষয় বেদখল হয়ে যেতে লাগল। এক কাকা গেলেন ঢাকার দাঙ্গায়, আর এক কাকাকে বাগানের মধ্যে কে কুপিয়ে রেখে গেল। শেষ খাঁড়ার ঘা পড়ল সমর্থ জোয়ান ছেলেটা নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায়।

কর্তামা বললেন— বউটা পুকুরে গেলেই চারদিক থেকে সব জোয়ানমদ্দ ঘিরে ধরত, টিটকিরি দিত।

—শোকে দুঃখে মদন কাকার মাথাটাই বিগড়ে গেছে ধরে নাও। ও কাকিরও তাই। ওই ছোট দুটি নাতি আর নিজে এই জন্য গিয়ে বাড়িতে পুরুষ মানুষ।

কর্তামা বললেন— তা হোক, তাড়িয়ে দাও। সব ঝেঁটিয়ে বিদেয় করো। সত্যিই তো গুষ্ঠের লোক জড়ো করছে। এর কুটুম তার কুটুম। মজা পেয়েছে যেন। বসতে পেলে শুতে চায়।

এই সমস্ত কথাবার্তার মধ্যে আমি পুনপুন মানিক আর বাচ্চা নেট ছাড়া ব্যাডমিন্টন খেলে যাচ্ছিলুম। ওরা কী করছিল জানি না। আমি কিন্তু কান পেতে সমস্ত কথা শুনছিলুম। কেননা এরা তো সেই শিয়ালদা স্টেশনের মিনুদের মতো। বাবা বলছিলেন না কেউ কেউ আত্মীয়দের বাড়ি জায়গা পেয়েছে, টিকে দেওয়ার লোকটিকে বাবা বোঝাচ্ছিলেন না, ওদের সব কেটে ফেলেছে, সব কেড়েকুড়ে নিয়েছে তাই ওরা পরিষ্কার থাকতে ভুলে গেছে!

জেঠিমা এই সময়ে বলে উঠলেন— বসতে পেলে শুতে আর কে না চায় পিসিমা!

ভাঙা গলায় কর্তামা বললেন— তুমি কি কথাটা আমাকে বললে বউমা? শুনলি রাঙা! শুনলি তো?

জেঠিমা— আপনি তো পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করছেন, আমি কখন ও কথা আপনাকে বললুম?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানিকের বাবা— আহা হা হা। একটা বাইরের উটকো সমস্যা নিয়ে কথা হচ্ছে এর মধ্যে বউদি তুমি আবার কেন?

কর্তামা মুখ থমথমে করে দক্ষিণের ঘরে ঢুকে গেলেন। জেঠিমা বললেন—এখনও সময় আছে, বেনোজল সামলাও এই বলে দিলুম।

ঝনাত করে পিঠে চাবি ফেলে জেঠিমা কুটনো-ঘরে ঢুকে গেলেন। কুটনো ঘরটাই এখন ওঁদের রান্নাঘর হয়েছে।

জ্যাঠামশাই মানিকের বাবাকে কী একটা কথা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। হেঁকে বললেন— মানিক, এখান থেকে যাও। এই খোকা এখন খেলতে হবে না, যাও বাড়ি যাও।

পুনপুনের মুখটা শাদা হয়ে গেল। আমি পুনপুনকে নিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে শুনলুম জ্যাঠামশাই বলছেন— যত্তস্‌সব জ্যাঠা ছেলে।

পুনপুন আমার দিকে তাকাল না। আমিও পুনপুনের দিকে তাকালুম না। আমরা কেউই আর মানিকের দিকে তাকালুম না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় অধ্যায়

পিতৃব্য

বুনবুন এখন রোজ চার নম্বরে যায়। স্কুল থেকে ফিরে বইখাতাগুলো টেবিলের ওপর রেখেই সে দৌড়োয়। দিদিভাই পেছু ডেকে বলেন—'খেয়ে যাও বুনবুন, খেয়ে যাও।' সে কথা সে প্রায়ই শোনে না। চেঁচিয়ে বলে 'পিসিমার কাছে খাব।' আবার কোনও কোনও দিন শুনতেই হয়। ঢকঢক করে এক গ্লাস দুধ, বাড়িতে তৈরি লেবু-গন্ধ-অলা সন্দেশ তাকে খেতেই হয়। তারপরেই সে ছুট্টে বেরিয়ে যায়। তার এক হাতে ব্যাট আর এক হাতে টেনিস বল। সার্কুলার রোড পেরিয়ে যায় সে এক দৌড়ে, ফড়েপুকুরে ঢোকে। টকি শো হাউসের পাশ দিয়ে লাফাতে লাফাতে সে কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে পড়ে। এবার কোন দিকে যাবে বলুন তো? সিনেমা হল, স্টেশনারি দোকানের পাশের ফুটপাথ দিয়ে সে এখন মোটেই হাঁটবে না। কী হবে অত মে'দের ছবি দেখে, মে'দের জিনিস দেখে? সে এখন উল্টোদিকের বলরাম ঘোষের স্ট্রিটে ঢুকে পড়বে। এই রাস্তাটা এঁকে বেঁকে চ্যাপা স্কুল, সরস্বতী বালিকা বিদ্যালয় পেরিয়ে রামধন মিত্তির লেনে পড়েছে। ওখান দিয়ে বেরিয়ে শ্যামপুকুর স্ট্রিটে পড়বে, তারপরে তো শিবশংকর মল্লিক কয়েক দৌড়ের রাস্তা। এই রাস্তাটা দিয়ে কেন সে যায় জানেন? খেলতে খেলতে যাওয়া যায় বেশ। ব্যাটের আগা দিয়ে বলটাকে শূন্যে ছুঁড়ে দেয়। আবার, আবার। এই খেলাটা খেলবার সময়ে একবার গলির এদিক, একবার ওদিক এইরকমভাবে এগোতে হয়, চোখ ওপরের দিকে। উল্টোদিক থেকে লোক এসে পড়লে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। কারুর সঙ্গে ধাক্কাটাক্কা লাগলে 'ওপ্‌ফ, এই ছোঁড়াগুলোকে নিয়ে আর...এই খোকা, রাস্তাটা কি খেলবার জায়গা?' ঠুনঠুন করে রিকশা এসে গেলে দূর থেকে বলতে বলতে আসবে 'খবর্দার খবর্দার।' সাইক্‌ল ঘণ্টি বাজাবে ক্রিং ট্রিং। সে ফুট করে ধারের দিকে সরে যাবে, বল তখনও শূন্যে, ব্যাট তখনও তার হাতে চিৎপাত। শুধু ঘণ্টিটা বাজিও, তাহলেই হবে। খেলাটা ধারের দিকে সরে যাবে।

চার নম্বরের সদরে পুনপুন কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে আছে। কী যে দোষ ও করেছে, কিসের যে ওর অত ভয় কে জানে। কিন্তু ও আজকাল সবসময়ে কাঁচুমাচু থাকে। ও মুখে কিছু বলছে না, চোখে বলছে 'এত দেরি করলি কেন?'

সিঁড়ির মাঝের ধাপে সাটিনের ড্রেসিং গাউন পরে চুরুট মুখে বর্মার জ্যাঠাবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। গাউনের পাল্লা দিয়ে বুবুকে সাপটে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন উনি। বুবুর গোল গোল চোখ, গোল্লা-গোল্লা চুল। গোল গোল গাল, বুবু বলছে 'লু লু লু...।' জ্যাঠাবাবুর হাতে লুডোর বোর্ড। উনিও বলছেন 'হবে নাকি? লু?'

তারা চারজনে লু খেলে এবার। জ্যাঠাবাবু কুচকুচ করে তাদের ঘুঁটিগুলো কাটেন। কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে যে ওঁর সবসময়ে পছন্দসই দান পড়ে, কে জানে!

গেলাসের মধ্যে ছক্কা ঢুকিয়ে তিন চারবার ঝাঁকালেন। খট্‌খট্ খটাখট আওয়াজ হল মুখে বলছেন 'পো, পো, পো,' মানে 'এক'। দান ফেললেন, কুড় কুড় কুড় কুড় করে ছুটে গেল ছক্কা। ফুট করে উল্টে গেল ঠিক পো পড়েছে। সে, পুনপুন ঠিক অমনি করে ঝাঁকিয়ে দেখেছে পড়ে না। পুটপুটদিদি বলে জ্যাঠাবাবু শকুনি। জ্যাঠাবাবুর ছক্কা ওঁর কথা শোনে। আবার বুবুর ওপর ওঁর এমন দয়া যে বুবুকে কাটবার দান পড়লেও উনি মানবেন না। বলবেন 'উঁহু, হল না, বোর্ডে লেগে গেছে, আবার চালো।' ঘুঁটি হোমে উঠে গেল, সেখান থেকে নেমে এসে উনি ওদের কুচকুচ কাটবেন। ভী-ষণ রাগ হয়। কিন্তু আবার যেই সাটিনের জোব্বা পরে, মুখে চুরুট, বোর্ড নাচাবেন, অমনি ওরা তিনজনে লু খেলতে বসে যাবে।

জ্যাঠাবাবু নাকি ক্যারামে চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। চকচকে ক্যারাম বোর্ড পেতে যখন বসবেন, বোর্ডকে পাউডার মাখাবেন, তখন ছোটরা ওঁর কাছে পাত্তাই পাবে না, খেলবে পালক, ই-দাদা, সু-দাদা, অং-দাদা কখনও কখনও, কিন্তু ছোটরা কক্ষনো না। একমাত্র সুষমির কাছে উনি জব্দ। সুষমি প্রথম দান পেলেই ফটাস করে একটা মারে চার দিক থেকে চারটে ঘুঁটি পকেটে পাঠিয়ে দেবে। তারপর একটা অ্যাঙ্গল-এ দুদিকে দুটো। রিবাউন্ড করে গোটা চারেক...এইভাবে বোর্ড ফাঁকা করে দেবে। জ্যাঠাবাবু হেরে গেলেই তিন ছোট বলবে 'হেরো, হেরো।' বুবু বলবে 'হোরে হোরে।' 'হেরো' বলতে ও যে কেন পারে না সে ওর মেনিনজাইটিসই জানে। জ্যাঠাবাবু 'হেরো' বললে ভীষণ রেগে ফোঁস ফোঁস করতে থাকেন 'দাঁড়াও তোমাদের মাকে বলে দিচ্ছি। বউমা, বউমা, এই দ্যাখো, এরা আমাকে হ্যাটা করছে।' মা দূর থেকে একবার তাদের দিকে তাকিয়ে চোখ রাঙাবেন। ব্যাস, তারা হিম।

AMARBOI.COM

রোববারে বুনবুন তো ঘুম থেকে উঠেই ছুটছে। কেন বলুন তো? বর্মার জ্যাঠাবাবু ওদের চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাবেন।

—বউমা, আমাদের নুচি তরকারি গুছিয়ে দাও—মা বাক্সে লুচি তরকারি দিলেন।

—দুগ্‌গি কমলালেবু ভুলিসনি তো?— বাবা বাজার থেকে কমলালেবু এনেছেন, সব ঝোলায় ভরা হল।

—অংশু চট করে হরিবাবুর দোকান থেকে গোটা ষোলো টফি এনে দাও তো। পয়সাটা বাবার ঠেঁয়ে নিয়ে নিও।

বাবার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে অংশু গোটা ষোলো টফি এনে দিলে ওরা বেরিয়ে পড়ে। প্রথমে সেকেণ্ড ক্লাস ট্র্যামে চড়ে এসপ্লানেড, এসপ্লানেড থেকে বাস ধরে চিড়িয়াখানা, কী মজা! বাঁদরদের দেওয়ার জন্যে এক ঠোঙা ছোলাবাদাম কেনেন জ্যাঠাবাবু।

সারা দিন বাঘ, সিংগি, উট, উটপাখি, জিরাফ, জেব্রা, নীলগাই, হনুমান, বনমানুষ, পাখি সব প্রাণভরে দেখার পর ওরা আব্দার ধরে, ট্যাকসি চড়ে বাড়ি যাবে। জ্যাঠাবাবু বলেন একটা কথা ভাবছিলুম।

—কী জ্যাঠাবাবু? কী?

—ট্যাকসি চড়ে বাড়ি যেয়ে কী হবে? তার চেয়ে প্রাইজ পাওয়াটা ভাল না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—প্রাইজ পাওয়াই ভাল— ওরা সমস্বরে বলে।

—ঠিক আছে। এখান থেকে ভিক্টোরিয়া পর্যন্ত কে আগে পৌঁছোতে পারে দেখি। ব্যাস মুখের কথা খসতে না খসতে ওয়াকিং রেস শুরু হয়ে গেল। বুবু হাঁটছে নোদল গোদল, পুনপুন হাঁটছে খুরখুর তুরতুর, বুনবুন হাঁটছে লেফ্‌ট রাইট, লেফ্‌ট রাইট, লেফ্‌ট।

হ্যাণ্ডিক্যাপ, হ্যাণ্ডিক্যাপ—জ্যাঠাবাবু চেঁচাচ্ছেন মাঝে মাঝে। তার মানে দু ভাইকে দাঁড়িয়ে পড়তে হবে, বুবু ধুপধাপ করে ছুটে ছুটে খানিকটা এগিয়ে যাবে। তারপর আবার ভাইয়েরা হাঁটা শুরু করবে।

ভিক্টোরিয়ায় পৌঁছে ওরা একটা করে কমলালেবু, দুটো করে টফি পায়। তারপর জ্যাঠাবাবু বললেন 'মনুমেন্ট পর্যন্ত কে আগে যেতে পারো, এবার দেখি।'

খুড়োর কল সামনে ঝুলিয়ে আবার ছোট ছোট ছোট। মনুমেন্ট অবধি একই কায়দায় পৌঁছে আর একটা করে কমলালেবু, আর একটা করে টফি পাওয়া যায়। ময়দানে বসে বসে অবশ্য ওরা গপ্পো শোনে। জ্যাঠাবাবুর ছেলে ছিল যেমন বীরপুরুষ তেমনি দেশভক্ত। আজাদ হিন্দ ফৌজে সে যোগ দেবেই দেবে। জ্যাঠাবাবুর জ্যাঠাইমাও যেতে দেবেন না। সে-ও যাবেই। তারপরে?

তারপরে আর কি? রেঙ্গুনে এয়ার-রেইড। দলে দলে লোক পালাচ্ছে। জ্যাঠাবাবুরাও পালালেন। ঘন জঙ্গলে পথ ধরে, ঘন কাদাজলা ভর্তি আরাকান পাহাড় পার হতে হতে পায়ে কাঁটা, কাদা, খাবার নেই, জল নেই, জ্যাঠাবাবুর জ্যাঠাইমা আর পারলেন না। মারা গেলেন। আবার চল্‌, আবার চল্‌, জ্যাঠাবাবুর ছেলেও মারা গেলেন। তারপর জ্যাঠাবাবু কোনওমতে ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিয়েই— বন্দে মাতরম জয়হিন্দ্‌ বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। চার খিলি নকুলদানা কেনা হল।

এইবার ট্যাকসি। একে বলে বেবি-ট্যাকসি। ততক্ষণে ওরা প্রাইজের কথা ভুলে মেরে দিয়েছে। একেবারে বাড়ির কাছে এসে মনে পড়েছে।

—জ্যাঠাবাবু আমাদের প্রাইজ?

—ওইয্‌ যাঃ—জ্যাঠাবাবু বললেন—ট্যাকসি করে আসা হল যে।

ট্যাকসিতে এলে যে প্রাইজ পাওয়া যেতে পারে না এটা একটা আইন, কিংবা একটা অলঙ্ঘনীয় প্রাকৃতিক নিয়ম। জ্যাঠাবাবুকে সেই বাবদ অসহায় দেখে ওরা চুপ। মনে বড়ই অনুশোচনা। কী হতে পারত প্রাইজটা?

পুনপুনের ধারণা ওটা একটা লুডো। লুডোর ঊর্ধ্বে কিছু ও কল্পনা করতে পারত না।

বুবু বলল—আকাশ থেকে পড়ল একটা বই।

বুনবুন—কী বই?

পুনপুন— রঘু ডাকাত, আরও ডাকাতের গল্প নিশ্চই।

বুবু— হযোবরল্‌।

ভাইয়েরা দুজন হিহি হাহা। 'হযোবরল্‌' বলে কিছু হয় না, কথাটা হ য ব র ল। বুবুর কান্না। মা কিংবা পমপমের আবির্ভাব। বকুনি। ওরা চুপ।

জ্যাঠাবাবুকে সে বীরপুরুষ ভাবতে চায়। কিন্তু পারে না। ওঁর পিস্তল আছে, কত বীরত্বের গল্প জানা আছে, উনি নেতাজিকে নিজের চোখে দেখেছেন, আরাকান পাহাড় পার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে দেশে ফিরেছেন। তবুও না। ঠাকুরদাদাকে সে বীরপুরুষ ভাবে। ফর্সা ধবধবে ঠাকুর্দা, মাথায় ধবধবে চুল, গায়ে ধবধবে ধুতি ফতুয়া, তালতলার শুঁড়তোলা চটি পরে গটগট করে হেঁটে যেতেন, গমগমে গলায় ডাকতেন— 'টে-কন, টে-কন।' দিদিভাই-দাদাভাইয়ের সঙ্গে গল্প করবার সময়ে কি রকম হাসতেন ঠাকুর্দা। হা-হা-হা। ঠাকুর্দা ভাঙা হাড় জোড়া দিয়ে দিতে পারতেন, কত লোকের কত অসুখ ফটফট করে ভালো করে দিতেন, এমন কি পুলিশের সঙ্গেও হেসে হেসে কথা বলতে দেখা গেছে ঠাকুর্দাকে। একবার যখন সে কুঠেদের জিনিস তুলে নিয়েছিল, সব্বাই ভয় পেয়েছিল, ঠাকুর্দা একাই তাকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন। পুলিশ, ভূত, অসুখ, কিছুকেই ভয় পেতেন না ঠাকুর্দা। দাদাভাইকে দেখলে মনে হয় না, কিন্তু সে জানে উনিও বীরপুরুষ। দাঙ্গার সময়ে উনি মুসলমান দর্জিকে নিকাশিপাড়ায় পৌঁছতে গিয়েছিলেন। একদিন দাদাভাইয়ের সঙ্গে সে বেরিয়েছে। একটা সরু গলি দিয়ে ওরা আসছে, দেখছে খুব ঝগড়া হচ্ছে। একজন ফটাস করে একটা ছুরি বার করে তেড়ে গেল উল্টোদিকে। দাদাভাই তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আসছিলেন— 'বুঝলে বুনটু, ওই যে দেখলে আমার বন্ধুকে, ওঁর নাম অশোকনাথ শাস্ত্রী, মহা পণ্ডিত লোক। কত যে জানেন... সে আর।' বলতে বলতে লোকটার ছুরিসুদ্ধু হাত উনি ডান হাত দিয়ে সরিয়ে দিলেন— 'ধ্যাত, হচ্ছেটা কী? রাস্তার মাঝখানে...?' লোকটা সরে গেল, ছুরিটাও নামিয়ে ফেলল। দাদাভাই আর সে যেমন চলছিল, চলতে লাগল। অথচ দাদাভাইয়ের ঠাকুর্দার মতন গলাও নেই, রাগও নেই।

আর দিদিভাইয়ের তো কথাই নেই। তার আর কানুমামুর যখন পানবসন্ত হল, তাদের সব কিছুই একসঙ্গে হয় তো। রাত্তিরে তখন ওদের বিছানার কাছে সাদা কাপড় পরা, ঘোমটা দেওয়া একজন ভূত আসত, বড়মামা বলেছিলেন— ওটা শেতলা মা, দিদিভাই কিন্তু বললেন ওটা কিছুই না, মনের ভুল। মাথা গরম হয়ে গেলে মানুষ ওরকম ভুল দেখে। ওরা ভয় পেলে সে দিদিভাইকে বাবাকে বলতে শুনেছে— 'সিমটম অনুযায়ী তো তোমরা ওষুধ দাও দুগগা, এটা একটা সিমটম না?' —বাবা বলেছিলেন 'নাইনটি নাইন পার্সেন্ট লোক এ সবে ভয় পায় মা, আপনি পেলেন না? হ্যাঁ, এটা এক ধরনের হ্যালুসিনেশন— সিমটম অনুযায়ী ওষুধ দিই বইকি!'

জ্যাঠাবাবু খুব লম্বা-চওড়া। বেশ ষণ্ডামার্কা। আর বাবা তো মোটেই লম্বা-চওড়া নন। কিন্তু যেদিন রাত্তিরে চার নম্বরে চোর এলো, বাবা তো সব্বার আগে মেথরের গলিতে ঢুকে গিয়েছিলেন। পালক যত বলছে 'দাঁড়ান কাকাবাবু, আমি আগে টর্চ মারি', বাবা ততই এগিয়ে যাচ্ছেন, দেরি করলে নাকি চোর পালিয়ে যাবে। সব্বাই বেরিয়েছে, চোরেরা ঠাকুরঘরের ট্রাঙ্ক ফেলে রেখে পালিয়েছে, তখন জ্যাঠাবাবু দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন।

—কী হল? চোর ধরা পড়ল?

ঠাকুমা যেদিন ভোররাতে ধনুষ্টংকারে মারা গেলেন, সেদিন নাকি জ্যাঠাবাবু বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। বুনবুনকে যেতে দেওয়া হয়নি। পুনপুন, বুবু, পুটপুটদিদি সব দিদিভাইয়ের বাড়ি চলে এসেছিল। দু তিনদিন ধরে বাড়ি পরিষ্কার হল। ঠাকুমার জামাকাপড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিছানা সব নাকি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। ছাতে কোথা থেকে পেরেক পড়েছিল কে জানে, ঠাকুমার পায়ে সেই পেরেক ফুটে যায়, কাউকে বলেনওনি, কিছুই না। নিজে নিজেই মারকুরোক্রোম লাগিয়ে নিয়েছিলেন। মাঝরাতে গোঁ গোঁ শুনে বাবা মা ছুটে যান, গিয়ে দেখেন ঠাকুমা একপাশে বেঁকে মাটিতে পড়ে রয়েছেন। জ্যাঠাবাবুও অসুখ-বিসুখ শুনে বেরিয়ে এসেছিলেন, তারপর তো ঠাকুমাকে ওষুধ দেওয়া হল, বাবা সুযযিকে বললেন সব্বাইকে ওষুধ দিয়ে দিতে, ঠাকুমা মারা গেলেন, বিছানাপত্রসুদ্ধ বেঁধেছেঁদে ঠাকুমাকে নিয়ে গিয়ে কাশী মিত্তিরের শ্মশানে পুড়িয়ে আসা হল, বাড়িতে সব কিছু ডেটল জলে ডোবানো হয়েছে, সারা বাড়ি মোছা হচ্ছে, পিসিমাই প্রথম খেয়াল করলেন— তোদের জ্যাঠাবাবু কোথায় গেল, অ ইন্দু! 'আ-র জ্যাঠাবাবু!' ই-দাদা সারা বাড়ি খুঁজে এসে বলল— 'জ্যাঠাবাবু ভোঁ কাট্টা।'

অত দুঃখের মধ্যেও কেউ কেউ নাকি একটু একটু হেসে ফেলেছিল।

দিন সাতেক পরে ওইরকমই এক ভোররাতে জ্যাঠাবাবু একটা নতুন চামড়ার স্যুটকেস নিয়ে ফিরে এলেন। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করেনি, অত বড় একজন জ্যাঠাবাবু যে কিছুর মধ্যে কিছু না হারিয়ে যেতে পারেন না সেটা সবাই-ই বুঝতে পেরেছিল, তাই ব্যস্ত হয়নি। জ্যাঠাবাবু নিজেই বললেন— বর্মার পরিচিত একজনের খুব বিপদ, ডেকে পাঠিয়েছিল, তাই গিয়েছিলেন। 'সে কি কেলেঙ্কারি কাণ্ড তুমি ধারণা করতে পারবে না দুগগা।' বাবা কিছু বললেন না। পালক বলল— 'একটু বলে গেলে পারতেন জ্যাঠাবাবু। সবাইকে এত চিন্তা করতে হত না।'

তো সেই থেকে 'কেলেঙ্কারি কাণ্ড' কথাটা তাদের পারিবারিক তামাশা হয়ে দাঁড়াল। 'কেলেঙ্কারি কাণ্ড' কেউ বলবে, অমনি বাকিরা হাসতে শুরু করবে। খালি পমপমদিদি টমটমদিদি এই হাসাহাসির মধ্যে চুপ করে থাকত, যেন শুনতে পাচ্ছে না। নিজের কাজ করছে, শুধু ভুরু কুঁচকে উঠেছে। সামান্য, খুব সামান্য। কেন কে জানে? গুরুজনদের কথা নিয়ে হাসাহাসি করা উচিত নয় বলে? কে জানে! তা মনে হত না। জ্যাঠাবাবু-সংক্রান্ত ব্যাপারে দিদিরা কোনও কথা বলত না। তবে তারা তিনজনে যখন-তখন কথাগুলো নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত। দিদিভাই বুনবুনকে নিয়ে হয়তো চার নম্বরে এলেন, বুবু অমনি চুল দুলিয়ে বলল— 'দিদিভাই এসেছেন, কী কেলেঙ্কারি!'

—'কেন রে, আমি এলে কেলেঙ্কারি হবে কেন?'— দিদিভাই জিজ্ঞেস করছেন, বুবু হাওয়া। বিশেষ করে, কোনও অতিথি বাড়িতে এলেই বুবু কথাটা প্রয়োগ করত। আচার শুকোতে দিয়ে পুনপুনকে পাহারা দিতে বলা হয়েছে, পুনপুন বলে ফেলল— 'কেলেঙ্কারি!' মা বিরক্ত হয়ে বললেন— 'কী যে পাকা পাকা কথা শিখেছো!'

এক রবিবারে চার নম্বরে এসে বুনবুন শোনে পিসিমাকে পাওয়া যাচ্ছে না, মানে পিসিমা তাঁর রান্নাঘরে বা ঠাকুরঘরে কোথাও নেই। মা বললেন— 'দেখ তো বরুণ, অংশু, পাবন... দিদিমণি কোথায় গেলেন।' ওরা লাফাতে লাফাতে সারা বাড়ি খুঁজছে, আর বলছে 'পিসিমাকে পাওয়া যাচ্ছে না, কী কেলেঙ্কারি কাণ্ড! পিসিমাকে পাওয়া যাচ্ছে না কী কেলেঙ্কারি কাণ্ড, কী কেলেঙ্কারি কা—' কথা তাদের মুখে আটকে গেছে, কেন না পিসিমাকে পাওয়া গেছে, ঠাকুমার ঘরের মেঝেয় বসে পিসিমা হাপুস নয়নে কাঁদছেন। কাঁদছেন আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষমা ভিক্ষা করছেন সেজমার ফটোর কাছে। সিপিয়ায় সেই ফটো পালক তুলেছিল। জানলার পাশে ঠাকুমা বসে আছেন জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে ঠাকুমার মুখে, গায়ের আলোয়ানে— হাতে 'সঞ্চয়িতা'। ভেতরের পৃষ্ঠায় আঙুল রেখে বইটা মুড়েছেন ঠাকুমা, গোল গোল সোনা ফ্রেমের চশমার মধ্যে দিয়ে অন্যমনস্ক হাসছেন। আরও দশ বছর আগের গ্রুপ ফটো থেকে ঠাকুর্দার পাশে বসা ঠাকুমার ছবি একটা তৈরি করে নেওয়াই যেত। কিন্তু বাবা বললেন— 'না, এই ফটোটাই ঠিক ফটো। এইটাই শ্রাদ্ধের ঘরে মালা পরিয়ে রাখা হবে।' তাই রয়েছে। আজও।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চতুর্থ অধ্যায়
শরণাগত

একটা মহা সমস্যা হয়েছিল বুনবুনের। তার ভাই পুনপুন থাকত আলো-ছায়ার জগতে। সে পরশমণি, ত্রিশূলেশ্বর, য়্যালিস, লীলাময়ী এইসব আজগুবি জিনিসে বিশ্বাস করত। সে ভালবাসত স্মৃতিদের, আদর্শদের, গল্পের মানুষদের। আর বুবুর তো কথাই নেই। সে পুরোপুরিই ছায়ালোকের শিশু। সে বুঝি কোনওদিন বড় হবে না। কোনওদিন হেঁয়ালিতে ছাড়া কথা বলবে না, কী যে তার মনে ঘটছে তার দিশা কেউ কোনওদিন পাবে না। কিন্তু বুনবুন তো তা নয়। সে পুরোপুরি আলোয় থাকে। সব কিছু সোজাসুজি বুঝে নিতে চায়। এটা এরকম, ওটা ওরকম। সিং-বাড়ির সেই তেলমাখাকে বা তার ব্যবহারকে সে ঠিক সমর্থন করতে পারছিল না, আবার শেয়ালদার সেই ঝোলা-গোঁফকেও তার ভাল লাগছিল না। আর সবকিছুর মধ্যে খালি ঘুরে ঘুরে তার মনে আসছিল মিনু আর মিনুর মায়ের কথা। কয়েক দিন পর শেয়ালদা গিয়ে ওরা আর মিনুদের দেখতে পায়নি। দুর্গাপ্রসাদ তাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন—ওরা ট্রানজিট ক্যাম্পে গেছে, সেখান থেকে ওদের ব্যবস্থা হবে। বুনবুনের কিন্তু দৃঢ় ধারণা মিনুর মা মারা গেছেন আর মিনু এই শহরের জনারণ্যে ভয়ার্ত চোখ মেলে, মুখ শুকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার জামার পেছনের বোতাম নেই। কাঁধ থেকে জামা খসে খসে পড়ছে, চুলে জট, মাটি মাখা। চোখ-ভর্তি জল। জল শুকিয়ে রয়েছে গালে। ভিক্ষে চাইতে মিনুর লজ্জা করে, কাউকে কিছু বলতে সাহস হয় না। সে এত গাড়িঘোড়ার রাস্তা পার হতে ভয় পায়, কোথায় যাবে জানে না। ফুটপাতে বসলে পুলিশ এসে তাড়া দেয়, অফিস-যাত্রী ভদ্রলোকদের গায়ে ধাক্কা লেগে গেলে তারাও গাল দিয়ে ওঠে। একমাত্র যদি বুনবুন ও দুর্গাপ্রসাদের চোখে সে পড়ে যায়, তবে মিনু বাঁচতে পারে। নইলে তার আর রক্ষা নেই। তর্জনী আর মধ্যমা দুটো আঙুল সে কানুমামুর সামনে জোরে জোরে নাড়ে। তর্জনী ধরলে বুঝতে হবে মিনুরা আর নেই, মধ্যমা ধরলে—আছে। কানুমামু বারেবারে মধ্যমাটাই ধরে। তবুও বুনবুনের বিশ্বাস হতে চায় না।

মিনুকে না পারলেও হারানকে উদ্ধার করবার কৃতিত্ব খানিকটা বুনবুনকে দিতেই হয়। শেয়ালদায় নানা ধরনের মানুষের সঙ্গে দুর্গাপ্রসাদের আলাপ হত। নবীনবাবু এই রকমই ভদ্রলোক। নাদা পেট, মাথার টাক ঢেকে এক দিকের চুল উল্টোদিকে পাট করে আঁচড়ানো। ইনিই একদিন দুর্গাপ্রসাদকে বললেন—'আপনি বুদ্ধিমান হৃদয়বান মানুষ, একটা সমস্যার সমাধান করে দিতে পারেন?'

—কী ব্যাপার?

—ঢাকায় আমার এক বন্ধু থাকেন। উনি ওঁর ওয়াইফ আর ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়েছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এদিকে, নিজে জমি-জমার ব্যবস্থা করে হয়তো মাসখানেক পর আসবেন। অতি সজ্জন, ব্রাহ্মণ, আপিসে চাকরি ছাড়াও পুজো-আচ্চার কাজ করতেন। আমার ওপর নির্ভর করছেন। এদিকে আমি তো থাকি মেসে, চালচুলো নেই। সে মহিলাকে তুলি কোথায় বলুন তো?

দুর্গাপ্রসাদ বললেন—মেসে থাকলেও, একটা দেশঘর কিছু তো আপনার আছে?

—কিচ্ছু নেই ডাক্তারবাবু, মা যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন দেশে একটা মাটির ঘর ছিল, মা যেতে সে পাট তুলে দিয়েছি। মহা মুশকিলে পড়েছি। ছোট ছেলে নিয়ে ভদ্রমহিলা...

বুনবুন অমনি বলে উঠল—আমাদের বাড়িতে জায়গা আছে।

নবীনবাবু বললেন—বাঃ, এটা তো ভাল কথা। খোকা ভাল কথা বলেছে।

বুনবুন ভাবছিল মিনু আর তার মাকে রিক্‌শায় করে সে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। মিনুর মা বড্ড রোগা, দিদিভাই কিন্তু সব্বাইকে গঙ্গুর দুধ খাইয়ে মোটা করে দিতে পারেন। আর মিনু? মিনুর জন্যে সে বুবুর ফ্রক এনে দেবে এখন...

দুর্গাপ্রসাদ বললেন—ছোট ছেলে ওর কথা ছেড়ে দিন। আমার বিরাট পরিবার, নিজেদেরই ভালভাবে জায়গা হয় না।

বুনবুন বলল—বারো নম্বরে। বারো নম্বরে অনেক জায়গা আছে...

বাবা একবার চোখ রাঙাবার চেষ্টা করলেন, বুনবুন অবধি সে দৃষ্টি পৌঁছল না।

নবীনবাবু বললেন—আহা ছোট ছেলে, ভাল মনে বলেছে, ওকে বকাঝকা করবেন না। কটা তো দিনের ব্যাপার। তারাপদদার যদি আসতে দেরি হয় আমি যেমন করে পারি একটা ব্যবস্থা করব।

হারানকে সঙ্গে নিয়ে সেই রানি মাসিমার বারো নম্বরে আবির্ভাব। মাথায় ঘোমটা। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। দিদিভাই জিজ্ঞেস করলেন—নাম কি তোমার মা?

—রানি—তখনই বুনবুন দেখল একেবারে গঙ্গুর মতন চোখ মাসিমার। এমনি বড় বড়, করুণ।

—স্বামীর নাম?

চুপ করে রইলেন।

নবীনবাবু তড়বড় করে কী বলতে যাচ্ছিলেন। তরুবালা ধমকের গলায় বললেন—আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করেছি?

হারানের মা বললেন—'ফারাপদ চক্রবর্তী, শ্বশুর ঈশ্বর ফালীপদ চক্রবর্তী।'

নবীনবাবু তাড়াতাড়ি একটা চিরকুটে নিজের মেসের ঠিকানা, তারাপদ চক্রবর্তীর ঢাকার বাড়ির ঠিকানা সব লিখে দিলেন।

—মাসখানেক, তার বেশি লাগবে না। আমি দু-চারদিন অন্তর খোঁজ নিয়ে যাব মাসিমা, যা উপকার করলেন না, এই খোকা যা উপকার করল....

রানিমাসিমা বা তাঁর ছেলে হারান কেউই বিশেষ কথা বলত না। সকালবেলায় উঠেই উনুনে আঁচ দিয়ে দিলেন রানিমাসিমা। তরকারির ঝুড়ি নিয়ে বঁটি পেতে বসে বললেন—কয় পদ রান্না হবে, বইলা যান মা, আমি কাইটা রাখি।

কটা দিন এরকম দেখে তরুবালা বললেন—তুমি এরকম করছ কেন মা, আমি কি তোমাকে রান্নার লোক রেখেছি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—রান্না তো আপনেই করতাসেন মা,—বিনীত গলায় উনি বললেন। দুপুরবেলা সারাদিনের খাটাখাটুনির পর তরুবালা একটু শুলেই রানি এসে নিঃশব্দে তাঁর পা দুটি কোলে তুলে নেবেন।

তরুবালার বাতের ধাত। টিপেটুপে দিলে ভাল লাগে। কিছুক্ষণ পর তিনি যদি বলেন—থাক আর দিতে হবে না।

রানি বলবেন—কেন মা? ভাল লাগতাসে না?

—ভাল আবার লাগছে না? —তরুবালা চোখ বুজিয়ে হেসে বলবেন—খুব ভাল লাগছে। কিন্তু তুমি আর কত দেবে?

—সারা রাত দিলে যদি আপনের ভাল লাগে, তাই-ই দিতে পারুম, আমার কুনো কষ্ট হইব না। খুব মৃদু গলায় উনি বলবেন।

নবীনবাবু দু-তিনদিন অন্তর আসতে লাগলেন, একদিন আনলেন হারান আর বুনবুনের জন্যে মৌরি লজেন্স। আর একদিন আনলেন তরুবালার জন্যে এক গোছা মিঠে পান আর দুটো নারকোল।

কিন্তু তারপর আর নবীনবাবুর দেখাই পাওয়া ভার। খেয়াল ছিল না, হঠাৎ মনে পড়তে তরুবালা একদিন বললেন—রানি, সেই নবীনবাবু তো অনেকদিন আসেন না, কী হল বলো তো!

রানি মুখ নিচু করে বললেন—উনি আর আইসবেন না মা।

—তার মানে?

—আমার স্বামী হারায়্যা গেছেন গিয়া সেই ছেচল্লিশ সনের দাঙ্গায়। এক সাথে বাইরাই ছিলাম। তো রাতের আন্ধারে হাজার হাজার মানষের ভিড়ে... আমার কপাল মা, ভাইগ্য, এতগুলান বৎসর ভাইস্যা বেড়াইছি, এই নবীনবাবুর বাসায় ছিলাম।

—নবীনবাবুর বাড়িতে! উনি যে বললেন উনি মেসে থাকেন।

—না, উনি বাসায় থাকেন।

—মিথ্যে কথা বলেছেন?

—হ্যাঁ।

—তুমি জেনেশুনেও চুপ করে ছিলে?

চুপ করে রইলেন হারানের মা। তারপর পায়ের নখের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বললেন— কী বা করি কন, দমদমের ক্যাম্প থাইক্যা আমার স্বামীর নাম কইর‍্যা আমারে লইয়া নিজের বাসায় তুইললেন। কোথা যাই, কী করি মা, থিক থিক করে কুম্ভীর কামট, মাথার ঠিক রাইখতে পারি নাই। কুনটা ভাল কুনটা মন্দ কে তখন আমারে কইয়া দিবে। বৎসরখানেক পর মেদিনীপুর থিক্যা এঁর স্ত্রী খবর পাইয়া আইলেন, আমারে তাড়াইয়া দিলেন। নবীনবাবু আমারে আপনার কাছে গছাইয়া দিয়া গেছেন। এখানে একটু ঠাঁই পাইয়া বাঁইচা গেছি মা, একটু দয়া করেন।

দুর্গাপ্রসাদ নবীনবাবুর দেওয়া ঠিকানায় খোঁজ করলেন। মেস ঠিকই, কিন্তু নবীন সমাদ্দার বলে কেউ সেখানে থাকে না, কোনওদিন থাকেনি। দুর্গাপ্রসাদের বর্মার দাদা মণিমোহন বললেন— তখনই তোমায় বলেছিলুম বাঙালকে বিশ্বাস করো না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুর্গাপ্রসাদ গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে বললেন—ঘটিকেই বা বিশ্বাস করতে পারছি কই। তিনি শ্বশুর-শাশুড়িকে আর মুখ দেখাতে পারেন না। শেষে স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে একদিন তিনি তরুবালার কাছে গেলেন— ব্যবস্থা হয়ে গেল মা, বুঝলেন!

—কিসের ব্যবস্থা দুগগা?

—ওই হারান আর তার মায়ের বন্দোবস্ত।

—কী রকম?

—আমাদের বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি।

—তাই নাকি? থাকবে কোথায়?

—সেজমার ঘরে তো আজকাল দিদিমণি একাই থাকছে, ওখানেই...

হয়ে যাবে...।

—তুমি তাঁর সঙ্গে কথা বলেছ?

—না, তা অবশ্য, তবে আমি আর আপনার মেয়ে মিলে...

— শোনো দুগগা, মনোর নানারকম আচার-বিচার আছে, সে এর ইতিবৃত্ত জানলে বাড়ি ছেড়ে কাশীটাশী চলে যাবে।

—আচার-বিচার তো আপনারও আছে মা।

তরুবালা বললেন—আচার-বিচার কখন খাটে, কখন খাটে না, সেই তফাতটা ভগবানের আশীর্বাদে আমি করতে পারি দুগগা। 'আতুরে নিয়মো নাস্তি' বলে একটা কথা আছে না! এ মেয়েটি এমন আতুর যে-কোনও নিয়মই এর বেলা আর খাটবে না বাবা।

দুর্গাপ্রসাদ মাথা নিচু করে চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপরে বললেন—আমি আপনাকে বিপদে ফেললুম।

—তুমি আমাকে বিপদে ফেলনি দুগগা। আমাকে যিনি বিপদে ফেলেছেন তিনি হলেন স্বয়ং মধুসূদন। তিনি আমাকে পরীক্ষা করছেন। উনি তো সেদিন নিজে চেয়ে রানির হাতের জল খেলেন।

অনাদিপ্রকাশ এই সময়ে বললেন—মধুসূদন স্বয়ং যার হাত ধরে বাড়ি এনেছেন তিনি সর্বশুদ্ধা সর্বশুক্লা মাতৃস্বরূপিণী কন্যা। দুগগা, তাঁর হাতের জল আর গঙ্গাজলে কোনও তফাত নেই। হতে পারে না। ত্রেতায় তিনি অহল্যাকে উদ্ধার করেছিলেন, দ্বাপরে কুব্জাকে মুক্তি দিলেন, কলিতে সেই তিনিই নবদ্বীপচন্দ্র হয়ে পতিতাকে সন্ন্যাসিনী করলেন.....এ হল তাঁর লীলা।

ইতিমধ্যে প্রচণ্ড বর্ষায় স্কুল যেতে না পারলে বুনবুন হারানের সঙ্গে কাগজের নৌকা ভাসায়, হারান ডাংগুলি ছাড়া আর বিশেষ কিছু খেলতে পারে না, বুনবুন তাকে ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন শেখায়। বর্মার জ্যাঠাবাবু ছাড়াই তারা চারজনে বেশ লুডো খেলতে পারে। বুবু, কুনকুন, পুনপুন আর হারান। হারান জানলার গরাদে দুই পা রেখে হুপহাপ করে উঁচুতে উঠে যায়—টিকটিকি ধরে জানলা দিয়ে ফেলে দেয়, মুঠোয় করে আরশুলা নাচায়, পিচিস করে বড় বড় মাকড়সা মেরে দেয়, দেশবন্ধু পার্কের পুকুরে গিয়ে সে সত্যি সাঁতার দেখায় ওদের। খালি পড়াশোনার বেলায় হারান চুপ। পড়ার কথা উঠলেই তার বড় বড় চোখ দুটো শঙ্কায় ভরে যায়। নীচের ঠোঁটে একটা গোঁয়ার্তুমির রেখা ফুটে ওঠে। অথচ বুনবুনের হারানকে নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রচুর উচ্চাকাঙ্ক্ষা। হারানকে বিদ্যাদিগ্‌গজ করে জজ ব্যারিস্টার করে বুনবুন আর কানুমামু দেখিয়ে দেবে সবাইকে। তারা নিজেরা কী হবে যদিও ঠিক নেই। তাছাড়া হারান যে রকম অকুতোভয় ও ঘেন্নাপিত্তিহীন তাতে তাকে ডাক্তার কিংবা সৈনিকও করা যেতেই পারে।

কানুমামু বলে—উত্তাল জল বুঝলি হারান, কলাগাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি তোর শালতি, ঢেউয়ের মাথায় মাথায় এগিয়ে যেতে হবে, পারবি?

হারান বলে—পারুম।

—আর যদি কুমির আসে? —বুনবুন বলে

—কুম্ভীররে আমাগ ডর নাই। পিঠে বইসা চোখগুলান গাউলিয়া দিলেই বাস।

পাহাড়েও চড়তে হবে, নর্থ ইস্টে বারো হাজার ফুট পর্যন্ত পাহাড় ধর, সোলজার হতে হলে পিঠে অক্সিজেনের সিলিন্ডার নিয়ে হ্যাভারস্যাকে নিজের মালপত্র নিয়ে খাড়া পাহাড়ের গায়ে হুক গেঁথে গেঁথে দড়ি ধরে উঠে যেতে হবে।

—পারুম। শিখাইলেই পারুম।

—পারুম নয় বল পারব।

—পারব।

—পারবো।

এইভাবে হারানের শিক্ষা এগোতে থাকে। কানু আর বুনবুন স্বপ্ন দেখে দূরভবিষ্যতে জেনারল হারান চক্রবর্তী কোনও এক আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে জার্মানি, তার পর ইংল্যান্ড, তারপর আমেরিকা সব জয় করে ফেলেছে।

—রাশিয়াটা পারবে না, বুঝলি বুনবুন। —কানু বলে।

—কেন?

—রাশিয়ার ভীষণ শক্তি। তা ছাড়া সোভিয়েট রাশিয়া আমাদের বন্ধু, ওরাও কম্যুনিস্ট, আমরাও কম্যুনিস্ট হয়ে যাব, মাস্টারমশাই বলেছেন।

এগুলো সব দূরের স্বপ্ন। কিন্তু হাত বাড়ালেই ধরা যায় এরকম উচ্চাকাঙ্ক্ষাও বুনবুনের আছে। তার ইচ্ছে করে হারানকে বানান লিখতে দিতে—মুমূর্ষু, নূপুর, মধুসূদন, শ্মশান—এইসব। হারান স্বভাবতই পারবে না, তখন সে আচ্ছা করে হারানের মাথায় গাঁট্টা কষবে ঠিক নিউ ইন্ডিয়ান স্কুলের বাংলার মাস্টারমশাই হরিহর সারের মতন খটাস করে। সে তক্কে তক্কে থাকে, কিন্তু কানুমামুর চোখ ফাঁকি দেওয়া শক্ত। হারানের কান্নাতেও তার ভয় আছে অবশ্য। অবলীলায় যে হারান টিকটিকি ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে সেই হারানই সামান্য টেবিলের কোনায় লেগে গেলে বা চিমটি খেলে এমনি হাঁউ হাঁউ করে কাঁদতে পারে যে বাড়িসুদ্ধু যে যেখানে আছে কী হল কী হল করে ছুটে আসবে। মাসিমা, অর্থাৎ হারানের মা অবশ্য তাকে খুবই উৎসাহিত করেন। বলেন —'অ বুনবুন। হারানরে একটুক পরাও না। না পারলে কান মুইল্যা গালে দুই চড় কষাইবে। কিস্যু কইমু না।' তা সত্ত্বেও বুনবুনের ব্যাপারটা সাহসে কুলোয় না। সে আলমারির মাথা থেকে ঝাঁপ খেতে পারে, বলে ড্রপ দিতে দিতে রাস্তা দিয়ে চলতে পারে, পাঁচিলহীন ছাতে ঘুড়ি ওড়াতে পারে, কিন্তু অপরাধ করে দিদিভাইয়ের ধমক খাওয়া? নাঃ, এটা সে বরদাস্ত করতে পারবে না।

দিদিভাই এক ধরনের দেবী যিনি তাকে প্রচুর প্রশ্রয় দিয়ে মানুষ করেছেন। তাতে বুনবুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেচারির দায়িত্ব আরও বেড়ে গেছে। সে আর কানুমামু দুজনে হয়তো একই অন্যায় করেছে, কিন্তু শাস্তি খেলো কানুমামু। কানু যদি বলে—'বুনবুনও তো করেছে।' তার উত্তর হবে—'তুমি তো বড়, তুমি করলে, ও-ও করবে, তোমার ওকে বোঝানো উচিত। তুমি মামা না?' এই শাস্তি না-পাওয়াটাও যথেষ্ট শাস্তি বুনবুনের কাছে। তার যেন নিজের কোনও মন নেই, তার হাত-পা যেন কানুমামার নির্দেশে চলে, সে একটা পুতুলের চেয়েও উপেক্ষার বস্তু।

তবে যেবার সে পাশের বাড়ির ফুটুসকে ঠেঙিয়েছিল, সেবার কানুমামু ধারেকাছে ছিল না। দিদিভাই কী করেন? এদিকে ফুটুসের মা রোরুদ্যমান ফুটুসকে নিয়ে বিচার চাইতে দিদিভাইয়ের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছেন। সুতরাং বুনবুন শাস্তি পায়।

—মেরেছ?

—হ্যাঁ। কিন্তু ও....

—ওসব শুনতে চাই না। মেরেছ?

—হ্যাঁ।

—মারো, নিজের গালে দুটো চড় মারো, জোরে মারো। নিজের কান মোলো। আর কখোনও যেন এমন না হয়। 'কখোনও'র সে কী উচ্চারণ। বাপরে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঞ্চম অধ্যায়

নষ্ট ভ্রষ্ট দষ্ট ব্রজ

বছর আষ্টেকের নয়েকের একটা ছোট ছেলে কৈশোরের দিকে এগোচ্ছে, তার চারপাশে আদর, আবদার, ভালোবাসার শাসন, তার চারপাশে সদ্য উন্মোচিত খেলাধুলোর পৃথিবী, ইস্কুল্যা বন্ধুদের নষ্টামি-দুষ্টামি জিভে-জল-আনা খাবার-দাবারের অবিরাম সরবরাহ, দুর্গাপুজোর অষ্টমী বিজয়া, নবান্ন পৌষপার্বণ, সরস্বতী পুজোর অফুরন্ত কুল, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ের আম্রোৎসব, অথচ শেয়ালদা স্টেশন তার চেতনা থেকে কিছুতেই সরছে না। বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না, কেননা সে খুব সতর্ক থাকে, পাছে কেউ তাকে 'জ্যাঠা ছেলে' বলে, পাছে বর্মার জ্যাঠাবাবুর মতো কেউ বলে ওঠে 'নিজের চরকায় তেল দাও'। তা ছাড়া এটাও সত্যি কথা যে সে ভুলেও যায়, তার মনের ওপরের স্তর যেটা গঙ্গুর দুধের সরের মতো মোটা, সেই স্তর থেকে ব্যাপারটা চলে যায় সরের স্তরের তলায় ছলছলে তরল দুধের গভীরে। তখন হয়তো সে পরপর তিনখানা ছক্কা মারার আনন্দে ফুলে ফেঁপে ত্রিগুণ হয়ে গেছে, কিংবা হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'মানুষ পিশাচ' পড়ে ভয়ের শিহরনে সজারুপ্রতিম, কিংবা হয়তো সে একটা লম্বা সরলের অঙ্ক মেলাতে পেরে গর্বের আহ্লাদে আটখানা। কিন্তু অন্য সময়ে আশ্চর্য অধ্যবসায়ের সঙ্গে শেয়ালদা ফিরে ফিরে আসতে থাকে তার স্মৃতিতে, মিনু ও মিনুর মা জাগরূক থাকে, জুতোয় ঢোকা পেরেকের মতো খচখচখচখচ করতে থাকে মিনুসম্পর্কীয় যাবতীয় প্রসঙ্গ।

ব্যাপারটা এইরকম হয়:

প্রথম বসন্তের সকালে তাদের বাড়ির উঠোনের আমগাছটা মুকুলে মুকুলে ভরে গেছে। সবুজ সবুজ কোঁকড়া পাতার মধ্যে থেকে এগিয়ে এসে এলিয়ে পড়েছে এক একটা তামার কোষাকুষির মতো পাতার গুচ্ছ, হারানের মা রান্নাঘর থেকে হাতে একটা খন্তি নিয়ে বেরিয়ে এলেন—আমের বকুল আইসে না? আহ্ কী সুবাস! — জোরে প্রশ্বাস টেনে সুবাস নিলেন তিনি— কত আম, কত্ত আমগাছ আমাগ বাগানে, জম্বুরাগুলান লইয়া ফুটবল খেলা হইবার পারত! জাম, জামরুল... হঠাৎ তিনি হুঁশ ফিরে পান, চকিতে আবার ঢুকে যান রান্নাঘরে উনি 'জ' 'য'গুলোকে ইংরেজি 'Z' উচ্চারণ করেন। খুব ভালো লাগে বুনবুনের। সে যখন একা থাকে, চারদিকটা একবার দেখে নিয়ে উচ্চারণ করে Zাম, Zামরুল, Zম্বুরা... জম্বুরাটা কী রহস্যময় জিনিস কে জানে। তম্বুরার মতন কিছু হতে পারত, কিন্তু গাছে ফলে যখন তখন তম্বুরা তো নয়। —জম্বুরা কী না জানার লজ্জায় অধোবদন হয়ে যায় বুনবুন, আর অমনি তার কোলের ওপর বিছিয়ে যায় ঘন নিবিড় সবুজ গাছে গাছে গাছাগাছি আম্রমুকুলের গন্ধে সুবাসিত এক কানন, যার শেষ নেই, বিঘার পর বিঘা সে চলেছেই, চলেছেই, সেই ছায়ায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেলা করছে তার মতো, তার চেয়েও ছোট শিশুরা, কেউ গাছে চড়ে, কেউ ডালে বসে দুলছে, কেউ ফল কুড়োচ্ছে। এই ছবির আদলটা সে জানে না, সে নেয় খানিকটা সেলফিশ জায়ান্টের গল্প থেকে, খানিকটা তাদের হরিপালের সমৃদ্ধ প্রকৃতি থেকে, অথচ তার মনে হয় এ এক অন্য দেশ, অন্য সবুজ, আরও হাজার গুণ সবুজ, যেখানে ফলে থাকে Zম্বুরা, যা লইয়া ফুটবল খেলা হইবার পারত।

হয়তো ভাদ্রের দারুণ রোদে সে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। কখনও কানুমামা, কখনও হারান, কখনও সে সুতো ধরছে, লাটাই ধরছে একজন, সুতো ছাড়তে ছাড়তে নিপুণ হাতে টান দিচ্ছে, কখনও আলগা দিচ্ছে, ঘুড়ি সড়সড় করে শিথিলভাবে নিচু আকাশ পরিক্রমা করছে, এই বুঝি গোঁত্তা খেলো, এই বুঝি... না, চমৎকার শাঁ শাঁ করে উঠে যাচ্ছে তাদের ঘয়লা। তাদের ঘয়লার সঙ্গে পশ্চিম দিক থেকে উঠে-আসা বামনাটার প্যাঁচ লেগে যাচ্ছে, সুতো ছাড় সুতো ছাড়—বুনবুন, টান দিসনি, যাঃ টানলি তো? ঘয়লা কেটে যাচ্ছে, সাদা-সবুজ ঘয়লা। আকাশ নয়, পদ্মার জল বইছে, সেই আকাশপদ্মার জল দিয়ে অসহায়ের মতো ভেসে চলেছে ঘয়লা, একটা ঘয়লা। না তো। ঘয়লা নয়, একটা ছোট মেয়ের মুখ, মিনু কী? হতে পারে মিনু নয়, কিন্তু মিনুর মতো।

শীতের সন্ধে যখন গুঁড়ি মেরে মেরে বসে উঠোনে আমগাছের তলায়, বাসন মাজার জায়গাটার আশেপাশে, একতলার কলঘরে যাবার পথে, তখন আকাশ বাতাস ফাটিয়ে কে চিৎকার করে ওঠে— 'কাইটা ফ্যালাইসে, স-ব কাইট্যা ফ্যালাইসে রে-এ-এ।' কে ও? মুখ দেখা যায় না, খড়খড়ে চুলে, রক্তে, ময়লায় জমাট বাঁধা একটা পরিচয়হীন মুখ, কিন্তু তার তলায় একটা ধড়, আধা ফর্সা ধড়টা, —তাতে একটা স্তন উর্ধ্ববৃন্ত হয়ে কার দোয়া চাইছে, অন্য দিকটা শূন্য। একস্তনী এক মা। হারানের মা, রাণিমাসিমা। আর কেউ জানে কি না, দেখেছে কি না বুনবুন জানে না, কিন্তু সে দেখেছে, দেখে ফেলেছে। তার চোখ খুব, নজর তীক্ষ্ণ, তীব্র, কুতূহলী, বিশেষত নারীদের স্তন সম্পর্কে, তার ভীষণ কৌতূহল। সেই যে হারাদিদিমার আলগা চামড়ার থলির মতো স্তন সে দেখেছিল, তার পর থেকে সে কতরকম দেখেছে দেখছে, মায়ের ময়দার পুঁটলির মতো, পিসিমার শাঁখের মতো, দিদিভাইয়ের কুলি বেগুনের মতো, কিন্তু একস্তনী কাউকে সে কখনও দেখেনি। বাঁদিকে রয়েছে, ডান দিকে চামড়াটা কুঁচকে, কালো হয়ে বিকট হয়ে আছে, মাসিমা ব্লাউজের মধ্যে একটা ছেঁড়া ন্যাকড়ার বল সেলাই করে নিয়ে পরেন, রোজ। গরমের দিনের দুপুরবেলায় কোথাও কেউ নেই ভেবে তিনি ব্লাউজ খুলে ফেলেছিলেন, তখন বুনবুন, সর্বত্রসঞ্চারী দুপুরবিহারী বুনবুন দেখে ফেলে, মাসিমা আতঙ্কে কাপড়-ঢাকা দিয়ে দিলেন বুকে। তারপর বললেন—ভয় পাইসস্? জন্ম হইতে তুমার মাসিমা এমুন নয় বুনবুন, উরা কাইটা দিসে।

এ কী আতঙ্ক? এ কী বিকট ত্রাসের করাল ভয়াল মূর্তি! কাটা মুণ্ড সে কল্পনা করতে পারে, কেন না মা কালীর গলায় থাকে মুণ্ডমালা, হাতে চুল ধরে একটা কাটা মুণ্ড ঝুলিয়ে রাখেন তিনি। ডাকাতের বইতে, ইতিহাসের বইতে সে এ-ও পড়ে থাকে— ঘ্যাচ করে তরোয়াল চালিয়ে মুণ্ডু কেটে ফেললো কেউ কারণ, শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে মুণ্ডু রণক্ষেত্রে গড়াগড়ি খাচ্ছে— এমনটাও সে কল্পনা করতে পারে। কিন্তু স্তন? নারীর, মায়ের স্তন? কে কাটল? কেন কাটল? কেন? কেন? কেন? অসাবধানে মুণ্ডু কাটতে গিয়েই কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাঃ স্তন খুব সুরক্ষিত, নিরাপদ আশ্রয়ে থাকে, বুনবুনের মতো কৌতূহলী পাকা ছেলে ছাড়া আর কেউ তাদের দেখতেই পায় না, তা হলে? তা ছাড়া 'উরা কাইটা দিসে', এর থেকে কী বোঝায়? ইচ্ছে করে, সাভিপ্রায়ে, কাটবে বলেই কেটেছে।

অতএব ঘুমের মধ্যে বুকে হাত পড়ামাত্র বুনবুন মাসিমা হয়ে যায়, হারানের মা। রুদ্রমূর্তি কোনও আতঙ্ক এসে তার ডান দিকের স্তন কেটে দেয়। স্তন নয়, স্তনরাজি। হাজার হাজার মেয়ে, লক্ষ লক্ষ, সংখ্যা করা যায় না এত একস্তনী নারী। তার মধ্যে তার দিদিভাই, মা, পিসিমা, দিদিরাও কি নেই? আছে। একরকম দেখতে নয়, কিন্তু কেউ বলে দেয় ওই তো ওই তো পমদিদি, ওই যাচ্ছেন দিদিভাই, মা, মা গো! ওই যে মা তার হৃদয়ের অধিশ্বরী মা যাচ্ছেন, সবাই, সব্বাইকার স্তন কাটা গেছে। —'শুনো বুনবুন, কাউরে বলবা না, হঁ্যা?'— মাসিমা বলেছিলেন। সে ছোট ছেলে, যুক্তি তো গুছিয়ে বলতে পারে না, কিন্তু তার ছোট্ট করে মনে হয় কেন? কেন? কোনও পাপে তো মাসিমার এমন হয়নি! তবে কেন তিনি সব্বাইকে বলে দেবেন না? কারও ওপর কেউ অন্যায় অত্যাচার করলে কাউকে বলে দিতে হয়, নালিশ করতে হয়। মাসিমা কেন তার অন্যথা করছেন? —'বলব না তো?' —সে কিছু বলেনি, খুব সম্ভব তার চোখের জিজ্ঞাসাটা পড়তে পেরেই গঙ্গুর মতো নিষ্পাপ করুণ বড় বড় চোখে তার দিকে তাকিয়ে তিনি বলেছিলেন— 'নিজেরেই অপয়া অমনিষ্যি লাগে বাবা, তুমি ছুট ছেলে বুঝবা না।'

বুবুও ছোট মেয়ে। যারা কিছুই না বোঝার দলে। কিন্তু না বুঝলেও তাকে বইতে হয়, অনেক ভার অনেক বোঝা। কতটা সেটা বড়রাও তো বোঝেন না। সকলেই বলে জ্যাঠাবাবু বুবুকে বড্ড ভালোবাসেন। যখনই কোথাও বেড়াতে যাবেন মণিমোহন বুবুকে নিয়ে যাবেন। সেইসব বর্মা প্রত্যাগত বন্ধুবান্ধবদের আড্ডায়। বুবু কিছুক্ষণ গল্প শোনে, তারপর সে আশেপাশে বইয়ের র‍্যাক খুঁজতে থাকে। কারও কারও বাড়ি চমৎকার চমৎকার বই থাকে। অনেক ছবিঅলা। সেই বই নিয়ে সে কোনও একটা কোণে বসে থাকে। ইংরেজি তাকে খানিকটা বানান করে করে পড়তে হয়। 'ঠাকুরমার ঝুলি'তে সে পড়ে ক রাজা। তাঁর সাত রানী। বড় রানী, মেজরানী, সেজরানী...। ক রাজাটা কী ব্যাপার কৌতূহল সামলাতে না পেরে সে একদিন পুটপুটদিদিকে জিজ্ঞেস করেছিল— 'কী আশ্চর্য। তুই এখনও এক ভুল করেছিস? আরও ছোটবেলায়ও তুই ক রাজা পড়তিস। এটা 'ক' নয় 'এক'। এই দেখ 'এ'টা বড় করে ছবির মধ্যে লুকোনো আছে। অর্থাৎ কিনা বুবুকে একটা পথ দুবার পার হতে হচ্ছে। তা সে যাই হোক, জ্যাঠাবাবুর বন্ধুদের বাড়িতে বেশির ভাগই ছোটদের বই থাকে না, থাকে ইংরেজি বুক অফ নলেজ। তাতে ছবি আছে। কিন্তু অত মোটা বই বুবু ঠিক কায়দা করতে পারে না। কিছুক্ষণ ওলট-পালট করবার পর তার ঘুম এসে যায়। কেউ তাকে কোলে নিয়ে কোথাও শুইয়ে দেয়। ঘুমের মধ্যে তার গায়ে মাকড়সা হেঁটে যায়। তাকে সাপে ছোবল মারে, ভয়ের চোটে চটকা ভেঙে গেলে দেখে জ্যাঠাবাবু বসে আছেন, —কী হল বুবু? ভয় পেলে? এই তো আমি পাশে বসে রয়েছি।

জ্যাঠাবাবু বুবুকে নিয়ে থাকেন বলে বাড়ির সবাই ভারি নিশ্চিন্ত। বুবুকে নিয়ে যে কী করা যায় তা তো কেউ ভেবেই পায় না। বুনবুন পুনপুনের ভাগে পড়াশুনো, খেলাধুলো, দাদা-দিদিদের ভাগে কত কাজ, কতবার বাইরে যাওয়া, কতবার ক্লান্ত হয়ে বাড়ি আসা, বুবুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাগে শুধু অকারণ ছেলে ভুলোনো আদর আর প্রশ্রয়। সে তো ভগ্নাংশ বুঝতে পারে না, যুক্তাক্ষর নিয়ে সমস্যায় পড়ে, গান গাইতে সে ভালবাসে কিন্তু তার অসামান্য হেঁড়ে গলা, সুর থাকলেও তালজ্ঞান তার আর কিছুতেই হচ্ছে না। কে তাকে অত সময় দেবে? তার চেয়ে জ্যাঠাবাবু তাকে গল্প বলেন—অস্ট্রেলিয়ান ভূতের গল্প, কর্নেল সুরেশ বিশ্বাসের গল্প, লক্ষ্মী স্বামীনাথন আর ক্যাপটেন সায়গলের গল্প, নজরুলের গান, শিশির ভাদুড়ির অভিনয়—আরও কত কত কত। জ্যাঠাবাবুর মাথা ধরে ভীষণ, বুবু তার ছোট ছোট হাতে সেই ধরা কপাল টিপে দেয়, টিপতে টিপতে হাত ব্যথা হয়ে যায়, তখনও জ্যাঠাবাবু 'আর দিতে হবে না' বলেন না। জ্যাঠাবাবুর পা-ও তাকে টিপতে হয়। শক্ত শক্ত মোটা মোটা পা, খুব লোমঅলা।

—তোমার জ্যাঠাইমা আমার পা টিপে দিতেন বুঝলে বুবু? রোজ। এটা আমার একটা অভ্যেস। তবে জ্যাঠাইমা তোমার থেকে অনেক ভাল দিতেন। সে হাতের তারই আলাদা। সতী, সাবিত্রী, সাধ্বী ছিলেন তিনি, মাথায় ডগডগে সিঁদুর নিয়ে চলে গেলেন, বলে জ্যাঠাবাবু দেয়ালে টাঙানো জ্যাঠাইমার অয়েলপেন্টিং-এর দিকে তাকান। —বুবুও তাকায়। সাবিত্রী-সত্যবানের ছবি সে মামারবাড়িতে দেখেছে, সেই সাবিত্রীর সঙ্গে জ্যাঠাইমাকে ঠিক মেলাতে পারে না সে, আর সতীকে তো শিব কাঁধে নিয়ে দেদার ছুটেছেন, এই জ্যাঠাইমা যে বড্ড মোটা, বড্ড ভারী, শিব তো ওঁকে... কিন্তু জ্যাঠাবাবু বলেন— তুমি বুঝলে বুবু পুরোপুরি না হলেও জ্যাঠাইমার মতো খানিকটা; —জ্যাঠাবাবু তাকে এত চটকান যে বুবুর কষ্ট হয়। সে বলে 'উঃ।'

—লাগল? —জ্যাঠাবাবু তাকে এক খিমচি নকুলদানা দেন।

মা খোঁজ নেন না, দিদিরা খোঁজ নেয় না, বাবা খোঁজ নেন না। বুনবুন-পুনপুন মাঝে মাঝে নেয়। সব সময়ে তাদের সঙ্গে খেলতেও যেতেও সে পারে না। ছোট্ট বুবু বর্মার জ্যাঠাবাবুর ক্রীতদাসী। ছোট্ট, অবোধ ক্রীতদাসী এক।

কড়া চুরুটের গন্ধ। চাপ চুপি কাঁচাপাকা বাবরি চুলে জবাকুসুমের কড়া গন্ধ, ড্রেসিং গাউনটা কতদিন কাচা হয় না, তার শুঁটকে গন্ধ... বুবু সইতে পারে না, কিন্তু প্রতিবাদের ভাষা যে তার জানা নেই। নেই কী? সত্যিই নেই?

সবাই খেতে বসেছে। জ্যাঠাবাবু বাবা থেকে পুনপুন বুনবুন পর্যন্ত। মা, পিসিমা, পরিবেশন করছেন মস্ত মস্ত গলদা চিংড়ি সবার পাতে। বুবু দু হাতে চিংড়ির মাথার খোলা ছাড়াতে ছাড়াতে বলল— 'এই জ্যাঠাবাবুর টিনের কোট ছাড়ালুম।' দাড়াগুলোকে সাপটে ধরে ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলে— 'এই জ্যাঠাবাবুর গোঁফ ছিঁড়ছি, চুল ছিঁড়ছি।' তারপর চিংড়ির ল্যাজের দিকটা তুলে ধরে বলে— 'এই জ্যাঠাবাবুর ন্যাজ বেরিয়ে গেছে।'

—বুবু কী হচ্ছে? মা ধমক দেন।

—আরও আদর দাও। —পিসিমা বলেন,

—বুবু অমন বলতে নেই। বাবা বিধান দেন।

জ্যাঠাবাবুর খাওয়া আজ তাড়াতাড়ি চুকে যায়। কোনটা আরও তরিবত করে রান্না উচিত ছিল, কোনটা উতরে গেছে, কোনটার 'তা তাঁর' স্বর্গত স্ত্রীর মতন হয়নি, সেই মন্তব্যগুলো অসমাপ্ত রেখে তিনি উঠে যান। তার আধ-খাওয়া পাতের দিকে তাকিয়ে বাবা, চুক চুক করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আক্ষেপের শব্দ করেন জিভে। বুবু এসব কিছুই দেখে না। সে ততক্ষণে চিংড়ির ল্যাজের খোলটা ছাড়িয়ে ফেলেছে। 'খোলস ছেড়ে জ্যাঠাবাবুর আসল ন্যাজ এইবার তোমার দিকে তেড়ে আসবে বুবু বলে দিচ্ছি কিন্তু।' আপন উপকথায় আপনি মগ্ন বুবু।

এইবার দেবহূতি কেমন অদ্ভুত ভয়-পাওয়া চোখে চেয়ে থাকেন বুবুর দিকে। পমপমদিদি খাওয়া থামিয়ে দিয়েছে, সে কড়া চোখে বুবুকে দেখছে।

খাওয়ার শেষে বাড়ির পুরুষদের অলক্ষ্যে, অজান্তে পমপমদিদিদের তিনতলার ঘরে দেবহূতি আর তাঁর বড় দুই মেয়ে মিলে ছোট মেয়ের বিচারসভা বসান। দরজার অন্তরালে কী সওয়াল জবাব চলে কেউ জানে না। কিন্তু দেবহূতি সেদিন খান না। রাত্তির থেকে বড় দুই মেয়েও খায় না। বুবুকে নিয়ে বুজবুজদিদি মামারবাড়ি চলে যায়।

দুদিন লাগাতার উপবাসের পর মনোরমা দুগ্‌গিকে জানাতে বাধ্য হন দেবু এবং পম, টম খাচ্ছে না।

—সে কী? কেন?

—ওরা বলছে, মণি এ বাড়িতে থাকলে ওরা জলগ্রহণ করবে না।

দুর্গাপ্রসাদ এত ধাক্কা কখনও খাননি। এ কী প্রহেলিকা! কিন্তু তাঁর স্ত্রী কোনও কথারই জবাব দেন না।

—খাওয়া-দাওয়া নিয়ে বড্ড খিচির-মিচির করে বলে?

—না।

—যা টাকা দিচ্ছে কুলুতে পারছ না তাতে?

—ছিঃ।

—না, সত্যিই ওর খাঁই বড্ড বেশি। খিটখিটেও খুব।

—ও সব না।

—তবে?

—আমি উচ্চারণ করতে পারব না সে কথা, আমার মেয়েরাও পারবে না। তুমি আর দিদিমণি ঠিক করো কী করবে।

মনোরমা বললেন, বলতে লজ্জা করে ঘেন্নাও করে দুগ্‌গি ও মণির একটু বাথরুমে, জানলায় উঁকিঝুঁকি দেওয়া অব্যেস আছে, পাশের বাড়ির অবিনাশবাবুর পরিবারও রাগ করছিলেন। তো সে তো আমিই মেয়েদের কবেই সাবধান করে দিয়েচি। আমাদের বুবুমণিকে ওরা মায়ে-ঝিয়ে ঘর বন্ধ করে কী যে মারধর করল, তার পর বারো নম্বরে বেয়ানের কাছে... বলতে বলতে মনোরমা চুপ হয়ে হয়ে গেলেন। তাঁর মুখ নিচু হয়ে গেল, ঠোঁট বেঁকে গেল। শুদ্ধান্তঃপুরচারিণী, জন্মশুদ্ধা তিনি তাঁর নিজেরই বিবেচনায়। এখন বৃদ্ধ, কিন্তু একদিন অল্পবয়স্কা কিশোরী ছিলেন, ছিলেন সেজমার অনন্ত পাহারায়, যা কুটিল, কুৎসিত, বিকৃত তা সহসা বুঝতে তাঁর একটু অসুবিধে হয়। কিন্তু সত্যটা এখন লোহার ফলার মতো বিঁধে গেল তাঁর বুকে। তিনি বলে উঠলেন— 'তাড়া দুগ্‌গি, এখ্‌খুনি তাড়া ওই মুখপোড়া মিনসেকে। নইলে আমি ওবাড়ির পাকুমার মতো প্রায়োপবেশনে বসব।'

দুর্গাপ্রসাদ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তিনিও বুঝেছেন। তাঁর বুক ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। তাঁর ছোট মেয়েটা, অবোধ, অবোলা... ইসস্‌স্‌। মেজদা বলে এই লোকটা যখন বর্মা থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসে সেজমা বলেছিলেন— সংসারে তৃতীয় ব্যক্তির অধিষ্ঠান ভাল নয় দুগ্‌গি।

শিবপ্রসাদ প্রতিবাদ করেন— মেয়েমানুষ মানেই বড্ড ছোট মনের হয়। ছোটগিন্নি তোমার থেকে এটা আশা করিনি কিন্তু। এত পড়াশুনো করো...

—পড়াশুনো করি বলেই চোখ-কান বুজে সংসারে থাকি মনে করো নাকি? তা ছাড়া হয়তো পড়াশুনো করি বলেই একটু জ্ঞানগম্যি হয়েছে। মণিমোহনের কতটুকু-বা আমরা জানি। এক বংশ হলেও এক পরিবার নয়। তা ছাড়া ওর তো পয়সাকড়ির অভাব নেই শুনছি। একটা বাড়ি ভাড়া করে ঝি-চাকর রেখে থাক না। তোমরা খোঁজখবর রাখবে।

সেজমার কথা শিবপ্রসাদ বা তাঁর ছেলে কারওই ভাল লাগেনি। দুর্গাপ্রসাদ দীর্ঘশ্বাস ফেল ন। কৃতঘ্নতার কোনও বাঙাল-ঘটি নেই। অপ্রিয় কর্মটি তাঁকেই করতে হবে। কী ভাবে করবেন?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ষষ্ঠ অধ্যায়

ডার্ক নাইট অফ দা সোল-১

শূন্যতার ধারণা আছে আপনাদের? একটা বিশাল ঘুরন্ত শূন্যতা! যত দূর চাও ধু-ধু করছে কিছু নেই। অনেক অনেক দূরে কিছু ধূমল উচ্চাবচ রেখা দেখা যায় বটে, কিন্তু তা-ও সম্পূর্ণ ন্যাড়া, অস্পষ্ট। আহ্বান করে না তেমন। কোনও আশ্রয়ের সন্ধানও দেয় না। মেনিনজাইটিসের জ্বরের ভীষণ ঘোরেও সে একা ছিল না কিন্তু। পক্ষীরাজ ঘোড়া ছিল, সন্ন্যাসীঠাকুর ছিলেন, কালপেঁচা বিছে এরা দুশমন তবু তো চেতন প্রাণী,— ছিল রাক্ষস খোক্কস দৈত্য দানা, তাদের সঙ্গে প্রাণপণ সংগ্রাম ছিল। কিন্তু এখন নিঃশব্দ নিশ্চল নির্জন নিশ্চৈতন্য দিয়ে তৈরি এক মহাশূন্যে সে একা। মামারবাড়িতে সে তো কতই এসেছে, এসেছে থেকেছে, সে তো খুব ভালবাসে মামারবাড়ি আসতে, কিন্তু এ আসা তো আসা নয়, নির্বাসন। ছোট্ট বুবু বুঝতে পারছে না তার হাওয়া-বদল করা হয়েছে। অপ্রীতিকর অনেক কিছুর থেকে আড়াল করবার জন্যেই তাকে মামারবাড়িতে পাঠানো হয়েছে। জীবনে একবার মাত্র পুনপুনের সঙ্গে কোনও খেলনার অধিকার নিয়ে মারামারি করায় বাবা তাকে তুলে আছাড় মেরেছিলেন। 'তুলে আছাড়' বাবা কথায় কথায় বলতেন। কিন্তু সত্যি সত্যি কি আর আছাড় মারা সম্ভব? সে এক কংসরাই পারে। বাবা একবার শূন্যে তুলে, শোঁ করে মাটিতে নামিয়ে দিতেন, দাঁত কিড়মিড় করছেন এদিকে। এই হল গিয়ে তুলে আছাড়। কান ধরে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকারও প্রচুর অভিজ্ঞতা তার হয়েছে। কিন্তু দরজা বন্ধ করে মা এবং দিদিরা তাকে নানা খুঁটিনাটি জিজ্ঞেস করবেন, সে কেন এসব কথা আগে বলে দেয়নি বলে ভীষণ ধমকাবেন, চুলের ঝুঁটি ধরে পিঠে দুই থাপ্পড় দেবেন মা, পমপমদিদি কান মুলে দেবে কড়কড়িয়ে, টমটমদিদি যে তার শেষ আশ্রয় এমন কি সে-ও তাকে নিষ্ফল ক্রোধে মারবে, এসব তো সে কল্পনাও করতে পারে না। সে তো বুঝতে পারেনি থাপ্পড়টা মা নিজের গালেই মারছেন। পমপমদিদি টমটমদিদি মারছে কোনও এক ভিলেনকে, কুচি-কুচি করে যাকে কাটলেও তাদের রাগ যাবে না—এত কিছু তার অপরিণত মগজে ঢোকা তো সম্ভব নয়। সে সুতরাং পরিত্যক্ত। আর কোনওদিন মাতৃমুখ দেখবে না, আর কোনওদিন সেই প্রিয় পরিচিত সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করবে না, পিতৃপরিচয় নেই তার।

বুজবুজদিদি তাকে পৌঁছে দিয়ে সে-রাতটা থেকেছে। তার পাশে শুয়ে শুয়ে গান করেছে—'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।' বুবুর মনে হল বুজবুজদিদি কথাগুলো তাকেই বলছে। সে ডাকবে, কেউ আসবে না। বুনবুন-পুনপুনও না, তাকে একলা চলতে হবে। কেউ ফিরে চাইবে না। সব্বাই মুখ ফিরিয়ে নেবে, কাঁটাঅলা পথে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে, তার পা কেটে যাবে তবুও তাকে চলতেই হবে, চলতেই হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলে যাবে সে দূরে তার পরিচিত প্রিয়জনদের কক্ষপথ ছেড়ে কোন দূর নীহারিকায়... 'তবে বজ্রানলে আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চলো রে...' এ গান তুমি কেন গাইলে বুজবুজদিদি? কেন গাইলে? পিসিমা বলেন খুব পাপ করলে তবে বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়। বজ্র যদি বুকের পাঁজরের ওপর পড়ে তখন তো বুবু মরেই যাবে? নাকি সে পাপী বলেই তার পাঁজরগুলো জ্বলবে, আর সেই জ্বলন্ত পাঁজর নিয়ে তাকে চলতে হবে আমৃত্যু?

তুমি? তুমিই বা কেন এ গান লিখলে রবি ঠাকুর। তুমি অতদিন আগে জানতে পেরেছিলে একটা ছোট্ট মেয়েকে তার জীবনের সারসত্য শোনাতে হবে, জানাতে হবে, এক নির্মম দিকশূন্য মুহূর্তে? তুমি, একমাত্র তুমিই তবে গেছ ওইরকম অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে? তুমিও একটা ছোট মেয়ে যার চুরুট-খাওয়া, জবাকুসুম মাখা, নকুলদানা-দেওয়া, কেঁচে-খেলা একটা বর্মার জ্যাঠাবাবু ছিল যে তোমাকে অকথ্য পাপে লিপ্ত করেছিল, আর তুমি পিতা-মাতা-দাদা-দিদি কর্তৃক পরিত্যক্ত, নির্বাসিত হয়েছিলে? তাহলে তো রবি ঠাকুর তুমিই একমাত্র আমার বন্ধু হতে পার! রবি ঠাকুরের খোঁজে তখন বুবু যাত্রা করল। আগেই সে চলে এসেছে তার পরিচিত পৃথিবী থেকে অনেক অনে-ক দূরে। বুক ভাঙা এক গান মনে মনে গাইতে গাইতে সে ছুটে চলেছে—'আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চলো সখা, আমি যে পথ জানি না।' গাইছে আসলে বুজবুজদিদি, একটার পর একটা গেয়ে যাচ্ছে। গাইছে তার আপন মনের কী এক শরণাগতির তাগিদে, কিন্তু প্রত্যেকটা গান তার এক বিশেষ অর্থ নিয়ে ধরা পড়ছে বুবুর শ্রবণে, আধ-ঘুমন্ত চেতনায়। সত্যিই কি সে ঘুমোচ্ছে? সত্যিই কি সে ঘুমোচ্ছে না?

ওই দেখো সে চুপচাপ চোখ বুজিয়ে শুয়ে আছে তার বুজবুজদিদির পাশে। তার বোজানো চোখের তলায় শুকনো জলের দাগ। ঘুম নয়, ঘোর। এই ঘোরের মধ্যে বুজবুজদিদির গান তার নিজের গাওয়া গান বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে তার কাছে। কী অপরূপ টান যে সে দিচ্ছে গলার। এ রকম কণ্ঠ সে কোথায় পেল? এমন করে সে কী করে ডাকতে পারছে তাকে? কাকে ডাকছে? রবি ঠাকুরকে ডাকা দিয়েই হয়তো তার ডাক শুরু হয়েছিল। কিন্তু রবি ঠাকুরের পুরো চেহারাটা চেতনায় ধরা দিতেই তার অন্তর কেমন গুটিয়ে যায়। জোব্বা পরলে সব মানুষকেই কেমন একরকমের দেখায়। চিলিবিলি জোব্বার মতন অত খারাপ না দেখালেও ভাল না, ভাল না একদম। সেই যে ছবি আছে রবি ঠাকুরের রুপোলি দাড়ি, রুপোলি চুল, চোখের তলায় একটু দুঃখী-দুঃখী কালি? সেই মুখটার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে বুবু কিন্তু দেহকাণ্ডহীন মুণ্ড কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকবে, কুয়াশায় মিলিয়ে যায়। তারপর ভেসে ওঠেন একজন সোনালি চুলের সোনালি দাড়ির মানুষ, কিন্তু হায়! তাঁর মুখ বুকের ওপর নত হয়ে পড়েছে, চোখ দুটি দেখা যায় না, টপটপ করে রক্ত পড়ছে তাঁর টান-করে বাঁধা দুই হাতের তালু থেকে, জড়ো করা দুই পায়ের পাতা ফুঁড়ে। এই মানুষ, বড় মানুষ হয়েও যিনি বালকের মতো অসহায়, তাঁকে তো তাকেই আশ্রয় দিতে হবে, উনি আর বুনবুন-পুনপুন তো একই? পুনপুন-বুনবুনের হাত পায়ের রক্ত সে ছাড়া কে মোছাবে আর? ঠাকুমার টেবিলের বেলেপাথরের বুদ্ধমূর্তি দশ মানুষ সমান উঁচু হয়ে এবার দূরে দেখা দেয়। ছোট মেয়েটি সেই কোলে আশ্রয় নেবার জন্য তাঁর পাদপীঠ বেয়ে উঠতে থাকে, উঠতে থাকে, রক্তমাংসের স্পর্শ পায় না। হিম-ঠাণ্ডায় তার অন্তরাত্মা জমে যেতে থাকে, আর সেই পাথরের দেবতার কোলে সে যখন পৌঁছয় তখন সে বুঝতেই পারে না সেটাকে কোল বলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কতকগুলো বিরাট পাথরের ভাঁজ, তার মধ্যে একটা পিঁপড়ের মতো হারিয়ে যায় সে।

আর ঠিক সেই সময়ে বুজবুজদিদি রিনরিন করে গেয়ে ওঠে—'শুধাই আমি পথের লোকে/এই বাঁশিটি বাজালো কে/নানান নামে ভোলায় তারা, নানান দ্বারে বেড়াই ঘুরে।'... ঘোরের মধ্যে তখন নীল নীল ঝলক আসে। নীলাভ দ্যুতির ঢেউ। আকার নিতে নিতেও নেয় না, নীল মেঘের মতন, নীল কুয়াশার মতন, নীল জলের ফোয়ারার মতন ভেসে যায় জমাট বেঁধে যায়, উৎসারিত হয়। অদ্ভুত সুর ছড়িয়ে পড়ে সে নীলের মধ্যে থেকে। তখন সে আর দৌড়য় না, ওড়ে। নীচে পড়ে থাকে তার ঘাটা আঘাটা নিয়ে আকাট পৃথিবী। সে শূন্য দিয়ে পাল উড়িয়ে দাঁড় বেয়ে ডানা ঝাপটে উড়ে গিয়ে সেই নীল মেঘের বুকে নিজেকে হারিয়ে ফেলে।

এখন, বুবু যে সত্যি-সত্যিই কাউকে চিনতে পারছে না, এটা অনেকক্ষণ কেউ বোঝেনি। প্রথমত সে সকালে অনেক বেলা করে উঠল। তাদের বাড়িতে সবাই ভোরে ওঠে। একমাত্র সুযযির একটু গড়িমসি করা অভ্যেস। অনেক সময়ে তার দিদিরা বোনেরা তার কানের কাছে কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে তাকে ঘুম থেকে তোলে। কেউ জানে না সে রাত জেগে তার ল্যাবরেটরি ঘরে পড়ে আর দিনের বেলায় চাকরি করে। তাই তার বেলা হয়। বুবু পুনপুন যদি সাতটা বাজিয়ে ফেলল উঠতে তো টমটমদিদি তুলতে এলে পমপমদিদি রাগ করে বলবে 'ঘুমোক, দেখা যাক কত ঘুমোতে পারে। আটটা অবধি ঘুমোক।' সেই বুবু যখন বেলা নটাতেও পাশ ফিরে শুলো, দিদিভাই বললেন—'ওকে এবার ডেকে দে তো শ্রদ্ধা, খাবেদাবে না?'

ঘুম থেকে উঠল বটে বুবু কিন্তু বসে রইল এক কোণে জড়সড় হয়ে। বুনবুন মাজনের কৌটো হাতে করে তাকে সাধতে লাগল—'যা বুবু মুখ ধুয়ে আয়।' একটু পরে সে অনিচ্ছুকভাবে উঠল, নীচে কলতলার দিকে না গিয়ে সদরের দিকে যেতে লাগল। বুনবুন সঙ্গে ছিল, বলল—'কোথায় যাচ্ছিস, এই বুবু। এখনই কি বাড়ি যাবি নাকি?'

দিদিভাই আদর করে বললেন—'যাও দিদিভাই মুখ ধুয়ে এসো, চান করে এসো।' বুনবুন সঙ্গে করে তাকে কলতলায় নিয়ে যায়। চান করে এসে সে অবশ্য চুপচাপ খেয়ে নিল। তারপর সিঁড়ির তলার ধাপে বসে রইল।

রানিমাসিমা বললেন,— 'যাও বুবু মা, বুনবুনদের ঘরে যাও।'

সে সংক্ষেপে বলল—আমি তোমাদের বাড়ি চিনি না।

দু দিন ধরে সবাই ভাবছে বুবুর বড্ড অভিমান হয়েছে, তাই এমন চিনি না জানি না করছে, ডাকলে সাড়া দিচ্ছে না, তৃতীয় দিনে যখন দাদাভাইয়ের ডাকেও সে সাড়া দিল না, তার চোখের শান্ত শূন্য দৃষ্টি দেখে দিদিভাই বললেন—'কানু শিগগিরই একবার ওবাড়ি গিয়ে তোর জামাইবাবুকে ডেকে আন তো।'

বাবা দেখে শুনে কানুকে আবার পাঠালেন—মাকে ডেকে আনতে। এমনিতেই দেবহূতি ছোট মেয়েকে ছেড়ে বেশিদিন থাকতে পারেন না। আজকে আসবেনই ভেবেছিলেন। বুবু মাকে চিনতে পারল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুবু কে সে জানে না। যিনি বলছেন তিনি তার মা, তাঁকে তার খুব চেনা-চেনা লাগছে, কিন্তু সে ঠিক মনে করতে পারছে না। বাবাকে, দাদাভাইকে দেখলে সে ভয় পাচ্ছে।

শীত চলে যেতে শুরু করেছে এখন। হাওয়ায় একটা সিরসিরোনি। শীতের ধুলোর পরত গাছে গাছে, পাঁচিলে, জানলার কার্নিশে জমে জমে কেমন মলিন করে দিয়েছিল সব। এইবার উড়ে যেতে শুরু করেছে। ফাল্গুনের গোড়ায় একদিন বেশ ভারি বৃষ্টি হল। বৃষ্টিটা পাঠানো হয়েছিল ধুলো-ময়লা সাফ করবার জন্য, হাওয়ায় মিশে থাকা ধোঁয়া কালি কয়লার গুঁড়ো সব এক এক ঝাপটে মাটিতে ফেলে স্রোতের বেগে সব ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। গুঁড়ি গুঁড়ি পাতা বেরোচ্ছে গাছে গাছে। সারাদিন একটা মন-কেমন-করা রোদ, মন-কেমন-করা হাওয়ায় পৃথিবীর যতেক প্রাণীর মন হুহু করতে থাকে। কেউ যেন কারও নয়। আসল আপনজন, ভালবাসার নির্ভরের মানুষ কোথায়, কত দূরে, কিসের যেন আড়ালে হারিয়ে আছে। তোমার আসল বাড়ি, আসল জায়গা এখানে নয়। সন্ধের অন্ধকারে তার ভয় করে না। ছাতে উঠে সে রুপোর গুঁড়ো-ছড়ানো আকাশটার দিকে চায়। চেয়েই থাকে, চেয়েই থাকে। ওই আকাশই যেন তার একমাত্র চেনা। তাকে বলে দিতে পারবে সব হারানো কথা, লুকোনো কথা।

তুমি কি বলে দেবে আমি কে? কে আমি? কোথা থেকে এসেছি? কেন এখানে আছি? এই যে আমার চারপাশের মানুষরা... ওরা কারা? কোথায় ছিল? হঠাৎ কেন হাজির হল আমার চোখের সামনে? ওরা কেউ আমাকে বলছে বুবু, কেউ বলছে বিদ্যা। সেই যে একজন কপালে সিঁদুর-টিপ পরা, মাথায় ঘোমটা মানুষ এসেছিলেন। কত সুন্দর, অথচ তাঁকে দেখে তার কেমন ভয়-ভয় করছিল। উনি ওকে ডাকছিলেন বিদ দা! বিদ দা! কী অদ্ভুত ডাক! আমি বিদ্দা নই। বিদ দা হতে চাই না। উনি কত করে বিদ দাকে নিজের বাড়ি নিয়ে যেতে চাইলেন, কিন্তু সে তো বিদ্দা নয়, কেন যাবে? তার চেয়ে এই মাসিমা বলে মানুষটি, দিদিভাই বলে মানুষটি, ওই দুটি ছোট ছোট ছেলে গৌর নিতাই দুই ভাই আবার যেন দেখা পাই। হারান বলে ওই খোকাটা... এরা তাকে আশ্রয় দিয়েছে, আত্মবিস্মৃত একটা মানুষকে, এই আশ্রয় আঁকড়ে পড়ে থাকা ভাল। তবে সে যাবে, চলে যাবে, নিজের নামটা মনে পড়লে, নিজের বাড়ির ঠিকানাটা মনে পড়লেই সে চলে যাবে। তেমন তেমন হলে, পুলিশকে বলবে পৌঁছে দিতে। পুলিসরা সব জানে।

ঋতি আর শ্রদ্ধা, তার পুটপুটদিদি ও বুজবুজদিদি পালা করে তার ওপর নজর রাখে। দুপুর বেলাটায় অবশ্য তারা থাকে না। রানিমাসিমা তার সঙ্গে গল্প করেন।

—ধলেশ্বরীর নাম শুনছ, খুকু?

—ধলেশ্বরী? সে কে?— সে মাথা নাড়ে।

— সে এক নদী আছিল। সেই নদী আমার বাপের ঘরের নদী। কথা কয়। ফিসফিস কইরা খলবল কইরা কত্ত কথা, আমি যখন তুমার মতো ছুট্ট তহন হইতে ধলেশ্বরীর লগে লগে ঘুরি। বরো ভাব ছিল দুই জনার। এমুন ফাল্গুনের বেলায় ডুরি শারি জরাইয়া, আঁজলা-ভইরা কুল, ছম ছম ঝুম ঝুম কইরা নদীর পারে পারে ছুইটা সারা হইতাম।

—বর্ষা আইলে ম্যাঘে জলে এক্কেরে এক হইয়া যাইত। গুমুর গুমুর ম্যাঘের ডাক। ভয়-ডর কারে কয় জানতাম না খুকু। হামা দিয়া দিয়া জল ঘরের গলিতে ঢুইক্যা পরত, তহন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার সোনাদাদা নাও ভাসাইত....

পুনপুন থাকলে অমনি বলে—আমি এই গল্প শুনেছি মাসিমা। পাকুমাদের দেশ। আপনি পাকুমাকে চেনেন? সুভগা, না না ধরিত্রী দেবী?

—আমাদের দ্যাশের? ধরিত্রী? দুইটা ভাই আছিল কি?

—হ্যাঁ হ্যাঁ।

—চার বুন, বরোটি ধরিত্রী, বাপের দুই বিয়া....

—না না, পুনপুন হতাশ হয়ে বলে— পাকুমার খালি দুই ভাই সরল আর সুন্দর।

আমি কি তবে সুভগা? —সে ভাবে। আমার দুই ভাই সরল-সুন্দর এরা দুজন? এরা বলছে এরা নাকি আমার ভাই। তা হলে এমন হেঁয়ালি করছে কেন? সরল সুন্দর তো ওদেরই নাম। কিন্তু সে নিশ্চিত হতে পারে না।

রানিমাসিমা বলেন—বুঝলা খুকু, আমাগ উঠানখান এত্ত বরো যে ছুটকালে উয়ারে আমরা তেপান্তরের মাঠ বানাইতাম। উঠানের তিন দিকে কত্ত ঘর, কত্ত ঘর, হেঁশেলঘর আছিল দুইখানা। ঠাকুমা, খুড়িমা আঁশ হেঁশেলে খাইতেন না। বামুনের বিধবার বরো বিচার। নারকেল চিরা বানাইতেন, পাটিসাপটা, পাটিজ্বরা অত ভাল আমরা পারি না। পিঠার দিনে শুধু পিঠা-পায়স শুধু পিঠা-পায়স। প্রথম পিঠাখান কাকরে দেওয়া হইত। কত উৎসব। কত খাওন-দাওন। ঘরের মইধ্যে ইট দিয়া উঁচু করা পালং। তাকে হাঁড়ি কুড়ি বাকসো। ঘর ভইরা কী বাস, আজও সেই বাসে মন উতলা হয়।

সে অমনি দেখতে পায় ধলেশ্বরী নদী বয়ে যাচ্ছে, জলের ওপর রোদ চিকচিক সে ছুটে যাচ্ছে। ডুরি শাড়ি কিন্তু পরেনি সে। পরেছে একটা ফ্রক, সাদার ওপর লাল ফুটি ফুটি দেওয়া ফ্রক। ওই তো সে দৌড়ে ঢুকলো বাঁশের ফটক খুলে, ভেতরে কত্ত বড় উঠোন। একদিকে মোরগঝুঁটি ফুলগাছ। একটা সাদা বেড়াল লাফিয়ে পালিয়ে গেল। তা হলে কি এইটাই তার বাড়ি? তার মা, তার বাবা কখন সেই ঘরের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসবেন ভেবে সে উদগ্র হয়ে অপেক্ষা করে। কিন্তু কোনও মানুষজন সেই বাড়ি থেকে বার হন না। তারও আর আপনজনদের চেনা হয় না।

মাসিমা বলেন— কী জিগাইলা? আমার মা? মা খুব রোগা ছিল। গোরাও খুব। নাকে একখান লাল পাথরের নাকছাবি। বাপে ছিলেন হাট্টাকাট্টা। তিনখানা গাঁয়ের পূজা-অর্চন, জমি-জিরাত দেখাশুনা সকলই একলা করতেন। খুড়ামশায় গত হন তো!

নাঃ খুব রোগা, নাকছাবি পরা কোনও মা, কিংবা হাট্টাকাট্টা জোয়ান কোনও বাপের কথা সে মনে করতে পারে না।

তবে শেষ দুপুরের দিকে রানিমাসিমার বিছানায় সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। যখন ঘুম ভাঙে তখন সূর্য ডুবে গেছে শাঁখ বাজতে শুরু করেছে। বুজবুজদিদি কলেজ থেকে সোজা বারো নম্বরে চলে এসেছে। সুইচ টিপে ঘরের আলোটা সে জ্বালিয়ে দিতেই বুবু বলে উঠল— বুজবুজদিদি, আমার লাল ফুটি ফুটি ফ্রকটা?

সে দেখল বুজবুজদিদির শুকনো মুখটা হঠাৎ জ্বলজ্বলে হয়ে গেল, চোখগুলো বড় বড়, সে প্রায় এক লাফে বুবুর কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসে তাকে চুমো দিতে থাকল, চুমো দিতে থাকল, চুমো দিতে থাকল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাদার ওপর লাল ফুটকি-ফুটকি ফ্রকটা যেন জীবনবৃক্ষের একটা শেকড়। অচেতনার জলে যে-ই সেটা তার কাছাকাছি এসে পৌঁছলো, বুবু অমনি তাকে ধরে ছেঁচড়ে-মেচড়ে তীরে উঠেছে। ক্ষারের দ্রবণের ভেতর থেকে এখন ফুটে উঠছে একটা স্পষ্ট ছবি—ওই, ওই তো তার মা, ওই তার বাবা, ওই সব দাদা-দিদিরা, পিসিমা, পালক পেছনে একটু অস্পষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে, ঠাকুমা-ঠাকুর্দা, মায়ের কোলের কাছটিতে বুবু-বুনবুন-পুনপুন।

বুনবুন-পুনপুন নাচছে—উচ্ছেগাছে নতুন পাতা বেরুচ্ছেন, বেরুচ্ছেন। একদম বাবার স্টাইলে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সপ্তম অধ্যায়

ডার্ক নাইট অফ দা সোল-২

এই কি বুজবুজদিদির সঙ্গে বুবুর শেষ দেখা? সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিতেই হেসে উঠেছিল বুজবুজের কমলা রঙের ধনেখালি শাড়ি। তাতে সরু কালো দাঁত দেওয়া পাড়। কালো ব্লাউজ। দু বিনুনি দু দিকে ঝুলছে। শুকনো মুখ হঠাৎ হাসিতে ঝলসে উঠেছিল। তারপরেই চুমো চুমো চুমো।

এমন করে আদর করতে এক বুজবুজদিদিই পারে। আর কারও চুমো খাওয়ার অভ্যেসই নেই। টমটমদিদি পমপমদিদির আদর থাকে চোখে, মায়ের আদর ছোঁয়ায়, পিসিমা আদর করবেন ডাক দিয়ে— ভবি, ভবতারিণী, ভবশংকর! একমাত্র বুজবুজদিদিই হঠাৎ পাখির মতো উড়ে এসে চুমো দিয়ে যায়।

—কী করছিস রে বুবু। আপনমনে কী বলছিলি রে তুই। হাত নাড়াচ্ছিলি কেন? বুবুর বাড়িতে বুবুর বন্ধু এসেছে তো। বন্ধুও বটে, প্রতিবেশীও বটে, যেমন মায়ের কাছে আসেন। বসতে দিয়ে পান দিয়েছে সে পাশের বাড়ির গিন্নিকে, তার পরে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কথা কইছে।

—তা যা বলেছেন! হ্যাঁ-অ্যা। আমারও তো বাসন মাজার লোক নেই। কী কামাই! কী কামাই। ... তাই তো... ছেলেরা এলো হলো খেতে দিই... ওই আরকি। আপনার ছেলে পাস করেছে? আমার ছেলেরা তো পাস করেনি।

ছেলেরা পাস না করার গর্বে সে মুখটাকে ঘুরিয়ে একটু মুচকি হেসেছে, কী বুজবুজ দিদি দেখে ফেলেছে।

—কী এত বকছিস রে বুবু? নাঃ তুই আর বড় হবি না।

চুমো চুমো চুমো।

চার নম্বরে এসে প্রথমটা তার লজ্জা লজ্জা করে। অনেক অনে-ক দিন পর বাড়ি আসছে কি না! এত লজ্জা করে যে চোখ মাটির থেকে তুলতে পারে না সে।

সঙ্গে এসেছেন দিদিভাই; কানুমামা, কুনকুন।

মা দিদিভাইয়ের সঙ্গে একটা দুটো কথা বলেই কেঁদে ফেললেন। দিদিভাই বললেন— কাজটা ঠিক হল না দেবু। মোটেই ঠিক হল না।

মা তাকিয়ে আছেন দিদিভাইয়ের দিকে। দুজনেরই মুখ থমথম করছে। বুবু মাকে জড়িয়ে ধরে। মায়ের কোমর একটু ছাড়িয়ে তার মাথা। সে বলে— মা, এই তো আমি এসেছি!

সে এসে গেছে অথচ মা কেন কাঁদবেন তা সে বুঝতে পারে না।

—ওঁকে তো জানো! যা গোঁয়ার! মা বললেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—ডাক দুগ্‌গাকে— দিদিভাই বেশ কড়া গলায় বললেন।

মা বললেন— কানু যা তো এদের নিয়ে। যা ছাতে যা। জামাইবাবুকে ডেকে দিয়ে যাস।

ছাতে তখন গোধূলি। পুটপুট একলা দাঁড়িয়ে আছে। পাঁচিলের ধারে। অথচ গোধূলি হল বুজবুজের, একমাত্র বুজবুজের। এই সময় থেকেই সে আঁচল দুলিয়ে চুলের বেণী উড়িয়ে গুনগুন করতে আরম্ভ করবে। 'আকাশে পঞ্চদশীর চাঁদ', গাইবে সে, 'বাতাসে বেতসফুলের গন্ধ ভেসে আসে/ কিছুখন বসবে এসো আজ এখানে এই বিজনে একটু আমার পাশে।' গাইতে গাইতে হয়তো একটু দাঁড়াল পাঁচিলের পাশে, হাতের কাচের চুড়িগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল, পাঁচিল থেকে ঝুঁকে দেখল একটু রাস্তা, আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে সব। বাতিওয়ালা কাঁধে মই নিয়ে বাতি জ্বালতে জ্বালতে আসছে। ওদিকে র‍্যাশনবাবুদের বাড়িতে ঠাঁই ঠাঁই মার আর চিল-চিৎকারের আওয়াজ শোনা গেল। বুজবুজ বিরক্ত হয়ে ডাকে ঋতি এই ঋতি-ই!

—কী বলছ।

—পুঁচকেগুলোকে নিয়ে আয় তো একবার।

বুবু-পুনপুন-কুনবুন-কানু সব হাজির।

—এই গা তো গা, জোরে গাইবি— 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে/ লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার।' মার্চ কর, মার্চ করতে করতে গা।

বুজবুজদিদিকে দেখা যাচ্ছে না। নিজের অজান্তেই রুপু সন্ধে হলে বুজবুজের গানের জন্যে কান পেতে রাখে। আজকে বুজবুজ গাইছে না, আছে কোথাও। কী করছে কে জানে!

টমটম একবার এসে দাঁড়াল। বুবুর দিকে চেয়ে দেখল— বুবু, দিদিভাইয়ের কাছে কী খেলি রে?

পমপম শাঁখ হাতে করে উঠে আসছে।

বুবু বলল— মাসিমা করেছিলেন— নারকেল-চিরা, গোকুল পিট্‌ঠা, পাটি জরা...

—ওমা কী সুন্দর বাঙাল কথা বলছে দেখো, —ঋতি বলল। একটু হাসি উঠল। তারপরেই সব চুপচাপ। শাঁখের শব্দ। ঠাকুরঘরে আরতির ঘণ্টা বেজে উঠল, ঠাকুরঘরের সামনের দালানে হাত জোড় করে ছোটরা সবাই দাঁড়িয়ে যায়। অংশুও আসে। ইন্দ্র, পুলক, সুযযি এখনও হয়তো বাড়ি আসেনি। কিন্তু মা আসেন না, বাবা আসেন না, পিসিমা বোধহয় আজকাল আর সিঁড়ি বেয়ে এসে উঠতে পারেন না। আর আসে না বুজবুজদিদি।

পমপমদিদি হরির লুঠ দেয় আর সবাই মিলে গায় :

হরির লুঠ পড়েছে আনন্দের আর সীমা নাই

চাঁদ বদনে হরি বলো ভাই।

হরির লুঠ পড়েছে...

বাতাসার মধ্যে থেকে একটা লাল পিঁপড়ে পুনপুনের জিভে কামড়ায়। সে উঃ করে একটা আওয়াজ দিয়েই চুপ হয়ে যায়।

—বুবু, কী খুঁজছিস রে?

—বুজবুজদিদি কোথায় গেল?

—ও মা জানিস না বুঝি, বুজবুজদিদি বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—কোথায়?

—কোথায়? হাজারিবাগে বোধহয়।

বোধহয়? টমটমদিদি জানে না ঠিকঠাক?

—বন্ধুর বাড়ি আবার কেউ থাকে নাকি? তবে সুদূর হাজারিবাগ হলে তো থাকতেই হয়!

বুজবুজদিদি তাকে সেদিন একবারও বলল না তো কথাটা?

ঋতি স্কুলে যায়, অংশু কলেজ যায়, সুদাদা নাইট কলেজে যায়, টমদিদি ইউনিভার্সিটি যায়। বুজবুজদিদির কলেজ কী করে ছুটি দিল?

—মা, বুজবুজের কলেজ নেই?

—না। ও হ্যাঁ, আছে তো!

মায়ের কী কাজের কথা মনে পড়ে যায়। মা তাড়াহুড়ো করে চলে যান।

বুবু একটা চিঠি লেখে :

বুজবুজদিদি,

তুমি কবে আসবে? তোমার কলেজ বন্ধ হয়নি কিন্তু। হাজারিবাঘে কি বাঘ থাকে? পুনপুনের জিবে পিঁপড়ে কামড়েছিল। পমপমদিদির শরীর খারাপ হয়েছে তাই টমদিদি পুজা করছে। হারমোনিয়ামের বাক্সের ওপর অংদাদা আবার এর জার্সি রেখেছিল। রেশনবাবু রোজ ছেলেমেয়েদের মারেন। বাবার, মার, পিসিমার, ইদাদার, সুদাদার, পুটপুটের, অংদাদার, পুনপুনের, বুনবুনের, টেকনের— সবাইকার তোমার জন্যে মন কেমন করছে। আমার তিনটে বই এসেছে— রাজকাহিনী, বুড়ো আংলা আর আবার যখেন ধন। পুনপুনের আম আটির ভেঁপু আর বুনবুনের ভোম্বল সর্দার। তুমি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিও। আজ ৮০।

ইতি

তোমারই বুবু (বিদ্যা)

চিঠিটা সুদাদাকে দেয় সে।

—খামে ভরে দিও। ঠিকানা লিখতে ভুলো না যেন।

বুবু গেরেস্তারি চালে চলে যায়।

সুযযি চিঠিটা পড়ে তারপর নিজের সবুজ টিনের সুটকেসে রেখে দেয়।

—অংদাদা, পালক কি আবার ছবি আঁকতে গেছে?

—আমি জানি না যা। বড্ড বিরক্ত করিস।

অংদাদা পরীক্ষার পড়া করছে। তার কোনও কথা শুনতে চায় না।

পালক প্রায়ই ছবি আঁকতে কলকাতার আশেপাশে যায়। বিষ্ণুপুরে গিয়েছিল। সেখান থেকে মাটির ঘোড়া কিনে আনে, যে ঘোড়ারা ঘোড়ার মতন দেখতে নয় অথচ ঘোড়ার মতন। পালক গিয়েছিল পালামউ। কত রকম গাছের পাতা এনে দিয়েছিল পুটপুটকে, বুজবুজকে, অংদাদাকে। পালক ফিরলে তাকেই পাঠাতে হবে হাজারিবাঘে বুজবুজদিদিকে আনতে।

এই পরামর্শটাই সে ইদাদাকে দিতে গিয়েছিল। ইদাদা এক ঝটকায় সামনে ফিরে বিরাট একটা চড় তুলল। নামছে নামছে চড়টা, বুবু আবাক হয়ে তাকিয়ে আছে... টম্‌টম ঝট করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চড়সুদ্ধ হাতটা ধরে ফেলল।

—দাদা করছ কী?

কেমন বোকা বনে গেছে বুবু। কাঁদতেও ভুলে গেছে।

ছাতের কোণে বুবুকে ডেকে নিয়ে গেছে ঋতি। চারদিকে তাকিয়ে নিচ্ছে। না ধারে-কাছে কেউ নেই।

ঋতি বলল— বুবু, সেজদি আর আসবে না। কাঁদিসনি।

বুবুর হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে যায়।

—মরে গেছে, বুজবুজদিদি? কোনওরকমে তার মুখ দিয়ে বেরোয়।

—না। সেজদি আর পুলকদা বিয়ে করে চলে গেছে।

পালক? বিয়ে? বুজবুজ? পালক তো বুবুকে বিয়ে করবে! বুবুকে কেউ বিয়ে করতে চাইবে না, তখন পালকই তো তাকে বিয়ে করে নেবে বলেছিল!

হ্যাঁ শোন, আর কাউকে কক্ষনও বোকার মতো ওদের কথা জিজ্ঞেস করবি না। পুলকদা কোথায় যেন আঁকার মাস্টারমশাইয়ের চাকরি পেয়েছে, পেয়ে বাবাকে এসে বলে— সেজদিকে বিয়ে করবে। বাবা বললেন—কী বললে? এখখুনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও। তখন সেজদি বলে—বাবা আমি ওকেই বিয়ে করব। বাবা সেজদিকে এক ভীষণ চড় মারলেন।—চুপ করো। একসঙ্গে ভাইবোনের মতো মানুষ হয়েছ, বিয়ে? ছি ছি ছি! বলছ কী করে? বেরিয়ে যাও পুলক। এখখুনি।

মা বললেন—শোনো, একটু চুপ করো, শ্রদ্ধা বলছে ওরা সিভিল ম্যারেজ করে এসেছে।

বাবা বসে পড়লেন যেন পাথর হয়ে গেছেন। চোখগুলো আগুনের গোলা। —দুধ-কলা দিয়ে কালসাপ পুষেছি? মানসম্মান বলে কিচ্ছু রাখলে না? —পুলকদা বলল—এ কী বলছেন কাকাবাবু, এতদিনের সম্পর্ক সব মিথ্যে হয়ে গেল? আমি কি কোনওদিন আপনাদের কষ্ট দিয়েছি? কোনওদিন মানমর্যাদা নষ্ট করেছি? আমি শ্রদ্ধাকে ভালবাসি এতে খারাপ কী আছে।

—জিভ টেনে ছিঁড়ে দেব তোমার। নাটুকে কথা বলতে শিখেছ? বায়োস্কোপ করছ, বায়োস্কোপ?

—সেজদি কাঁদছিল, বলছিল—ওকে ছাড়া আমি বাঁচব না মা। তোমরা একটু বোঝো, বোঝবার চেষ্টা করো একটু।

বাবা বললেন—কোথায় ম্যারেজ সার্টিফিকেট? ছিঁড়ে ফেলো ওটা। কাজিনে কাজিনে বিয়ে হয় না। তোমার আমি খুব ভাল বিয়ে দেব শ্রদ্ধা।

বাবা গর্জন করছিলেন। সেজদি বলল—তা হয় না বাবা, তা হয় না। আমরা এক। আমাদের আলাদা করা যাবে না।

—তবে বেরিয়ে যাও বুবু, বাবা ওদের এক কাপড়ে বার করে দিলেন। বলতে বলতে ঋতি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

তার বুকের মধ্যে কথাগুলো জমাট বেঁধেছিল। ঠিক যেমন-যেমন শুনেছিল তেমন-তেমন। বলতে পেরে ঋতি হয়তো হালকা হল। বুবু কতটা বুঝবে না-বুঝবে সে সম্পর্কে তার কোনও ভাবনা ছিল না। যতবার বুবু বুজবুজদিদির কথা বলে ততবার সমস্ত বাড়ির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শরীরের পেশী শক্ত হয়ে যায়, কোনওরকমে সেই অস্বস্তি, ভয়ের অবসান ঘটানো দরকার। এমনটাই তার মনে হয়েছিল হয়তো। হয়তো বা!

কিন্তু বুবুর পৃথিবীর হাওয়া হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার চারিদিকে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে সেই অন্ধকারে। পালক...বুজবুজ...বিয়ে...আমি শ্রদ্ধাকে ভালবাসি...দুধকলা দিয়ে কালসাপ...সিভিল ম্যারেজ। বুজবুজদিদি আর আসবে না। কোনওদিন আসবে না। বুজবুজদিদির আর কোনও কাপড় নেই। সবুজ, নীল, কালো, লাল সমস্ত কাপড় পড়ে রয়েছে। সেই কমলা রঙের শাড়ি পরে, কালো ব্লাউজ, দুদিকে দুটো কালো বিনুনি বুজবুজদিদি কোথায় চলে গেছে। তার কাপড়, হারমোনিয়াম, বইখাতা...। পালক...পালক তুমি কোথায় গেলে? আর তুমি 'কেয়া' কাগজ বার করবে না? আর আমাদের সভা হবে না? ইদাদার সঙ্গে তুমি আর বায়োস্কোপ দেখতে যাবে না? বাবা, বাবা, ওদের কে বেঁধে দেবে? কোথা থেকে বুজবুজ আর কাপড় পাবে? পাঁকুদিদির যখন বিয়ে হয়েছিল তখন কত শাড়ি, কত গয়না, কত খাট বিছানা আলমারি সব পাঁকুদিদির বাবা দিয়েছিলেন, নইলে সে পরবে কী? শোবে কিসে? শ্বশুরবাড়িতে তো আর খাট থাকে না, শাড়ি থাকে না। বুজবুজের তো শ্বশুরবাড়িও নেই। কোনও বাড়িই নেই। কোথায় যাবে পালক? কোথায় যাবে বুজবুজ? প্রচণ্ড শব্দে একটা বাজ পড়ল। বুজবুজদিদির পাঁজরে আগুন লেগে গেল। জ্বলছে। সেই আলোয় পথ দেখে দেখে বুজবুজ পথ চলেছে। 'তবে বজ্রানলে আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চলো রে।' বুজবুজের পাঁজরের আগুন লাফিয়ে এসে বুবুর পাঁজরে পড়ে। জ্বলতে থাকে বুকের খাঁচা। লকলকিয়ে ওঠে সে আগুন—বাবা, ও বাবা, তুমি ওদের তাড়িয়ে দিলে কেন? বাবা তুমি ভাল নও, আমি বুঝতে পেরেছি তুমি একদম ভাল লোক নও। মিছেই আদর করো আমায়, তোমার রাগ হলেই তুমি আমাকে তাড়িয়ে দেবে। বাবা, তোমাকে আমি ভালবাসি না। কোনওদিন ভালবাসব না। কোনওদিন না। তুমি চলে যেতে পার। একলা একলা চলে যাও কোথাও, আমার মন কেমন করবে না। তুমি মরে গেলেও আমার কোনও দুঃখ হবে না। কাঁদব না, তখনও আমি কাঁদব না। ও বাবা শুনছ?

বাবা শুনতে পান না। কারো কথা না, নিষেধ না। অনুরোধ-উপরোধ না, সারা সকাল শিয়ালদা স্টেশনে, সারা বিকেল-সন্ধে চেম্বারে, শনি-রবিবারে রানাঘাটে চলে যান, সেখানে নাকি বাস্তুহারাদের ক্যাম্প আছে, সেসব দিনে বাবার চেম্বারে বসাও হয় না। রাতে তারা ফার্স্ট ব্যাচ যখন খেতে বসে, তখন বাবা ঠাকুরঘরে বসে বসে গান করেন,

'ডুব দেরে মন কালী বলে
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন দু চার ডুবে ধন না পেলে
রত্নাকর নয় শূন্য কখ...ন...

শব্দ ঊর্ধ্বগামী। তেতলার ঠাকুরঘরের গর্ভগৃহ থেকে হাওয়া সে-গান উড়িয়ে নিয়ে যায় আকাশের দিকে। দু-একটা শব্দ, দু-এক কলি সুরের মূর্ছনা হঠাৎ লাট খেয়ে নেমে আসে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে, একতলার দালান দিয়ে দিশেহারা স্রোতের মতো ঢুকে পড়ে একবার এঘরে একবার ওঘরে, 'রত্নাকর নয় শূন্য কখন'... আবার ভিন্ন সুরে— 'রত্নাকর নয় শূন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কখন'—একটা লুটন্ত আত্মবিশ্বাস যেন জোর গলায় অস্তিত্ব ঘোষণা করতে চাইছে। তাঁর দিদিমণি উনুনের সামনে বসে রুটি সেঁকতে সেঁকতে কেঁপে ওঠেন, পত্নী ছেলেমেয়েদের পরিবেশন করতে করতে কেঁপে ওঠেন, ছেলেমেয়েরা মুখে গ্রাস তুলতে গিয়ে কেঁপে কেঁপে ওঠে। গান তো নয়, যেন পৃথিবীর বুকের ভেতরকার ফুটন্ত লাভার হুহুঙ্কার, কিংবা আকাশের অনন্ত শূন্যতার হাহাকার।

স্বভাবে তিনি শাক্ত। শক্তি-উপাসক। পারিবারিক আচারে বৈষ্ণব। বজ্রভৈরব এবং কান্তকোমল প্রেমের দেবতা তাঁর মানসপটে অবিরাম অধিকার-রক্ষার কূটযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। এঁর দামামার সঙ্গে ওঁর বাঁশি যায় না। তাই যে মানুষ বাস্তুহারাদের জুতোয় পা গলিয়ে তাদের দুর্গতিনাশক হয়ে ওঠেন, সেই একই মানুষ আপন সন্তানকে উদ্বাস্তু করেন। সমগ্র দেশের প্রতিনিধি হয়ে যিনি গৃহহারাদের আশ্রয় দিতে উন্মুখ, সেই তিনিই আপন পালিত পুত্রর কাছ থেকে কেড়ে নেন আশ্রয়। আর সেই কেড়ে নেওয়ার কষ্টে তিনি যখন গলায় ডমরু বাজান—'রত্নাকর নয় শূন্য কখন দু চার ডুবে ধন না পেলে...' তখন তীক্ষ্ণ প্রাণচেরা এক বাঁশির আওয়াজ সে ডম্বরুর গুরুগুরুতে মিশে থাকে।

তাঁর গলার স্বভাববলিষ্ঠ গান যে সহজসুন্দরী হয়ে সেই সেজমেয়ের গলাতেই আশ্রয় নিয়েছিল। গানের ভিতর দিয়েই তো এই পিতা-পুত্রীর আসল চেনাশোনা। তিনি গাইছেন—

'সব ঘুচালি জ্বালা কালী কালী
ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন মুণ্ডমালা কোথায় পেলি
কালী!'

বুজি এসে বসেছে। —বাবা এ গানটা আমায় তুলে দেবেন?

বড় তিন ছেলে মেয়ে—ইন্দ্র, ঋদ্ধি, ভক্তির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুব বন্ধুত্বপূর্ণ, নিবিড়, প্রয়োজনে তিনি এদের পরামর্শ নেন। সূর্যও মোটামুটি এই শ্রেণীতে পড়ে। ছোট কজন—বিদ্যা, পাবন, বরুণ তাঁর আদরের। অগাধ প্রশ্রয় এদের জন্য তাঁর হৃদয়ে। মাঝেরগুলি—অর্থাৎ—শ্রদ্ধা, অংশু, ঋতি—এদের সঙ্গেই তাঁর সম্পর্কটা অস্পষ্ট। এরা তাঁর সঙ্গে সহজে মেলামেশা করতে পারে না। বাবা এদের কাছে দূরের মানুষ। কিন্তু বুজি যখন গান গাইত, তিনি তো দূরেও থাকতে পারতেন না, অস্পষ্ট হয়েও থাকতে পারতেন না।

একা মোর গানের তরী ভাসিয়ে ছিলেম নয়ন জলে—গান এসে ধাক্কা দিত তাঁকে চেম্বারে। 'হ্যাঁ বলুন, নোনতা ভালবাসেন না মিষ্টি?'

—এই যে বললুম ডাক্তারবাবু, মিষ্টি মিষ্টি

ক্ষণিকের জন্যে হলেও তাঁর চিত্ত গানে লয় পেয়ে গিয়েছিল। রোগীর কথা শুনতে পাননি।

'মহাকালের কোলে এসে গৌরী হল মহাকালী
শ্মশানচিতার ভস্ম মেখে ম্লান হল মার রূপের ডালি ॥'

দুজনে গাইছেন, একটু পরেই বাজি-পোড়ানো শুরু হবে, নিজেদের বাজি শেষ হয়ে গেলে আকাশে চোখ মেলে রাখতে হবে। ছাতুবাবুদের অজস্র হাউই উঠবে আকাশে, একটার পর একটা বিস্ময় ছড়াবে, তার আগে মায়ের বন্দনা সেরে নিচ্ছেন।

আর পুলক? বারো তেরো বছর বয়স থেকে অনাথ ছেলেটাকে বড় করে তুলেছেন তাঁরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে তো তাঁর পরিবারের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গিয়েছিল। কী ভাব! কী ভাব ইন্দ্রর সঙ্গে! কোনওদিন তো বেয়াদপি করেনি। কিন্তু এখন। এখন এত বড় সামাজিক অপরাধ করলে তিনি তো নিরুপায়। ভালবাসা! ছিঃ। লোকে কী বলবে, এক বাড়িতে ছোট্ট থেকে মিলেমিশে বড় হয়েছে! লোকে তো অনেক অনাচারের মধ্যেই স্রেফ ভেবে নেবে।

প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা করল তাঁর মেজদা, দ্বিতীয়টা করল এই পুলক। পরিবারের পবিত্রতার ভেতরে ভাঙন ধরিয়ে দিল। অহরহ এখন আগুন জ্বলছে তাঁর বুকে। গানে গানে তার কতটুকুই বা নেভে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অষ্টম অধ্যায়

‘লেট দেয়ার বি লাইট’

সিংহবাড়ির সব্বাই যে যার মতো বেরিয়ে গেছে, পিসিমা ঝিমোচ্ছেন, মায়ের বুকের ওপর খবরের কাগজ উপুড়, মা ঘুমিয়ে গেছেন। যখন বুজবুজ ছিল সবাই বেরিয়ে গেলেও বাড়িটা ভরা থাকত। কেননা আমাদের চারপাশের আবহমণ্ডল আমাদের কথাবার্তা, আওয়াজ সব নিয়ে সর্বক্ষণ নাড়াচাড়া করে। হয়তো ইন্দ্র আর ঋদ্ধি দালানের এক কোণে দাঁড়িয়ে কোনও তর্ক-বিতর্ক করেছিল, সেইখানটা দিয়ে গেলেই সেই শব্দের রণন তুমি শুনতে পাবে। শ্রদ্ধা গান করত, তাই বাড়ির প্রতিটি কোণ গানে গানে সুরে সুরে ভরা থাকত। হয়তো অংশু-ঋতি ঝগড়া করেছে কোনও তুচ্ছ বিষয় নিয়ে, অংশু ঋতিকে লাগিয়েছে একটা থাপ্পড়, ঋতি অংশুকে একটা গাঁট্টা। সেখান দিয়ে যাও তুমি ‘ঠাস’ ‘খট্’ প্রভৃতি শব্দের ভূত শুনতে পার। কিন্তু এখন সিংহবাড়ির মধ্যে একটা ভ্যাকুয়াম বিরাজ করে। সেখান দিয়ে হাওয়া বয় না বলে কোনও শব্দেরই ভূত অর্থাৎ অতীত স্পর্শ করা যায় না। তা ছাড়া, এখন শব্দের তেমন কোনও বর্তমানও নেই আর। যে যার কাজ করে, কাজের কথা বলে, বাস, আবার কি? শব্দ নেই, কথা নেই, ভাবনা আছে চিন্তা আছে কিন্তু তাদের অবয়ব আরও সূক্ষ্ম। তাই তাদের রেশ বাড়ির হাওয়ায় থাকে কি থাকে না বলা মুশকিল।

সারা সকাল বুবু মায়ের পায়ে পায়ে ঘোরে। ছোট ছোট মাছ এলে সে বাছতে বসে। পুট পুট করে মৌরলা পুঁটির পেট টিপে ভেতরের পোঁটা বার করে দিতে ভারি মজা। চিংড়ির মাঝের খোলাটা রাখবে বুবু, পিঠ চিরে সরু মতন কালো সুতো বার করে দাও। মটরশুঁটি ছাড়াতে বলো, এক বাটি ছাড়িয়ে ফেলবে সে। কুমড়োর বিচি জড়ো করে শুকিয়ে রাখবে। কাঁঠালের বিচি জমাবে, কাঁঠাল বিচি চচ্চড়িতে পড়বে, ডালে পড়বে, মা আনাজ কুটে রাখবেন আর সে জামবাটিতে জল নিয়ে ধোবে। ধুয়ে ধুয়ে সাদা করে ফেলবে সব। তারপরে হবে লাউ কোরা, নারকোল কোরা, চাল বাছা, আটা চালা, সুজি চালা।

টমটমদিদি ডাকবে— বুবু, বুবু।

—এসেছি এই যে।

—এই অঙ্কগুলো করে রেখো।

তা টমটমদিদির টাসক্‌গুলো যথাসাধ্য করে সে। বাস, তারপর গল্পের বই নিয়ে বসে যায়। টঙের জানলার পাশটা তার খুব পছন্দ। চার পাল্লার জানলা। ওপরের পাল্লা দুটো বন্ধ করে নীচের পাল্লা দুটো খোলা রাখে সে, তারপর জয়ন্ত-মানিক বিমলকুমার অপু-দুর্গা রিদয়-খোঁড়া হাঁস, গায়েব-গায়েবীদের পাড়ায় গিয়ে গায়েব হয়ে যায়। পড়তে পড়তে এক সময়ে ঢুল এসে যায়, বইয়ের পাতার ভেতর আঙুল, দেওয়ালে ঠেস, ঘুমিয়ে পড়েছে বুবু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু ঘুমিয়ে টুমিয়ে আবার যখন উঠে পড়ে, তখন তো চোখ তাজা, মাথা পরিষ্কার, হাতে-পায়ে আর আলস্য তো নেই। যখের ধন গুহার ভেতরের অন্ধকূপে পড়ে গেছে, সেই যখের ধন বিমল কুমারের হাতে এলে তারা তা বুবু বুনবুন পুনপুনকে দিত কি না, দিলে কীভাবে সেগুলোর সদ্ব্যবহার হতে পারত : এই সব ভাবতে ভাবতে বুবুকে উঠে পড়তে হবে, এবার চলো, ঘোরো সমস্ত বাড়ি। ঠন্‌ন্ ঠন্‌ন্ বাসন বাজাতে বাজাতে বাসনআলা চলেছে, কাদের বাড়িতে এখনই রান্নাঘরে ঝাঁটা চলেছে, সামনের বাড়ির কার্নিশে পায়রারা বুকে মুখ গুঁজে বকুম বকুম করেই যাচ্ছে... অতএব বুবু একতলায় নেমে নিঝুম রান্নাঘরের নিভন্ত উনুনের গরমে গোটা দুই আলু পুরে দেয়। কিছুক্ষণ পর সাদা হয়ে-আসা ওপর-কয়লা সরিয়ে ভেতর থেকে সে আলুগুলো বের করে। আলুপোড়া তেল নুন দিয়ে খেতে ভারি মজা। আলুপোড়া খেতে খেতে সে উঠোন পেরিয়ে সদর দরজার খিল খোলে। বাড়ির বাইরে রক। রকে বসে বসে আলুপোড়া খেতে খেতে সে শেষ দুপুরকে রাস্তা দিয়ে যাওয়া-আসা করতে দেখবে। শেষ দুপুর আসলে এক ক্লান্ত যাযাবরী-ইরানি বাসনওয়ালি। তার লাল-সবুজ ছাপের কাপড়, হাতের সবুজ-হলুদ কাচের চুড়ি, তার পিঠে পুরনো কাপড়ের বোঝা। মাথার ওপর পদ্ম করে সাজানো থালাবাসনের ঝুড়ির টাল সামলাতে সামলাতে সে ছন্দে হাঁটছে— বা-স্‌ন লিবে গো... বা...সন। তার কণ্ঠ এখন ক্লান্ত, ঝিমন্ত। কিংবা শেষ দুপুর কাঁধ-থেকে হারমোনিয়াম ঝোলানো মাথায় পাগড়ি এক মজার মানুষ, খানিকটা প্যাঁ পোঁ হারমোনিয়াম বাজিয়েই যে উচ্চগ্রামে গান ধরে ফেলে, গানের কলি তার সঙ্গিনীর গলায় ফেলে দিয়ে তবে তার ছুটি, তখন সে আবারও প্যাঁ পোঁ করে দুরন্ত সুরের ঘোড়া তার যন্ত্রে ছুটিয়ে দেবে। সঙ্গিনীর গলা ভাঙা কিন্তু কী যে জাদু সেই দেহাতি গানে, শেষ দুপুর বাড়িগুলোর মাথায় মাথায় চল্লিশ ওয়াটের রোদ, রাস্তার ওপরে নামতে নামতে যা চব্বিশ ওয়াট হয়ে আসে। সেই ফিকে রোদে তার বড় একা লাগে। মন কেমন করতে থাকে। বুজবুজের জন্য, পালকের জন্য, নিজের জন্য, এক হারিয়ে যেতে থাকা বুবুর জন্য। সে রোজ দেখে এক মেয়ে এই সময়ে রাস্তার এক দিক দিয়ে ঢুকে আর এক দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। দেখে দেখে মনে হয় এ নিশ্চয় অন্য কোনও পাড়ার। এ জানে না সে স্কুলে যায় না, অঙ্ক না পেরে অংদাদার কাছে গাঁট্টা খায়। এ জানে না সুযোগ পেলেই পাড়ার মেয়েরা তাকে ঠকায়। সে সাহস সঞ্চয় করে বলে— তোমার নাম কি ভাই? তুমি এখান দিয়ে রোজ রোজ কোথায় যাও? আশ্চর্য। সে কিন্তু 'ডাকঘর'-এর অমলের থেকে এই জিজ্ঞাসা টোকেনি। মেয়েটি থেমে যায়, হাতের বই আঁকড়ে, ভিতু চোখ তুলে বলে— চাঁপা। আমি পাঠশালে যাই।

—তুমি আমার বন্ধু হবে? —চাঁপা বিমূঢ় চোখে তাকিয়ে থাকে।

—এসো না, এখানে এসো।

অনেক কষ্টে চাঁপার ভয় ভাঙিয়ে সাধাসাধি করে তাকে রকে বসায় বুবু। তাকে ভয় করে, সমীহ করে, তার সঙ্গে সসঙ্কোচে কথা বলে— এমন মানুষও আছে তা হলে? ভারি একটা সন্তোষ হয় বুবুর।

ভালো করে বিকেল হতে না-হতেই সে চাঁপাকে নিয়ে দোতলায় উঠে যায়।

—মা, ও মা, মা। —মাদুর পেতে ঘুমোচ্ছিলেন মা।

—কী হল? শ্রদ্ধা এলো না কি? ধড়মড় করে উঠে বসেন, উঠে দেখেন জটপাকানো চুল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাঁচা কয়লার মতো কালো, ময়লা ফ্রক পরা একটি মেয়ে।

—মা এই দেখো চাঁপা, আমার বন্ধু।

মেয়েটি এক পা এক পা করে পিছিয়ে যেতে থাকে। বুবু হাত ধরে থামায়।

—এই যাচ্ছিস কোথায়? এখন আমরা খেলব—মা, সে ফিসফিস করে মার কানে কানে বলে কথাটা, —কচুরি আলুর দম করে দিও আমার বন্ধুকে।

হাসি চেপে মা বেরিয়ে যান। পিসিমা বলেন— তাড়া তাড়া, ও দেবু, ও কোথাকার কোন বস্তির মেয়ে রে, হেগে ছোঁচায় না ওরা, ছি ছি সব ছুঁয়ে নেপে একেক্কার করে দিলে।

মাকে ভর করেন বুদ্ধ এবং যিশু এবং গান্ধী। আরও ভর করে ছোট মেয়ের জন্য করুণা। বলেন— থাক দিদিমণি, নিজে ডেকে এনেছে, অবোধ মেয়ে, ওরও তো একটা মান আছে। তা ছাড়া মানুষকে অমন দূর দূর করতে নেই।

—হ্যাঁ দূর দূর করবে না। কোলে বসিয়ে আদিখ্যেতা করবে। গজগজ করতে করতে তিনি কচুরি আলুর দম করতে বসেন। এ সব খাবারদাবারে তিনি এক্সপার্ট। প্রায় প্রতিদিনই কিছু না-কিছু জলখাবার করেন।

তার পুতুলের বাক্স খুলে দেখায় বুবু। আজকাল অবশ্য সে আর তত পুতুল খেলে না। বাক্সর মধ্যে পুতুলেরা সব ঘুমিয়ে আছে। মাটির পুতুল, কাচের পুতুল, সাদা পুতুল, লাল পুতুল, কড়ি পুতুল, সব যে যার মতো পরিষ্কার জামা কাপড় পরে ফিটফাট, চোখ চেয়ে চেয়ে কাঠের মতো শুয়ে ঘুমিয়ে আছে। পুঁতির গয়না কত! থোকা থোকা হার, তারা-তারা হার, মাথার টায়রা, নীল পুঁতি, সোনালি পুঁতি, সাদা পুঁতি। চোখ বিস্ফারিত করে দেখে চাঁপা। এ কী ঐশ্বর্য! এ তো সে কল্পনাও করতে পারে না। আলতা-পাতা, কালির বড়ি, একই পেন্সিলের এক দিকে লাল, এক দিকে নীল। কাচের গোল টিবি, তার ভেতর নীল সোনালি লাল সবুজ ফুলের গোছা, যতই চেষ্টা করো সে ফুল তুমি বার করতে পারবে না; একরত্তি একটা কাচের পুতুল, তার গোছা গোছা জামা, ছোট্ট ছোট্ট রঙিন কাপড়ের টুকরো। তার মাঝখানে একটা করে গোল ফুটো। ফুটো মাথায় গলিয়ে দিলেই ছোট্ট পুতুল-খোকার জামা পরা হয়ে গেল। ছিটের জামা, সিল্কের জামা, নেটের জামা। দেখতে দেখতে চাঁপার নেশা লেগে যায়।

—আমি জামা পরাব? —সে পরম সংকোচে অনুমতি চায়।

—হ্যাঁ-অ্যাঁ, না হলে খেলবি কী করে?

দেবহূতি যখন কচুরি আলুর দমের রেকাবি হাতে করে উদয় হলেন, তখন চাঁপা আর বুবু প্রায় এক মাথা হয়ে গেছে খেলার নেশায়। কাঠের পুতুল-সুবল, মাটির পুতুল শেফালি, কাচের পুতুল নিবারণবাবু, কড়ি পুতুল কাঁচু সবাই তাদের হাতে অনবরত হৃতবস্ত্র আর ধৃতবস্ত্র হয়ে চলেছে।

পিসিমা বলেছিলেন— ও মেথরের মেয়ে, শালপাতায় করে খেতে দে।

দেবহূতি কিছুতেই রাজি হলেন না। ছোট মেয়ের জীবনের প্রথম স্বয়ংবৃত সখী! একে কি অসম্মান করা যায়!

অবাক হয়ে খেলো চাঁপা। এসব কী? কী অপরূপ গন্ধ? স্বর্গীয় স্বাদ? এই পৃথিবীতেই এসব আছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিস্ময়ের ধাক্কায় সে প্রায় যেন ঘুমের মধ্যে হাঁটছে। খাওয়া-দাওয়ার পর তার হুঁশ হল। বলল— বাবা মারবে, এখন গিয়ে রাঁধতে হবে।

রাঁধবে? এই চাঁপা বুবুর মতো একটা মেয়ে সে মা-পিসিমার মতো রাঁধবে?

—তোর পিসিমা নেই?

—না।

—তোর মা?

—মা আঁতুড়ে? আমি তো অনেক দিন থে'ই রাঁধি।

আর বেশি কথা খরচ করে না চাঁপা।

—আবার আসবি ভাই, রোজ। আসবি তো?

চাঁপা ঘাড় হেলায়। সে আসবে।

পুতুল গুছিয়ে তুলতে গিয়ে বুবু আবিষ্কার করে—তার আলতা পাতা নেই, লাল-নীল পেন্সিল নেই। আর নেই কাঁচু, সেই ছোট্ট কড়ে আঙুলের মতো কড়ি পুতুল। সে বারবার সব বার করে, বারবার তোলে, উস্তম-খুস্তম হয়ে যায়। কিছুতেই খুঁজে পায় না।

—কী করছ বিদ্যা, অনেক তো খেলা হল, এবার ওঠো।

—খেলিনি তো খুঁজছি।

—কী খুঁজছ?

—আমার আলতা পাতা,...আমার কাঁচু।

অংদাদা বলল—তোর কাঁচু কাঁচুমাচু হয়ে গেছে রে মেয়েটা।

পিসিমা বললেন—চুরি। চুরি করে নিয়ে গেছে। চোট্টা একটা বস্তির মেয়েকে বাড়ি ঢুকিয়েছে। এ মেয়ের কোনওকালে বুদ্ধি হবে না।

তারপর আরও আবিষ্কৃত হল, কদিন পরে, যে বুবুর চুল সব উকুনে ভরে গেছে, উঠোনে ইঁট পেতে বসে সাশ্রুনয়নে তাকে আবার ন্যাড়া হতে হয়। সেই থোকা থোকা, থলো থলো চুল আর ওঠে না। এবার সব ঝাঁটার কাঠির মতো সোজা সোজা।

বুবু অক্লান্ত রকে বসে থাকে চাঁপাকে ধরবার জন্যে। কিন্তু চাঁপা তার পাঠশালে যাবার জন্য অন্য রাস্তা খুঁজে নিয়েছে।

প্রথমবার চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ, তবু এ পথেই বুবুরামের ক্রমমুক্তি, বন্ধুপ্রাপ্তি হয়। এই পথ দিয়েই মিনু আসে। দুধে-আলতা রঙের, কুচকুচে কালো চুলের টুকটুকে মিনু এই পথ দিয়েই যাচ্ছিল। তাকে খুঁজেছিল বুনবুন, পেয়ে গেল বুবু।

এখন, পাঠক-পাঠিকারা, আপনাদের মধ্যে যাঁরা কালো, তাঁরা কিন্তু কখনওই মনে করবেন না আমি কৃষ্ণবর্ণের সঙ্গে নোংরামি, চৌর্যবৃত্তি, এবং গৌরবর্ণের সঙ্গে পরিচ্ছন্নতা ও সদ্‌ভাবনার সমীকরণ করছি। বুবু নিজেও তো কালো, কালী কালো, কৃষ্ণ কালো, অর্জুন কালো, রাম কালো, দ্রৌপদী কালো। উপাসিত কালো, আদর্শায়িত কালো, সৌন্দর্যের বীরত্বের বুদ্ধিবৃত্তির পরাকাষ্ঠা কালোর তো অভাব নেই আমাদের পুরাণে, মহাকাব্যে, লোককথায়, লোকমানসে। বেচারি চাঁপা সত্যি কালো ছিল, আর মিনু সত্যিই ফর্সা ছিল। সেই তথ্যগুলোকেই এখানে পরিবেশন করা হয়েছে মাত্র। উপরন্তু, বুবুর সৌন্দর্যচেতনায় চাঁপা মিনুর থেকে বিন্দুমাত্র ন্যূন ছিল না। দুজনে দুরকম। মিনু যদি হয় ফলসা, চাঁপা তবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৈঁচি। দুটোই বুবু দারুণ ভালবাসে। তা ছাড়া চাঁপা ছিল যাকে বলে লক্ষ্মী-ট্যারা, ওইটুকু মেয়ের নাকে ছিল নাকছাবি, তার গায়ে খড়ি উঠেছিল—এই সমস্তই মুগ্ধ বিস্ময়ে বুবু লক্ষ করে। একমাত্র চাঁপার নখের ময়লা এবং চুলের দুর্গন্ধ তাকে একটু বিরূপ করে; এ ছাড়া চাঁপার সব বৈশিষ্ট্যই বুবুর চোখে আকর্ষণীয়। এরপর থেকে সারা জীবন বুবু লক্ষ্মী-ট্যারাদের প্রেমে পড়বে, চাঁপা না এলে, চাঁপাকে ভাল না লাগলে কি আর তা সম্ভব হত? আর একটা জিনিস বুবুকে বিস্মিত করেছিল,—চাঁপার অপূর্ব কৌশলে হাত সাফাই। সারাক্ষণ দুজনে পাশাপাশি বসে খেলল, পাশাপাশি বসে খেলো। এক মুহূর্তের জন্যেও চাঁপা একা ছিল না, অথচ চাঁপা চলে যাওয়ার পর থেকেই তার আলতা-পাতা নেই, কাঁচু নেই! এখনও সে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না যে চাঁপাই জিনিসগুলো নিয়েছে। ভূতেই নিয়েছে বোধহয়। চাঁপা চোর? চাঁপার লক্ষ্মী-ট্যারা চোখের সেই ভীত সংকুচিত দৃষ্টি, তার ভড়কে-যাওয়া হাবভাব! চোরেরা হয় সাহসী, দুর্বিনীত, চালাক-চালাক! কাঁচুকে হারিয়ে তার কষ্ট হয়েছে ভীষণ কারণ ঠিক ওই রকম কাচের কড়ি পুতুল, যার চোখমুখ পোঁছা পোঁছা, একটি চোখ একেবারেই লোপ পেয়েছে, কোমর থেকে তলা পর্যন্ত যার হালকা সবুজ ক্রমশই ফিকে আরও ফিকে হয়ে যাচ্ছে, এমনটি আর পাওয়া যাবে না, যদি পাওয়া যায়ও সে তো হবে অন্য কাঁচু। কাঁচু নাম্বার টু, তার ভালবাসা আর যত্ন যার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে আছে সেই কাঁচু চিরদিনের মতো কোথায় হারিয়ে গেল, কিন্তু চাঁপার হাত-সাফাইয়ের অপূর্বতা যেন এই কাঁচু-বিরহের যন্ত্রণাকে ডুবিয়ে দিয়েছে। এই সময়ে সে মিনুর দেখা পেল।

কিন্তু এখন সে ন্যাড়া-মাথা। মাথায় রুমাল বাঁধা, মুখের চেহারায় একটা ভোঁতা কষ্ট আর বিস্ময়ের ভাব, লোভ হলেও সে মিনুকে ডাকে না। এক দিন দেখে, দু দিন দেখে, তৃতীয় দিন সেই আশ্চর্য ঘটনাটি ঘটে।

মিনু নিজেই তার দিকে এগিয়ে আসে:

—এই, তুমি গুল্লাছুট খেলতে পার?

—আমি এক্কা-দোক্কা খেলি।

—কোর্ট কাইটবার ঢ্যালা আছে?

—আমাদের কোর্ট আছে।

—কই?

তখন উঠোনে ঢুকে বুবু তাদের এক্কা-দোক্কার কোর্ট দেখায়। উঠোনটা সিমেন্টের স্ল্যাব দিয়ে তৈরি। চৌকো চৌকো স্ল্যাব। বিনা ভূমিকায় দুজনে এক্কা-দোক্কা খেলতে আরম্ভ করে তখন। মিনু তার 'পেন্ট'-এর ভেতর থেকে একটি রিং-এ তিন-চারটি চাবির একটি রোগা গোছা বার করে; 'এক্কা-দোক্কা-তেক্কা-চৌকো জিরেন পঞ্জা হিরেন' খেলা চমৎকার চলতে থাকে। বেশির ভাগই মিনু জিতছে, বুবুও জিতছে। অন্তত ক্ষোভের কোনও কারণ থাকছে না। পুনপুন-বুনবুন দরজা ঠেলে ঢুকল।

—আলু-কাবলি-অলা এসেছে—তাদের ঘোষণা।

চার পাতা আলু-কাবলি কেনা হয়। পাতা চাটতে চাটতে বুবু বলে—এই দ্যাখ, মিনু।

চমকে মুখ তুলে তাকায় বুনবুন। —মিনু? এ তো মিনু নয়? এ কেন মিনু হবে?

মিনুর বাড়ি খুব কাছেই। তিনজনে তার সঙ্গে দৌড়ে-দৌড়ে তাদের বাড়ি যায়। গায়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গায়ে সব বাড়ি। মাঝখানে কোনওখানে হয়তো সরু একটা মেথরের গলি আছে। বেশির ভাগই নেই। সেইরকম একটা রং-ওঠা পলকা দোতলা বাড়ির অন্ধকার একতলায় থাকেন মিনুর বাবা পতিসর ইস্কুলের প্রাক্তন হেডমাস্টারমশাই, তাঁর স্ত্রী মেয়েদের স্কুলের আঁকার টিচার।

একজন মা, মাথায় ঘোমটা, হাতে শাঁখা রুলি, সাধারণ করে কাপড় পরা। হাতে হাতপাখা, ফাটা পায়ে আলতা এরকম একজন মা আবার টিচার হন? এই আশ্চর্য ব্যাপার এই প্রথম প্রত্যক্ষ করল বুবু-বুনবুন-পুনপুন। আর কী ফর্সা। কী ফর্সা! মিনুর মা মিনুর চেয়েও ফর্সা, মিনুর বাবা মিনুর মায়ের চেয়েও ফর্সা! কাঁসিতে করে বাতাসা খেতে দিলেন মিনুর মা।

—অ খুকন, তোমাগ' বাবা ডাক্তার? কায়স্থ তুমরা? আইস, বইস।

মিনুর বাবা বললেন—একদিন তুমার বাবার সাথে সাক্ষাৎ হইলে বালো অয়। ঘুষঘুষা জ্বর আর কাশি যাইতে চায় না।

বুনবুন বলল—চলুন না, আজই চলুন—আমার বাবা সন্ধে ছটার সময়ে চেম্বারে বসেন।

মিনুর মা বললেন—এতটুকুন ছেল্যা, কী সুন্দর কথা কয়। কী মিষ্ট! কান যেন জুড়াইয়া যায়। আইসবে বাবা, আবার আইসবে মা, কী নাম কইল্যা?—বিদ্যা। বাঃ—বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বং।

বুনবুন বারো নম্বরে ফিরতে ফিরতে ভাবে কালো মিনু তবে কোথায় গেল? কত মিনু আছে বাস্তুহারাদের মধ্যে? আর একটা পাবন আর একটা বিদ্যা আর একটা বরুণ তো সে আজও দেখেনি। অথচ বাস্তুহারাদের মধ্যে এত মিনু? শেয়ালদা স্টেশনের মিনুকে সে কোথায় খুঁজে পাবে? কেমন করে তাকে উদ্ধার করবে? এদের উদ্ধার করার দায়িত্ব তার আর তার বাবার। মিনু কুপার্স ক্যাম্পে যাক এটা তার ইচ্ছে নয়। একটা ছোট্ট মেয়ে যাদের সবাইকে কেটে ফেলেছে, যার মা ভারতে পৌঁছেও শেষ রক্ষা করতে পারলেন না, শেয়ালদা স্টেশনেই মারা গেলেন, সে ক্যাম্পের ভয়াবহ বিশৃঙ্খলা, জঘন্য খাবার, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কেমন করে বাঁচবে? আজ যে অন্ধকার একতলার ঘরে সে মিনুকে দেখে এলো, সেখানেও তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। মাসিমার কাছে সে শুনেছে, আজ মিনুর বাবার কাছেও শুনলো তাঁদের ওখানে কত আলো, কত হাওয়া, হাওয়ায় কী সুগন্ধ, কত শস্য, কত জল! তা হলে?

মিনুর বাবা সারদাবাবু যেদিন বাবার সঙ্গে দেখা করতে এলেন, বুনবুন তাঁদের অলক্ষে পেছন দিকে চুপ করে বসে রইল।

সারদাবাবু বলছিলেন: আপনি জানবেন ডাক্তারবাবু আমাগ' নাইন্টি পার্সেন্ট ভদ্রঘরের কেউ না কেউ স্বরাজের জইন্য আন্দোলন করছে। খাল বিল জলের দ্যাশ আমাগ', পুলিসরে নাকানি-চুবানি খাওয়াইছে। লাভ হইল কী? —অশ্বডিম্ব। বাংলা আর পাঞ্জাব সবথিক্যা বেশি স্যাক্রিফাইস করল। এই দুইটারেই কাটল। বাংলার তো যা সর্বনাশ হইল—সারদাবাবু কপাল চাপড়াতে লাগলেন—ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষ সভা কইরা কইরা কী কন জানেন? —হিন্দুরা দ্যাশ ছাড়বেন না, এ আপনাগ' দ্যাশ, ছাইড়বেন কেন? কিছু হইব না। সভায় তো এই। এ দিকে সতীন স্যানরে কইলেন—কী? কবে যাইবেন? ও বাংলায়?

সতীন স্যান তো বাইক্যাহারা—বলেন কি ডক্টর ঘোষ। এ বাংলার জিলায় জিলায় ঘুইরা আপনি ইয়াদের দ্যাশ ছাড়তে নিষেধ করলেন। আর আমায় কইছেন কি চলেন? ফার্স্ট থিং আপনারে কমু কি আপনি স্বয়ং চইলা যান, আমাগ 'লিডারি আপনারে করতে হইব না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুর্গাপ্রসাদ বললেন—ডক্টর ঘোষ এই কথা বললেন?

—তয়ে আর কইছি কী?

—আপনাদের ওদিককার নেতারা যদি ওখানে থাকতেন, আপনাদের সবাইকে নিয়ে একটা রেজিস্ট্যান্স গ্রুপ তৈরি করতে পারতেন, তা হলে হয়তো এ দুর্দশা রোখা যেত।

—দ্যাহেন ডাক্তারবাবু, আমি কই কি শরৎ বসু মহাশয়ের অখণ্ড বাংলার প্রস্তাব বেটার ছিল।

দুর্গাপ্রসাদ বললেন—এঁরা ভয় পেলেন অখণ্ড বাংলায় মুসলিম মেজরিটি হয়ে যাবে, স্লাইট হলেও তো মেজরিটি বটে। যে কোনও সময়ে পাকিস্তানে যোগ দিতে পারে।

—সইত্য, সে কথা সইত্য। কিন্তু এইটাই বা কী হইল? হিস্ট্রিতে এমুন আর একটি এক্সোডাস পাইবেন না। ইহুদিগ' দশা হইল। উয়াদের একটা মোজেস আছিল, আমাগ' তা-ও নাই। লোহিত সাগর, রক্তের সাগর আমরা পার হইত্যাছি বাপের, মায়ের, মাইয়ার, ছেল্যার, বউর, কার রক্ত নয়, কন? পার হইয়া যদি বা আইলাম, এই কইলকাতা এই পশ্চিমবঙ্গ, এইডা কি আমাগ' স্বপ্নের দ্যাশ? যেখানে যাই, দূর দূর, যেখানে যাই দূর দূর! গোরু-ছাগলেরও অধম কইরা রাখছে।

দুর্গাপ্রসাদ বললেন— কিছু মনে করবেন না মাস্টারমশাই, নিজের অস্তিত্ব বিপন্ন হলে মানুষ আর মানুষ থাকে না। এমনিতেই কী অবস্থা এ বঙ্গের! খরা, বন্যা, দুর্ভিক্ষ এ তো লেগেই আছে, এর ওপর যখন-তখন দাঙ্গা। আর এখন? সেন্টার কিছু করলে না, স্ট্যাস্টিসটিক্স্ যা শুনছি তিন লাখের কাছাকাছি লোক অলরেডি এসে গেছে, খালি বাড়ি, জমি, সব দখল নিয়ে নিচ্ছে। আপনাদেরও অস্তিত্ব বিপন্ন, আপনারাও মরিয়া অ্যাগ্রেসিভ হয়ে গেছেন। এই কামড়াকামড়ি, এই যুদ্ধ, এটাই রিয়্যালিটি, হিউম্যান রিয়্যালিটি, এই রিয়্যালিটিকে মেনে জেনেই আমাদের চেষ্টা করে যেতে হবে। এই আর কি।

—আমাগ' প্রয়োজন এখন একটি কৃষ্ণ-অবতারের —সারদাবাবু বললেন, সেই তিনি ইন্দ্র-ভজনা বন্ধ কইরলেন। বাস ইন্দ্র কুপিত হইয়া বৃষ্টি পাঠাইলেন, বৃষ্টিতে ব্রজ ভাইসা যায়। তখন তিনি গিরিগোবর্ধন এক আঙুলে তুইলা ছাতার মুতন ধইরলেন ব্রজবাসীর মাথার উপর...

—আমরাও ব্রিটিশ-ভজনা বন্ধ করেছি বলছেন? দুর্গাপ্রসাদ স্মিত মুখে বললেন, —আর তাই ব্রিটিশ এই দেশভাগ দাঙ্গার রক্তের বন্যায় আমাদের ভাসিয়ে দিচ্ছে? কে ছাতা ধরবে সারদাবাবু! ছিলেন একজন, তা তাঁকে তো গুম করে রেখেছে।

—সুভাষবাবুর কথা কইছেন তো? সারদাবাবু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন—তিনি থাকলে তো এ সঙ্কট হইতই না। দেশভাগ তিনি কখনও মাইনতেন না। ইনটেনশনের কথা যদি বইলতে হয় তো তিনি কৃষ্ণরও বাড়া ; স্বার্থ দেখেন নাই, ব্যক্তিগত লাভের জইন্য লালায়িত হন নাই, কিন্তু ক্ষমতার কথা যদি বইলতে হয়, তিনি তো অলৌকিক শক্তিধর ছিলেন না ডাক্তারবাবু। মানুষের পক্ষে যা সম্ভব তিনি তারও অধিক করলেন, কিন্তু মিরাক্ল্, তিনি কি কইরা ঘটাইবেন। কলি কালে অবতার পুরুষেরও মিরাকুলাস পাওয়ার থাকে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নবম অধ্যায়

জেনেসিস

মিরাকুলাস পাওয়ার কী মাস্টারমশাই?—কানুমামুর মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞেস করে বুনবুন।

মাস্টারমশাইয়ের বয়স মোটেই বেশি নয়। কিন্তু তিনি একটু ভারিক্কি। বিজ্ঞ সাজতে চেষ্টা করেন।

—মিরাকুলাস-টুলাস জানি না খোকা, ক্যালকুলাসের কথা বলতে পারি তবে সে তো তুমি এখন বুঝবে না। মানুষ যদি হতে চাও তবে ওইসব মিরাক্‌লট্‌ল নিয়ে মাথা ঘামিও না। উচ্ছন্নে যাবে।

কানুমামু চোখের ইশারা করে— মাস্টারমশাই রেগেছেন, ভাগ্‌ এখান থেকে। কানুমামুর ঠোঁটের ওপর কচি ঘাস, কানুমামুর চোখ চকচক নাক চকচক। সে এখন মন্ত্রমুগ্ধের মতো মাস্টারমশাইয়ের পাঠ্যসূচীবহির্ভূত বক্তৃতার ইন্দ্রজাল শুনবে। জার্মানি-ইংল্যান্ড-রাশিয়া, মার্কস-এঙ্গেলস, ক্লাস-ওয়র, ক্লাস-এনিমি, প্রোলেটারিয়েট....।

বুনবুন খপখপ করে তুলে নেয় তার বইখাতা শব্দ করে চলে যায়। মাস্টারমশাই চশমা খুলে কাচ মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করেন—কী হল? ও কি রাগ করলো না কি?

কানুমামু অপ্রস্তুত মুখে বলে— ও একটু মেজাজি ছেলে, জানেনই তো!— ভাল ভাল, মেজাজি হওয়া ভাল— মাস্টারমশাই চশমাটা পরে ফেলে ওপর নীচে দেখে নেন- ওই সব বিনয়-টিনয়....বিদ্যা বিনয়ং দদাতি শ্রদ্ধয়া দেয়ম্‌ অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম—সব অবসলিট, বোগাস। বিনয় আবার কী? কেনই বা? আই হ্যাভ এ কোয়েশ্চন। পারো তো জবাব দাও, নেহি তো ভাগো হিঁয়াসে। আরে বাবা শ্রদ্ধায় কেউ দেয়? দেয় বাধ্য হয়ে। কেড়েকুড়ে নিতে হয়। নিয়ে নেবে এই ভয়ে চালাকরা আগে থেকে দিয়ে দেয়, বুঝলে? দাবি করতে শেখো, ডিমান্ড, মাথা উঁচু করে চাও, প্রতিবাদ করো, দলবদ্ধ হও, না দিলে ভাঙো চোরো, তছনছ করো। মেরে পাট করে দাও। লাট করে দাও সব।

চারিদিকে সাম্রাজ্য পতনের শব্দ হয়। ধ্বংসস্তূপের ওপর ধিকি ধিকি আগুন জ্বলে। সেই আগুনের ওপর দিয়ে গাজনের সন্ন্যাসীদের মতো খালি পায়ে ছুটতে থাকে উন্মত্ত জনতা। কামান গর্জে ওঠে, ট্যাঙ্ক গড়ায়, ঝাঁকে ঝাঁকে বম্বার উড়ে যায়। জলপাইগুড়ি-পশ্চিম দিনাজপুর-দার্জিলিং থেকে যাদবপুর-বেহালা-বালি নদিয়া-হাওড়া-হুগলি-বর্ধমান সর্বত্র মাটি ফুঁড়ে বাঁশের কেল্লা উঠতে থাকে অরবিন্দনগর, আজাদগড়, বাঘাযতীন। বিজয়নগর, ঠাকুরপুকুর, পল্লীমঙ্গল, মাহেশ উদ্বাস্তু শিবির, সেবা গ্রাম, শহীদ কলোনি, মুক্তিনগর, খুদিরাম পল্লী— অজস্র অজস্র, ছিন্নমূল ক্ষুধিত আশাহত, মরিয়া মানুষের নতুন উপনিবেশ, নতুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপনিবেশবাদ। আর সব সংগঠনকে একত্র করে উঠে দাঁড়ায় ইউনাইটেড সেন্ট্রাল রিফিউজি কাউন্সিল। মিছিল মিছিলে ক্রমে কণ্ঠরোধ হয়ে যেতে থাকে শহরের। ঘৃণা, পুলিশের লাঠি, জনতার ইঁট-পাটকেল, মার, পাল্টা মার সমস্ত মানবীয় অনুভূতির গলা টিপে ধরে। জল ঘোলা হয়ে যায়। ঘোলা জলে চমৎকার মাছ ধরে চতুর চালাক।

বরুণ অনাদিপ্রকাশকে জিজ্ঞেস করে— দাদাভাই, অবতারপুরুষ কী? কে?

—কেন? আমি যে দশাবতার স্তোত্র গাই, শোননি?

প্রলয় পয়োধি জলে ধৃত বানসি বেদম্
বিহিত বহিত্র চরিত্রমখেদম
কেশব ধৃত মীন শরীর জয়জগদীশ হরে...

—ও তো সেই মীন, কূর্ম, বরাহ, বামনদের রূপকথা।

—রূপকথা? তা বোধহয় নয় বুনটু। বড় হয়ে যখন প্রাণীর বিবর্তনের কথা পড়বে তখন এগুলো আর রূপকথা মনে হবে না। রূপক হয়তো, রূপকথা নয়।

ভারি বিরক্ত হয় বরুণ,— মাছ, কচ্ছপ, বরাহ ('শুয়োর' কথাটা বলা চলে না) —এরা আবার কিছু করতে পারে না কি?

—পেরেছিল হয়তো। সেই সময়ে। তবে মাছ-কচ্ছপদের যদি তোমার মনে না ধরে তো রাম, বুদ্ধ এঁরাও তো ছিলেন।

—ওঁরা কী করেছেন?

—রাম মানে পরশুরাম একুশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন। আর আমাদের অযোধ্যার রামও তো দুর্বৃত্ত রাবণ কুম্ভকর্ণকে ধ্বংস করলেন।

—পরশুরাম সব রাজাদের মেরে শেষ করেছিলেন? বাঃ। এটা কি ভাল কাজ নাকি? উনিই তো বাবার কথায় মাকে মেরে ফেলেছিলেন। উনিই তো কর্ণকে রথ বসে যাবার শাপ দিলেন শুধু শুধু।

—রাজারা হয়তো অত্যাচারী হয়ে গিয়েছিলেন।

—আর কর্ণ? কর্ণ ওঁর ঘুম যাতে না ভাঙে তাই বজ্রকীটের দংশন সহ্য করলেন আর উনি শাপ দিলেন। রামও তো সীতা বিসর্জন দিয়েছিলেন। ধ্বংস করা আর শাপ দেওয়া ছাড়া এঁরা কি কিছু জানেন না?

—তা যদি বলো বুনটু তো বুদ্ধ আছেন। কেশবধৃত বুদ্ধশরীর। তা ছাড়া খ্রিস্ট? খ্রিস্টকেও তো আমরা অবতারই ধরি।

—ধুর, বুদ্ধ তো খালি সন্ন্যাসী হতে বলেন। আর মাছ-মাংস খেতে বারণ করেন। খালি লড়াই করো না। হিংসা করো না। আর খ্রিস্ট তো আরও বোকা। ক্রুসে ওকে গেঁথে দিল। উনিও গেঁথে গেলেন। এক গালে চড় মারলে আর এক গাল ফিরিয়ে দাও। ধুত্।

দাদাভাই বলেন— তা হলে তো ভারি মুশকিল বুনটু, মেরে শেষ করা, ধ্বংস করা তা-ও তোমার বরদাস্ত হচ্ছে না। আবার অহিংসা, সন্ন্যাস, ক্ষমা, সহনশীলতা তা-ও তুমি পছন্দ করতে পারছ না। কী করি এখন? কী করেন বেচারি আবতারেরা?

—সব অবতারের বেলাতেই যে আপনি কেশবধৃত কেশবধৃত করছেন, কেশব কে?

—যাঁরা এই অবতারদের কথা লিখেছেন তাঁরা ঈশ্বর অর্থাৎ জগৎকারণ আর কেশব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃষ্ণকে এক দেখতেন।

—আর আপনি? আপনি কী দেখেন?

দাদাভাই হেসে বলেন— আমি? আমি এই বুনটুকে দেখি। কেশবধৃত বালশরীর জয় জগদীশ হরে।

তখন বরুণের মনে পড়ে যায় তারা তিনজন অষ্টমগর্ভ। অষ্টমগর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মেছিলেন, এ কথা তারা সারা ছোটবেলা জুড়ে কতবার শুনেছে। দাদাভাই কি ঠাট্টা করতে পারেন তার সঙ্গে? কখনই না। দাদাভাই কি ভুল করতে পারেন? যে দাদাভাই ই-দাদার চেয়েও ভাল অঙ্ক জানেন, পমদিদির থেকেও ভাল সংস্কৃত জানেন, তিনি করবেন ভুল?

ভুল সে-ই করেছে। তারা-ই করেছে। ভুলে গেছে তারা কে। সে সংকল্প করে প্রাণপণে মনে করবার চেষ্টা করবে তার মধ্যে কোথায় লুকিয়ে আছে সেই নীলাভ শরীর, সেই বিশ্ব জনমোহন বাঁশি, সেই কালভৈরব চক্র। তখন সে যা ইচ্ছে করতে পারবে।

শনিবার সন্ধেবেলায় চার নম্বরে গিয়ে সে পুনপুন আর বুবুকে চুপিচুপি কথাটা বলে। ওরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না।

—আমরা তিনজন এক এটা তো বিশ্বাস করিস? বুনবুন বলে।

—আগে বিশ্বাস করতুম, এখন করি না— বুবু সখেদে বলে— কেন জানিস? তোরা এখন অ্যালজেব্রা কষছিস, আর আমি দশমিকই পারছি না। তোরা এক, আমি আলাদা।

পুনপুন বলে—এ কথাটার কোনও মানেই হয় না। আমরা কি তোর মতো আটা মাখতে পারি? রুটি বেলতে পারি? মাছ বাছতে পারি?

বুনবুন বলে— সবাই মিলে সব পারব।

বুবু বলে— আমার অনেক দিনই মনে হত, আমি একজন পরী। কে শাপ দিয়েছে তাই তোদের কাছে জন্মেছি। একদিন ঠিক ফুস করে উড়ে যাব।

রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে তিনজনে ঠাকুমার একহারা মাদুরটা নিয়ে ছাতে যায়। হাওয়ার স্রোত বইছে এখন। হাওয়া তো নয়, যেন সাগর, ঢেউয়ে ঢেউয়ে সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

—সেই যে চুপ করে বসে থাকা খেলাটা বুজবুজদিদি খেলাত, সেইরকম করব? মাথায় বুরুশের মতো চুল, বোতামের মতো চকচকে চোখ, লাল ফুটি-ফুটি ফ্রক পরা বুবু জিজ্ঞেস করে।

পুনপুনের রোগা কোমর থেকে কালো ঝলমলে পেন্টুল ঝুলছে, মাথার পেছন দিকের কয়েক গাছি চুল খাড়া-খাড়া, সে বলে—আমি জানি, পাকুমার পরশমানিক যখন হারিয়ে যায় তখন রোজ আমি ছাতে বসে পদ্মগোখরোকে ডাকতুম—হে গোখরোঠাকুর, হে গোখরো ঠাকুর, হে গোখরোঠাকুর পরশমানিকটা আমায় পাইয়ে দাও।

বুনবুন খুব অসহায় বোধ করে। ব্যাপারটা এরকম নয়। চোখ বুজিয়ে চুপ করে তো রাজ্যের খেলনাপাতি, চকোলেট-লজেন্সের কথাও ভাবা যায় তাতে কী করে কাজ হবে! নিজের ভেতরে তলিয়ে যেতে হবে। দেখতে হবে। আর প্রার্থনার কোনও প্রশ্নই নেই। কারণ সে, সম্মিলিতভাবে তারা নিজেরাই তো সেই অবতারপুরুষ যাঁর জন্য সারদাবাবুদের, দুর্গাপ্রসাদদের আরও কত কোটি কোটি মানুষ, দুর্গত মানুষ, অন্যায় অবিচারে ক্ষত-বিক্ষত মানুষের প্রার্থনা। এত কথা সে বোঝাবার মতো করে ভাবতেও তো পারছে না। খালি অস্পষ্টভাবে বুঝছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই কিছু বলতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত সে কিছুই বলে না। চুপ করে বসে থাকা খেলাটাই শুরু হয়ে যায় অতঃপর। খুব হাওয়া দেয়, সুপুরি গাছগুলো খুব দোলে। সিংবাড়ির ছাতের আলসেতে একটা প্রকাণ্ড অশথ গাছ আর একটা পাকুড় গাছ গজিয়েছে, তাতে ঝর ঝর থর থর শব্দ হয়, চাঁদ ক্রমশ মাঝ আকাশে ওঠে, তারাদের ঝেঁটিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। আকাশ থেকে এক অন্ধকার পুরুষ নেমে আসতে থাকেন, পৃথিবীব্যাপী এক মহাজলধিতে ডুব গালেন তারপর দিক-বিদিক আড়াল করে উঠে দাঁড়ান, বরুণের হাতে ফিরিয়ে দেন লক্ষ লক্ষ শিশুর, নারীর, পুরুষের সঞ্জীবিত প্রাণকোষ। অজস্র শিশু তাঁর হাতের মুঠো থেকে, নিশ্বাস বায়ু থেকে, নেত্র থেকে জ্যোতির্বিন্দুর মতো ঝরে ঝরে পড়ে। সেইসব মিনুদের প্রত্যেককে বাবা-মা-ঘর খুঁজে দিতে থাকে বরুণ। সে মুঠো করে তুলে আনে মাতৃস্তন, নারীদের শূন্য বুকে স্তন যোজনা করে, পুরুষদের কুক্ষিতলে লিঙ্গযোজনা করে দিগবিসারী মাঠে মাঠে সোনালি শস্য দোলায়, নদীতে নদীতে মঙ্গলবারি বওয়ায়, আকাশে আকাশে ভাসিয়ে দিতে থাকে কল্যাণমেঘ। দিতে দিতে সে দেখে পাবন গানঘরে একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিল, সেই প্রদীপ ক্রমে অধূমক অগ্নি হয়ে জ্বলে, তাতে পুড়ে যেতে থাকেন রাঙাজেঠু, নতুন কাকু, বর্মার জেঠু, কর্তামা, ছবিরানির বাবা-মা, ছোট ঠাকুর্দা, জিনাকাকিমা, এক সিং-বাড়ি থেকে আরও অনেক সিং-বাড়ির জ্যাঠা-কাকা জেঠিমা-কাকিমা-পিসিমা এবং ঝাঁটাগোফ, ফাঁকা চুল, তেলমাখা চটচটে দুর্মুখ দুর্ভাগা মানুষ সব। ক্রমে আগুনের ভেতর থেকে স্বর্ণাভ এক পিতামহী স্বর্ণাভ পরিজনেদের কোলে কাঁখে করে হেসে কেঁদে বেরিয়ে আসেন। পাবন জিজ্ঞেস করে—তুমি কি তা হলে পরশমানিক পেয়েছো?

—এই তো—সোনারঙের মানুষগুলি দেখিয়ে তিনি বলেন। ছবিরানি আসতে থাকে। তার ভুরু গজিয়েছে, শরীর থেকে থলো থলো চর্বি সব ঝরে গেছে, ছবিরানির পেছন পেছন আসতে থাকে তার অকালমৃত বোনেরা। লীলাময়ী এসে তাকে কোলে তুলে নেন, অ্যালিস খুলে দেন তাঁর স্বর্ণভাণ্ডার, মানিক হাসতে হাসতে হাসতে বলে—যাকে ইচ্ছে তাকেই এ সোনা দিতে পারিস। কিন্তু হাজার দিলেও দরকারের বেশি কেউ পাবে না। কেউ না।

বরুণ বলে—বিদ্যা এবার তোর দান। —মনে মনে বলে, এখন সবাইকার মন এক হয়ে আছে বলে সবাই সবাইকার কথা শুনতে পায়।

বিদ্যা কী জানে? কী পারে? সে তার ছোট্ট জীবনে যত মানুষ দেখেছে, যত স্বভাব, যত আচার, আচরণ এবং যা দেখেনি সেইসব মানুষ, ভাষা, ধর্ম, বিশ্বাস সব আটা ময়দার মতো মিশিয়ে চালতে থাকে। তারপর তাতে স্নেহপদার্থের ময়ান দিয়ে ঠেসে ঠেসে মাখে, মাখতে মাখতে এমন মাখে যে এতটুকু খিচ থাকে না। পিসিমা বলেন—ময়দার পাটে এ মেয়েকে কেউ হারাতে পারবে না। মা প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকান। সে কৃতার্থ হয়ে যায়। ভীষণ আহ্লাদে সে লেচি কেটে কেটে বরুণ-পাবনের দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেয়। দেখা যায় ঐ সমস্ত মানুষ, সমস্ত আচার, সমস্ত অভ্যাসের অবস্থান পাল্টে গেছে, একটা লেচিতে যদি পিসিমা-ঠাকুমা দুই মনো, তবে আর একটা লেচিতে গলাগলি করে দুর্গাপ্রসাদ পুলক শ্রদ্ধা, একটাতে যদি প্যাটেল জিনাহ তো আর একটাতে সুভাষ নেহরু, একটাতে যদি টলস্টয়ের পায়ের তলায় হিটলার, তো আরেকটাতে লেনিনের সঙ্গে গান্ধীজি। নিবেদিতার পায়ের তলায় এড়ুইনা মাউন্টব্যাটেনকে এনে ফেলে ওরা, সারদামায়ের পরিবেশনে খেতে থাকেন চার্চিল-ট্রুম্যান-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ট্যালিন, বিবেকানন্দর সঙ্গে ভিড়ে যান রাসেল, আর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কামাল আতাতুর্ক। এইসব মানুষদের অধিকাংশকেই যে ওরা চেনে না তাতে কিছু এসে যায় না কারণ মানব অস্তিত্বের মূল উপাদানগুলোকেই ওরা মিলিয়ে মিশিয়ে নিয়েছে। মানুষের পাট সেরে তারপর গোটা পৃথিবীটার ভূগোল এবং ইতিহাস নিয়ে টানাটানি করতে থাকে তিন জোড়া অপটু হাত, বুঝি এই পৃথিবী, এই সভ্যতার উপকরণগুলোর বিন্যাস অদলবদল করে দিয়েই গড়ে ফেলতে চাইছে এক চতুর্থ পৃথিবী।

রাত এগারোটা বেজে গেছে। দেবহূতি শুতে এসে দেখেন তিন মূর্তি নেই। এত রাত তাঁর হয় না। বাসন মাজার লোক আসছে না। রাতে সবার খাওয়ার পর রান্নাঘর ধুয়ে, উনুন নিকিয়ে, সমস্ত বাসন মেজে উঠেছেন। তারপরে বেশ করে সাবান মেখে চান করেছেন, আরও একটা বিলাসিতা করেছেন, উবসী পাউডার ছড়িয়েছেন গায়ে, তারপর ধোপার বাড়ির পাট ভেঙে একটি ভোমরাপাড় শাড়ি পরে শুতে এসেছেন। এসে দেখেন এই।

কোথায় গেল? কদিন ধরেই ছেলে দুটোকে সূর্য-অংশুর ঘরে পাঠাবার চেষ্টা করছিলেন, তাই গেল না কি? মেয়েটাও নিশ্চয় ট্যাং ট্যাং করে গেছে। কই না তো? ইন্দ্র-পুলকের ঘর ফাঁকা, ইন্দ্র গেছে কানপুরে, ইন্টারভিউ দিতে। দুর্গাপ্রসাদ ওপাশে তক্তপোষে নাক ডাকাচ্ছিলেন। দেবহূতি ডাকেন— শুনছো? ছোট তিনটে কোথায় গেল বলো তো?

—কোথায় যাবে? দেখো ভালো করে।

—সব দেখেছি।

—মেয়েদের ঘরে?

—ও ঘর তো ওরা কখনই খিল দিয়ে দিয়েছে। ঢুকতেই দেবে না ওদের।

—ছাতে দেখেছো?

—ছাতে? এত রাত্তিরে? ভিতুর অবতার তো এক একটি।

দুজনে ছাতে যান। হু হু হাওয়া দিচ্ছে। বেলফুলের গন্ধে সব ছমছম করছে।

দেখেন নিভন্ত জ্যোৎস্নার ছাতে, এক চিলতে মাদুরের ওপর, হাত পা ছড়িয়ে তিনজনে ঘুমিয়ে আছে।

...আর সপ্তম দিনে ঈশ্বর তাঁর যা-কিছু গড়ার কাজ সব শেষ করে ফেললেন— আলো-আঁধার আকাশ মাটি। গাছপালা, মানুষজন, মন মেজাজ সভ্যতা-সংস্কৃতি। চারদিকে চেয়ে দেখলেন আহা সব বেশ তৃপ্তিকর, চমৎকার। আগেকার ভুলগুলো শুধরে নেওয়া গেছে। তখন তিনি সমস্ত, সমস্ত, সমস্ত কাজ থেকে বিরত হয়ে নিশ্চিন্তে নিদ্রা গেলেন।

॥ তৃতীয় স্কন্ধ-প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~